সূচীপত্র

মুক্ত বেণীর উজানে

জীবন বড় ছোট। কথাটা একসঙ্গে উচ্চারণ করলে, বড়-ছোটয় কেমন যেন মেশামেশি হয়ে যায়। অতএব 'বড়' বাদ, জীবনটা ছোট। আমি যখন বলি, কথাটা তখন আমার। কিন্তু কথাটা তো শুনেছি নানা ভাষায়, নানা স্বরে, সুরে। আজ অনেক ঘাট পেরিয়ে এসে, কথাটা আর মুখ ফুটে বাজতে চায় না। বাজনদারটি যে কে, তাকে দেখতে পেলাম না, চিনতে পেলাম না, আজ পর্যন্ত। কিন্তু কোথায় যেন সে নিরন্তর বাজিয়ে চলেছে, ছোট এ জীবন। ক্ষণস্থায়ী। নদীর স্রোতের প্রায়।

কথাটা কখন মনে হয়? কখন, কোন্ সময়ে ভিতর থেকে ধ্বনি দেয়? মানুষ যখন ভেজালের চালে চলে, তখন কী? জাল ভেজালেরই বা কী কথা। যার যেমন জীবন, সে তেমনি চালে চলছে। তা থেকে কেমন একটা সন্দেহ জাগে, ধ্বনিটা সবাই শুনতে পায় কী?

এ জিজ্ঞাসাতেও আবার গণতন্ত্রের আওয়াজ খেতে হবে না তো, অজানা অলক্ষ্যের ধ্বনি কারোর একলার ধন না। সবাই শুনতে পায়। তবে জোড় হস্তে নিবেদন, জিজ্ঞাসাটা তুলে নিলাম। রণমদে মত্ত হয়ে, ধরো কাটো মারো, একে করো তুক, ওকে কষো তাগ্, আপন স্বার্থে আজ তুমি ভালো, কাল মন্দ, নানা প্যাঁচ পয়জারের খেলায় বড় সুখের দর্পে লড়ছে। বহু কায়দায়, 'আমি' ছাড়া দুনিয়া নেই, 'ছোট এ জীবন'-এর ধ্বনি তুমি শুনতে পাও না, এমন উক্তি আর করবো না। বরং গণতন্ত্রের বক্রোক্তিটা নিজের কানেই কেমন খচ্ খচ্ করে বাজছে। চারদিকে এতো যে ছুটোছুটি লড়ালড়ি, জগত জুড়ে তুলকালাম কাণ্ড, সবই তো সেই ধ্বনির ধাক্কায়, ছোট এ জীবন। ক্ষণস্থায়ী। ত্বরায় চলো। তড়িঘড়ি চলো।

কথাটা মানুষের অবচেতনের ঢেউ কী না, বুঝতে পারি না। কিন্তু জীবন ছোট, অতএব, রাখো তোমার জীবন ধারণের খেলাখেলি, ভাঙবে সব জারি-জুরি, যখন জুতবে বাঁধবে তোমাকে চারপায়ায়, নিয়ে যাবে শ্মশান খোলায়, রইবে না তো কিছুই বাকি, বৈরাগ্যের এ কথাটা কে মানতে পারে। যদিও বৈরাগ্যের এই বাণী আসলে মানব জন্মের এক দিকটাকে বারে বারে দেখিয়ে দিতে চায়, বৈরাগীর মতো আমি পারি না, সেই পথের পথিক হতে। একটা কথা, সংসারের আটপৌরে সীমানায় বলে, 'মরার বাড়া গাল নেই'। কথাটা শুনতে খাটো, আসলে মস্ত বড়। এমন অমোঘ কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে লাভ কিছু হয় না। আসল কথাটা বোধ হয় 'ধর্মে চলো'।

বলেও ফ্যাসাদ। ধর্ম আবার কাকে বলে? না, ধূপ দীপ জ্বালিয়ে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে, ঠাকুরের দরজায় ঢিপ ঢিপ কপাল ঠোকার কথা বলিনি।

জীবন ধর্মের কথা বলেছি। কর্মের সঙ্গে ওটা জড়াজড়ি। 'কর্ম' কথাটা না বললেও চলে, জীবন ধর্মই আসল কথা। জীবন ধর্ম, জীবনলীলার নানা রঙে ছড়াছড়ি। এ জীবনলীলা একান্ত মানুষের, সেই কারণে মহতের মহান আবিষ্কার, দুর্লভ মানব জন্ম। অনিবার্য লয় তার মৃত্যুতে। যদি মানো, দুর্লভ এ মানব জন্ম, তবু কেউ হিসাবের অঙ্ক কষে গায়ে ছাপিয়ে দেয়নি, এ লীলার আয়ুষ্কাল কতোটা। আছে জীবন ধর্মে, তারই অভিজ্ঞতা, ছোট এ জীবন।

কথাটা নিয়ে অনেক বিলাপ, আক্ষেপ বিক্ষেপ শুনেছি। তবু কোথায় একটা ঠেক লেগে যায়। আমি যখন বলি, তখন কথাটা আমার। কিন্তু আমি যখন নেই, তখনও জীবন নিরবধি। চলমান বিশাল জীবনস্রোতকে ছোট বলি কেমন করে। জগত জুড়ে যার কূল নেই, সীমা নেই, অহর্নিশের সেই মহাজীবনকে নিজের একার সীমায় ধরা যায় না। বাঁধা যায় না। সেই কারণে কি, আমার তোমার ছোট জীবনের আর্তি, কিন্তু মানুষ থেকে যা[illegible] অমর? মানুষ যদি অমর, তবে জীবন ছোট কেন?

ছোট জীবনের সৃষ্টি লয়ে, অমর মানুষের ধারা অব্যাহত। কথাটা দৈব-বাণীর মতো বেজে ওঠেনি। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটা ছবি যেন চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে দেখছি। মানুষ অমর, মানুষ অমর।

তবু সেই বাজনদারটি বাজিয়ে চলেছে, ছোট এ জীবন। ধর্মে থাকো। ত্বরায় বা মন্থরে, কাল তোমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তোমার লীলা তুমি কর। সাঙ্গ হবার দিনটির সূর্যোদয়ের হিসাব তোমার হাতে নেই। কথাটা ভাবলে কষ্ট হয়। মহামানব তো নই। পূর্ণতার প্রশ্ন জাগে, অথচ জানি, অপূর্ণতার ছায়া আমার পিছনে ঘুরছে। জন্ম মুহূ[illegible] থেকে এই ছায়া আমার পায়ে পায়ে ফিরছে। সময় আমার হাতে নেই, সম[illegible] আছে ছায়ার হাতে।

তাই যদি, তবে বলি, থাক ছোট জীবনের কথা। শরিক হয়ে যাই অম[illegible] মানুষের চলমান ধারায়। ছোট জীবনের বিলাপ থেকে, দুর্লভ জন্মের রূপের সন্ধানে যাই। মরে যাই, কী মন প্রবোধের কথা! দুর্লভ জন্মের রূপের সন্ধান। তবু যদি পথ চেনা থাকতো। অতএব, থাক সুলভ দুর্লভ জন্ম-রূপের সন্ধান। তার চেয়ে, চলো আপন পথে।

আপন পথেই চলেছিলাম। তার মধ্যেই ছোট এ জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব বাখানি, আসলে একজন কানে তুলে দিয়ে গেল। শ্রবণ থেকে মনে, তারপ[illegible] যতো আন কথার ফুলঝুরি। চলেছিলাম গঙ্গার কূল ধরে উজান বহে। দূরে[illegible] পথে না, বলতে গেলে ঘরের আঙিনায়। বংশবাটি বলো, আর বাঁশবেড়ে, [illegible] পাটকলের শেষ সীমানায় মোটর বাস, শেষ কয়েকজন যাত্রীকে নামিয়ে দি[illegible] গেল। ফেরার পথে তুলে নিয়ে গেল অপেক্ষমান দুই চার যাত্রীকে।

রাস্তা শেষ, কাঁচা রাস্তার শুরু। বাঁদিকে বিঘা বিঘা পোড়ো জমি, জঙ্গলে ভরা। বড় গাছও কিছু কম নেই। মনে হয় যেন কোনো বড় বনের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি।

ডানদিকের ছবিটা একেবারে আলাদা। বিরাট লম্বা এক গুদাম ঘর, যার শেষ দেখা যায় না। গঙ্গাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। গুদাম ঘরের মাথার ওপরে টিনের ঢাকনাগুলো অর্ধচন্দ্রাকার। যেন বড় বড় ঢেউয়ের সারি। রাস্তার এদিকে কোনো জানলা দরজা নেই। তবু দেখছি, কেমন করে যেন টিনের দেওয়াল কেটে ছোট বড় ফোকর করা হয়েছে জায়গায় জায়গায়। তারই এক ফোকরে, দুই তরুণী কন্যার মুখ। বোধহয় সিঁথেয় কপালে সিঁদুরের চিহ্নও রয়েছে। আমার সঙ্গে তাদের চোখাচোখি হলেও তারা আছে তাদের মনে। কী যেন বলাবলি হচ্ছে, আর খিলখিল হাসি, মাঘের এই নরম রোদের নিরিবিলিকে ঝংকৃত করে তুলছে।

দু পা যেতেই আর একটি মুখ। আর এক ফোকরে। তরুণী বটে, কুমারী না সধবা বুঝতে পারছি না। গোল মাজা ফরসা মুখের বেশি দেখা যায় না। ডাগর চোখের দৃষ্টি আনমনা উদাস।

ঢেউ খেলানো টিনের চালা, বিরাট লম্বা গুদাম ঘরের ফাঁকে ফোকরে হাসি খুশি, উদাস গম্ভীর মেয়েদের মুখ। ব্যাপার কী? বন্দীশালা নাকি? ভিতর থেকে ভেসে আসছে নানা স্বরের বামাকণ্ঠ। তার মধ্যেই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ঝগড়া-বিবাদের চিৎকার চেঁচামেচি। সবই স্ত্রী-স্বর। ঝগড়া-বিবাদের দু-চারখানি বিশেষণ যা কানে আসছে, কান ঝাঁকিয়ে ওঠার মতো। 'শতেক খোয়ারি' 'ভাতারখাগী' যদি বা উচ্চারণের যোগ্য বাকি কয়েকটিতে কেবল তোবা। তোবা। ভাষা যে ওপার বাঙলার, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে এ রকম বিশাল গুদাম ঘর আরও অনেক জায়গায় দেখেছি। সেই সব গুদাম ঘরে মাল আছে কী না জানি না। মানুষ দেখিনি, নিঃসন্দেহে। তাও আবার কেবল স্ত্রীলোক। একটি সরু লম্বা ফোকরে দেখছি, মাথায় শাদা ধবধবে ছেলেদের মতো কাটা চুল, লোলরেখা বৃদ্ধার মুখ। শরীরের অংশ প্রায় চোখেই পড়ে না। আপন মনে বকবক করে চলেছে। আর গুদামের ঢেউ খেলানো চালের ওপরে বছর সাত আটেকের তিন চারটি ছেলে, এই মাঘের সকালে খালি গায়ে হনুমানের মতো লাফালাফি করছে। সারা গায়ে রোদ মাখামাখি। শীতের পরোয়া নেই।

ব্যাপারখানা কী? জবাবের আশা নেই জানি। পথ চলতে অনেক ব্যাপার ঘটে, ঘটনা ঘটে অনেক। সে তো সামান্য কথা। জীবনেরই অনেক কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। অতএব, নিরালা পথ চলতে, পথের মাঝে হঠাৎ এক মিলিটারি গুদাম বাড়ির টিনের দেওয়ালের ফোকরে ফোকরে তরুণী, বৃদ্ধার মুখ, ভিতর থেকে ভেসে আসা বামাস্বরের চিৎকার চেঁচামেচি, চালার

ওপরে খালি গায়ে ছেলেদের লম্ফঝম্ফ, কেন, কী বৃত্তান্ত তার জবাব না পেলেও চলবে।

গুদামের মাথা ডিঙিয়ে রোদ এখন আমার কাঁধে। চলার বেগটা কিঞ্চিৎ মন্থর হয়ে এসেছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁচা রাস্তা ক্রমে নীচে নেমে চলেছে। কিছু এগিয়ে বাঁয়ে বেঁকে দূরে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে। ওপরের সীমানায় একটা বড় সাঁকোর লোহার বিম আকাশের গায়ে।

'নিখুঁজি, বুইতে পারলেন তো বাবু, নিখুঁজি। লতুন এয়েছেন ইদিক পানে, না?' ভাঙ্গা ভাঙ্গা সরু স্বরের বুলি শোনা গেল আমার বাঁদিকে।

ভুতের ভয় থাকলে, মাঘের এই সাত সকালেই কাছা খুলে দৌড় দিতাম। বাঁদিকে গাছপালায় নিবিড় খোলা পোড়ো জমির আশেপাশে আসশ্যাওড়ার জঙ্গল। বাস থেকে নেমে, পা বাড়িয়ে একটা লোকও চোখে পড়েনি। যে-দু-চারজন যাত্রী আমার সঙ্গে নেমেছিল, তারা যে কখন কোন্‌দিকে হাঁটা দিয়েছে, লক্ষ্য করিনি। রাস্তাটাকে একেবারে নির্জন বলা যাবে না। দূরে, বাঁদিকের নীচু খোলা মাঠে গরু চরাচ্ছে এক রাখাল পুরুষ। হাঁটুর ওপরে কাপড়, গায়ে একটা সামান্য জামা, মাথায় গামছা বাঁধা। তার কাছাকাছি একটি বউ আর এক বালিকা, গোবর কুড়োচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছিল, তারা সবাই অবাঙালী। পিছনে, পাটকলের শেষ সীমানায়, ছোট একটা চায়ের দোকান, একটা পান বিড়ির চালা ফেলে এসেছি। আমার আশেপাশে আর কেউ ছিল বা রয়েছে, দেখিনি। টেরও পাইনি।

মিলিটারি গুদামবাড়ির পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন আপন মনে চলছি আর ভাবছি, গুদামবাড়ির রহস্যের জবাব মেলার আশা নেই, তখনই হঠাৎ ভাঙা সরু স্বরের আওয়াজ। যেন নিজের ছায়াটাই অন্য সুরে কথা বলে উঠলো। অবাক চোখে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, খাটো রোগা একটি লোক। ময়লা লুঙ্গির ওপরে মোটা সুতির কাপড়ের একটা রঙচটা ময়লা চাদর। মাথার কালো চুল ছোট করে ছাঁটা। কিন্তু গোঁফদাড়ির বহর আছে। দেখলাম, গোঁফদাড়ির ফাঁকে বড় বড় হলুদ দাঁতে বিকশিত হাসি। বড় বড় চোখ দুটিও প্রায় হলদে। সরু নাক। সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে ভারি নিরীহ। আমার বাঁয়ে, একেবারে পাশাপাশি নালা, দু এক কদম পিছনে। খালি পা দুটো ফাটা চটা। নখ কাটবার অবকাশ মেলেনি অনেক দিন, দেখলেই বোঝা যায়।

চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। তার প্রথম কথাটা ধরতে পারিনি, 'লতুন এয়েছেন ইদিকে, না?'

বুঝতে পেরেছি। সেই কথাটার জবাব দেবার আগেই, সে নিজেই আবার মাথাটা পিছনে একবার ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু কি এই কলে কাজ করেন নাকি?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'তাই ভাবি, বাবুকে তো এ তল্লাটে কখনো দেখিনি।' লোকটির বিকশিত দন্ত ঢাকা পড়ে না, চোখে অনুসন্ধিৎসা, 'তিরবেনীর বাবু হলে চিনতে পারতাম। বাবুর বাড়ি কি চুঁচড়োয় ?'

আমি আবার মাথা নেড়ে বললাম, 'না তো।'

'চুঁচড়োর বাস থেকে নামতে দেখলাম, তাই ভাবলাম, চুঁচড়োর মানুষ।' লোকটির চোখে সেই একই জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসা। কালো গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় বড় দাঁতের হাসি, 'কিন্তু মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানার দিকে বাবুর লজর দেখে ঠিক ধরেছি, এ তল্লাটে লতুন এয়েছেন।'

'মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানা' কথাটার মানে কী? লোকটার আপাদমস্তক একবার দেখে নিলাম। ভদ্রলোকের মনের প্রকৃতি, তার তো আবার নানান গতাগতি। লোকটাকে আপনি বলবো না তুমি, ঠেক লেগে যাচ্ছে। তবে, নিজের মান নিজের হাতে, আপনি সম্বোধনই রক্ষাকবচ। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেয়ে নিখুঁজিদের আস্তানা মানে সেটা কী জিনিস ?'

'নিখুঁজি, নিখুঁজি। নিখুঁজিদের কথা জানেন না বাবু ?' লোকটির দাঁতে হাসি, হলদে চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

ভাববার অবকাশ কম। ঝটিতি মনে পড়বার মতো কথাও না। তবু কয়েক মুহূর্ত স্মৃতি হাতড়েও 'নিখুঁজি' শব্দ খুঁজে পেলাম না। অবাক চোখে একবার মিলিটারি গুদামশালার দিকে দেখে লোকটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'নিখুঁজি মানে? কাদের বলে ?'

লোকটির দাঁত ঢাকা পড়লো না। জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলো, মুখে অবাক হতাশা, 'নিখুঁজি বুইলেন না? পাকিস্থান থেকে যারা এয়েছে, নিখুঁজি।'

আমার মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল। পাকিস্থান থেকে যারা এসেছে। আমি বললাম, 'আপনি কি রিফ্যুজিদের কথা বলছেন ?'

লোকটির চোখে মুখে গোঁফদাড়িতে, আর বড় দাঁতে হাসি আরও বিস্তৃত হলো। অনেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আপনারা বলেন— কী যেন বললেন? ওটা আমার আসে না, ত ঠিক ধরেছেন, এরা হল নিখুঁজি। আর এটা হল মেয়ে নিখুঁজিদের ক্যাম্প, গরমেণ্ট রেখেছে।'

প্রাণ খুলে হাসতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আমার হাসি লোকটির মনে অন্যভাবে বিঁধতে পারে। মনে মনে বললাম, 'আ মরি বাঙলা ভাষা।' রিফ্যুজি কেমন করে নিখুঁজি হয়, বোধহয় আচার্য স্নুনীতি চাটুয্যে মশায়েরও ঠেক লেগে যেতো। অনেক জেলায় র অ হয়, অ-তে র, কিন্তু রিফ্যুজি একেবারে নিখুঁজি, এমন উচ্চারণ এই প্রথম শুনলাম। আমার শব্দের ভাঁড়ারে, এটাকে নতুন সঞ্চয় বলতে পারবো কী না, বুঝতে পারছি না। কিন্তু ভাবছি, নিখুঁজি শব্দের একটা অর্থ করলেই বা ক্ষতি কী। যাকে খুঁজে পাওয়া যায়

না, বেপাত্তা, তাকেও নিখোঁজি বলে চালিয়ে দিলে কেমন হয়। সেই হিসাবে রিফ্যুজি আর নিখোঁজিতে তফাত তেমন দেখি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা মেয়ে নিখোঁজিদের গরমেণ্ট এখানে রেখেছে কেন ?'

'কোথায় রাখবে বলেন।' লোকটির বড় বড় দাঁতে হাসিটি তেমনিই, 'এদের বাপ সোয়ামী কে কোথায় হারিয়ে গেছে, মরে গেছে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। দেখভাল করার কেউ নেই। কারুর বড় ছেলেপিলে নেই, সব কাঁচকাঁচা। গরমেণ্ট এদের এনে এখানে ঠাঁই দিয়েছে। খাবার ডোল দেয়, জামাকাপড়ও দেয়। ভেতরে অফিস আছে, বাবু আছে—সরকারী বাবু। মেয়েমানুষ বলে কথা, বুইলেন কী না, বাইরে আসবার উপায় নেই। তবে মন বলে একটা কথা আছে, আছে না বাবু ?'

আমি লোকটির চোখের দিকে দেখলাম। হলদে চোখের খয়েরি তারায় কেমন একটা অর্থপূর্ণ ঝিলিক।

বললাম, 'তা, মানুষ মাত্রেরই মন থাকবে সে তো সত্যি কথা।'

'অই, সে-কথাটাই বলছিলাম। আমার মন করে আল্লা আল্লা, কে আগলায় দেউড়ি পাল্লা।' লোকটি নিরীহ হেসেই বললো, 'বাইরে আসবার মন করলে তাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারে না।'

লোকটির চোখের অর্থপূর্ণ হাসির ঝিলিক বুঝতে পারলাম। আর একবার নিখোঁজি মেয়ে আস্তানার দিকে দেখে নিয়ে বললাম, 'কিন্তু বাইরে আসবার রাস্তা কোথায় ?'

'কেন বাবু, আস্তানার ও-ধারে গঙ্গা আছে না ?' লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে বড় দাঁতে হাসিটি তেমনই নিরীহ, 'লৌকোর ত অভাব নেই। রাতের আন্ধারে লৌকো ঘাটে লাগলেই হল। চোখে পড়ে, তাই বলি।'

আমি ইতিমধ্যে পা বাড়াতে আরম্ভ করেছি। বললাম, 'নৌকাবিলাস ?'

লোকটি ভাঙা সরু স্বরে হি হি করে হেসে উঠলো, 'জবর কথা বলেছেন বাবু, লৌকোবিলাস। তবে সহজে তো হবার জো-টি নেই। মেয়েছেলেদের নিজেদের মধ্যে এ বেলা সাঁট আছে তো ও বেলা নেই। একটু উনিশ বিশ হলেই ঝগড়া, তারপরে সাতকান হতে আর বাকি থাকে না। ক্যাম্পের বাবুর কানে কথা ওঠে, তখন বিচার মজলিস। সে সব আমরা দেখতে পাইনে। বিচারের ফলও জানিনে। তবে কানে আসে ঠিকই। চোখেই দেখেছি কয়েক-জনকে আস্তানা থেকে বের করেও দিয়েছে। তা না দেবে কেন বাবু ? পুরুষ নেই, সোয়ামী নেই, মেয়েমানুষের পেট বড় হয় কেমন করে ? নিখোঁজি মেয়েদের ক্যাম্প ত আজব কারখানা লয়, না কী বলেন বাবু ?'

আমি লোকটির চোখের দিকে আবার তাকালাম। সত্যি বলছে কি মিথ্যা বলছে, জানি না। কিন্তু গুরুতর ব্যভিচারের কথাগুলো নিজের ভাষায় এমন নিরীহ স্বরে বলছে কেমন করে ? চোখ বা মুখের দিকে তাকিয়ে তো মনে

হচ্ছে না, খোশ মেজাজে আমার সঙ্গে রসিকতা জুড়েছে। অবিশ্যি এমন কথার জবাব আমার কিছু ছিল না। মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এ রকমও হয় নাকি?'

'হয়, মিছে কথা বলব কেন বাবু?' লোকটি নিজের মতো করেই বললো, 'ত, সেও সেই কথা, গতর মনের গরজ বড় দায়, দোষই বা দেবেন কাকে? গরমেণ্ট বলতে পারে, খেতে দিচ্ছি পরতে দিচ্ছি, পেটে তোমার জ্বার কেন? পথ দ্যাখ। বলা যায় অনেক কথা, পেটভাতায় ত সব দায় মেটে না, না কী বলেন বাবু?'

আমি আবার মুখ ফিরিয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। হাসিটি একই রকম, একটু যা আনমনা। কিন্তু সরকারের নীতিতে সে বিশ্বাসী, না নিখুঁজি অনাথিনীদের ওপর তার সায়-সমবেদনা, সেটার ঠিক ধরতাই পাচ্ছি না। আমি কোনো জবাব দিলাম না। সে আবার নিজে থেকেই বললো, 'তবে হ্যাঁ, এও দেখি, খুঁজতে খুঁজতে কারুর সোয়ামী এসে হাজির হয়। মায়ের খোঁজে আসে জোয়ান ব্যাটা। সরকারের ব্যাওস্তা মতো আইবুড়ো মেয়েকে কেউ শাদী করে নিয়ে চলে যায়। শুনি গরমেণ্ট নাকি তাদের ঘর সোমসার করার জন্যে কিছু টাকা পয়সাও দেয়।'

এমন স্পর্ধা নেই, যে বলি, নতুন একটা মানুষকে দেখে, আর দুই চার বয়ান শুনলেই তার চরিত্র বুঝতে পারি। তবে লোকটি মুসলমান, এটা বুঝতে পারছি। তা ছাড়া, আমার কৌতুহল মেটাবার পক্ষে নিখুঁজি মেয়ে ক্যাম্পের একটি, প্রায় নিখুঁত চিত্র সে তুলে ধরেছে। ঠাট্টা বিদ্রুপ কতোটা আছে, জানি না। চিত্রটি ভালো মন্দ মিশায়ে সফলই। লোকটি জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে আবার বললো, 'আল্লার কী মর্জি দ্যাখেন, কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। ভিটে মাটি চাটি, বাপ সোয়ামী ভাই বেরাদার কে কোথায় মরেছে কি বেঁচে আছে, আর এরা এখানে পড়ে আছে। তকদিরের কম লিখন।'

আমি বললাম, 'আল্লার মর্জিতে তো কিছু হয়নি, হয়েছে নেতাদের মর্জিতে। তাঁরা দেশ কেটে ভাগ করেছেন।'

'তা বাবু, যাই বলেন, মর্জি আরজি সবই আল্লার, নইলে নেতারাই বা অমন কম্মো করবে কেন। কার কী গুনাহ্, কে বলবে। যা হয়, সবই আল্লার মর্জিতে হয়।'

আমি লোকটির মুখের দিকে তাকালাম। গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় দাঁতের হাসিটি এখন তেমন বিকশিত না, বরং একটু মন খারাপের ছায়া পড়েছে মুখে। আল্লার মর্জিতে তার অখণ্ড বিশ্বাস, কোনো সন্দেহ নেই। তবু মন খারাপ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার পাকিস্থানে যেতে ইচ্ছা করে না?'

'তা কেন করবে বাবু?' লোকটির দন্তবিকশিত হাসিতে যেন সংকটের

লক্ষণ, 'সেখানে আমার কে আছে, কার কাছে যাব ? আমাকে তো এখানে কেউ মেরে তাড়াচ্ছে না, তবে ? বাপ চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে, অচেনা দেশে যাব কেন ? আল্লার যেন তেমন মর্জি না হয়।'

ন্যায্য কথা। জবাব দেবার কিছু নেই। আল্লার মর্জিতে আছে। সংসারের সব কিছুই যখন আল্লার মর্জিতে ঘটছে, তখন আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করাও বৃথা। যার বিশ্বাস আছে, তার সবই আছে। না থাকলেই পালটা জিজ্ঞাসা, খাসা যুক্তি তর্ক। এমন বিশ্বাস কেমন করে জন্মায় ? এমন একটি বিশ্বাস আমি কেন পাই না ? যেখান থেকে আমাকে কেউ টলাতে পারবে না। ছুটিয়ে বেড়াতে পারবে না।

আমি সামনের দিকে তাকিয়ে চলেছি। কিন্তু টের পাচ্ছি, লোকটি আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। কোথায় যাবে, কে জানে। আমার লক্ষ্য আপাতত ত্রিবেণী। যাত্রা, গঙ্গার কূলে কূলে, উত্তরের উজানে। ত্রিবেণীতে একটু ঠেক দিয়ে যাওয়া।

'বাবু কি গাজীসাবের মজ্জিদ দেখেছেন নাকি ?' লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

গাজীসাহেবের মসজিদ ? আমি লোকটার দিকে ফিরে তাকালাম। কেতাবের কিছু অক্ষরমালাও যেন মগজে দেখা দিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় সে মসজিদ ?'

'ঐ যে, ঐ ত দেখা যায়।' লোকটি বাঁ হাত তুলে, বাঁদিকে দেখালো, 'এই যে আপনার বাঁদিক দিয়ে রাস্তা ওপরে উঠে গেছে।'

দাঁড়িয়ে বাঁদিকে দেখলাম। বাঁদিকে উঁচু ঢিবির ওপরে পায়ে চলার রাস্তার দাগ উঠে গিয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কালো পাথরের ইমারত আর একাধিক গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। আমি বাঁয়ে পা বাড়ালাম। লোকটিও আমার সঙ্গ নিল। খুশির স্বরে বললো, 'তাই ভাবি, বাবু লতুন মানুষ এয়েছেন গাজীর মজ্জিদ না দেখে যাবেন কেন ?' এমনিতেই কতো লোকে আসে।'

চারপাশে ঘন গাছপালায় নিবিড়। দোয়েল টুনটুনি বুলবুলির ডাকাডাকি। কাঠবেড়ালীর হুটোপুটি দৌড়োদৌড়ি ভুঁয়ে আর গাছের ডালে।

'গাজীসাব মোচলমান হলেও, গঙ্গা মায়ের পুজা করতেন।' লোকটি বললো।

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে, ওপরে উঠতে লাগলাম। নীচের রাস্তা থেকে উঁচু কম না। লোকটির কথায় মাথা ঝাঁকালেও আমার মনে এখন কেতাবের খবর। মসজিদের উঠোনে পা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ তো জাফর খাঁ গাজীর সমাধি ?'

লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে, বড় বড় দাঁতের হাসির থেকেও অবাক খুশির হাসি যেন নতুন করে ছড়িয়ে পড়লো। 'বাবু তো সবই জানেন দেখছি। তবে যে না দেখেই চলে যাচ্ছিলেন ?'

বললাম, 'এখন দেখে মনে পড়লো, বইয়ে পড়েছি। আমি ভেবেছিলাম এ মসজিদ ত্রিবেণীতে।'

'ত বাবু এও ত ত্রিবেণীই।' লোকটি বললো, 'তবে সমাধির কথা যা বললেন, ঐ-ঐযে ঐটা।' সে আমাকে সামনের কবরটি দেখিয়ে বললো, যার ওপরে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা, 'মজ্জিদটা বানিয়েছিলেন উনি। এ হল বাবু, হিঁদু মোচলমানের মজ্জিদ। দ্যাখেন, মজ্জিদের গায়ে হিঁদু মন্দিরের কাজ আছে।'

আমারই ভুল। সমাধি আর মসজিদ আলাদা। মসজিদের উঠোনের এদিকে ওদিকে কয়েকটি পাথরের বড় টুকরো ছড়ানো। সাধারণ পাথর না, তার গায়েও কিছু অস্পষ্ট শিল্পের কাজ আছে। বোধহয়, আর দরকার হয়নি বলে, এমনি পড়ে আছে। মসজিদের মাথার ওপরে পাঁচটি ডোম। ভালো কথায় গম্বুজ। তবে গম্বুজ বললে যেমন বড় সড় বুঝায়, তেমন না। ডোম বললেই যেন মানায়। কয়েকটি থামে আর দেওয়ালে, হিন্দু মন্দিরের নরনারীর মূর্তি। দেবদেবীদের তেমন চেনা যায় না। হিন্দু বৌদ্ধ, যে-কোনোরকমই হতে পারে।

আমরা জানি, মুসলমান নবাব বাদশা যোদ্ধারা হিন্দু মন্দির কেবল ধ্বংসই করেছে। আর কোথাও এমনটি আছে কিনা জানি না, এখানে দেখছি, কোথাকার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে, মসজিদের কাজে লাগানো হয়েছে। জাফর খাঁ গাজীর মনের অন্ধিসন্ধি জানবার উপায় নেই। মহাশয়ের কি গুনাহ্-এর ভয় ছিল না? আল্লার দেওয়া আক্কেলটা তাঁর একটু ভিন রকম ছিল। না হলে, হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের শিল্প খোদাই করা পাথর দিয়ে মসজিদ নির্মাণ? তোবা তোবা! এমন মিলমিশের কারণ কী?

একটি খিলানের মিহরাবে আরবি বা ফারসিতে কিছু লেখা আছে। ঐতিহাসিক তা থেকেই নির্মাণের বছরের হিসাব পেয়েছেন। বারোশো আটানব্বুই খ্রীষ্টাব্দ। প্রায় সাতশো বছর হতে চলেছে, কিন্তু কালের থাবা যেন তেমন করে দাগ বসাতে পারেনি। জাফর খাঁকে বলা হয়েছে সপ্তগ্রাম বিজেতা। অন্য দিকে, পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুফির খুড়তুতো ভাই। পায়ের স্যাণ্ডেল খুলে রেখে, মসজিদের মাঝখানের প্রবেশ পথ দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। জনা তিন চারেক বাচ্চা ছেলে, হঠাৎ এপাশ ওপাশ থেকে দৌড়ে ছিটকে, কোন্‌খান থেকে বেরিয়ে এসে আমার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। চমকেই উঠেছিলাম। লোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। কাকে যেন ধমকে দিয়ে উঠলো, 'হে, হেই তুরকা, ইস্কুলে যাসনি?'

কোনো তুরকারই জবাব শোনা গেল না। এমন নামও কখনো শুনিনি। মসজিদের ভিতরে ভেজা আর প্রাচীনের একরকম গন্ধ নিতে নিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'চেনেন নাকি?'

'ওদের মধ্যে একটি আমার ছেলে।' লোকটি হেসেই বললো, 'দ্যাখেন, বেলা কতখানি হল, ইস্কুলে যাবার নাম নেই, এখানে খেলে বেড়াচ্ছে। ছেলে-গুলানও সব আমাদের পাড়ার।'

মসজিদের ভিতরে কিছু দেখবার নেই। বেরিয়ে এসে পিছন দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে পাড়া আছে নাকি?'

'আছে বাবু, ঐ দিকে।' লোকটি আমাকে উত্তর পশ্চিমের কোণে হাত তুলে দেখালো, 'আমরা কয়েক ঘর আছি, এ মজ্জিদেই নেমাজ পড়ি। আমরাই ঝাঁট পাট দিয়ে সাফ সুরত করি। গরমেণ্ট কিছু সামান্য দেয়। আর এই আপনাদের মতন কেউ এলে, কবরথানে কিছু দিয়ে থুয়ে যান। ঐ ভাগ বাঁটোয়ারা করে যা পাওয়া যায়।'

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝির কথা। সরকারের সংরক্ষিত বিষয়ক কোনো বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়েছিল বলে মনে করতে পারি না। পিছন দিকে, মসজিদের শেষে আর জমি নেই বললেই চলে। তবু একটি যাওয়া আসার পথ আছে। পিছনের ঢালুতে ঘন জঙ্গল, লতায় পাতায় মোড়া। সেখান থেকে উত্তরে মাঠ চোখে পড়ে। উঁচু নীচু কাঁচা রাস্তা আর লোহার তৈরি ঝোলানো সাঁকো। সাঁকোটা কি সরস্বতী নদীর ওপরে? তাই হবে। ইতিহাসের কথা মনে পড়ে গেল। জাফর খাঁ গাজী নাকি এই মসজিদটি তৈরি করেছিলেন, সরস্বতী আর গঙ্গার সঙ্গমস্থলে। এখন আর সে-গঙ্গা নেই, যদি বা মনে হয়, চর পড়া ছাড়া, এদিকে গঙ্গা তার খাত বদলায়নি। সরস্বতীও না। তবে দূরে স্রোতস্বিনী রেখাটি দেখে অনুমান হয়, কায়া তার ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হয়েছে। রাস্তার নীচে বাঁদিকে যে-মাঠে এখন গরু চরে বেড়াচ্ছে, সেই মাঠে হয়তো একদা সরস্বতীর ঢেউ খেলতো। তার এ পারের বিস্তৃতি ছিল হয়তো এই মসজিদের কাছেই। সেই হিসাবে গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গম বলা চলে। কিছু দক্ষিণে গেলে, যমুনার মরা গাঙ দেখা যায়। সেই হিসাবে, ত্রিবেণী সঙ্গম নিঃসন্দেহে। তবে, সরস্বতী এখানে গুপ্ত নন, যেমন আছেন প্রয়াগ সঙ্গমে। প্রয়াগ হল গুপ্ত বেণী। বাঙলার ত্রিবেণী মুক্ত বেণী। তারও অবিশ্যি ব্যাখ্যা আছে। প্রয়াগে তিন ধারার মিলন ঘটেছে, এখানে এসে ছাড়াছাড়ি। এখানে এসে তিন কন্যার তিন দিকে পৃথক ধারায় যাত্রা। গুপ্ত মুক্ত যা বলো, তীর্থ-ক্ষেত্রের এই হল মাহাত্ম্য।

চোখের সামনে পুরনো দিনের একটা ছবি যেন ভেসে উঠছে। চারশো বছর আগে, গঙ্গার সঙ্গে সরস্বতীর যোগাযোগ নাকি একটি খাল কেটে করা হয়েছিল। সেই খালই বড় হয়ে, 'কাটি গঙ্গা' নাম হয়েছে। কিন্তু যেখানে দাঁড়িয়ে এখন, গঙ্গা থেকে পশ্চিমগামিনী শীর্ণ রেখাটি দেখতে পাচ্ছি, সেটা বারোশো আটানব্বুই খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন 'কাটি গঙ্গা'-এর কথা কেউ জানতো না। দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দেই ধোয়ী কবির 'পবন দূতম'-এ ত্রিবেণীর:

গুণগান শুনেছি। দিল্লির মুঘলদের আগে, গৌড় বঙ্গে পাঠান সুলতানদের রমরমা। বিপ্রদাস বা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম কিছু আগে পরের কথা।

আমার চোখের সামনে যে ছবিটা ভেসে উঠছে, সেটা কেবল মুক্ত বেণীর সঙ্গমে তীর্থযাত্রার স্নান কোলাহল না। ত্রিবেণী, আদি সপ্তগ্রামের থেকেও যেন বড়, বিশাল এক বন্দর। সরস্বতী আর গঙ্গার বুক জুড়ে, হাজার জলযানের মাস্তুল ঠেকে আছে আকাশে। হাজার মানুষের কাজের ব্যস্ততা। সমুদ্রগামী বিশাল নৌকায় মাল খালাস আর ভরতির দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি হাঁক-ডাক। যদি বলি, সেটা মুসলমান আমলের প্রারম্ভ, তা হলেও দূরদেশী সওদাগর আর নাবিকদের ভিড়ও কম না। তারপরে ছবিটা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। গৌড়ের পাঠান আমল মুঘলদের কাছে মার খাচ্ছে। ফিরিঙ্গিদের ভিড় বাড়ছে। তাদের সঙ্গে আসছে তখনকার জাহাজ। যার উঁচু মাস্তুলে মাস্তুলে ত্রিবেণীর আকাশের চেহারা গিয়েছে বদলে। জন-জনতার চেহারাও রঙ বদলের পালা। ঘুরে গিয়েছেন আগেই, তখন প্লিনি, টলেমি, উইলিয়াম হেজ্ আর স্ট্রাভোরিবাসের যুগ।

কবিকঙ্কন পূর্ব স্মৃতিচারণের কাব্য লিখছেন। কেউ লিখছেন চণ্ডীমঙ্গল, কেউ চাঁদ সদাগরের উপাখ্যান। রামায়ণ মহাভারতও যদি নেই। গৌড়ের বাদশাহী আমল থেকেই তার শুরু। রাধাকৃষ্ণের যৌবনলীলা, আর সেই সঙ্গে শক্তি উপাসনার তন্ত্র ব্যাখ্যা। কিন্তু ত্রিবেণীতে তখন সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করেছে যারা, তারা সবাই ভিনদেশী। তারা ত্রিবেণীকে কেউ বলে 'তিরপানি' 'তারাবানি' একসময়ে 'ফিরোজাবাদ'।

এখানে এসে পৌঁছুবার আগেই পেরিয়ে এসেছি সাগঞ্জ। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওসমান সা যখন বাঙ্গলার শাসনকর্তা, তখন নাকি সেই ক্ষুদ্র জায়গাটি তাঁর নজর কাড়ে। কারণ, সেখানে একটি বড় গঞ্জ ছিল। অতএব, নাম বদল হোক। হল, সা আজিমগঞ্জ। পরে, লোকের মুখে মুখে, কেবল সাগঞ্জ।

তারপরে এই ত্রিবেণী। যেখানে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র, টোলে আর টোলো পণ্ডিত আর ছাত্রে ছাত্রে ছয়লাপ, সেখানে বিশাল বন্দরের আবির্ভাব। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাল আরও অনেক পরে। তখন 'পবন দূতম্'-এর কাল গত, পাঠান মুঘল রাজ্য ছাড়া। ফিরিঙ্গিরা কলকাতায় গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে। দেশ জোড়া তাদের শাসন। ত্রিবেণী এখন কেবল এক তীর্থ, আর মহাশ্মশানের আগুনে লকলক জ্বলছে। মহাশ্মশান! তার চিতার আগুন তো কখনও নেভে না।

পুরনো দিনের একটা ছবি না, অনেকগুলো ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে, এখন মফস্বলের শহর হয়ে ওঠার একটা আপ্রাণ চেষ্টা মাত্র ভাসছে। কোনোকালেই যে আধুনিক শহর হয়ে উঠবে না, অথচ গ্রামের রূপ নিয়ে নিরিবিলিও থাকতে পারবে না। সে তার পুরোনোকে ফিরে পাবে না,

নতুনের এক শ্বাসরুদ্ধ সামান্য ব্যবসাকেন্দ্র, চাপা গলি, ঘিঞ্জি বাড়ি, নিয়ম-নীতিবিহীন আর পাঁচটা মফস্বল ছোট শহরের মতোই পাঁচমেশালী একটা দলা পাকানো চেহারা। সেই সঙ্গে তীর্থক্ষেত্রের ভালো মন্দ যা থাকা উচিত, যা ছড়িয়ে আছে আমাদের গোটা দেশ জুড়ে, তার সবই আছে। এমন কি নেই, মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যুগও।

কেতাবের হক কথাতেই প্রমাণ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো শ্রুতিধর জগতে এক বিনা দুইয়ের উদাহরণ নেই। সংস্কৃতের পণ্ডিত, ইংরেজির নামগন্ধ জানতেন না। ঘাটে স্নান করছিলেন। নৌকোয় তখন দুই গোরা সাহেব তাদের মাতৃভাষায় বচসা চালিয়েছে। বচসা থেকে মারামারি। তার জের গিয়ে উঠলো আদালতে। কিন্তু সাক্ষী কোথায় পাওয়া যায়? ডাক পড়লো জগন্নাথ পণ্ডিতের। ইংরেজি না জানুন, দুই সাহেবের সব কথা শ্রুতি আর স্মৃতিতে ধরে রেখেছেন। আদালতে দাঁড়িয়ে, দুই সাহেবের ইংরেজি বুকনির বচসা সব গড়গড় করে বলে গেলেন। বিচারক সাহেব 'মাই গড' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন কী না, সে-সংবাদ জানা নেই। কিন্তু আদৌ ইংরেজি না জানা একজনের মুখে, অবিকল ইংরেজি ঝগড়ার বুলি শুনেই, বিচারককে রায় দিতে হয়েছিল।

'বাবু।'

ডাক শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। সেই লোকটি। গোঁফদাড়ির ভাঁজে, এখন তার বড় দাঁতের হাসি প্রায় নেই। হলদে চোখের খয়েরি তারায় তার অবাক উৎসুক জিজ্ঞাসা। আমি তার দিকে ফিরে তাকাতে, সে তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা সরু অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'বাবু, আপনি কী দেখছিলেন?'

লোকটির কাছে লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ এক মনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, সেই কারণে তার অবাক হওয়ায়, আমার অস্বস্তি। বললাম, 'জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ থেকে ত্রিবেণীকে দেখছিলাম।'

'এতক্ষণ ধরে?' লোকটির গোঁফদাড়ির ভাঁজে বড় বড় দাঁতের হাসিটি আবার বিকশিত হল, 'আমি ভাবি, বাবু এত কি দ্যাখেন? জপ করেন না, তপ করেন, নাকি চোখ দিয়ে জমি জরীপ করেন? তারপরে ভাবি, যে মাঠে গরুগুলান চরছে, তার মধ্যে চোরাই গরু খোঁজেন নাকি।'

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে বললাম, 'চোরাই গরু? তার মানে?'

'ঐ ওদের বিশ্বাস নেই বাবু, ঐ বিহারীদের কথা বলছি।' লোকটি মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'সাঁকোর ওপরে থেকেও গেরস্তের গরু নিয়ে এসে, নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেয়। খোঁজ পড়ল ত ভালো, নইলে গেল। এ নিয়ে কতো বিবাদ কাজিয়া, লাঠালাঠি, বলা যায় না। তাই একবার ভাবলাম, বাবু বোধহয় ত্রিবেণীরই লোক হবেন, চিনতে পারিনি। চোরাই গরুর খোঁজ করছেন দূর থেকে
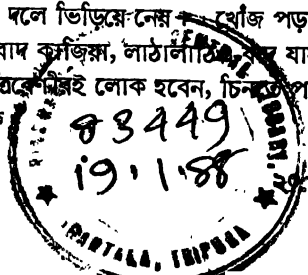
উদ্গত উচ্ছ্বসিত হাসিটাকে ঢোক গিলে হজম করলেও, অতঃপরেও রামগড়ুরের ছানা হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। হাসতে মানাও ছিল না। লোকটিকে একেবারে বেয়াকুফ বানাবার ইচ্ছাটাকে দমন করে, অল্প হাসলাম। ওকে আমার দোষ দেবারও কিছু নেই। ভাবতে হয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত। জপ তপ জমি জরিপ থেকে চোরাই গরুর সন্ধান। যতোটা ভাবতে পেরেছে, ততোটাই বলেছে। বলেনি কেবল একটা কথাই, আমাকে ভূতে পেয়েছে কী না। মনে মনে ভাবলেও, মুখে অন্তত বলেনি।

বললাম, 'না, ত্রিবেণীর লোক হলে আগেই বলতাম। তা, এরা গরু নিয়ে এ রকম করে নাকি ?'

'মিছে বলব কেন বাবু ? এ তল্লাটে যাকে জিগেস করবেন, সেই বলবে, গেরস্তের গরু ভাগাতে এরা ওস্তাদ।' লোকটির স্বরে এই প্রথম কিঞ্চিৎ বিক্ষোভের সুর বাজলো। তারপরেই আবার অবাক হাসির আসল স্বরে বললো, 'আমি ভাবি, বাবু এত কী দ্যাখেন, এত কী ভাবেন ? ভেবে আর কোন কূল কিনারা পাইনে। কী করে বুঝব বাবু আপনি এখান থেকে এক মনে এক নজরে কেবল ত্রিবেণী দেখছেন।'

আমি পিছন ফিরে আবার মসজিদের সামনের দিকে এলাম। লোকটি আছে সঙ্গেই। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে রোদ। মাঘের বাতাসে তেমন জোর নেই। বহুকালের পুরনো স্মৃতিসৌধ, যার গায়ে হিন্দু মুসলমানের শিল্প একাকার হয়ে আছে। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। ঝিঁঝিঁর ডাক নৈশব্দ্যেরই অন্তরঙ্গতায় যেন ডুবে আছে। আমারই বা তাড়া কিসের ? পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে দক্ষিণে সরে এসে, একটি পরিত্যক্ত পাথরের ওপর বসলাম। চলে যাবার আগে একটু এই প্রাচীন মসজিদের নির্জনতাকে কেবল মন দিয়ে না, শরীর ভরে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে সিগারেট খেলে দোষ নেই তো ?'

'বাবুর কী কথা !' লোকটির সারা মুখ থেকে হাসি ছড়িয়ে পড়লো যেন রঙ চটা ময়লা চাদর জড়ানো সারা গায়ে। আমার দু হাত দূরে মাটির ওপরে লুঙ্গি গুটিয়ে হাঁটু ভেঙে বসে বললো, 'আপনি তো আর মজ্জিদের মধ্যে খাচ্ছেন না। মাজারের গায়ে ঠেশ্ দিয়েও বসেননি। কত বাবুরা আসেন, ওসবও মানেন না। এই শীতকালে, ছুটিছাটার দিনে, বাবুরা চড়ুইভাতি করতে আসে, তারাও নিয়মকানুন মানে না। আপনি এখানে বসে সিগারেট খাবেন না কেন ?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'চড়ুইভাতি কোথায় করে ? এই উঠোনেই নাকি ?'

'না না।' লোকটি মাথা নেড়ে জিভ কাটলো, 'তা কেউ করে না।

আশেপাশে অনেক জায়গা রয়েছে। পশ্চিম দক্ষিণের জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় চড়ুইভাতি করে।'

এখানেও চড়ুইভাতি। বনভোজনের জায়গা দেখছি সবখানেই। বন যখন আছে, তখন ভোজের অনুষ্ঠানে বাধা কী? কিন্তু এই মসজিদ আর সমাধির আশেপাশে, মানুষের বনভোজনের হৈ হল্লাটা ভেবেই কেমন অস্বস্তি লাগে। একদা হয়তো এই চত্বরে অনেক ভিড় থাকতো। ত্রিবেণী বন্দরের অনেক ফিরিঙ্গি দেখতে আসতো। হিন্দুরা নিশ্চয় দূরেই থাকতো। এখন সে ত্রিবেণী নেই। মসজিদটিও নেই গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমে। গাছপালা বনের আড়াল, একলা নিরিবিলি। এখন এই অনর্গল, গাছে গাছে বনের ঝোপে পাখির ডাকই সব থেকে মানানসই।

সিগারেটটা ধরিয়ে, দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলতে গিয়ে লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। নিজেকেই কেমন অভব্য মনে হল। সেই নিখুঁজি মেয়ে ক্যামপের সংবাদ দেওয়া থেকে, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সিগারেট চলবে?'

'দ্যান একটা।' বলতে গিয়ে, গোঁফদাড়ির ভাঁজে হাসিটি ভারি লাজে লাজানো হয়ে উঠলো। গায়ের চাদরটিও অকারণ একটু টেনে টুনে নিতে হল।

আমি একটি সিগারেট আর দেশলাই তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সে ঝুঁকে পড়ে দু হাত পেতে নিল, 'ত, বাবু আমাকে আর আপনি আপনি করবেন না। বড় লজ্জা করে।'

লজ্জাটি যে অকৃত্রিম, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাম কী?'

'এমদাদ আলি খাঁ' বলতে গিয়েও যেন লাজিয়ে উঠলো, 'বাপ ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি আমাদের সঙ্গে নাকি গাজীসাবের রক্তের সম্পর্ক ছিল।'

তার মানে জাফর খাঁ গাজীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক! সংসারে তো অসম্ভবের তুলনা নেই। দিল্লিতে যদি মুঘল বংশধর এখন টাঙাওয়ালা হতে পারে, বাংলাদেশের সামান্য একজন গ্রাম্য গরীব চেহারার মানুষটির শরীরে জাফর খাঁ গাজীর রক্ত থাকতেই পারে। বইয়ের পাতায়, জাফর খাঁ গাজী সপ্তগ্রাম বিজেতা। তাঁর বাসস্থানও নিশ্চয় সেখানেই ছিল। মসজিদটি কেন এইখানে করেছিলেন, সেই মর্জির কথা জানা যায় না। এমদাদ আলি খাঁয়ের বংশধরেরাও হয়তো এককালে সাতগাঁয়ে ছিল। তারপরে ত্রিবেণীর মসজিদের কাছে এখন পর্ণকুটিরে।

এমদাদ আলি খাঁ সিগারেটটা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছাড়বার মুখে কী একটা উচ্চারণ করলো। দেশলাইটি বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। আমি দেশলাই নিলাম, আর সে মুখ খুললো, 'তবে বাবু, আপনি যে বললেন জাফর খাঁ

'গাজী, আবার ওঁয়ারই নাম কিন্তু দরাফ গাজী। উনি গঙ্গা মায়ের পূজা করতেন। অনেক মন্তর তন্তর জানতেন।'

আবার আমার মনে পড়লো কেতাবের কথা। কিন্তু ত্রিবেণীর দরাফ গাজী আর সপ্তগ্রামের জাফর খাঁ গাজী এক ব্যক্তি কী না, তা আমার জানা নেই। জাফর খাঁ মন্তর তন্তর জানতেন কী না জানি না, দরাফ গাজী কী জানতেন তাও জানি না। তবে দরাফ গাজী গঙ্গাস্তোত্র লিখেছিলেন, কেতাবে এমন কথা আছে।

'বাঁশবেড়ের খামারপাড়া চেনেন তো বাবু?' এমদাদ আলি খাঁ আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'ত শোনেন বলি।' এমদাদ সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ঢোক গিললো, ধোঁয়া ছাড়লো আস্তে আস্তে। অনেকটা গঞ্জিকা সেবনের মতো। বললো, 'সেখানে এক আখড়া ছিল, বাবাজীর নাম ছিল ভিখিরিদাস। ত, সেই ভিখিরিদাসের সঙ্গে গাজীসাহেবের কেমন একটা আড়াআড়ি ভাব ছিল। কেউ কারু কাছে মাথা নোয়াতে চাইতেন না। তা, একদিন কী হল। গাজীসাব একদিন ভোরবেলা এক বাঘের পিঠে চেপে, ভিখিরিদাসের আখড়ায় গিয়ে হাজির। ভিখিরিদাস তখন দাওয়ায় বসে দাঁত মাজছিলেন। গাজী ভেবেছিলেন, বাবাজী ভয়ে পালাবেন।' এমদাদ হাসতে হাসতে সিগারেটে একটা টান দিয়ে নিল, 'পালানো ত দূরের কথা, বাবাজী দাওয়ায় চাপড় মেরে বললেন, 'দাওয়া এগিয়ে যা।' যেমন বলা তেমনি কাজ, দাওয়া এগিয়ে গেল বাঘের পিঠে গাজীর সামনে। তখন দুজন দুজনকে চিনলেন। একজন নামলেন বাঘের পিঠ থেকে, আর একজন দাওয়া থেকে। তারপরে দুজনের সে কি জড়াজড়ি গলাগলি পিরীত। ইনি বলেন, তোমাকে দেখি। তিনি বলেন, তোমাকে দেখি। আসলে, ব্যাপারটা কী বুঝলেন ত বাবু?'

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না বটে, তবে এমন একটা কাহিনী কেতাবে পড়েছি মনে হচ্ছে। এমদাদের ভাষায় একটু অন্যরকম শোনাচ্ছে, এই যা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

'আসলে দুজনের মধ্যে আঁতান্তর ছিল না, মনে পেরাণে এক মানুষ।' এমদাদের হলদে চোখে রহস্যের ঝিলিক, 'আর এটা হল, দুজনকে দুজনের একটু বাজিয়ে দেখা, বুঝলেন না?'

তা বুঝলাম। কিন্তু সেই প্রায় সাতশো বছর আগে, হিন্দু মুসলমানের এত জড়াজড়ি গলাগলি পিরীতের কারণ কী? দরাফ গাজী আর জাফর খাঁ গাজী একই ব্যক্তি কী না, হলফ করে বলা দায়। কারণ ইতিহাসের বয়ান তেমন স্পষ্ট না। 'কথিত আছে, ইঁহারা উভয়েই নাকি একই ব্যক্তি' ইতিহাসের বয়ানটা এইরকম। 'কথিত আছে' আর নাকি কেমন একটা অস্পষ্টতায় ঢাকা।

আর জড়াজড়ি গলাগলির এমনই মাহাত্ম্য, গাজী সাহেব গঙ্গাস্তোত্র রচনা করে ক্ষান্ত হননি, নিয়মিত গঙ্গাপুজোও করতেন।

ভিখিরিদাস আর গাজীসাহেবের ঘটনা, যবন হরিদাসের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু গৌড়ের পাঠান আমলের সেই ইতিহাস তো কামারের নেহাইয়ে হাতুড়ির ঘা। যবন হয়ে হিন্দু নিমাই পণ্ডিতের ভক্ত শিষ্য, বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ! কাজীর বিচারে তাই হরিদাসকে বাইশবাজারে, বেত দিয়ে পেটানো হয়েছিল। তা ছাড়াও ছিল হিন্দুর জাতি মারার নানান কৌশল। অথচ তার প্রায় দুশো বছর আগেই যবন গাজীর গঙ্গাপুজো, মনে কেমন ধন্দ লাগিয়ে দেয়। দরাফ যদি জাফর হন, তবে তাঁর পরিচয় সপ্তগ্রাম বিজেতা। স্বয়ং বাদশার ওপরে তো কাজীর বিচার চলে না। কিন্তু পাণ্ডুয়া বিজয়ী শাহ সুফিও খুড়তুতো ভাইটিকে কিছু বলেননি? কেন? গঙ্গার স্রোতে তখন তা হলে জাত বিজাতের ভক্তির শক্তি ছিল।

'আরো একটা কথা কি জানেন বাবু?' এমদাদের নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লো, 'গাজীসাবের এক ছেলে হুগলির এক হিঁদু রাজার মেয়েকে শাদী করেছিল। তা সেই মেয়েও এখেনেই আছেন।'

ইতিহাসের অক্ষরমালা মাথায় পাক খেলেও, ঠিক মনে করতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে আছেন মানে?'

'এঁজ্ঞে, তাঁকে এখেনেই গোর দেওয়া হয়েছে।' এমদাদ হাত তুলে পশ্চিমে দেখালো, 'ঐ যে, ঐখেনে উনি আছেন।'

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, পশ্চিমের ছায়ায় ঝোপঝাড়ের কাছাকাছি আর একটি ছোট সমাধি। দেখতে গিয়ে চোখে পড়লো, সেই কুচোকাঁচা ছেলেগুলো, ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে আমাদের দিকেই দেখছিল। মুখ ফেরাতেই চড়ুই পাখির মতো ঝুপঝাপ আড়ালে চলে গেল। এমদাদের তুরাক আজ আর ইস্কুলে যাবে না। কিন্তু এমদাদ দেখেও কিছু বললো না, বা তাড়া দিল না। এখন তার মনের গতি অন্য দিকে। তুরাকের ইস্কুলে না-যাওয়া নিয়ে আমার চোখে ভ্রূকুটি নেই। বরং নিজের ছেলেবেলাটা মনে করে, হাসছে আমার অন্তর্যামী। সেই সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস। ঐ দিনগুলো আর এ জীবনে ফিরে পাবো না।

'তা, বাবু, আজ মাঘ মাসের কত তারিখ হল?' এমদাদ তার বুড়ো আর মধ্য আঙুলে, বলতে গেলে সিগারেটের অঙার ধরে টান দিয়ে, মাটিতে ফেললো। লোহার আঙুল না নিশ্চয়ই, কিন্তু আঙুল দিয়ে টিপেই আগুন নিভিয়ে ছাই করে দিল। হলদে জিজ্ঞাসু চোখ আমার দিকে।

ধর্মান্তরিত হিন্দু রাজকন্যের গোর দেখিয়ে, তারপরেই মাসের দিন তারিখের খোঁজ খবর কেন? বিপদে ফেললো আমাকেও। মাঘ মাস জানি, তারিখের হিসাব তো জানা নেই। বললাম, 'তা তো বলতে পারি না।'

এমদাদ তখন নিজেরই আঙুলের কর গুনতে আরম্ভ করেছে, আর গোঁফ-দাড়ির ফাঁকে কালো ঠোঁট নড়ছে। তারপরে হঠাৎ বড় দাঁতে হেসে বললো, 'আমিও হিসেব পাচ্ছিনে। তা, সে যাই হক গে, বলছিলাম, মাঘী পুন্নিমেয় সবাই ত্রিবেণীতে নাইতে আসে ত, খুব ভিড় হয়। ত, ইদিককার যত সাবেক দিনের হিঁদু আছে, সব্বাই এই মজ্জিদে একবার আসবে। কেবল মাঘী পুন্নিমেয় নয়, ত্রিবেণীর ঘাটে যত পালপাবনের যোগ আছে, উত্তরান, বারুনি, দশেরা, সাবেকি হিঁদুরা এখানে একবার আসে। আর মোচলমানের ত কথাই নেই। তা, ব্যাপারটা বুঝলেন ত বাবু?' তার হলুদ রঙ বড় দাঁতের হাসিটি গোঁফদাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো, চোখের খয়েরি তারায় যেন রহস্যের ঝিলিক।

ঘটনা শুনলাম, তার মধ্যে আবার ব্যাপারটা কী? গূঢ় রহস্য কিছু আছে নাকি? আমি তার মুখের দিকে অবুঝ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

এমদাদ আমাকে অবাক করে দিয়ে, আদৌ গলা না চড়িয়ে গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলো, 'কী বা হিঁদু কী মোচলমান মিলে জুলে করছে সাঁইজীর কাম।/ হিঁদুর গুরু মোচলমানের পীর সেই নাম রেখেছেন সাবের ফকির।'...

আবেগে গেয়ে উঠেই, যেন বড় লজ্জা পেয়ে গেল। হাত জোড় করে বললো, 'কিছু মনে করলেন না ত বাবু?'

ভাবলাম, আমিও গেয়ে শোনাই, 'মন আছে তোর মনের ভেতরে। তারে একবার দ্যাখ না নেড়েচেড়ে।'...কিন্তু সুতোয় ভরা আবেগের লাটাইকে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারলাম না। বাবুর মন যে! তবে এমদাদ আমার দিলে তুক করেছে। বললাম, 'মনে করব কী হে, তুমি যে আমার মন মজিয়ে দিলে।'

'ই আল্লা!' এমদাদ কপালে হাত ঠেকালো। 'গাইতে ত পারিনে বাবু, ত এসে গেল। আসলে কথাটা কী, এখানে জাত বেজাতের বিচার নেই। আচ্ছা বাবু বলেন তো, এই জাতের বিচার করলে কে?'

সর্বনাশ! হাতের মূলধন ইতিহাসের দুই চারি পাতা। জাতের বিচারকের সুলুক সন্ধান সেখানে নেই। নিজের দৌড় জানি। সিগারেটের টুকরো পায়ের স্যাণ্ডেলের তলায় চেপে দিয়ে বললাম, 'সে কথা তো বলতে পারবো না।'

'এই ত, এই একটুখানি ত জীবন, জাত জপে কী হয় বুঝিনে।' এমদাদের বড় দাঁতের হাসিটি কেমন ছায়াঘন হয়ে উঠলো, 'কবে আছি, কবে নেই, জানের বাসা ফুড়ুৎ।'

ছোট এ জীবনের ধরতাইটা এখান থেকেই শুরু। মনে করতে পারছিলাম না। আমি এমদাদের মুখের দিকে তাকালাম। তার কথা থেকেই অনুমান করি, চালচুলো নেই, এমন একজন ভূমিহীন, দরিদ্র বাঙালী ছাড়া সে আর কিছু

না। যেদিন যেমন জোটে, সেদিন তেমনি, দিনযাপনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা যে নেই, সেটা তার সর্বাঙ্গে যেন লেখা রয়েছে। তার মধ্যেই কোথায় যেন জীবনের একটা পথকে সে, জেনে বা না জেনে, খুঁজে নিয়েছে। সেখানে তার সুখ স্বস্তি আছে কী না জানি না, হাসতে ভোলেনি। এমন কি নিখুঁজি মেয়ের 'পেটভাতায় সব হয় না, মন গতরের কথাও তার মনে থাকে।' হয়তো এটাই সহজ কথা। তবু দেখি, সংসারের সীমানায় দাঁড়িয়ে, সহজ কথা সহজ করে বলার শক্তি সকলের জন্য না। অনুভবের ঘরে তার আনা যানা চাই। এই এমদাদের সেই ঘরটা নিশ্চয় চেনা।

কথায় কথায় এমদাদের জিজ্ঞাসা। সে তত্ত্ব কথা বলেনি, নিজে সাঁইজী বনতে চায়নি। তবু মাঘের এই প্রাক-দ্বিপ্রহরে, জাফর খাঁ গাজীর নির্জন মসজিদ প্রাঙ্গণে, জীবনের একটা পাঠ নেওয়া হলো। পথ চলার এইটুকু লাভ। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

'চললেন নাকি বাবু?' এমদাদও উঠে দাঁড়ালো।

বললাম, 'হ্যাঁ, এবার উঠি, বেলা তো বাড়ছে।' আমি পকেটে হাত দিলাম। কেন না, এমদাদের সেই কথাটা ভুলিনি, এই মসজিদ দেখাশোনা করার জন্য তাদের কয়েক ঘরকে সরকার নাকি কিছু দেয়। আর সমাধিতে যারা যা দেয়, তাই ভাগ বাটোয়ারা হয়।

'কোথায় যাবেন বাবু?' এমদাদ জিজ্ঞেস করলো।

আমি জাফর খাঁ গাজীর সমাধির দিকে পা বাড়িয়ে, উত্তরে হাত দেখিয়ে বললাম, 'এখন যাবো ঐ ঘাটে।'

'ছি বাবু, অমন করে ঘাটে যাব বলতে নেই।' এমদাদ এমনভাবে হাত তুলে বললো, পারলে আমার গায়ে হাত দেয়, 'বলেন, ঘাটের দিকে বেড়াতে যাবেন।'

তাও তো সত্যি কথা। এমদাদ জাত বেজাত না মানুক, হিন্দু মুখে ঘাটে যাবার কথা শুনলে, মনে তার অলুক্ষণে সংকেতটা কাঁটা দিয়ে ওঠে। ঘাটে যাওয়া, শেষ যাওয়া। যে ঘাটে পা বাড়িয়েছে, সে আর পিছন ফেরে না। আমি সেই কথা ভেবে বলিনি। প্রয়াগে গুপ্ত বেণীর ঘাট দেখে এসেছি আগেই। মাথা মুড়িয়ে আসিনি বটে, কেন না, 'প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা / মরগে পাপী যথা তথা।' এক রকমের তীর্থ দর্শনেই গিয়েছিলাম বটে। কিন্তু সেই তীর্থের রূপ আলাদা। ঘুরে ঘুরে ভারত দেখবো, তেমন রেস্তো ছিল না। অথচ ভারতের মানুষের বিশ্বাস, কোটি গরু দানে যে-পুণ্যের ফল, তার থেকে মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করলে, সেই পুণ্য লাভ হয়। তার সঙ্গে যদি থাকে পূর্ণ বা অর্ধকুম্ভের যোগ, তা হলে তো কথাই নেই। সারা ভারতের মানুষ সেইখানে। তার জীবনের সকল বাসনা কামনা মানত মানসিক আর পাপ নিয়ে তারা আসে সঙ্গমের পুণ্য স্নানে। মুক্তি স্নানে।

আমি সেই ভারতকে দেখতে গিয়েছিলাম। সেই আমার তীর্থ, সেই দর্শন আমার পুণ্য। কিন্তু ঘরের কাছে মুক্ত বেণী দেখা হয়নি। যারা পুণ্যস্নানের তীর্থে বিশ্বাসী, তারা গুপ্ত বেণীতে ডুব দিলে ভাবে, একবার মুক্ত বেণীতেও অবগাহন দরকার। বাসনা কামনা মানত মানসিক না থাক, মুক্ত বেণীর ঘাটে একবার বসে যাবো, এই ইচ্ছা। ভারতবাসীর কাছে যে-স্থানের জীবনকালের মহিমা, সে-স্থানকে ঘরের কাছে বলে তুচ্ছ করতে পারি না। এখন মেলা নেই, কোনো যোগ নেই, পার্বণ নেই। না-ই থাক, মুক্ত বেণীর ঘাট বলে কথা।

আমি হেসে বললাম, 'ঘাটে যাবার ডাক এলে, কে আর ধরে রাখবে? আমি সেই ভেবে বলিনি।'

'তা কি আর জানিনে বাবু?' এমদাদের বড় দাঁতে, গোঁফদাড়িতে হাসির ঝলক, 'আপনার এখন কাঁচা বয়স। ত, কথাটা শুনলে মনে ঝান খায়।'

জানি, ঘাটে যাবার কথা বলতে নেই। একলা আপন মনে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসা তো আরও অশুভ। তুমি মানো চাই না মানো, যারা মানে, তাদের মান রাখলে ক্ষতি কি? আমি পকেটে হাত দিয়ে, খুচরো পয়সা যা পেলাম, তা তুলে নিলাম। জাফর খাঁ আর দরাফ গাজী, যা-ই বলো, আগে তাঁর সমাধিতে কিছু রাখলাম। এই সময়েই, পঞ্চম ঋতুতে কুহু কুহু ডাক ভেসে এলো। স্বরটাও সপ্তমে না, একটু যেন অস্পষ্ট, পঞ্চমেই। আমি চোখ তুলে আশেপাশের গাছের দিকে তাকালাম। অকাল বসন্তের এই হঠাৎ ডাক, কিছু সংকেত দিচ্ছে নাকি? এতোক্ষণ ধরে তো, দোয়েল বুলবুলি টুনটুনির ডাকই শুনে আসছি।

'কী হলো বাবু?' এমদাদের হলদে চোখের খয়েরি তারায় অবাক জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'কোকিল ডেকে উঠলো না?'

'হ্যাঁ বাবু। সব সোময়েই ত ডাকে।' এমদাদ যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল, 'কোকিলের ডাকে কী হয় বাবু?'

হেসে বললাম, 'কিছু না। এতক্ষণ শুনিনি তো। মাঘ মাসেও এখানে কোকিল ডাকে?'

'মাঘ মাস কেন বাবু, সারা বছর ডাকে।' এমদাদের মুখের অস্বস্তি কাটলো। এখন তার চোখ গাজীর সমাধির ওপর।

তা বটে! এমন সবুজের ছায়া নিবিড় নির্জনে যদি বারো মাস না থাকবে ডাকবে, আর কোথায় বা যাবে ডাকবে। এখন তো দেখছি, রংবেরঙের প্রজাপতিও পাখা মেলে উড়ছে। আমি এগিয়ে গেলাম, হুগলির কোনো এক রাজার মেয়ের সমাধির দিকে। যাদের রাজ্য জয় করে, জাফর খাঁর ছেলে শাদী করেছিল। তার হিন্দু নাম কী ছিল, মুসলমানের বিবি হয়ে কী নাম হয়েছিল, কে জানে শ্বশুর আর পুত্রবধূ এক প্রাঙ্গণেই আছে। ছেলেটি

কোথায় গিয়ে মাটি নিয়েছে? সব কথা জানা যায় না। ইতিহাসই কি জানে? ভাবতে যদি চাও, ভেবে নাও, সে আরও অনেক রাজ্য জয় করেছিল, অনেক বিবির সঙ্গে ঘর করেছে, নানা খানে, নানা দেশে। তার সমাধির খবর কেউ জানে না।

আমি হুগলির রাজকন্যের সমাধিতে বাকি পয়সাগুলো রাখতেই, এমদাদ ধমকে উঠলো, 'আই, হেই রে, ওখেনে কী করছিস তোরা? এই কাচকাঁচা-গুলোনকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, সেই গোটাকয়েক কুচোকাঁচা জাফর খাঁ গাজীর কবরের কাছ থেকে, চড়ুইয়ের মতোই ফুড়ুত ফাড়ুত মসজিদের মধ্যে দৌড়ে গিয়ে ঢুকছে। এমদাদ সেদিকেই তাকিয়ে। তার ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে, মুখে বিরক্তি। আবার বললো, 'আমি রয়েছি না? যা, তোরা যা। যা জুটবে, আমি সব নিয়ে থুয়ে ভাগ বাটোয়া করে দেবখনি।'

মনে আমার সন্দ ধন্দ কিছু নেই। কুচোকাঁচাগুলো কেন সমাধির কাছে ছুটে এসেছিল, তা অনুমান করতে পারি। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কী করছে এরা?'

'কী আর করবে বাবু?' এমদাদ আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বিব্রত হাসি হেসে বললো, 'বলেন কেন বাবু, ইস্কুলে যাবে না, বাড়িতে থাকবে না, সারাদিন এখানে এসে ঘুরঘুর করবে। আর কেউ এসে দু চার পয়সা দিলে সেগুলোন তুলে নিয়ে বাজার দোকান থেকে এটা সেটা কিনে খাবে। দেখলেন না, যেই আপনার সঙ্গে ইদিকে ফিরেছি, অমনি মজ্জিদের ভেতর দিয়ে ছুটে এসেছে। এই নজর না রাখলেই পয়সাগুলোন নিয়ে পালাত।'

ছোট জীবন, তবু সব দিকে নজর রাখতে হয়। ওটাও জীবনের ধর্ম। কিন্তু এমদাদের ছেলে তুরাক আর দোসরদেরও এক পলকে দেখে নিয়েছি। আধ ন্যাংটো, গায়ের জামা ধুলিঝুলি, হাটখোলা বুক। ধাড়ির পিছু পিছু বাচ্চাগুলো চিরদিনই এমনি করে ফেরে। দোষ দেওয়া যায় কাকে?

আমি বিবির গোরে পয়সা দিয়ে পা বাড়াতে গিয়ে মনে ঠেক খেয়ে গেলাম। জানি, এমদাদের এখন এখান থেকে নড়াচড়া সম্ভব না। ধাড়ি গেলে, বাচ্চাগুলো পাকা ফলে হাত বাড়াবে। তারা যে মসজিদ বা আশে-পাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে রয়েছে আর এদিকেই নজর রেখেছে, কোনো সন্দেহ নেই। আমি পকেটে আর একবার হাত ঢুকিয়ে বললাম, 'এ পয়সা-গুলো তা হলে তুমি রাখো। আর ওদের একবার ডাকো না।'

এমদাদের চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, বললাম, 'ওদেরও তো কিছু পাওনা আছে। সেই ফিকিরে সারাদিন এখানে ঘোরাফেরা করে।'

'বাবুর যে কথা!' এমদাদের গোঁফদাড়ির ভাঁজে আর বড় দাঁতে হাসি

ছড়িয়ে পড়লো। তারপরেই গলা তুলে হাঁক, 'অই, অই রে, তুরাক, ফইজ, এজাদের নিয়ে ইদিকে আয়, বাবু তোদের ডাকছেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। মাঘের অল্প বাতাসে গাছের পাতায় ঝিরঝিরে শব্দ। সেই সঙ্গে পাখির ডাক। মাঝে মাঝে পঞ্চম স্বরে কোকিলের কুহু। আমি আর এমদাদ চারদিকে তাকাচ্ছি। আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে একটি একটি করে মুখ উঁকি দিতে শুরু করলো। এমদাদ একজনকে ডাকলো, 'আয় আয়, বাবু তোদের ডাকছে।'

দেখলাম, সকলের সন্দিগ্ধ ভয় ভয় চোখের দৃষ্টি আমার দিকেই। আমি সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। হাসি দেখে ভয়টা বোধহয় একটু কাটলো। এমদাদ আবার ডাকলো, 'ইস, অন্য সোমায় বাবুদের পায়ে পায়ে ঘুরিস, এখন আর আসতে পারছিস নে ? ঝটপট আয়, বাবু কি তোদের জন্যে দিন কাবার খাড়া থাকবেন নাকি ?'

অন্য সময় বাবুদের পায়ে পায়ে মানে, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় না। পয়সা চেয়ে বেড়ায়। তবে, যেচে সেধে ডাকাটা একটু ভিন্ন রকমের ব্যাপার। এমনটা বোধহয় ঘটে না। এমদাদের শেষ কথায়, সব কটা এবার ভয়-পাওয়া মুরগীর মতো, আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে এলো। দেখলাম, গুণতিতে কুল্যে চারজন। তার মধ্যে একটার গায়ে যদি বা ছেঁড়া ধুলিঝুলি জামা আছে, তলার দিকটা একেবারে খোলা। আমি সামান্যতম মূল্যের একটি করে মুদ্রা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। সবাই হাত পেতে নিল। এমদাদ বললো, 'হয়েছে তো ? যা, এবার সব ঘরে যাদিনি, পালা। নইলে পিটিয়ে হাড় ভাঙব।'

যেমনি বলা, তেমনি সবাই চড়ুইয়ের মতোই ঝোপে ঝাড়ে মিশে গেল। এমদাদ বিবির গোর থেকে পয়সাগুলো তুলে নিল। আমি পকেট থেকে হাত তুলিনি। কারণ তোমার পিছু টানটা রয়েছে মনের আর এক কোণে। তবু পা বাড়ালাম। এমদাদ আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে গাজীর গোরের ওপর থেকেও পয়সাগুলো নিল। চাদরের ভিতর হাত ঢুকিয়ে কোথায় যেন রাখলো। বোধহয় জামা আছে এবং তার পকেটও আছে। অন্যথায় লুঙ্গির কষিতে গুঁজতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি একটি কাগজের টাকা বের করে এমদাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এটা তুমি রাখো।'

এমদাদ এমনটা আশা করেনি। এক পলকের জন্য তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো ধন্দ লাগা বিস্ময়। তারপরেই তার সারা চোখে মুখে গোঁফ-দাড়িতে ঝলক দিল হাসি। তবু যেন লজ্জা কাটতে চায় না। বললো, 'কেন বাবু, আবার এটা কেন ? যা দেবার দিয়েছেন তো।'

বলতে পারতাম, একে বলে, পেটে খিদে, মুখে লাজ। কিন্তু এ মানুষটাকে নিয়ে তেমন ভাবতে ইচ্ছা করে না। বরং সহবতের কথাই মনে আসছে।

সেই কারণে লজ্জাটা আমার মনেও। বললাম, 'পকেট ভরতি নেই, তবু তোমাকে দিতে ইচ্ছে করছে। কিছু মনে করছো না তো ?'

'ই আল্লা!' এমদাদের হাসি মুখের একূলে ওকূলে ঢেউ দিল, 'আপনি দিলে আমি কিছু মনে করব ? এ তো আমার তকদির বাবু। আজ না জানি কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। দ্যান বাবু।' সে দু হাত পেতে বাড়িয়ে দিল।

মিথ্যা বলিনি। কানা না হোক, কড়ি আমার গোনাগুনতি। দানসাগরের দরাজ হাত হবার উপায় আমার নেই। তবু, সেই একই কথা, মন গুণে ধন। তার অন্ধিসন্ধি সব সময়ে নিজে বুঝতে পারি, এমন না। এমদাদ আমার সেই না-জানা মনের কোথায় ঢেউ তুলেছে। গরীবকে রাজা করেছে। আমি তার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম, 'কার মুখ দেখে আর উঠবে ? নিশ্চয়ই বিবির মুখ দেখেই উঠেছো ?'

'বাবু যে কী বলেন!' এমদাদ তার ভাঙ্গা সরু গলায় উচ্চস্বরে হাসলো, 'তা বাবু, ঘর করতে পাশাপাশি, বিবি না হোক, ছেলে মেয়ের কারুর মুখ দেখেছি।'

আমি যে-পথে এসেছিলাম সেইদিকে পা বাড়ালাম। এমদাদকে সঙ্গে আসতে দেখে বললাম, 'বাড়ি কি তোমার এদিকে ?'

'না বাবু, আমি যাব পচ্চিম।' এমদাদ বললো, 'চলেন, আপনার সঙ্গে সাঁকো তক যাই। আপনি ঘাট বেড়াতে যাবেন, আমার ত যাবার উপায় নেই। নইলে সঙ্গে যেতাম।'

আমি ঢালু পথে পা বাড়ালাম। ত্রিবেণীর ঘাটে এমদাদের যাবার উপায় নেই, কেন, তা জানি। জানি না, কেবল জাতের বিচার করলে কে ? অথচ যে-গাজীর মসজিদ আর সমাধি ছেড়ে যাচ্ছি, তিনি নাকি গঙ্গামন্ত্র জানতেন, গঙ্গাপুজা করতেন। বৈপরীত্য একে বলে।

সূর্য পশ্চিমে ঢল খেলেই যে শীতের বেলার তাড়া লেগে যায়, এমন না। পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে কবজি ঘোরাতেই দেখি, সময়ের কাঁটা বেলা বারোটা ছুঁই ছুঁই। একটু আগে প্রাক-দ্বিপ্রহর মনে হয়েছিল। কিন্তু মন পিছিয়েছিল ঘণ্টাখানেক। এ দেখছি, গাজীর বাঘের দৌড় আর বাবাজীর দাওয়ায় চাপড়ের দৌড়ের মতো, সময় কেটে গিয়েছে পলকে।

ঢালু পথে নামতে নামতেই একটা যেন হাসিখুশির হৈচৈ কানে ভেসে আসছিল। নিরালা রাস্তাটায় আবার কাদের দল এলো। গাছের আড়াল ছেড়ে আসতেই চোখে পড়লো, উত্তরের পথে চলেছে শবযাত্রা। কিন্তু ঠেক না, একেবারে ঠোক্কর। জীবনে এমন দৃশ্য কদাপি নয়নগোচর হয়নি। শব-কাঁধে শ্মশানযাত্রী চারজনই মহিলা। চালিতে সারা গা কাপড়ে ঢাকা, শবের রোদ লাগা মুখখানিও দেখছি মহিলার।

ব্যাপার দেখে দাঁড়িয়েই পড়েছিলাম। এমদাদ আলি খাঁ বলে উঠলো, 'তোবা তোবা। মেয়েমানুষ মড়া বই করছে, এমন তাজ্জব কাণ্ড আর দেখিনি।'

আমারই মনের কথা। আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম না। ঠোক্কর খেয়ে রাস্তার ওপর অবাক ঘটনাটাই দেখছিলাম। মহিলা বললে ভদ্রলোকেরা যেমনটি ভাবেন, শববাহিকাদের দেখে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে না। কোন্ শ্মশানযাত্রীরাই বা পোশাকের চাকচিক্যের ধার ধারে। বরং হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তা-ই গায়ে চাপিয়ে কোমরে একটা গামছা বেঁধে নিলেই হলো। তবু বসন ভূষণ চেহারায় একটা স্তরভেদের ছাপ থাকে। এই শব-বাহিকাদের সব কিছুতেই কেমন একটা গ্রাম্যতার ছাপ। অবিশ্যি বিচার করা দায়। কারণ, জীবনে এমন দৃশ্য দেখিনি। শব বয়ে নিয়ে চলেছে রমণীর দল। শাড়ি জামায় সাধারণ সধবার বেশে, তাদের সামাজিক স্তরভেদ এই চর্ম চক্ষে সম্ভব না।

শবাধারের চার বাহিকাই প্রায় প্রৌঢ়া। শাড়ি জামার ওপরে কারোর গায়ে বা কোমর জড়িয়ে গামছা। হরিধ্বনির হাঁক নেই, ঠোঁট নড়ছে দেখতে পাচ্ছি। গলার স্বর যে তাদের নিভু নিভু, তা বোঝা যাচ্ছে তাদের চলন দেখে। কারোর পা পড়ছে এলোমেলো। কাঁধ নুয়ে পড়েছে। কোমর সোজা করে চলবার ক্ষমতা নেই। কোনোরকমে বহে নিয়ে চলেছে, জোর কদমের কোনো কথাই নেই। যদি ঠিক দেখে থাকি, কারোর জিভ বেরিয়ে না পড়লেও, এই মাঘের রোদেও মুখে তাদের ঘাম ঝরছে।

অবলা বলে হেলা করতে চাই না। চিত্রটি যদি বা অভূতপূর্ব, চার বাহিকাদের দেখে কষ্ট লাগছে। খবরের তল পাওয়া যাবে কী না, জানি না। ঘটনার এমন কি গতি, পুরুষ বাহক জোটেনি? পিছনে একদল কুচোকাঁচা যারা জুটেছে আর হাততালি দিয়ে হাসছে, ওরা যেন শ্মশানযাত্রী না, তা বোঝা যাচ্ছে। পথ চলতে মজা লোটা। এমন মজাই বা আর কে কবে দেখেছে? তা ছাড়া, বেলা এগারোটায় মিল ছুটি হয়েছে। ইতিমধ্যে মজুরদের ভিড় কমে গিয়েছে বটে, তবু কিছু লোক আশেপাশে ছড়িয়ে যেন শবানুগমনেই চলেছে। কেউ অবাক, কেউ হাসছে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

এমদাদের 'নিখুঁজি মেয়ে ক্যামপের' টিনের দেওয়ালের ফাঁক ফোঁকরে নানা বয়সের স্ত্রীলোকদের বিস্তর মুখ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এমন একটি দৃশ্য উপভোগের জন্যে, তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ধাক্কাধাক্কি লেগে গিয়েছে। হনুমানের মতো একদল ছেলেপিলে উঠে পড়েছে গুদাম ঘরের ঢেউ খেলানো টিনের চালায়। এমদাদের গলায়, আক্কেল গুড়ুম! 'তোবা তোবা।' আর থামে না।

আক্কেল গুড়ুম আমারও বটে। তবে, শববাহিকাদের পাশে পাশে চলা

একটি লোককে দেখে বুঝতে পারছি না, সে কে। সঙ্গেই বা কেন? লম্বাচওড়া ফরসা লোকটি প্রৌঢ় হলেও তাকে সুপুরুষ বলতে হবে। একদা যে রূপবান ছিল, সন্দেহ নেই। খালি পা। ধুতির ওপরে বুক খোলা একটা পাঞ্জাবি। কোমরে জড়ানো খয়েরি রঙের পশমী চাদর। মাথার চুলে পাক ধরেছে, কিন্তু কালোই যেন বেশি। একমাত্র সে-ই মাঝে মাঝে চিৎকার করে 'বল হরি, হরি বোল' দিচ্ছে। আর তার প্রতিধ্বনি করছে পিছনের মজাখোর, কতগুলো রাস্তার ছোট ছোট ছেলে। অথচ এমন না, যে খই বা পয়সা ছড়িয়ে শবযাত্রা চলেছে। ধুলিঝুলি পোশাকে আধল্যাংটার দলের পিছন নেবার একটা অন্য উদ্দেশ্য থাকতো। আসলে, ওদের মজার পালে হাওয়া লেগেছে।

আমার মজার পালে হাওয়া লাগবার কিছু নেই। অবাক কৌতুহলের পালটা থর থর করছে। কথায় বলে, বাপের জন্মে দেখিনি। সত্যি কথা, আমার বাবা ঠাকুর্দার মুখেও এমন ঘটনার কথা শুনিনি। মনে একবার প্রশ্ন জাগলো, একি বিশেষ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রথা বিশেষ? নিজের দেশেরই বা কতটুকু জানি।

আমি রাস্তায় নেমে গেলাম। পিছনে পিছনে এমদাদ, 'চললেন বাবু?'

'হ্যাঁ, এবার যাই। মনে হচ্ছে, এরাও ঘাটে যাচ্ছে। ব্যাপারটা কী, সেখানে গেলে জানা যাবে।'

এমদাদ রাস্তার ধার দিয়ে আমার সঙ্গেই পা বাড়ালো। বললো, 'হ্যাঁ হিঁদু যখন ঘাটেই যাবে। তবু একবার খোঁজখবর করে দেখি, এ আজব কাণ্ডটা কী? বলতে বলতে সে পিছন দিকে চলে গেল। যাবার আগে আমাকে বলে গেল, 'আপনি চলেন বাবু, আমি আসছি।'

অন্তর্যামী অন্তরে থাকেন বলেই জানি। সেটা মানুষের নিজের সত্তা। বাইরে তার কোনো অস্তিত্বের সন্ধান জানি না। সে যখন হাসে, মানুষের অন্তরে বসেই হাসে। মানুষ হয় তো সেই হাসিটা দেখতে পায় না। কয়েক পা চলতে চলতে শববাহিকাদের থেকে কিছুটা দূরত্বে আমার অন্তর্যামীও হাসছিল কী না, বুঝতে পারিনি। হঠাৎ মনে হলো, চালির সামনের দিকে বাঁয়ের শববাহিকা একবার আমার দিকে তাকালো। ঘাড় ঝাঁকিয়ে কী একটা ইশারা করলো।

আমি আমার বাঁয়ে তাকালাম। আমি ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। ধন্দ ভেবে, আবার তাকালাম। দেখি, শববাহিকারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। শবাধারের সামনের দিকের বাহিকা বাঁ হাত তুলে আমাকেই ইশারায় ডাকছে। আমি ছাড়া তার বাঁয়ে আর কেউ নেই। ঘোলা চোখের করুণ দৃষ্টিও আমার দিকে। না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

বাহিকার খোলা চুলে অল্প স্বল্প পাক ধরেছে। মুখে ঘাম। মাথা ঝাঁকিয়ে জানালো, আমাকেই ডাকছে। অবলা বলে হেলা করি না। নারীর আর

এক নাম তো শক্তি। মানবতা বলেও একটা কথা আছে তো। তবু যে কেন চিরকালের মনটা ভিতরে ভিতরে গুটিয়ে যেতে লাগলো, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু কাছে এগিয়ে গেলাম। আর কর্ণে আমার বজ্রাঘাত! বাহিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, 'আর পারচিনে বাবা, একটু কাঁধ দাও।'

কাঁধ দেবো? বলে কী? সত্যি বলছে নাকি? নাকি, বলা সম্ভব? আমি ভাবছিলাম, না জানি কী এক আজব ব্যাপার। অথবা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য। শেষটায় বলে কী না, 'কাঁধ দাও!' জলে পড়লাম, না না আগুনের হাতায়, সাত পাঁচ ভেবে পাচ্ছি না। আমার মুখের চেহারা তখন কেমন, নিজে দেখতে পাচ্ছি না। কেবল অবাক অবিশ্বাসের স্বরে বললাম, 'কাঁধ দেবো?'

'হ্যাঁ বাবা।' বাহিকা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ঘোলা চোখের তারা দুটো মরা মাছের মতো। হাত দিয়ে নিজের পায়ের দিকে দেখিয়ে বললো, 'দেখ বাবা, পা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেচে, এক ফোঁটা তাগদ নেই। এবার মুখ থুবড়ে পড়ব। এসে গেচি বাবা, এইটুকু পথ, একটু কাঁধ দাও।'

তাকিয়ে দেখি, সত্যি কথা। পা দুটো ফুলে ঢোল, পাঁউরুটি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাসী আলতার দাগ রয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এমদাদ আমাকে ডাকছে, 'বাবু, ইদিকে আসেন, ইদিকে।'

হঠাৎ সেই লম্বা চওড়া ফরসা লোকটি এগিয়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। তার বোতাম খোলা জামার বুকে দেখি, মোটা একগাছা পৈতা। বললো, 'বলেছে যখন নাও বাবা। মেয়েমানুষ, কত আর পারে। এখান থেকে তো নয়, অনেক দূর থেকে আসছে।'

তা আসতে পারে, কিন্তু অনেক দূরের পথে শেষটায় চোখে পড়লাম আমি? গেরো আর গ্রহ বলো, একেই বলে। আমি মুখ ঘুরিয়ে অন্যান্য বাহিকাদের দিকে তাকালাম। পিছন থেকে, ডাইনের কোমল মুখ, ডাগর চোখ, প্রৌঢ়াটি ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে বললো, 'নাও বাবা, একটু কাঁধ দাও, ও আর পারচে না। দেখে মনে হচ্ছে, তোমার প্রাণে দয়া আছে।'

দয়া এখন আমার গয়ায়, মস্তিষ্কে পিণ্ড দিচ্ছে। পিছন ফিরে দৌড় দেবো কী না ভাবছি। দিলেই বা কে কী বলবে। কাঁধ না দিতে চাইলেই বা কার কী বলার আছে। এমদাদের ডাক তো তখনও শুনতে পাচ্ছি। তার দিকে মুখ ফেরাতে যাবো। লম্বা চওড়া গোরা পৈতাধারী বলে উঠলো, 'সত্যি বাবা, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তোমার দয়ার শরীর।'

সামনের ডান দিকের বাহিকা যেন মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি চুপ যাও তো ঠাকুর, আর মুখ সাপুটি কোরো না।'

ঠাকুরমহাশয়ের হাসিটি আদৌ ছানা কাটলো না। আমি বললাম, 'আপনি কাঁধ দিচ্ছেন না কেন?'

ঠাকুরমহাশয় একেবারে মাকালী। মস্ত জিভ বের করে চোখ ঘোরালো। বুকের কাছ থেকে পৈতেগাছা টেনে বের করে দেখিয়ে বললো, 'পুরোত মানুষ বাবা, আমি তো শ্মশানক্রিয়া করতে যাচ্ছি। মড়া বইতে পারি না।'

এদিকে আমার ডান পাশের বাহিকার কষ বেয়ে লালা গড়াচ্ছে। হাঁপের থেকেও কষ্ট বেশি, কোনোরকমে বললো, 'কাঁধ দাও বাবা, এবার পড়ে যাব।'

তার ওপরে দেখছি, শরীর কাঁপছে থরথরিয়ে। একি ঘোড়া দেখে খোঁড়া? এতক্ষণ দিব্যি চলছিল। কিন্তু নিজের সঙ্গে লড়াই করে হার হলো। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু আমার পায়ে যে চামড়ার স্যাণ্ডেল রয়েছে।'

'ও সব আমি শোধন করে দেব।' ঠাকুরমহাশয়টি হেসে বললো, 'মন্ত্রে কী না হয় সব আমার জানা আছে। তুমি স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়েই চল বাবা।'

অবস্থা এমন, এখন এখানে দাঁড়িয়ে ঘটনার সাত সতেরো খবর নিই, তার উপায় নেই। চালির সামনের ডান পাশের বাহিকা যেভাবে ঠাকুরকে মুখ ঝামটা দিল সেটাও যেন কেমন চালে মিলছে না। নিজের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। পাশের বাহিকার অবস্থা সঙ্গীন। কাঁধের ঝোলা সাব্যস্ত করে, কোচা গুঁজলাম মাল সাপটে। কাঁধ বাড়িয়ে দিলাম চালিতে। ঠাকুর চিৎকার করে হরিধ্বনি দিল, 'বল হরি, হরি বোল।...'

বাহিকারা ক্লান্ত নিচু স্বরে হরিধ্বনি দিল। পিছনে ধুলিঝাড়ার দল জোরে হাঁকলো। নিষ্কৃতি পাওয়া বাহিকাটি সেইখানেই বসে পড়লো। পিছন থেকে এক বাহিকা বলে উঠলো, 'বসো না গো দুগ্‌গা-দিদি, তা হলে আর উঠতে পারবে না। আস্তে আস্তে চলতে থাক।'

ঠাকরুন দুগ্‌গা-দুর্গা, যা-ই হোক, তার উঠে দাঁড়াবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ঝুঁকে পড়ে দু হাত মাটিতে রেখে কোনোরকমে বললো, 'তোরা এগো লক্ষ্মী, আমি আসচি।'

ঠাকুরমহাশয় তাড়া দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দাঁড়ানো নয়, চল চল। বল হরি, হরি বোল।'

আবার বাহিকাদের ঠোঁট নড়লো। ধুলিঝাড়াগুলো হেঁকে নেচে আওয়াজ দিল। তার মধ্যেই 'নিখুঁজি' আস্তানা থেকে রমণীর উচ্চস্বর শোনা গেল, 'ভাল পথ দেখাইলা গো মায়েরা, অখন থেইক্যা আমাগো মড়া আমরাই কান্ধে লইয়া যামু। পুরুষে আর কাম নাই।' বলার শেষেই খিলখিল খলখল হাসি!

এদেশে শ্মশানযাত্রা মানে, হাঁকেডাকে গগন ফাটে। তবু শ্মশানযাত্রা বলে কথা। পরলোকের ভয়ভক্তিতে দর্শকেরা মৃতের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কপালে হাত ঠেকায়। বোধহয় নিজের জীবনের অমোঘ দিনটির কথা মনে

পড়ে যায়। আর এ শ্মশানযাত্রায় ফুর্তির ফর্‌রা, হাসির গর্‌রা। কর্ম আর ভাগ্য, যা-ই বলো, এখন পা বাড়াও হে শ্মশানযাত্রী।

ডান পাশের বাহিকার সঙ্গে আমার শরীরের দৈর্ঘ্যে অমিল। অতএব, আমার দিকে চালি উঁচু, তার দিকে নিচু। চালি কাত হয়ে পড়লো। তা পড়ুক, সে-সব এখন দেখবার সময় নেই। তবে নিজের মতো পা চালাবার উপায় নেই। বাহিকাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে সেই টুকুস টুকুস চলা। অবলা বলে হেলা করি না। কিন্তু পদক্ষেপের বিশ বাইশ আছে। দূরের পথের ক্লান্তি আছে। এক সঙ্গে চলতে গেলে, তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

সামনে তাকিয়ে দেখি, এমদাদ রাস্তার বাঁ ঘেঁষে আগে আগে চলেছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ঠাস ঠাস করে কপাল চাপড়ালো। মাথা নাড়লো হতাশায়। আর গোঁফদাড়ির ভাঁজে তার হাসির হা নেই। কেবল ঠোঁট নেড়ে যেন কিছু বলছে। মুখ শুকিয়ে আমসি। সে যে কপাল চাপড়ে হায় হায় করছে, কোনো সন্দেহ নেই।

আর হায় হায়। কাঁধ যখন একবার দিয়ে ফেলেছি, আর তা সরাবার উপায় নেই। স্ত্রীলোকদের শব বহন সম্পর্কে সে নিশ্চয়ই কিছু খবর পেয়েছে। যে-খবরটা জানবার জন্য, ব্যগ্র কৌতূহল আমার ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছে। অথচ জানতে পারছি না কিছুই। অতএব আপাতত এমদাদের কপাল চাপড়ানো, মাথা ঝাঁকানো বে-ফয়দা। একে যদি আর্তের সেবা বলে, আমি তার ধারেকাছে নেই। সেবা করতে শিখিনি, তার আবার আর্ত। বড় কথায় বড় ভয়। সহজ কথা, আমি ডাকের পাখি। অলক্ষ্যে কে ডাক দেয়, আজও তার দেখা পাইনি। ডাক শুনলে, ডানায় আমার অস্থির কাঁপন। উড়তে না পারি, দৌড় দিতে পারি। সম্মোহন আর আত্মসম্মান, যা-ই বলো। তখন আমি ঘর করেছি বাহির। তবু কবুল করেছি আগেই, বিবাগী নই, বৈরাগ্য নেই। কপাল ঠোকার তীর্থে আমার যাত্রা না। পথ চলাটা আমার, পাখা ঝাপটার খুশির ডিগবাজি। আর্তের সেবায় আমি ঠেকতে রাজী না।

কেবল কথায় দূরের কথা, ভাবনাতেও চিঁড়ে ভেজে না। সেবা তোমার ঘাড়ে চেপেছে। সেবা? জোয়াল বলতে পারতাম। তবে ঐখানে মনে কিঞ্চিৎ খচখচানি। চালিতে যে চিৎশয়ানে শেষ যাত্রা করেছে, তাকে নিতান্ত জোয়াল বলতে বাধো বাধো লাগছে। পরিচয় না জানা থাক, তবু সে মানুষ। কামাখ্যা পাহাড়ের পবিত্রী মায়ের কথা মনে পড়লো। কেবল মানুষ না, নারী। মূলে, পরিচয় তার শক্তিস্বরূপিণী। তত্ত্বে যদি না-ই বা চলি, জন্মটাকে অস্বীকার করি কোন্ যুক্তিতে। গর্ভধারিণী বলেও একটা পরিচয় আছে। তা সে যারই হোক। অতএব জোয়াল বলতে পারি না। স্কন্ধে আমার নারী।

ঠাকুরমহাশয়টি হঠাৎ গলা খুলে গান ধরে দিল :

'এ বড় সাধের আসা যাওয়া।
কে আনলে সেধে
কে বা ছাড়লে খেদে
নাকি যাও, আপনি সেধে
কেউ করে না তার বলা কওয়া
এ বড় সাধের আসা যাওয়া।'...

'মরণ।' আমার ডান পাশের বাহিকা প্রায় দম আটকানো গলায় বললো, 'প্রাণে বড় ফুর্তি লেগেছে, গান ধরেছে।'

ঠাকুরমহাশয় চলছিল চালির ডানদিক ঘেঁষে। কথাটা তার কানে গেল। সেই আবার মাকালী। একবার জিভ বের করে ভুরু কপালে তুলে বললো, 'ছি ছি ছি, সন্ধেতারা, এর মধ্যে তুমি ফুর্তি দেখলে কোথায়? এ হল গে, তোমার বাঁচা মরার তত্ত্বের গান।'

বলতে বলতে চালির সামনে দিয়ে ঘুরে আমার পাশে এসে আবার স্বর চড়িয়ে গেয়ে উঠলো,

'তুমি সাধলে আসবে
বাদ সাধলে যাবে
এমনটি না ঘটে ভবে
সাঙ্গ হলে লীলা খেলা সবই হাওয়া
এ বড় সাধের আসা যাওয়া।'...

খ্যামটা না ঢপ অঙ্গের সুর, শ্রবণে এখন সেই বিচারের গুণ নেই। তবে মহাশয়ের লম্বা চওড়া শরীরটির মতোই, গলাখানিও বড় আওয়াজের। সুরে আর তালেও নেহাত মাটো খাটো না। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী বাবা, মিথ্যে বলেছি?'

আমার জবাবের আগেই পিছন থেকে কোনো বাহিকার স্বর শোনা গেল, 'মিনসের শরীরে দুঃখ কষ্ট বলে যদি কিছু থাকে।'

উঁমম! উঁহু, কানে যেন কথাগুলো কেমন খটখট করে বাজছে। 'মরণ' 'মিনসে' উচ্চারণের ধিক্কারে, গ্রাম্য ধ্বনি। কিন্তু, এদের স্বরে কি কেবলই গ্রাম্যতা? 'মুখে আগুন' শুনিনি এখনও। তবু ঠাকুরমহাশয়ের 'সন্ধেতারা' সম্বোধনটি কানে লেগে আছে। সন্ধ্যা শুনেছি, তারা নামও শুনেছি। দুয়ে মিলে 'সন্ধেতারা' আর কখনো শুনেছি, মনে করতে পারি না। সম্বোধনের মধ্যেও কেমন সখা ভাবের স্নেহের সুর। সম্পর্ক নিরূপণ সহজ না।

এ ছাড়াও আর একটা কেমন ধন্দ লেগে গেল। আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। ঠাকুরমহাশয়টির সুপুরুষ চেহারার বড় চোখ দুটি প্রথম থেকেই একটু লাল দেখেছিলাম। চোখের রঙ সকলের একরকম না। কিন্তু এখন কাছে এসে, গলা খুলতেই, বাতাসে যেন কিসের গন্ধ? যেন কোনো চেনা দ্রব্যের।

কোথায় যেন গান শুনেছিলাম 'রঙ খেলে, রঙ লাগে প্রাণে আমার রঙ লেগেছে নয়নে।' ঠাকুরমহাশয়টির যেন সেই অবস্থা। আমি একবার তার দিকে তাকালাম।

ঠাকুরমহাশয় চলতে চলতে পিছন ফিরে উদাস হেসে বললো, 'চারুবালা, ওইখেনটিতে তোমরা উলটো বোঝ। ভাবো বুক কপাল চাপড়ে কান্নাকাটি করলেই শোক দুঃখ করা হয়। হ্যাঁ, মনের কষ্টে বুক কপাল চাপড়ে কাঁদবে বই কি। কিন্তু মনে মনে যে কাঁদে, শোকে বুক ফেটে যায়, লোকে সেটা দেখতে পায় না। তা বলে কি তার শোকটা শোক নয়?' আমার দিকে ফিরে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, 'কী বল বাবা, ঠিক বলছিনে?'

হুঁ, আর কোনো সন্দ ধন্দ নেই, মহাশয়ের নিশ্বাসে গন্ধমাদন। সন্ধে-তারার বুকে দম নেই, তবু গলায় বিদ্রূপের ঝাঁজ, 'মরে যাই আর কি! শোকে পাথর ফাটচে।'

আমার জবাব দেবার অবকাশ নেই। আমি এখন শববাহী, নিমিত্তমাত্র। যাদের কথা, তারাই বলছে, কইছে। কিন্তু বাহিকাদের বলা কওয়ার মধ্যে ঝাঁজ বিদ্রূপ যাই থাক, কেমন একটা অভিমানের সুরও যেন আছে। কথা তাদের ভাববাচ্যে। কথন ভঙ্গিটা যেন, অই কী বলে হে। আঁতের ঘরে মাখামাখি, বাইরে, দাঁতে কাটাকাটি। সম্পর্কটা কেমন থাকলে, এমন ভাবে ভঙ্গিতে কথা চালাচালি হয়?

সে জিজ্ঞাসাটা ঠেকে আছে আমার ব্রহ্মতালুতে। নারীলোকে শব বহন করে। সঙ্গে চলে ঠাকুরমহাশয়। এমন আজব কাণ্ডের কারখানায় আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারখানার কারবার বুঝি না। এরা কারা, কোথা থেকে এলো, ঠাকুরমহাশয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক, এ রহস্যের সন্ধান পাওয়া অতি দুষ্কর। এসব কথাবার্তা সম্বোধন দিয়ে, অবস্থার বিচারও চলে না। অবস্থা বলতে বুঝি, সমাজ ও আর্থিক। ইংরেজীতে সেই কী একটা কথা যেন আছে? আনসোফিস্টিকেটেড। ওটা সব সময়ে আর্থিক অবস্থা দিয়ে বিচার করা যায় না। গ্রামে তো বটেই, অনেক সময় নগর জীবনের উচ্চবিত্তের অন্দরমহলে এমন বচন বাচন চলে। স্তরভেদটা জীবনযাপন আর শিক্ষায়। শববাহিকাদের মফস্বলীয় গ্রাম্য বচন, বসন ভূষণ দেখে আগেই বুঝেছি, নম্র চিকন লালিত্য নেই। সমাজের ক্ষেত্রটা নির্ণয় করতে পারিনি।

কিন্তু সব মিলিয়ে কোথায় একটা ঠেক লেগে যাচ্ছে। তার ওপরে ঠাকুরমহাশয়ের চোখের রঙ, আর মুখের রংয়ের গন্ধে, আমার বিলকুল গোলমাল লেগে যাচ্ছে। বয়সের ছাপ দেখে, একটা ধরতাই পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে সবাই প্রায় প্রৌঢ়া এবং প্রৌঢ়, যাকে বলে দিনকাল যাবার সময় হয়েছে। তবে মিছে ভাবনায় আত্মবিভ্রম বাড়ে। কাঁধ যখন দিয়েছি, ওখানেই সব ভাবনার ইতি। এখন কাঁধের বস্তু যথাস্থানে নামিয়ে দিলেই খালাস।

তারপরে আজব কাণ্ডের উৎস জানা গেল, ভালো। না জানলেই বা মাথা কুটবো কোথায়।

থমকে দাঁড়াতে হলো। কাঁচা রাস্তা ভাঙা। এক হাঁটু নিচে নেমেছে। এবড়ো খেবড়ো নিচু রাস্তা খানিকটা গিয়ে। আবার আস্তে আস্তে সাঁকোর দিকে ওপরে উঠেছে। সন্ধেতারার গলায় শোনা গেল, দম চাপা অস্ফুট শব্দ। কষ্টের শব্দ। ঠাকুরমহাশয় হাঁকলো, 'সাবধান, আস্তে।'

আমিই আগে নিচে পা দিলাম। সন্ধেতারার পক্ষে অবস্থাটা কঠিন হলেও, বুদ্ধি করে, চালির বাঁশ দু-হাতে একটু উঁচু করে ধরলো। চেষ্টা করলো, আমার কাঁধ সমান রাখতে। ঠাকুরমহাশয় এখন পিছনে, 'হ্যাঁ, অ্যাই, অ্যাই, লক্ষ্মীমণি আর চারুবালা, এবার তোমরা এগোও।'

এর আগে লক্ষ্মী নামই শুনেছিলাম। ঠাকুরমহাশয়ের মুখে লক্ষ্মী এখন লক্ষ্মীমণি। পিছন থেকে লক্ষ্মী বা চারুর প্রায় গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'তুমি চুপ কর, আমাদের কাজ আমরা করচি।'

যখন বুঝলাম, সকলেই নিচে নেমে এসেছে, আবার আস্তে আস্তে চলা শুরু হলো। রাস্তা একটু একটু করে ওপরে উঠেছে। মাঠের গরুর পাল ছেড়ে রাখালটা এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। সেই সঙ্গে গোবর কুড়ানী বউ আর ছোট মেয়েটিও। তাদের পাশে এমদাদ। সে সঙ্গ ছাড়েনি। রাখালের সঙ্গে কী সব কথা হচ্ছে। কিন্তু চোখ আমার দিকে। মাথা ঝাঁকানো আর বুক চাপড়ানো নিষ্ফল জেনেই, ক্ষান্ত দিয়েছে। গোঁফদাড়ির ভাঁজে বিমর্ষ মুখ। হলদে চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমার দিকেই। এখনও কিছু ইশারায় বলবার চেষ্টা করলো। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। উপায় ছিল না। কাঁচা রাস্তা ভাঙাচোরা। কোথায় পা ফেলতে, কোথায় ফেলবো। তখন ঘাড়ের চালি টালমাটাল হয়ে, সব পয়মাল হবে। সাবধানে চলতে হচ্ছে।

ঠাকুরমহাশয় সামনে আওয়াজ দিয়ে চলেছে, 'খুব সাবধান, রাস্তা খারাপ। ওপরে উঠচ, হ্যাঁ, চারুবালা আর লক্ষ্মীমণি তোমরা খুব সাবধান। এখন পেছনে বেশি ভার পড়বে। তেমন বুঝলে, একটু দাঁড়িয়ে যাও। দুর্গাদেবী এসে গেচে। সে সামনে গিয়ে বাবাকে ছেড়ে দিক, বাবা পেছনে এসে সামাল দেবে।'

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না। উঁচুতে উঠছি। এখন যারা পিছনে, তাদের কাঁধে ভার বেশি। পিছন থেকে কোনো বাহিকার সেই একই রকম মুখ ঝামটা শোনা গেল, 'আমরা কী করব, কারুক্কে দেখতে হবে না। খালি মুখে পটপটানি।'

ঠাকুরমহাশয় যেমন তেমনি। হংসের গায়ে জল ধরে না। মুখে হাসিটি লেগে আছে। কোনো বিকার বিকৃতি নেই। বললো, 'হ্যাঁ, বাহ, দুর্গাদেবী পেছনে কাঁধ দিয়েছে, আর ভাবনা নেই। শরীরটা এখন একটু যুত লাগচে তো দুর্গাদেবী?'

কারোর কোনো জবাব শোনা গেল না। আমি পিছন ফিরে দেখতে পাচ্ছি না। ঠাকুরমহাশয়ের কথা থেকে বোঝা গেল, আমি যার হয়ে কাঁধ দিয়েছি, সে পিছনে সামাল দিচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের মুখে, সকলের নামই বিশেষভাবে উচ্চারিত। দুর্গার সঙ্গে দেবী জোড় খেয়েছে। সম্মানের থেকে স্নেহ প্রীতিই যেন বেশি। আর একটু ভেঙে বললে, আদর সোহাগ বলা যাবে কী?

যাক গিয়ে। তা ভেবেই বা আমার লাভ কী? এটুকু বুঝে, মন কষাকষি যাই থাক, এই বাহিকারা আর ঠাকুরমহাশয়, অভিন্ন না। এক দলের দলী। মুখ ঝামটা ঝংকার বিদ্রূপ, যতোই আওয়াজ দিক। কথা যা তা নিজেদের মধ্যে। কথায় বলে, এমনি কি আর বাবা বলি? গুঁতোর চোটে বাবা বলি। আমি সেই হিসেবে বাবা হয়েছি। দলের সঙ্গে বে-দলী দৈব আর কাকে বলে।

এই সময়েই হাঁক-ডাক হইচই হাসি হাততালি শুনতে পেলাম। আওয়াজ আসছে উত্তর থেকে। মাথা তোলবার উপায় নেই। কোনোরকমে চোখ তুলে দেখি, সাঁকোর ওপরে জনতার ভিড়। শ্মশানযাত্রায় মৃতের প্রতি এমন হাসি হাততালির আপ্যায়ন কখনও শুনিনি, দেখিনি। নাকি, নারীলোকের শববহনের আজব কাণ্ডের মজার খুশিয়ালি। হতেও পারে। পিছনের ধুলিঝাড়াগুলো এবার দৌড়ে সাঁকোর দিকে উঠছে, ওদেরও হইচই হাততালি হাসি।

আমার মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে উঠছে। কী আতান্তরে যে পড়েছি, কিছুই বুঝতে পারছি না। সব ব্যাপারটাই আজব। সাঁকোর ওপর থেকে তখন, হাসি হাততালির সঙ্গে, চিলের ডাকের মতো শিসও শুনতে পাচ্ছি। পুরুষের গলার চিৎকার শোনা গেল, 'এস গো এস। কলির খেলা তোমরাই দেখালে বটে!'

চালি নিয়ে আমরা সাঁকোর ওপরে উঠলাম। নীচে বিশীর্ণা সরস্বতী। যেমন তেমন সাঁকো না, লোহার বিমে, চওড়া ঝুলন্ত সাঁকো। রাস্তা থাকলে অনায়াসে গাড়ি চলতে পারতো। কিন্তু সাঁকোর দু পাশে ভিড়। জনতার চেহারাটাও কেমন একটু মন চমকানো। রিকশাওয়ালা, ভবঘুরে, রকের আড্ডাবাজ, এমন শ্রেণীরই বেশি। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কিছু রমণীর দল। যাদের দেখলে কেমন ঠেক লেগে যায়, ভুরু কুঁচকে ওঠে। কেউ শাড়ি জামায় আলুথালু, ভাঙা খোঁপা, খোলা চুল। চোখের কাজলের থেকেও, চোখের কোলের কালিই গাঢ়। বাঁকা সিঁথেয় সিঁদুর কারো, কারো-বা কপালে কাচপোকার টিপের বদলে, নতুন রকমের নীল কালো টিপ। বয়স তাদের নানা প্রকারের। চৌদ্দ থেকে চল্লিশ ছাড়াও, পঞ্চাশ উতরে যাওয়া স্ত্রীলোকও আছে।

চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের এক স্বাস্থ্যবতী ডুরে শাড়ির আঁচল বুকের

ওপর টানতে টানতে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো। ভাঙা খোঁপা ঘাড়ে ঝুলছে। কপালের লাল টিপ ঝাপসা আর বাঁকা। রাত্রের কাজল চোখের পাতায় অস্পষ্ট, মুখ নাক কাটা কাটা তীক্ষ্ণ। বললো, 'হ্যাঁ গো সন্ধেদিদি, শেষটায় তোমাদের ঘাড়ে করে বয়ে আনতে হলো?'

'হ্যাঁ, কপালের লিখন ভাই, খণ্ডাবে কে বল?' সন্ধেতারার গলায় এখন যেন কিঞ্চিৎ জোরের রেশ।

ঠাকুরমহাশয়ের শ্রবণ বড় সতর্ক। কোনো কথা ফসকায় না। বললো, 'হ্যাঁ, কপালের লিখন ছাড়া, আর কী বলা যায় গো, জোয়ান মরদরা সব ঘরে বসে রইলো, কেউ এগিয়ে এলো না। তবে নাটের গুরুটিকে আমিও ছাড়ব না। ভেবেছিল, সবাইকে ফুস মন্তরে ধরে রাখবে, আমাদের শিক্ষা দেবে। তা এবার এসে দেখে যাক, কেমন শিক্ষা দিল?'

সাঁকোটি নেহাত ছোট না। এখন ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে। কোমরে লুঙ্গি জড়ানো, খালি গা শক্ত শরীর, এক মাথা রুক্ষ চুল এক জোয়ান হেঁকে উঠলো, 'অ্যাই খেটো, বংকাকে একবার আসতে বল না, দিদিদের তাগদ দেখে যাক।'

যে-যুবতীটি সন্ধেতারার সঙ্গে কথা বলছিল, সে ভুরু কুঁচকে ঘাড়ে ঝটকা দিল। তাকালো খালি গা জোয়ানের দিকে। ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'কেন, বংকাকে ডেকে দেখাবার কী আছে? খ্যামটা নাচ হচ্ছে নাকি?'

জোয়ানটির হাসিতে কিঞ্চিৎ ছায়া। বললো, 'এরকম একটা ব্যাপার, একবার দেখবে না?'

'না, দেখবে না।' যুবতীটির স্বরে ঝংকার তীব্র হলো, 'যার ইচ্ছে হয়, সে নিজে দেখে যাবে। তোমাকে ডেকে দেখাতে হবে না।'

জোয়ানের পাশ থেকে রোগা লম্বা লুঙ্গি জামা গায়ে একজন, কনুই দিয়ে খোঁচা দিল, 'হ্যাঁ, তুই চুপ করে থাক না বেজি। রুকি বোন ঠিকই বলেছে। যার ইচ্ছে হয়, সে নিজে দেখে যাবে।'

সাঁকো পেরিয়ে, বাঁদিকে দেখছি একটা সিনেমা হল। দেওয়ালের গায়ে ছবি দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু কার শব বহন করছি? এরা কারা? মনের সব সন্দ ধন্দ কাটিয়ে, একটা ধারণাই ক্রমে যেন মনে চেপে বসছে। পথ চলতে, পথের মাঝে এমন এক অবিশ্বাস্য অভাবিত দায়ও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল? যার অলক্ষ্যের ডাকে আমি ঘর ছেড়ে পথে চলি, আমাকে নিয়ে তার এ কেমন খেলা?

কে একজন বলে উঠলো, 'কিন্তু এ শালা লাগরটি কে, তা তো চিনতে পারচিনে?'

'হবে ওদিককারই। সিধি ঠাকুর পটিয়ে পাটিয়ে নিয়ে এসেছে।' আর একজন জবাব দিল।

অই, হায় রে আমার কপাল। শেষে আমি হলাম শালা লাগর। জিজ্ঞাসা জবাব যে আমাকে নিয়েই, তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের কান সজাগ। সে বলল, 'না বাবা খেটো, এ লাগর টাগর কেউ না। দুগ্‌গোদেবী আর বইতে পারছিল না, তাই এ বাবাকে পথ থেকে ধরে নিয়ে এসেছি।'

খেটো বললো, 'হুঁ আমার তাই মনে হচ্ছিল, পিকচার আলাদা, মাইরি সিদ্ধিঠাকুর, তোমার গোড়ে মাথা ঠুকি। দাদাকে পথ থেকে ছিনতাই করলে?'

'আহা হা, ছিনতাই কেন করব?' ঠাকুরমহাশয় বা সিদ্ধিঠাকুর, যে-ই হোক, মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'যে সে কি আর এমনি করে কাঁধ দেয়? বাবার আমার বড় দয়ার শরীর, দেখে বুঝতে পারচ না?'

দয়ার শরীর শুনলেই মনে হয়, মহাশয়ের ঠোঁটে টেপা কপট হাসি। দয়ার শরীরে কি বোকা বাস করে?

এদিকে ভুতে ঠ্যালা মারা দুপুরে, ভিড় আর হইচই বাড়ছে। হঠাৎ ডান দিক থেকে, বলতে গেলে এক লাবণ্যবতী, রূপকুমারী ছুটে এলো। মাথার চুল তার ভেজা। ফর্সা মুখে গালে গলায় বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটা, বয়স তিরিশের নিচে, অনুমান এইরকম। শায়ার ওপরে, লাল পাড় তাঁতের শাড়ি কোনরকমে জড়িয়ে এসেছে। পায়ে বাসী আলতার দাগ। বললো, 'ওগো, চাঁদাদিদিকে এখেনে একবারটি নামাবে না?'

আমি ডাইনে চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখলাম। ঘিঞ্জি বস্তির ফালি অলি গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে একপাল স্ত্রীলোক। কারোর বা কোলে সন্তানও রয়েছে। তাদের মুখে হাসি নেই, হই হল্লা নেই। ঠাকুরমহাশয় মাথা নেড়ে বললো, 'ওইটে আর করতে যাস না লতা বোন। এই তো এসে গেচি। টানে টানে চলে যাওয়া ভাল, নইলে আটকে পড়তে হবে। তোদের যাদের মন করে শ্মশানে চলে আয়। না হয় গঙ্গায় আর একবার ডুব দিবি।'

রুকি যার নাম, স্বাস্থ্যবতী এবং নিতান্ত অসহবৎ চালে নেই, বললো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই যাও, আমরা আসচি। ঐ ভদ্দরলোকটিকেও ছাড়তে হবে তো।'

আমি চোখ ফিরিয়ে তাকাতে চোখাচোখি হয়ে গেল অনেকের সঙ্গে। ভদ্দরলোক! কার শব কাঁধে বইছি, আর বোঝাবার দরকার নেই। ব্রহ্ম-তালুতে ঠেকে থাকা কৌতুহলের অনেকখানি এখন গলার কাছে নেমে এসেছে। কাঁদতে পারবো না। কিন্তু ভদ্দরলোকের গুষ্টি জাহান্নামে যাক। আমার এখন একমাত্র পরিচয়, বারাঙ্গনার শববাহী। এর পরে আর মস্তিষ্কে ছিদ্র করে বা গিলিয়ে খাইয়ে কিছু বোঝাবার নেই। অন্য এক ব্যাখ্যায় জানতাম, পুরুষস্য ভাগ্যং, স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। ভাগ্যের কী গতি দেখতেই পাচ্ছি। ভাগ্যের খবরদারি কে করে, জানি না। সে পরিহাসপ্রিয় বটে। অথচ সে নাকি

অমোঘ। দাবনায় চাপড় মেরে তার সঙ্গে যে লড়ে যাবো, সে-রকম কোনো ঠিকঠিকানা উপায়ও জানা নেই।

কালকূটের প্রাণ বিষ জরজর। অমৃতের ঠিকানা কোথায়? আজও পাইনি। তা বলে দেহোপজীবিনীর শব কাঁধে? এমদাদের কপাল চাপড়ানি, উদ্বেগে মাথা ঝাঁকানি এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু ভাগ্যে কর্মে মেশামেশি। কে ঠেকাবে তাকে। অতএব, চলো হে পথ সুখী। পথের খোয়ারি কাটাও। পথের নেশায় অনেক তো মত্ত মাতাল হয়েছো। মাঝে মাঝে খোয়ারি না কাটালে চলবে কেমন করে।

ঠাকুরমহাশয় বললো, 'ছাড়তে হবে কী গো রুকি ভাই? বাবাকে তোমরা সেবা করবে। বাবা আজ আমাদের উদ্ধার করেছে।'

'তা করব সিদ্ধঠাকুর, যেমন বলবে তেমনি করব।' রুকি বললো, আমার দিকে চোখ রেখে, 'আমাদের সেবা নিলে, কেন করব না।'

এবার আমারই বলে উঠতে ইচ্ছা করলো, 'মরণ!' আমার কোথায় গতি, কোথায় এলাম, এখন তারই ঠিক পাচ্ছি না। কাঁধে আমার চিত শয়ানে শেষ যাত্রিণী। তাকে যথাস্থানে নামাতে পারলে বাঁচি। এখন আমি সেবা খাবো? কিসের সেবা? কেমন সেবা? কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারি না। শুধু জানি, কোনো সেবায় আমার দরকার নেই।

ঠাকুরমহাশয় বললো, 'আগে যাই। বাবার চান ধোয়া হোক। তারপরে মিষ্টি, জল দেবে। আর যদি বাবা তোমাদের হাতে খান, ঘরে এনে তৃপ্তি করে খাওয়াবে।'

শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। আবার এখানে ফিরে ঘরে এসে তৃপ্তি করে খাবো। ভীমরতি তো আসলে বয়সে না, মনে? বোধহয় বয়সেই। সেই বয়সটায় এখনও পেঁছাইনি। সন্ধেতারা তাড়া দিল, 'শোন রুকি, লতু শোন, আমরা এগোই। যা ভাববার তা ওখেনে গে ভাবা যাবে।'

ঠাকুরমহাশয় হাঁক দিল, 'হ্যাঁ, চল, চল, আর দাঁড়ানো নয়।'

আবার চলা শুরু হলো। জাফর খাঁ গাজীর মসজিদ থেকে ঘাটের একটা নিশানা পেয়েছিলাম। এখন আর পাচ্ছি না। সামনে মিছিল, পিছনে মিছিল। রাস্তার দুধারে লোকের ভিড়। তারা কেউ হতবুদ্ধি, নির্বাক। কেউ হেসে ঢলে টলছে। আর চালি নিয়ে আমরা চলেছি মাঝখান দিয়ে। এখন হরিধ্বনি দেবার লোকের অভাব নেই। এতোক্ষণ যা-ও বা কাঁচা মাটির নিরিবিলি পথ ধরে আসছিলাম এখন সরু পথের ঘিঞ্জি শহরে।

পথ মাপজোকের কোনো প্রশ্ন নেই। সময় কতো, তা দেখবারও অবকাশ নেই। সামনে কিছুটা এগোতেই, একটা বড় রকমের হাঁক ডাক হৈ হুল্লোড় শুনে, চোখের কোণে তাকালাম ডানদিকে। চমৎকার! দেশীয় মদ আর সিদ্ধি গাঁজার দোকান পাশাপাশি। অন্তত দেশী মদের দোকানের সাইনবোর্ডটা

চোখে ফাঁক গেল না। বাকি আর কিছু নেই। বজতে গেলে, সাঁকো পেরিয়েই আর এক ত্রিবেণী সঙ্গম। সেটা যে যেমন বুঝে নেবার, বুঝে নেবে।

সামনে এগিয়ে তিন মাথার মোড়। আবার ডাইনে বাঁক। সরু রাস্তার দুপাশে জম্পেশ ভিড়। নানারকমের দোকানপাট। সাইকেল রিকশা, গরুর গাড়ি, কিছু বাদ নেই। তার মধ্যে নারীলোকের শববহন, পৃথিবীর এমন আজব কাণ্ড দেখতে, ভিড়ের ঠেলা বাড়ছে ছাড়া কমছে না। রাস্তা ক্রমে নিচে টানছে। বাঁদিকে চোখে পড়লো প্রাচীন মন্দির। তারপরেই দোকান-পাটের চেহারা আলাদা। যাকে বলে তীর্থক্ষেত্রের আসল ছবি।

সামনে এগিয়ে আবার বাঁদিকে বাঁক নেবার আগেই চোখে পড়লো গঙ্গা। বড় একটি ঘাট। সূর্য কোথায় নিজের অয়নে চলেছে, বুঝতে পারছি না। ঘাটে বেশ ভিড়। ভিড় মানেই, আমাদের ঘিরে আরও ভিড়। দেখছি, ঘাট থেকে মেয়েমদ্দ অনেকে সিঁড়ি টপকে আজব শবযাত্রা দেখতে আসছে। আর কাঁধে কোনো এক চাঁদ জানি না, ঠাকুরমহাশয়ের মুখে এই মৃতা চাঁদদিদি কী নামে সম্বোধিত হতো। হয়তো চাঁদমালা কিংবা চন্দ্রাবতী, কে জানে। তাকে কাঁধে নিয়ে চলতে চলতেও, ঘাটের দিকে তাকিয়ে, কেতাবের অক্ষরমালা আমার মগজে জাগলো। এই ঘাটই কি উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ-দেবের নির্মিত?

সেটাও ভাবনার কথা। উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব আর মুকুন্দদেব হরিচন্দন কি একই ব্যক্তি? তাও যদি হয়, তবে এ ঘাটের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছু থাকতো না। যদি এ ঘাট, সে-ঘাট হয়, তবে নিশ্চয়ই নতুন করে তার খোল নলচে বদলাতে হয়েছে। বিরাট চওড়া, ব্যবহারযোগ্য ঘাট দেখলে, তাই মনে হয়।

কিন্তু সেদিকে নজর দেবার সময় নেই। ঠাকুরমহাশয় আমার কাছে এসে বললো, 'এবার বাঁয়ে, হ্যাঁ বাঁয়ে গিয়ে, নিচে গঙ্গার ধারে আসল জায়গা। মহাশ্মশান বলে কথা। এখানে চিতা কখনো নেভে না।' বলে কপালে দু হাত ঠেকিয়ে বললো, 'চন্দ্রাবলীর এইটুকু সাধ ছিল, সে মরলে যেন ত্রিবেণীর ঘাটে পোড়ানো হয়। আর তার জন্যেই এত হ্যাপা। তা হোক, সাধ আহ্লাদের এই তো সব শেষ, না কী বল বাবা?'

জবাবের প্রত্যাশা আদৌ আছে বলে মনে করি না। জবাব দেবার মতোও আমার কিছু নেই। তবে কানে বাজলো নামের মহিমা। চাঁদ থেকে চাঁদমালা চন্দ্রাবতী পর্যন্ত ভাবতে পেরেছিলাম। চন্দ্রাবলী নামটি মাথায় আসেনি। বৈষ্ণব কাব্যের আর এক নায়িকা। ঘাট পেরিয়ে, ডানদিকে নিচে নামতে হচ্ছে। দু পাশে ভিড়ের চাপ ঠাসাঠাসি। মড়া ছুঁতে নেই, শবযাত্রীদেরও না। ছুঁলেই স্নান করতে হবে, এটাই জানতাম। কিন্তু এ কৌতুহলী জনতার

ভিড় দেখছি, সে-সব মানতে রাজী না। আসলে অবাক মজার খুশি। আগে খুশির খোয়ারি মিটুক, তারপরে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে নিতে কী আছে?

ক্রমে নিচে নেমে, আসল স্থান শ্মশানক্ষেত্র। এদিকে বাঁধানো ঘাটের কোনো চিহ্ন নেই। এক দিকে একটি চিতা জ্বলছে। শ্মশানযাত্রীরা আশে-পাশে বসে ছিল। আমাদের দেখে সবাই, হাঁ মুখ অবাক চোখে উঠে দাঁড়ালো। এমন আজব কাণ্ড তারাও দেখেনি। উত্তর ঘেঁষে কয়েকটি চালা ঘর। সেদিক থেকেও দু-চার মেয়েমদ্দ ছুটে এলো। এরাই বোধহয় আসল শ্মশানবাসী। তাদের হতবাক চোখের নজর দেখলেই বোঝা যায়, এমন শবযাত্রিণী তারাও কখনও দেখেনি।

ঠাকুরমহাশয় হাঁকলো, 'এবার নামাও, চালি নামাও।'

আহ, যেন দৈববাণীর নির্দেশ। একবার সন্ধেতারার দিকে তাকালাম। সে বললো, 'তুমি আগে নামাও বাবা।'

আমি ঘাড় খালি করে, চালির বাঁশ হাতে নিলাম। আস্তে আস্তে চালি নামানো হলো। এখনও ভিড় কাটবার লক্ষণ নেই। না থাকুক, আমার কাজ মিটেছে। প্রথমেই ইচ্ছা হলো, আগে একটু বসি। এমন না যে, জীবনে এই প্রথম শব বহন করে শ্মশানে এলাম। কিন্তু শরীর বলে একটা কথা আছে। কোমর টনটন করছে। প্রথমে চাই একটু বসা, তারপরেই চাই ধূমপান। শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দু যেন রাক্ষসের মতো, রক্তশোষা জোঁকের মতো খাই খাই করছে, ধোঁয়া চাই ধোঁয়া চাই।

তা চাই। কিন্তু এখানে কোথাও বসবার ইচ্ছা নেই। একটু নিরিবিলি চাই। এসেই চোখে পড়েছিল, এক চিতা জ্বলছে। আর এক চিতা সাজানো হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করিনি। চিতার পাশে শোয়ানো, সেও এক বৃদ্ধা। শাদা ধবধবে ছোট করে ছাঁটা চুল। কুটোকাটি দিয়ে তৈরি পাখির বাসার মতো রোঁয়া জর্জরিত মুখ। চোখ বোজা। ঠোঁট দুটো ফাঁক। সেই শবকে ঘিরে বেশ কিছু মেয়ে পুরুষ। তার মধ্যে এক প্রৌঢ়, বৃদ্ধার শবের পাশে শুয়ে গড়াগড়ি। ভাবছিলাম, কাঁদছে বুঝি। আসলে সে গানের সুরে যা বলছে, শ্মশানে এমন কথাও কদাপি শুনিনি। বলছে, 'মাগো, এত পোটরা প্যাটরা ঘাটালে, একটা পয়সা পেলাম না। পোড়াবার কাঠের খরচা রেখে যাওনি, তাতে কোন দুঃখু নেই। তা বলে মালের জন্য দুটো টাকাও রেখে যাওনি? ও মাগো, তুমি তো জানতে, তোমার ছেলের পেটে মাল না পড়লে, কুটো ভেঙে দুটো করতে পারে না।'

নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছিল না। কথাগুলো ঠিক শুনছিলাম তো? বৃদ্ধার শব ঘিরে যারা রয়েছে, অনেকটা শহরঘেঁষা মধ্যবিত্ত পরিবারের মতো দেখছি। তাদের একটি তরুণী চারপাশে তাকিয়ে দেখছে। হাসি চাপতে পারছে না। মুখে আঁচল চেপে চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। এক সধবা মহিলার

নাকছাবিতে ঝলক দিচ্ছে। সুখে না, রাগে। চোখ দপদপ, মুখ শক্ত, নাসারন্ধ্র কাঁপছে। একটি তরুণ বলছে, 'জ্যাঠামশাই, উঠুন। এই নিন, আমি টাকা দিচ্ছি।'

কে কার কথা শোনে। প্রৌঢ় ছেলেটির শোক আর থামে না। 'ওরে, তোদের টাকা পাব জানি, মায়ের টাকায় মাল খেতে পেলাম না, এ দুঃখু কোথায় রাখব।' ...সুর করে বলে, আর ধুলা কাদা মাখা প্যান্ট শার্ট পরা হাত পা তুলে, আঁতুড় ঘরের শিশুর মতো ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

'আহা বেচারীর কী দুঃখ!' ঠাকুরমহাশয় বললো, 'মায়ের টাকায় মাল খেতে পেল না।' ঠাকুরমহাশয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল বেজি। সে বললো, "সিদ্ধিবাবা, মায়ের খোকাটি খোয়ারি কাটাচ্ছে মনে হচ্ছে?'

'খোয়ারি কি কাটবে? সবে তো জমেচে। পেটে বস্তু আছে, বুঝতে পারচিসনে? নইলে আর অমন করে?' ঠাকুরমহাশয় হেসে বললো, 'একে মাতৃশোক, তায় পেটে বস্তু। ও রকম একটু তো হবেই। কেমন মা-অন্ত প্রাণ বল দিকিনি? পোড়াবার টাকা রেখে যায়নি, তাতে দুঃখু নেই, তা বলে মাল খাবার জন্য দুটো টাকা রেখে যাবে না?'

বেজির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল খেটো। সে হেসে এক চোখ বুজে ইশারা করে বললো, 'তোমার কিন্তু সে দুঃখু নেই সিদ্ধিবাবা। চাঁদদিদি তোমার জন্য অনেক মাল খাওয়ার টাকা রেখে গেচে।'

'মায়ের সঙ্গে চন্দ্রাবলীর কথা আসে কেন?' ঠাকুরমহাশয়ের সদাহাস্য মুখে এই প্রথম বিরক্তি দেখতে পেলাম। চাপা গলায় খেঁকিয়ে বললো, 'আমার মা আমাকে বুকের দুধ দিয়েই যেতে পারেনি, তায় আবার মালের টাকা। মিছিমিছি আমার পাছায় কাটি দিতে আসিসনে খেটো, মেজাজ খারাপ করে দিসনে।' কোমরে জড়ানো পশমী চাদরটা খুলে ঝাড়া দিল। আবার জড়ালো। মহাশয় তুক করলো নাকি?

বেজি আর খেটো চোখাচোখি করে হাসলো। শ্মশানের অধিকাংশেরই নজর, মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া প্রৌঢ় লোকটির ওপর। শ্মশানে লোকে কেবল কাঁদতে আসে না। ঘটনার ঘূর্ণীতে হাসির উচ্ছ্বাসও ছলকায়। যে-মহিলাটির রাগে ক্ষোভে নাকছাবিতে ঝলক দিচ্ছে, তিনি বোধহয় মায়ের টাকায় দ্রব্য না খেতে পারার শোকগ্রস্তের পত্নী। বাকি মহিলা পুরুষদের মুখে শোকের ছায়া। কিন্তু লোকের মজার হাসি দেখে, লজ্জা পাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলিও হচ্ছে।

ভালো কিংবা মন্দ, কইতে পারি না। খ্রীষ্টান মুসলমানের সমাধিক্ষেত্রের নীরবতা শ্মশানে নেই। থাকেও না। এখানে কান্না বাজনা সব একসঙ্গে। হ্যাঁ, খোল করতালের বাজনাও বাজে। এখন অবিশ্যি বাজছে না। কিন্তু শ্মশানবাসিনী ডোম্বিনী, না কি, কী বলবো, দুটি বউ তো উত্তরের সীমানায়

দাঁড়িয়ে হেসে বাঁচছে না। ওদিকে তাদের একজনের তিন চার বছরের ধুলোকাদা মাখা মেয়েটি মায়ের আঁচল ধরে চিৎকার করে কাঁদছে। তা কাঁদুক। মজা দেখা ফুরিয়ে যাবে না? কিন্তু মহাশ্মশানের উদ্ধারকারীরা কেউ বসে নেই। উত্তরের ধারে চালার ঢাকায় কাঠের স্তূপ। গদীতে মহাজন আসীন। সেখানে লেনদেন চলছে। চিতা সাজাবার দায়িত্ব যাদের, তারা কাঠ বহে আনছে। পুরোহিত মহাশয়ের তাগাদা। বিশেষ করে, যাদের বৃদ্ধা শবের পাশে, প্রৌঢ় ছেলের কান্নাকাটি চলেছে।

আমার কাজ শেষ। কাজ? কার কাজ কে করলো, জানি না। একটি সিগারেট ধরিয়ে, একবার কাছে রাখা শবের দিকে তাকালাম। যাকে বয়ে আনলাম, একবার তার মুখটা ভালো করে দেখে যাই। চার বাহিকা বসে ছিল শব ঘিরে। কারোর বা মাথায় হাত, কারোর কোলে আর মাটিতে। দেখেই বোঝা যায়, তাদের ঘাড় কোমরের ব্যথা এখনও মরেনি। বুকে হাপর টানছে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কী সব কথা চলছে। তার মধ্যেই, প্রৌঢ় ছেলেটির কান্না শুনে, ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে রাখতে পারছে না।

চাঁদদিদি আর চন্দ্রাবলী; যে-ই হোক, তার মৃত মুখের ফরসা রঙ এখন ফ্যাকাসে। বয়স শববাহিকাদের মতোই ষাটের কাছাকাছি। কপালের সামনের চুলে অল্পস্বল্প পাকের রঙটা রুপোলি না। নতুন তারের মতো। এদের জীবনে বৈধব্য আছে কী না, সেই গূঢ় তত্ত্ব জানা নেই। আপাতত দেখছি, মৃতার সিঁথায় কপালে সিঁদুরের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে চন্দনের ছড়া। নীরক্ত ফ্যাকাসে মুখের চামড়ায় টান ধরেছে। কিন্তু বয়সের রেখা তেমন পড়েনি। বরং গোল মুখ দেখলে মনে হয়, ভোগে সুখেই ছিল। রোগভোগের শীর্ণতা নেই। দড়ি জড়ানো কাপড় ঢাকা অঙ্গ দেখলেও বোঝা যায়, চন্দ্রাবলী হাড়ে মাংসে দোহারা ছিল। বাহিকাদের আর দোষ কী। কম ওজনটা বহন করতে হয়নি।

প্রাণহীন মুখেও কি জীবিতকালের চিহ্ন কিছু থাকে। অন্তত চোখে মুখে থাকে। বোজা থাকলেও দেখছি চন্দ্রাবলীর চোখের ফাঁদ ছিল বড়। নাক টিকলো।... শুকনো ফ্যাকাসে ঠোঁট ঈষৎ পুষ্ট। তারপরেও কেমন যেন মনে হয়, এখনও কিঞ্চিৎ দেমাকের ভাব ফুটে রয়েছে। কিংবা আমার নজরে গোল। তবে এই মুখ দেখে অনায়াসে বলা যায়, রূপের কিছু চটক ছিল। সেই চটকের ঝটকায় অনেক মাথা ঘুরেছে।

চন্দ্রাবলীর পেশা কি ছিল, এখন আর তা অজানা নেই। সংসারের পথ চলতে, এ জীবনের ধারা কার কেমন, সংসারের প্রান্তে দাঁড়িয়েও কিছু দেখা যায়। জানাটা সামান্য। অথচ মূলের বিষয়টা অজানা নেই। অভিজ্ঞতা আছে এমন বললে মুখে পটপটানি সার। হাতছানি দিয়ে যে-ই ডেকে নিয়ে যাক কাছে আর দূরের পথে, সমাজের বুড়ী ছোঁয়াটা জন্মকালের দান। সে

আমাকে ছাড়েনি। আমিও তাকে কোনোদিন ছাড়তে পারিনি। 'নিষিদ্ধ'-এর বেড়িটা চিরদিন পায়ে পায়ে ফিরেছে। তাকে ভেঙেচুরে সীমা টপকাতে পারিনি।

এটা হলো মনের বেড়ি। বাস্তবে কিছু দেখিনি, বললে মিথ্যাচারণ হয়। মনের উদারতায় সুড়সুড়ি দিয়ে বা কী লাভ। কৌতূহলের বান ডেকেছে। সংস্কারের চোরা বান টেনে নিয়ে গিয়েছে সীমান্তের বাইরে। অথচ, চিরকালই দেখে এসেছি, ঘরের সামনের দরজা খুলে এক পথে বেরিয়ে গিয়েছি। সেটা আমাদের সদরের সামাজিক দরজা। পিছনে অন্য ঘরের দরজাটার বাস বেসাতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছি। শহর মফস্বল, এমন কি রাঢ়বঙ্গের গ্রাম-জীবনেও, জীবন যাপনের এ ছবিটা কে অস্বীকার করবে।

না, এখন আর আক্ষেপ বিক্ষেপ নেই। কে এই চন্দ্রাবলী, কোথায় ছিল, কোথা থেকে এসেছিল বারো বাসরের অঙ্গনে, জানবার কোনো কৌতূহল নেই। কে জানে, আছে কিংবা ছিল কী না স্বামীপুত্র। জানি না, এখনও তার গায়ে লেখা আছে কী না, সে ছিল বারবণিতা। এই শ্মশানভূমিতে সবাই দেখছি সমান। তার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও বুঝতে পারছি না, সে এক মানবী ছাড়া আর কিছু। মনে মনে বলতে পারি, দৈব নাহি খণ্ডনে যায়। অতএব, গন্তব্যের কিছু বাকি পথে, আমার কাঁধ ছিল তোমার জন্যে। তোমার খেলা সাঙ্গ। তুমি যাও। আমার খেলা সাঙ্গ করে আসছি।

'বড় আশা ছিল, ত্রিবেণীর ঘাটে যেন গতি হয়।' ঠাকুরমহাশয় আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো।

চমকেই উঠেছিলাম। বুঝেছিলাম ঠিক, লোকটির চোখে কিছু ফাঁক যায় না। বোধহয় আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখেই, কৈফিয়তটা মনে এসেছে। যদিও তার দরকার ছিল না। আমি বললাম, 'এবার চলি।'

'ছি ছি, তাই কি হয় বাবা?' ঠাকুরমহাশয় একেবারে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো, 'চলে যাবে কি? একটু বস। জিরোও। এভাবে চলি বললেই কি ছেড়ে দেওয়া যায়?'

নতুন গাওনা শুনছি। ছেড়ে না দেওয়ার কী আছে। আমাকেও কি চালিতে উঠতে হবে নাকি?

সন্ধেতারা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'কোথাকার ছেলে, কোথায় যাচ্ছিলে, কিছু জানলাম না বাবা। সে-কথা এখন থাক। মড়া বয়েচ, চানটান করবে। যত তাড়াই থাকুক, আগে একটু চা খাও।'

'হ্যাঁ, যা বাবা খেটো।' সিদ্ধিবাবা বললো, 'নইলে বেজিই যা, বাবার জন্যে একটু চা নিয়ে আয়। আমার জন্যেও একটু আনিস, দুফোঁটা গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে আনিস, নিরম্বু উপোসের দোষটা কেটে যাবে। তোমরা কেউ খাবে নাকি গো? তোমাদের চা খেতে তো দোষ নেই।'

চারুবালা তার কোমরের কাছ থেকে হাত তুলে বেজির দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এই নাও পয়সা। সবার জন্যেই নিয়ে এসো।'

মিথ্যা বলবো না, এ রকম একটা তৃষ্ণা জিভের তালুতে এসেও নিজের অগোচরে ছিল। ঠাকুরমহাশয় না বললেও বিদায় নিয়ে আগে নিশ্চয় চায়ের ধান্দায় যেতাম। এখনও তাই যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু প্রস্তাবটা এলো ঠাকুরমহাশয়ের কাছ থেকে। অথচ একটু নিরিবিলি একলা হতে চাই। বললাম, 'থাক না। আপনারা এখানে খান, আমি দোকানে যাচ্ছি।'

দুর্গাদেবী বসে থেকেই জোড় হাত বাড়িয়ে বললো, 'ঐটি হবে না বাবা। আগে একটু চা খাও। তোমার দয়ার শরীরে অনেক করেচ। নেয়ে ধুয়ে শুদ্ধ হও, কিন্তু চাঁদকে চিতেয় তোলার পরে যেও।'

জোড়হস্তের আবেদনে কাপট্য নেই। কিন্তু এ আবার কেমন আবদার? চাঁদকে চিতায় তোলা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে কেন। এও কি নিয়মের মধ্যে পড়ে নাকি? আমার মুক্তবেণী পাক দিয়ে উত্তরে উজানের টানে দেখছি, জোয়ারের ভরাডুবি। কাঁধের ঝোলায় আমার জামাকাপড় আছে। নেয়ে ধুয়ে 'শুদ্ধ' হবার দরকার নেই। তবে ডুব দেবার দরকার আছে। নইলে শরীরের অস্বস্তি যাবে না। কিন্তু জামাকাপড় ধুয়ে শুদ্ধ করার কোনো বায়ু নেই।

ইতিমধ্যে খেটো পয়সা নিয়ে দৌড় দিয়েছে। বেজি ওর শক্ত শরীরটা নিয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'চা ছাড়া অন্য কিছু যদি চলে, তাও এনে দিতে পারি।'

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মুখে হাসি আছে বটে, কথাটা হাস্যাত্মক না। 'অন্য কিছু' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছে, তাও জানি। তবু আমার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল। সন্ধেতারা বললো, 'জানিসনে, চিনিসনে, কাকে কী বলিস? একবার চেয়ে দ্যাখ তারপর মুখ খোল।'

বেজি বড় বাধ্য ছেলে। সত্যি আমার মুখের দিকে তাকালো। তার জীবনযাপন চালচলনটা যে একেবারে বুঝতে পারি না, এমন না। তবু তাকিয়ে দেখাটা হাস্যকর। বললো, 'মনে কিছু করবেন না দাদা। মাসী বলছে বটে, কিন্তু দেখে কি মানুষ চেনা যায়? ওই দেখুন তো, মানুষটার কী অবস্থা?' হাত দিয়ে দেখালো সেই মায়ের টাকায় দ্রব্যহারা প্রৌঢ় মানুষটিকে।

সন্ধ্যেতারার দলও হেসে উঠলো। তাদের মধ্যেই কে একজন বললো, 'মরণ! শ্মশানে এমন র‍্যালা দেখিনি বাপু।'

কিন্তু ইতিমধ্যেই আরও দুই যুবকের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা টেনে তুলেছে প্রৌঢ়কে। দুজনের মুখই শক্ত, আর শক্ত হাতেই টেনে নিয়ে চলেছে

বাঁধানো ঘাটের পথের ওপরে। প্রৌঢ়ের কান্না তবু থামবার না, 'ওরে, তোরা আমাকে হাজার টাকার মাল খাওয়ালেও, এ শোক আমার যাবে না। আমি যে জানতাম, মা আমার অনেক টাকা রেখে গেছে।'

যুবকদের মুখে কোনো কথা নেই। জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রৌঢ়ের নিজের চলবার ক্ষমতা নেই। দ্রব্যগুণেই টলমল। তার ওপরে কোমরের পাতলুন নেমে পড়েছে অনেকখানি। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাদা মাখামাখি। ঠাকুরমহাশয় বললেন, 'হুঁ, ঐটি হলো আসল কথা। দু টাকার মালের শোক নয়, মায়ের অনেক টাকার খোঁজ। এবার বুঝতে পেরেছি।'

'টাকার কথা তুমি বুঝবে না?' চারুবালা হঠাৎ ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখঝামটা দিল।

লক্ষ্মীমণি হাত তুলে সামাল দিল, 'থাক সন্ধে, এখন ওসব কথা থাক।'

ঠাকুরমহাশয় তেমন বিচলিত না। হাসিমুখে চুপচাপ। অনেকটা, হেসে ওড়াও দাদা। ওসব কথায় কান দিও না। এমন মুখঝামটা ঝংকার, সেই চালিতে কাঁধ দেওয়া ইস্তক শুনে আসছি। এদের সঙ্গে ঠাকুরমহাশয়ের সম্পর্কটা কী, তা ধরতে পারিনি। এখন টাকার কথায়, চারুবালার ঝাঁজের খোঁটায়, কেমন একটা ইনিঝিনি ছায়া। ইনিঝিনি বেলার মতো, যাকে বলে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে। তবে অনুমান তো আগেই করেছি। আঁতের বাসায় মাখামাখি, দাঁতে কাটাকাটি। কিন্তু এদের কাছে এখন আমার আসল জিজ্ঞাস্য, চন্দ্রাবলীর চিতায় ওঠা পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে কেন? মুক্ত বেণীর এলাকায় থাকি আর যেদিকেই পা বাড়াই, সেটা আমার খুশি। চালিতে কাঁধ দিয়েছি। দাহকৃত্যে আমার কোন্ কর্ম? চিতা দেখতে থাকবো কেন?

যদিও জানি, পথ চলার ছকটা কোনোকালেই বাঁধা যায় না। বাঁধতে গেলেই, কে কোথা থেকে এসে যেন সব এদিক ওদিক করে দিয়ে যায়। ভালোর দিকে বা মন্দের দিকে, কথাটা জাগে জীবনের গতিবিধি দেখে। কিন্তু চন্দ্রাবলীকে চিতায় তোলা দেখার সাধ নেই।

কথাটা ভেবে কেন যেন চন্দ্রাবলীর মুখের দিকে নজর গেল। একে বলে বিভ্রম। চিতায় ওঠবার আগে সে নিশ্চয় চোখ তাকিয়ে মাথার দিব্যি দেবে না, 'তোমার দয়ার শরীর, থেকে যেও।'...দুর্গাদেবীর কথাটা ঠাকুরমহাশয়কে বলা দরকার। আগে থেকেই পথ পরিষ্কার করে রাখি।

'এই যে বাবা খেটো, এনিচিস?' ঠাকুরমহাশয় মুখ ফিরিয়ে বললো।

আমিও মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। না, মাঘের শীতের কথা আর সবার দিকে তাকিয়ে বলবো না। দেখলাম, হাফ প্যান্ট পরা আদুর গায়ে খড়ি ওঠা একটা ছেলে। ডান হাতে কালিপোড়া একটা কেতলি। বাঁ হাতে

একটার ওপরে আর একটা বসানো একগাদা ঝাপসা কাঁচের গেলাস। খেটোর হাতে আলাদা একটা চা ভরা গেলাস। ঠাকুরমহাশয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'লাও বাবা সিদ্ধিঠাকুর, এইটে তোমার চোনা মেশানো চা।'

'চোনা মেশানো মানে?' ঠাকুরমহাশয়ের লাল চোখে ভ্রূকুটি।

খেটো হেসে বললো, 'গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া। গরুর চোনা আর গঙ্গাজলে ফারাক তো নেই। তাই বললাম।'

'দেখিস বাবা, তোদের কিছু বিশ্বাস নেই।' ঠাকুরমহাশয় হাত বাড়িয়ে গেলাস নিল। আগে নাক বাড়িয়ে গন্ধ নিল।

আমার তখন অন্য ভাবনা। শববাহীদের সঙ্গে খেটোর ছোঁয়াছুঁয়ি বাকি ছিল না। ঠাকুরমহাশয় এতক্ষণ ছোঁয়া বাঁচিয়ে, খেটোর হাত থেকে গেলাস নিল। ভুলে গেল নাকি? আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'ছুঁয়ে ফেললেন?'

ঠাকুরমহাশয় অবাকও হয়। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের ছোঁয়া বাবা?'

আমি খেটোর দিকে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'এই আমাদের।'

এই প্রথম ঠাকুরমহাশয়ের কথার ধরতাইয়ে আর নজরে ঈষৎ ঠেক লাগলো। তারপরেই তার লম্বাচওড়া শরীরের মতোই হা হা হাসি। বললো, 'অ, ওই ছোঁয়াছুঁয়ির কথা বলচো? তাই বল। এখেনে তো বাবা আর ছোঁয়াছুঁয়ির কিছু নেই। এখেনে এসে যখনই পা দিয়েচি, ওসব ঘুচেচে। তবে হ্যাঁ, পুরুতের কাজ আমার, মড়া বইতে পারিনে। ওতে যজমানের অকল্যেণ, বুঝলে না?' একবার চোখের ইশারায় শববাহিকাদের দেখিয়ে দিল, 'এখন তো কাজেই লেগে যাব। ছোঁয়া বাঁচাবার কোনো কথা নেই। একেবারে কাজ মিটিয়ে নাওয়া ধোয়া।'

'ঢঙ দেখে বাঁচিনে।' সন্ধেতারা ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, ন্যাক্কামো, আয় খটে, চা নিয়ে চল ওই গাছতলায় গে বসি। এসো বাবা, তুমি এসো।' আমার দিকে তাকিয়ে ডাকলো।

বেজি বললো, 'সেই ভাল। কিন্তু তোমাদের একজনকে চালি ছুঁয়ে থাকতে হবে না?'

'আমি আচি বাবা, তোরা যা।' দুর্গাদেবী বললো, 'তবে আমাকে একটু চা দিয়ে যা।'

খেটো ছেলেটার গেলাসের থাক থেকে একটা গেলাস তুলে নিয়ে বললো, 'নে, চা ঢাল।'

ছেলেটি চা ঢেলে দিল। খেটো দুর্গাদেবীর হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল। লক্ষ্মীমণি আমাকে আবার ডাকলো, 'এসো বাবা।'

দেখলাম, উত্তর-পশ্চিমের বাঁদিকের উঁচুতে, একটি গাছের তলায় সবাই

এগিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরমহাশয়কে দুর্গাদেবীর কথাটা বলার অবকাশ পেলাম না। চায়ের তৃষ্ণা মিটিয়ে নিই, তারপরে জানানো যাবে।

তিন বাহিকা মাটির ওপর বসলো। বেঁজির সঙ্গে আদুর গা চা-ওয়ালা ছেলেটি। আমি একটা জায়গা ঠিক করে বসবার জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। চারুবালা বলে উঠলো, 'এই দেখ, আসন-টাসন কিছু নেই, বাবাকে বসতে দেব কিসে ?'

'তাও তো বটে।' সন্ধেতারা বিব্রত ব্যস্ত হলো, তাকালো বেঁজির দিকে।

বেঁজির পরণে লুঙ্গি আর বুকখোলা একটা জামা। খেটোর গা খালি। আমার নিজের পাঞ্জাবির ওপরে অবিশ্যি চাদর আছে। কিন্তু আমিই ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আসনের দরকার নেই, আমি মাটিতেই বসছি।'

শববাহিকারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় করলো। বেজি বললো, 'কেষ্টদার দোকান থেকে একটা কিছু চেয়ে নিয়ে আসব ?'

'কোনো দরকার নেই।' আমি আরও ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আমি ঠিক বসে যাচ্ছি।'

সন্ধেতারা বললো, 'বল তো আঁচল পেতে দিই বাবা। এই কাঁচা মাটিতে বসা তোমাকে মানায় না।'

আমি সন্ধেতারার দিকে তাকালাম। সন্দেহের খোঁচা একটু লেগেছে বইকি। কিন্তু সেটা আমার মনের ইনিঝিনি বেলা। পেশার পরিচয়টা জানা না থাকলে, হয়তো সন্দেহের খোঁচাটা লাগতো না। তাকিয়ে দেখছি, অকপট মুখেও একটি ব্যস্ততা। নিরীহ দৃষ্টিতে অমায়িক অনুরোধ। আগে দেখেও বুঝতে পারিনি, এখনও পেশার লিখন কোথাও লেখা নেই। বরং এই সরল আতিথেয়তায় আমি একটু সহজ হতে পারলাম। হেসে বললাম, 'কাকে কোথায় মানায়, কে বলতে পারে বলুন। মাটিতে আজ নতুন বসছি না।'

সন্ধেতারার থেকে হাতখানেক ফারাকে বসে পড়লাম। কাঁধের ঝোলাটা টেনে নিলাম কোলের কাছে। ভার একটু কমলো। খেটো বললো, 'দে, চা দে।'

সন্ধেতারাই বললো, 'তা যা বলেচ বাবা। কাকে যে কোথায় মানায়, তা কেউ বলতে পারে না। নইলে তোমাকে কে আজ আমাদের সঙ্গে মানিয়ে জুটিয়ে দিলে ?'

এ কথার জবাব জানা নেই। আদুর গায়ে খড়ি-ওঠা ছেলেটা কাঁচের গেলাসের থাক আগে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। ভাবলাম, আগে বাহিকাদের দিতে বলি। সমাজের সহবত সেটাই। শ্মশানে মশানে আর সমাজ সামাজিকতা কিসের। গেলাস একটা তুলে নিলাম। ছেলেটা কালি-

পোড়া কেতলি থেকে গেলাস ভরে চা ঢেলে দিল। গন্ধ যেমনই হোক, গরম আছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গেলাস ধরতে হলো। তারপর জনে জনে চা।

আমি চুমুক দিয়েই বুঝলাম, এ হলো মহাশ্মশানের চা। মহাশ্মশানের চিতা যেমন কখনো নেভে না, এখানকার চায়ের দোকানের চায়ের হাঁড়িও কখনো ঠাণ্ডা হয় না। তা সব সময়েই টগবগিয়ে ফোটে। ডাক পড়লেই ঢালা ওপর। মিষ্টি আছে, দুধও আছে, চা আছে কী না জানি না। কিন্তু চুমুক দিতেই অমৃত। মাঝে মাঝে অমৃতের স্বাদ বোধহয় এমনি করেই পাওয়া যায়। তার জন্য মহৎ কিছুর দরকার হয় না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে একটা চিতার আগুনের ওপারে, গঙ্গার মাঝ বরাবর সুদীর্ঘ ভাসমান চরটি চোখে পড়লো। বাঁশবেড়ের চরের থেকে এ চর বড়। দূর থেকেও দেখছি। লোকজনের ভিড় বেশি। মুসুর কলাই আলু যেন দূর থেকেও চিনতে পারছি। চালাঘরের সংখ্যাও কেবল বেশি না। একটা গরুকে দেখছি, শ্মশানের কূলে তাকিয়ে আছে। গলার দড়ি খোঁটায় বাঁধা। তার মানে, ত্রিবেণীর চর আরও জমজমাট। জলে ভাসা সবুজ চরটি উঁচুও বটে। সহজে ডোববার না। এ কি সমুদ্রের বালি, না কি পাহাড়ের মাটি। গঙ্গার বুক জুড়ে কেবল মাথা চাড়া দেওয়া চরের সারি। গঙ্গা শুকায়, না পথ বদলায়? কথায় বলে, মন না মতি। নদী কবে স্থির থেকেছে? তার গভীরের মন-মতির খবর যারা জানে, তারা বোঝে। আমরা দেখি, মান্ধাতা আমলের বইয়ে আঁকা মানচিত্র বদলে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা ভার।

এককালে যাদের কাছে এ জায়গা ছিল তিরপানী, তারাবানী আর ফিরোজাবাদ, বন্দরে তীর্থে একাকার, গঙ্গার বুকে এমন সারি সারি চরের বহর তারা স্বপ্নেও দেখেনি। কবিদের তো কথাই নেই। কেবল প্রাচীনদের সম্পর্কেই কথাটা মনে এলো না। রবিঠাকুরও তো এই পথে জলভ্রমণ করেছেন। তাঁর শিলাইদহের যাত্রা নিশ্চয়, এ পথেই পদ্মায় গিয়ে মিশেছে। এমন চর দেখেছিলেন কী?

'হ্যাঁ বাবা, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' পাশ থেকে সন্ধেতারা বলল।

আমি মন গুটিয়ে, চোখ ফিরিয়ে বললাম, 'কী, বলুন?'

'কোথা থেকে আসচিলে বাবা, যাচ্ছিলেই বা কোথায়?' সন্ধেতারার চোখে অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। কানের কাছে কিছু পাকা চুল, তবু কানে দুটো সোনার ফুল। নাকে নাকছাবি। হাতে দুচারগাছা চুড়ি, শাঁখা, লোহা। বাঁ হাতের অনামিকায় রুপোর আংটিতে লাল প্রবাল। সিঁথিতে সিঁদুর। চোখের কোল বসা, মুখে ক্লান্তির ছাপ।

কিন্তু এইখানেই মুশকিল। পথে বেরিয়ে, এ কথাটার জবাব কাউকে কোনোদিন দিতে পারিনি। আর জিজ্ঞাসাটা তো কেবল সন্ধেতারার না। চারুবালা লক্ষ্মীমণিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। খেটো আর বৌজ নিজেদের কথায় ব্যস্ত। মিথ্যা কথা তৈরি করতেও সময় লাগে। তবু বললাম, 'ত্রিবেণী হয়ে নবদ্বীপ যাবো।'

অথচ নবদ্বীপের চিন্তা আমার মাথায় ছিল না। সন্ধেতারা বললো, 'এখেন থেকে রেলগাড়ি চেপে যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আসচিলে কোথা থেকে? চুঁচড়ো না হুগলি?' সন্ধেতারার জিজ্ঞাসায় মোটামুটি এইরকম ধারণা।

বললাম, 'ঐ আর কি, কাছেপিঠে থেকেই।'

জবাবটা স্পষ্ট হলো না জানি। সন্ধেতারা তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে একবার চোখাচোখি করলো, বললো, 'তা বাবা, যেটুকু বলার তাই বলবে, তার বেশি আর বলবেই বা কেন। নবদ্বীপে নিজের লোক আছে বুঝি?'

তাও বটে। নিজের লোক না থাকলে, কেউ আবার কোথাও যায় নাকি? মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আছে।'

'আর আমরা তোমাকে কী গেরোয় ফেললাম বল দিকি?' সন্ধেতারা বিব্রত আর সংকুচিত, 'তা বাবা, তোমার গাড়ি কখন?'

মিথ্যা কথার ভরাডুবি এইখানে। মিথ্যার স্বরূপ মিথ্যা। একটার পিছনে আর একটা আসে। নবদ্বীপে যেতে হলে ত্রিবেণী থেকে ট্রেনে যাওয়া যায়। এ কথাটা জানা ছিল, সময়ের কথা তো জানি না। বলতে হলো, 'গাড়ির সময়টা ঠিক জানিনে, খোঁজ নিতে হবে।'

'ছি ছি ছি, কী গেরো বল দিকিনি।' চারুবালা বলে উঠলো, 'গাড়ি না পেলে আমাদের জন্য তোমাকে না ইস্টিশনে পড়ে থাকতে হয়।'

হেসে বললাম, 'মানুষের তো কতো কিছুতেই পড়তে হয়। আপনাদের সঙ্গে দেখা না হলেও আমার গাড়ি ফেল হতে পারতো।'

'হ্যাঁ, একে বলে দয়ার—।' লক্ষ্মীমণির কথাটা শেষ হলো না। কাসির দমকে আটকে গেল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলাম লক্ষ্মীমণির মুখ একেবারে পশ্চিমের উল্টো দিকে ফেরানো। তার মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আগুন কোথায় লেগেছে, তা জানি। অগ্নিকাণ্ডের ভয় নেই। লক্ষ্মীমণির ধোঁয়ার গন্ধেই টের পেয়েছি। চিতার ধোঁয়ার গন্ধ ছাপিয়ে, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ স্পষ্ট। এক্ষেত্রে জীবিকার কথাটা আগে আসে। কিন্তু স্ত্রীলোকের ধূমপানে কোনো সমাজের ভেদরেখা নেই। তবে ঐ দয়ার শরীর কথাটা আমার আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

'তা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি বাবা, মনের কথা বলবে তো ?' সন্ধেতারা জিজ্ঞেস করলো।

আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। শুকনো ঠোঁটের কোণে সংকোচের হাসি, চোখে দ্বিধা। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছেন বলুন ?'

'বলচি, আমাদের চিনতে তো আর তোমার ভুল হয়নি। এমন একটা দায় নিলে, আমাদের ওপর রাগ করনি তো ?' সন্ধেতারার ঘাড় যেন একটু ঝুঁকে পড়লো।

আমি হাতের শূন্য গেলাস নামিয়ে বললাম, 'প্রথমে আপনাদের আমি চিনতে পারিনি।'

'পারলে বাবা নিশ্চয়ই কাঁধ দিতে না ?' সন্ধেতারার প্রৌঢ়া চোখের তারায় বড় ব্যগ্রতা।

জবাবটা হঠাৎ দিতে পারলাম না। কয়েক মুহূর্ত সময় নিলাম। কিন্তু নিজেকে নির্যাস চিনি, এই বরাতটা নেই। জানলে কী করতাম, জানি না। বললাম, 'তা বলতে পারি না। তবে আপনাদের ঐ ভদ্রমহিলাব খুবই কষ্ট হচ্ছিল, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

আমার কথা শুনে তিনজনেই আবার চোখাচোখি করলো। আমাব দিকেও দেখলো। চারুবালা বললো, 'ও সব ভদ্দব মইলে টইলে বলো না বাবা। আমরা যা, তা-ই।'

হ্যাঁ, এমন একটা ঠেক তো আমার মনেও ছিল। কিন্তু কথা বলতে গেলে, মুখেব ভাষাই বেরিয়ে আসে।

'কিন্তু আমি যে কথা জিজ্ঞেস করলাম ' সন্ধেতারার ব্যগ্র চোখের দৃষ্টি আমার দিকে, 'পরে তো চিনেচ। রাগ করনি তো ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'ঘেন্না হয়নি তো ?' সন্ধেতারার চোখে এখন দ্বিধা ও তীক্ষ্ণতা।

কথাটা একবারের জন্যও মনে আসেনি। অবাক হয়েছিলাম, নিজের ভাগ্যকে ধিক্কারও দিয়েছিলাম। কিন্তু ঘৃণা আর ধিক্কার, এক কথা না। বললাম, 'সে-রকম কিছু তো মনে হয়নি।'

ভাবছিলাম, আবার নিশ্চয় 'দয়ার শরীর'-এর আওয়াজ শোনা যাবে। কিন্তু সন্ধেতারা বললো, 'বাঁচালে বাবা। মনটা তোমার সত্যি ভাল। তোমার বেশভুষা চালচলন দেখে একবারও ভাবিনি, তুমি সত্যি কাঁধ দেবে। জীবন কাটে একরকম, মানুষ আর কতটুকুনি চিনি।'

অথচ আমার ধারণা, সন্ধেতারারা যতো মানুষ চেনে, আমরা ততো চিনতে শিখিনি। কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা আমার বুক ফেটে এখন ঠোঁটের ডগায় আকুলি-বিকুলি করছে। না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না, 'তা আপনারাই বা কাঁধে বয়ে আনতে গেলেন কেন ? এ রকম আমি কখনো দেখিনি।' জিজ্ঞাসার

ফাঁকেই একবার চন্দ্রাবলীর চালির দিকে দেখে নিলাম। নজরে পড়লো, দুর্গাদেবী আর ঠাকুরমহাশয় আমাদের দিকে তাকিয়ে কিছু বলাবলি করছে।

সন্ধেতারা আর দুই বাহিকার মুখে হঠাৎ বাক্যি সরলো না। তারাও নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে, একবার চন্দ্রাবলীর চালির দিকে দেখলো। চারুবালা বললো, 'সে বাবা অনেক কথা। তা কী আর হয়েচে, বল্ না সন্ধে। বাবাকে বলতে দোষ কী?'

'দোষ আবার কিসের?' সন্ধেতারার স্বরে দৃঢ়তা, 'গোটা দেশ গাঁ জেনে গেল, আর উব্‌গারি ছেলেটাকে বলতে পারিনে?' সে আমার দিকে তাকালো। এখন তার মুখ গম্ভীর, একটু বা শক্ত। বললো, 'তোমাকে আর সে সব কথা কি বলব বাবা। দেখে শুনে মনে হচ্ছে, তোমার ওসব জেনে কাজ নেই। তবু যদি শুনতে চাও, বলতে পারি।'

এই কথাটা শোনার জন্যই, প্রথমে কৌতূহল ব্রহ্মতালুতে গিয়ে বিঁধেছিল। সরস্বতীর সাঁকো পেরিয়ে, অবস্থা দেখে, তখনই কেমন কৌতূহলের খোঁচাটা একটু ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। তবু শোনবার ইচ্ছা একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। গণিকার শব হলেও, গণিকাদের কখনও কাঁধে বইতে দেখিনি। বললাম, 'আপনাদের অসুবিধে থাকলে বলতে হবে না।'

'আমাদের আবার অসুবিধে!' সন্ধেতারা হেসে উঠলো, 'কী যে বল বাবা।' সে বিঘতখানেক এগিয়ে এলো আমার দিকে, বললো, 'ত, বলি বাবা শোন। কথায় বলে, ঘরে আমার ভাতার, জার করি কাতার কাতার।'

হুম, শ্রবণটা কেমন চমকে উঠলো। সন্ধেতারা 'জার' বলেনি। তার বদলে যে-কথাটা উচ্চারণ করেছে, তার প্রতিধ্বনি করতে আমি অযোগ্য। আমার কানে মনে যাই ঘটুক, সন্ধেতারা থামেনি। সে তার কথা বলেই চলেছে, 'তা সে-কথা তোমাকে আর কী ভেঙে বলব বাবা। ওই চাঁদ কাঁচা বয়সে এসেছিল চন্দননগরে। তারপরে আমাদের তল্লাটে।'

'আপনাদের তল্লাটটা কোথায়?' শববহনের দূরত্ব জানবার জন্য প্রশ্নটা মুখে এলো।

সন্ধেতারা হুগলির একটি অঞ্চলের নাম করলো। বাহিকাদের পক্ষে দূরত্বটা বিরাট, সন্দেহ নেই। সন্ধেতারা নিজের কথায় ফিরে গেল, 'তা বাবা একটা কথা, মেয়েমানুষের রূপ থাকলে, যেখেনেই বল, সেখেনেই গোল। আর আমাদের ঘরে পাড়ায় রূপসী জুটলে তো কথাই নেই। তখন সে ভাগাড়ের মড়া। শকুন শেয়ালের কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি। রক্ষে করবার কেউ নেই। চাঁদকে নিয়ে চন্দননগরে মানুষ খুনও হয়ে গেচে। ওরও খুন হবার কথা। তা হলেই ঝামেলা মিটে যেত। ওকে নিয়ে যারা মারামারি

কাড়াকাড়ি করেছে, খুনোখুনি করেছে, তাদের জেল জরিমানাও হয়েছে। তা, এত সব যখন দেখলি, তুই নিজে কেন সামলে চললিনি।'

চারুবালা সন্ধেতারার কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বললো, 'ওকথা বলিসনে সন্ধে, বয়েসকালের কথা ভুলে যাসনে। চাঁদের কি তখন সামাল দেবার বয়স ছিল, না মন ছিল? ওকে ঘিরে তখন রাজ্যের বাবুদের র‍্যালা। অমন দিন তোরও গেচে।'

'না, আমার কেন যাবে?' সন্ধেতারা ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, 'আমার তো আর চাঁদের মতন রূপ ছিল না। তা বলে সামাল দিতে পারবে না কেন? সেই তো দিতে হলো।'

লক্ষ্মীমণি বললো, 'হ্যাঁ হলো, রক্তের জোর যখন কমল। চন্দননগর ছেড়ে যখন আমাদের তল্লাটে পালিয়ে এলো।'

চন্দ্রাবলীর মৃত মুখ এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবে অনুমান ঠিকই করেছিলাম। তার এই প্রৌঢ় দেহের স্বাস্থ্য রঙ মুখ চোখ দেখে, আমি কেবল চটকের কথাই ভেবেছিলাম। আসলে সে ছিল গণিকা সমাজের রূপসী। রূপসী প্রমোদার জীবনে কতো পুরুষের আগমন ঘটেছে, তার হিসাব কেউ দিতে পারবে না। স্বয়ং চন্দ্রাবলীরও কি হিসাব জানা ছিল? বোধহয় না। তার মৃত মুখেও আমি যেন একটা দেমাকের ছাপ দেখেছিলাম। মনে হয়েছিল, জীবনটা তার ভোগে কেটেছে। কিসের ভোগ? কেমন ভোগ?

আমরা একটা মন নিয়ে মানবীর শরীরের শুদ্ধাচারের কথা ভেবেছি। মানবী ভেবেছে আত্মরক্ষার কথা। সেই আত্মরক্ষার সংকল্প দিয়ে, শরীর তার মন দিয়ে বাঁধা। কারণ, সে ধারণ করে। শরীর নিয়ে দায় তার সেই কুঁড়ি ফোটার কাল থেকে। সতীত্ব শুদ্ধাচারের মন্ত্র তার কানে পুরুষ দিয়েছে। সেই আত্মরক্ষার দায়কে নারীত্ব বলে কী না জানি না। পরিবর্তন আর বৈপরীত্য তাকে আত্মরক্ষা করতে শিখিয়েছে। ওটা তার প্রবৃত্তি।

সেই শরীর যখন বারো ঘাটের ডুবুরি ঘাট, তখন সেই ঘাটের ভোগ কেমন—হাসি রঙ্গ উন্মাদনা বিলাসব্যসন যাই থাক, ঘাটের সেই উথালপাথাল জলে ঘৃণা উথলে ওঠে না, এমন বাক্য কেউ কবে না। যা রক্ষা করতে পারিনি, তবে নে সেই ভাগাড়ের মড়া। ভোগের ঝলকানো আলোয়, রাগ আর ঘৃণার ছায়া গাঢ়। কেবল চন্দ্রাবলীর না। আমার পাশে যারা বসে আছে, নিশ্চয় সকলেরই। ধারণাটা নিজস্ব। সত্যি মিথ্যার বিচার তোমাদের।

এমন জীবন কোনো রমণী হাত বাড়িয়ে নেয় না। চন্দ্রাবলীও নেয়নি। অসহায়তা দারিদ্র্য অপমান, যে-অন্ধকার থেকেই সে উঠে আসুক। তারপরে আর সামাল দেবার কী ছিল।

সন্ধেতারার বিশ্বাস, 'কেন সামাল দিতে পারেনি? তুমিই বল বাবা, ওই সেই যে-কথাটা বলছিলাম। রূপ তো তোর চিরকাল থাকবে না,

বয়সও না। ভাতার পুত ছিল না, জার নিয়ে সারা জীবন। তা বেশ তো, দু নৌকোয় পা কেন? সিদ্ধিঠাকুরের নৌকোয় পা দিলি তো, আবার অন্যকে ঘাটাল দেওয়া কেন?'

'ঠাকুরের নাম নিচ্ছিস সন্ধে?' লক্ষ্মীমণির অবাক স্বর।

সন্ধেতারার গলায় ঝাঁজ, 'রাখ্, ঠাকুর আমার সাতপাকে ঘোরা ভাতার না। ও মুখপোড়া মিনসের নাম অনেকবার নিয়েচি। ওসব—আমার নেই।'

ওসবের মাঝখানের বিশেষ্যটি উচ্চারণেই ঠেক। সন্ধান যে জান, বুঝহ সে-জন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সিদ্ধিঠাকুরমশায় বুঝি আপনাদের তল্লাটেরই লোক?'

'হ্যাঁ বাবা, আমাদের তল্লাটের হাড় জ্বালানো বামুন।' সন্ধেতারা বিরাগ বিরক্তিতে ঘাড়ে একটা ঝটকা দিল, 'বাপের বিস্তর সম্পত্তি ছিল, কোঠাবাড়ি ছিল। শুনি নাকি কোন্‌কালে লেখাপড়া শিখেচিল। যত কাল দেখছি, তার কোন আঁচ পাইনি। মদ মেয়েমানুষ জুয়া ছাড়া আর তো কিছু করতে দেখিনি। ওদিকে দেখ, মা ষষ্ঠীর কৃপায় ঘর ভরতি ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী। নিজে একটা ছেলেকে মানুষ করতে পারে নি, একটা মেয়ের বিয়ে দেয়নি। সব উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষটায় আমাদের কাছে। তা আর কী বলব বাবা, অনেক-কালের যাতায়াত, তাড়াতে তো পারিনে। শেষটায় ওই চাঁদের কী মরণ ধরল, ঠাকুরকে ঘাড়ে নিল। তা নিলি, বেশ করলি, আবার সিংবাবুজীকে ঘাটাল দেওয়া কেন? সে তোমাকে অনেক দিয়েচে থুয়েচে, পায়ে ধরে তো সাধতে যায়নি, ও চাঁদ, আমাকে ছেড় না। তার তো আর অভাব নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য সুদী তেজারতির কারবার ভাল। তবে হ্যাঁ বাবা, একটা কথা কী, যার যত থাকুক, সে তত চায়। সিংজীবাবুই বা চাইবে না কেন? ওই দুজনের আকচা আকচিতে আমাদের জীবনপাত।' সন্ধেতারা কাশতে আরম্ভ করলো।

আমি তাকালাম ঠাকুরমশায়ের দিকে। চন্দ্রাবলীর চালির পাশে, দুর্গা-দেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, দুজনেই থেকে থেকে আমাদের দিকে দেখছে। কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে খেটো আর বেজি। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয়, তাদের কথাবার্তা বা সলাপরামর্শও আমাদের নিয়েই।

এদিকে সন্ধেতারার বৃত্তান্তে, অন্য জগতের এক ঘটনার গাঁট খুলছে। শুকনো গলার কাশি সামলে সে আবার বললো, 'চাঁদ সম্পত্তি তো কিছু কম করেনি। চন্দননগরে হুগলিতে দুখানি বাড়ি করেছে। সোনা দানা নগদও কিছু কম ছিল না। তা সে-সবের হিসেব কেউই পায়নি, আমরা কোন্ ছার। যা পেয়েচে, সবই ওই সিদ্ধিঠাকুর। তা বাবা জান তো, বাঁজা রাঁড়ের সম্পত্তি সরকারে বর্তায়। কিন্তু চাঁদ তার ঘর বাড়ি সবই সিদ্ধিঠাকুরের নামে আগেই বিক্কির কোবালা লিখে দিয়েছে। মন ভোলাবাবার গুনে তো ঠাকুরের ঘাট

নেই। চাঁদ মরার পরে সে সব খোঁজ পড়ল। জানাজানি হতেই সিংজী-বাবুর মেজাজ খারাপ। বড়লোক মানুষ, পাড়ায় তার জোর বেশি। আমাদের মড়া আর কে ছোঁবে? পাড়ার আর দশটা ছেলে ছাড়া গতি নেই। কিন্তু সিংজী সাহেব টাকা দিয়ে সকলের হাত বেঁধে দিলে। কেউ আর চাঁদের মড়া বইতে চায় না। কী বিপদের কথা বাবা, বল দিকিনি?'

হ্যাঁ, বিপদ, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপত্তারণের জবাবটাও যেন এখন আমার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার। তবু, কথা না বলে, শ্রোতার ভূমিকায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম সন্ধেতারার দিকে। তার ভ্রূকুটি বিরক্ত চোখের দৃষ্টি তখন ঠাকুরমহাশয়ের দিকে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। রাজ্যের বিস্ময় তার স্বরে আর চোখে মুখে। 'তা ওই ঠাকুর মিনসে কী করলে জান বাবা? চাঁদের গতি করতে, আমাদের পায়ে ধরে সাধতে এল। বোঝ একবার কাণ্ড! এমন কথা কেউ কখনো শুনেচে, মেয়েরা মড়া বই করবে? কিন্তু সিদ্দিঠাকুর কান্নাকাটি শুরু করলে। শাস্তরের কথা আমরা জানি নে, সে আমাদের অনেক করে বোঝালে। সেই রামায়ণ না মহাভারতের আমলে মেয়েরাও নাকি মড়া বইতো। এদিকে বিকেলের মড়া, রাত পোয়াতে চলেচে। আমরাও গিয়ে পাড়ার ঘরে ঘরে ছেলে ছোঁড়াদের অনেক ডাকা সাধা করলাম। কেউ বেরতে চাইলে না। উল্‌টে মেয়ে মদ্দ সবাই মিলে অনেক কথা শুনিয়ে দিলে। যাবেও না, আবার আন্‌মান্‌ কথা। তা আমরাও ঠিক করলাম, যা থাকে কপালে, চাঁদের মড়া আমরাই বইব। আমাদের দিন গেচে। কে আর কী বলবে? শত হলেও চাঁদ আমাদের বন্ধু ছিল।'

লক্ষ্মীমণি বললো, 'ও কথাটিও বল, ঠাকুর একটা পয়সাও বার করেনি। খরচ-পত্তর যা এখনও সবই আমরা করচি।'

কেন, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে গলায় আটকাচ্ছে। চাঁদ বন্ধু, কেবল সেই কারণেই? তাও নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে? আমি ঠাকুর-মহাশয়ের দিকে তাকালাম। তার লম্বা-চওড়া শক্ত সমর্থ গোরা চেহারা আগেই দেখেছি। চুলেও তেমন পাক ধরেনি, দাঁত সব অটুট। মুখে বয়সের ছাপটা একেবারে লোপাট হয়নি। সেটা বার্ধক্যের ভাঙাচোরা খানাখন্দে ভরা না। নাম কি সিদ্ধেশ্বর। তারপরেও রমণীমোহন না বলি, গণিকা-মোহন বলতে বাধা কী? অন্যথায় এমন অসাধ্য সাধন করলো কেমন করে। এই বাহিকাদের বশ মানাবার মন্ত্র তার জানা আছে। সে মন্ত্রের ধান্দা করা অসম্ভব। এমন মানুষ কোন ধাতু দিয়ে গড়া, জানি না। তবু মনে মনে বলতে হলো, নমস্কার মহাশয়। খবরের কাগজের দুর্ভাগ্য, এমন একটি শ্মশানযাত্রার ছবি দেশবাসী দেখতে পেলো না। আপনার অভিনব কীর্তি-কাহিনীও জানতে পারলো না।

তবু একটা কথা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। 'কিন্তু এখানে এসে তো দেখলাম, আপনাদের লোকেরা সবাই আগে থেকেই জানতো।'

'তা জানতো।' সন্ধেতারা বললো, 'খবর তো চাপা থাকে না। আর এখেনে সিংজীর জারিজুরি খাটে না। এখন আমরা নিশ্চিন্দি। তবে হ্যাঁ, আমাদের তল্লাটে এ নিয়ে এবার একটা তোলঘোল কাণ্ড হবে। এখনই বলে রাখচি, দেখো।'

না, সে তোলঘোল কাণ্ড দেখবার সময় আমার কোনোদিন হবে না। চালিতে কাঁধ দিয়েছি, রমণীদের শব বহন দেখেছি, এই কথাটা মনে থাকবে। তারপরেও দেখছি, এই স্মৃতিটা আজ অনেকখানি তুচ্ছ হয়ে এসেছে। কিন্তু সংসারের নিরন্তরতায় কতো ঘটনা ঘটে চলেছে, তাব কতোটুকুই বা জানতে পারি। তার লীলার অন্ত নেই।

আমার খেলা সাঙ্গ। এবার উঠতে হয়। এমদাদের মুখটা মনে পড়ছে। এখন বুঝতে পারছি, শববাহিকাদের পিছনে পিছনে, যে ধুলিঝাড়াগুলো আসছিল, সে খবর পেয়েছিল তাদের কাছেই। কিন্তু আমাকে সাবধান করার সময় পায়নি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে যে আর তার দেখা পাবো, সে-ভরসা নেই।

ইতিমধ্যে দেখছি, রুকি আর লতা এসে হাজির। হাতে তাদের দাহকর্মের নানা সম্ভার। শুধু দুজন না, আরও দুজন আছে। তাদের দেখে থাকলেও মনে নেই। রুকি তার শাড়ি জামা বদলায় নি। লতাও না। তবে এখন তার ভেজা চুল মোছা। কিন্তু আঁচড়ানো না। শাড়ির ভিতর জামা পরে এসেছে। দেখছি, সকলের নজরই এদিকে। খেটো বেজিদের বয়সী আর এক যুবকও এসেছে। লুঙ্গির মতো করে ধুতি জড়ানো। গায়ে একটা পাতলা জামা। নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা হচ্ছে। আমি ওঠবার উদ্যোগ করলাম। রুকি হাত তুলে ডাকলো, 'সন্ধেমাসী, একবার এদিকে এস।'

সন্ধেতারা উঠলো। আমিও উঠে দাঁড়ালাম। চারুবালা পিছন ডাকলো, 'একটু বসে যাও বাবা।'

'না, আর বসবো না। এবার আপনাদের কাজ আপনারা করুন। আমি একটু ঘাটে যাই।' উঁচু ঢিবির গাছের তলা থেকে নেমে এলাম। তার মধ্যেই দেখতে পেলাম, খেটো আর বেজি ছাড়া, নতুন যে যুবকটি এসেছে, সে হঠাৎ দৌড়ে চলে গেল শ্মশানঘাটের বাইরে। বাঁধানো ঘাটের উঁচু পথে। আমি কাছাকাছি হতে, ঠাকুরমহাশয় এগিয়ে এসে বললো, 'তোমাকে আর এখেনে বসিয়ে রাখব না বাবা। তুমি নেয়ে ধুয়ে একটু সাফ সুরত হয়ে নাও। কিন্তু চলে যেও না।'

শ্মশান বলে কথা। এ যে দেখছি এখন যমে ছাড়ে না। কিন্তু হেসেই

বললাম, 'আমাকে আর আটকাচ্ছেন কেন? স্নানটা করবার ইচ্ছে আছে, তবে জামাকাপড় শুকোবার উপায় নেই। ভাবছি, ভেজা জামাকাপড় নিয়েই আমি চলে যেতে পারবো।'

'নবদ্বীপে যাবেন তো?' রুকি আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তা যাবেন। জামাকাপড় শুকোবার ব্যবস্থা সব হবে। সেজন্যে ভাবতে হবে না। কিন্তু একেবারে এরকম করে কেন যাবেন?'

তবে কি আমি এদের সঙ্গে শ্মশানে থাকবো নাকি? মনটা ক্রমে বিরূপ হয়ে উঠলো। সেটা জানাতে পারি না। বললাম, 'আমাকে আর কী দরকার? কিছু করার আছে কী?'

'না, তা নেই।' এবার লতা এগিয়ে এলো রুকির পাশে। 'আমাদেরও একটা ধমমো কমমো আছে তো। আপনি এভাবে চলে গেলে, আমাদের মন খারাপ করবে।'

ঠাকুরমহাশয় বলে উঠলো, 'বুঝলে না বাবা, এরা তোমাকে একটু সেবা করতে চায়।'

সেবার গাওনা তো সে সাঁকো পেরিয়ে পাড়ার ধারে দাঁড়িয়েই গেয়েছিল। এখন কি আমাকে সেই পাড়ায় গিয়ে, রুকি লতার সেবা নিতে হবে নাকি? শুনেছি, চালকোটার ঢেঁকিকেই বোঝানো যায় না। কারণ লাথির ঢেঁকি চাপড়ে ওঠে না। আমি বললাম, 'না, আমার কোনো সেবার দরকার নেই। মাফ করবেন, আমি একটু ঘাটে যাচ্ছি।'

পা বাড়াতেই লতা ডাকলো, 'শুনুন দাদা, আমাদের ঘরে গিয়ে আপনাকে বসতে হবে না। কী করেই বা তা বলি বলুন, আমরা কি আর বুঝিনে?' সে রুকির দিকে তাকিয়ে হাসলো।

রুকিও হাসলো। অভাবিত কী না জানি না, রঙ্গিনীর হাসি না। লতার রূপে একটা পরিচ্ছন্নতা ছিল। রুকিও তেমন অপরিচ্ছন্ন না। তবু তার শরীরের স্বাস্থ্যের ঔদ্ধত্যে, চোখে-মুখে জীবনযাপনের ছাপটা একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি। লতাকে সেই হিসাবে নম্র লাবণ্যময়ী বলতে হয়। তা হলেও, গলা বাড়িয়ে বলবো না, বেমানান। এমনটিও দেখা যায়। আবার সমাজের বুকেও দেখা যায় অনেক কিছু বেমানান। স্থান কাল বিশেষে গৃহস্থ-অ-গৃহস্থ-রূপ ভাগাভাগি করা যায় না। স্বীকার করতে হবে, তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে না, সমাজের পিছন দরজার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বরং গৃহস্থের সদরের ছবিই যেন স্পষ্ট। তবু আমি যা, তা-ই। কানা, মনে মনে জানা।

রুকি বললো, 'সে ভয় করবেন না। আপনি নেয়ে ধুয়ে একটু ধাতস্থ হন। আপনাকে ইদিকে আর আসতে হবে না। বাঁধা ঘাটে বসে একটু রোদ পোয়ান। আপনার মনের মতন সর্ব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

কথা বইছে কোন ধারায়, কিছু বুঝতে পারছি না। এরা যে তাদের ঘরে

আমাকে যেতে বলবে না, তা আমি জানি। সে-আশংকা আমি একবারও করিনি। দেহোপজীবিনী হলেও, কথাবার্তায় তাদের সহজ বোধবুদ্ধির ধারটা মোটামুটি বোঝা গিয়েছে। কিন্তু সেবাটা কিসের? আমার মনের মতো ব্যবস্থাই বা কী হয়ে যাবে।

'ওরা ঠিকই বলেচে বাবা তোমার কোন অসুবিধে হবে না।' সন্ধেতারা রুকি লতাকে দেখিয়ে বললো, 'আমাদের এই দু মেয়ের সব দিকে নজর আছে। আমরাই বরং ভাবচিলাম, কী করে কী হবে।'

দুর্গাদেবী চালি ছুঁয়ে বসেই ছিল। বললো, 'কথাটা আমার মনেই আগে এসেছিল, ঠাকুরকে আমিই আগে বলেচি।'

'তা বলেচ সত্যি।' সন্ধেতারা বললো, 'সন্ধান তো এ মেয়েরা ছাড়া কেউ জানে না। তা সে যাই হোক গে, বংকা যখন গেচে, ব্যবস্থা হবেই। মেয়েরা যা বলচে, তুমি তাই কর বাবা। নাওয়া ধোয়া সেরে নাও গে।'

ঠাকুরমহাশয় একটু ব্যস্ত, তাড়া দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। এবার আমরা এদিকটা দেখি। তুমি বাবা চানটান করে তোয়ের হয়ে নাও।'

ইতিমধ্যে খড়কুটো মুখ শাদা ছাঁটা চুল বৃদ্ধাকে, ঘৃত লেপন, নববস্ত্র জড়ানো ইত্যাদি চলেছে। অনেক্ষণ থেকেই, হারমোনিয়ামে বেশ পাকা হাতের বাজনা ভেসে আসছিল। কোথা থেকে আসছিল, জানি না। তার সঙ্গে বাজছে কেবল মন্দিরা। ডুগি তবলার সঙ্গত নেই। বাজনার সঙ্গে কোনো স্বরের গানও শোনা যাচ্ছে না। কেবল হারমোনিয়ামে বেজে চলেছে পরিচ্ছন্ন পাকা হাতের বাজনা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ভেরোঁ সুরে টপ্পার অঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত বাজছে। মাঝে মাঝে ধন্দ লেগে যাচ্ছে। চেনা চেনা মনে হলেও, ঠিক যেন বিশেষ কোনো শ্যামাসঙ্গীত বাজছে না। তবে সুরটা খেলছে ভৈরোঁ রাগে। দানার কাজ এত স্পষ্ট, বাজনদারের আঙুলে জাদু আছে। হঠাৎ শুনলে মনে হতে পারে, কোনো স্ত্রী-কণ্ঠে, নিমগ্ন প্রাণের নিবিড় গলার স্বর ভেসে আসছে। মন্দিরার ঠিন ঠিন মিলেছে ভালো। ডুগি তবলার বৈঠকি আমেজটা নেই বলেই যেন ভালো লাগছে বেশি।

কিন্তু পাকা হাতের মিঠে বাজনা যেখান থেকেই ভেসে আসুক, কান পেতে শোনার সময় নেই। এরা কিসের ব্যবস্থা কিসের সন্ধান করছে, আমার এই এক জন্মে বোধহয় ভেবে ওঠা সম্ভব না। বংকাই বা ছুটে গেল কোথায়? ভাবতে পারতাম, তোমরা যা খুশি তাই করো। আমি যাই আমার পথে। কিন্তু হালচাল দেখে নির্ঘাৎ বুঝতে পারছি, পা বাড়ালেই পথ পাওয়া যায় না। পাল্লায় পড়েছি। ওজনের পাল্লা না। এ পাল্লার নাম, পালে পড়েছি।

হাসির শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, রুকি আর লতা দুজনে নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। রুকি বললো, 'তুই বল, আমি তো বললাম।'

'আমিও তো বললাম।' লতা তাকালো আমার দিকে, 'যান আপনি ঘাটে যান। তারপরে আমাদের ব্যবস্থায় আপনার মন বসে তো থাকবেন। নইলে যা প্রাণ চায় করবেন। এর ওপর তো কথা নেই ?' সে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো রুকির দিকে।

রুকি বললো, 'তুই আবার অমন করে বলচিস কেন। প্রাণ ঠিকই চাইবে।'

'ও মা, কী বলচিস তুই ?' লতার কালো চোখে অবাক ভ্রুকুটি, 'আমি কি দাদাকে চলে যেতে বলচি নাকি ? মানুষের মুখ দেখে বুঝি নে ? যেন কী বিপাকে পড়ে গেচে। কিন্তু জোর খাটাবো কী দিয়ে, বল ?' সে আমার দিকে এই প্রথম চোখের কোণে তাকালো।

রুকির চোখে কি চকিতে একটু ইশারার ঝিলিক হেনে গেল ? বললো, 'কী দিয়ে আবার ? আমরা কি মানুষ নই ? মানুষের মন নেই আমাদের ? ভালকে ভালর জোর খাটিয়ে রাখব। আমরা কি বাবু বসাতে যাচ্ছি ?'

লতা আমার দিকে তাকিয়েছিল। তাড়াতাড়ি চোখ নামালো। মুখে তার লজ্জার ছটা। বারোবিলাসিনীও রমণী, লজ্জা তারও ভুষণ। বললো, 'ছি, তাই কি আমি বলছি ?'

রুকির অনায়াস জিজ্ঞাসু উক্তিটি কানে বিঁধলো, মোচড়ও দিল। তবু উদাস মুখে, অবুঝ চোখে তাকিয়ে রইলাম। সব কথা বুঝতে নেই।

'তা বলিসনি, বাবা ভালই জানে।' সন্ধেতারা হেসে তাকালো আমার দিকে, 'তোমার ভাববার কিছু নেই। আর বেলা বাড়িও না, নেয়ে ধুয়ে নাও গে।'

মনে যতোই ধন্দ থাক, স্বীকার করতে হবে, সন্ধেতারার কথায় কেমন ভরসা আর স্বস্তি যোগায়। রুকি বা লতাকে নিয়ে আমার অবিশ্বাস নেই। কিন্তু এ দুই গাঙ গহীন না হতে পারে। তেজী আর বাঁকা স্রোতের টান গতিক বোঝা যায় না। আমি আর কথা না বাড়িয়ে, বাঁধানো বড় ঘাটের দিকে পা বাড়ালাম। ঘাড়ের চালি নেমেছে বটে। তাকে যদি জোর জুলুমের মত্ততা বলি, তবে খোয়ারি কাটাতে হবে। এখন, সেই খোয়ারি কাটাবার ব্যবস্থা, কোন বেড়িতে কী ঘোরে কাটবে, তা জানি না। জানবার উপায়ও নেই।

পিছনে রুকির গলায় শুনতে পেলাম, 'হাঁ করে এখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে ? সঙ্গে যাও।'

'যাচ্ছি রে বাবা। মাসী যেন কী বলছিলে ?' বেজির গলা।

কোন মাসী কী বললো, তা আর আমার কানে এলো না। আমি ঘাটের ওপরে এসে দাঁড়ালাম। পিছনে গাছপালা দোকানঘরের মাথা ছাড়িয়ে, মাঘের ছায়া লম্বা হতে আরম্ভ করেছে। রোদ এখন ঘাটের নিচের দিকে। কয়েক ধাপ

নামলে, ডাইনের মন্দিরে গৌর নিতাই। মনে করতে পারছি না, বিষ্ণুপ্রিয়াও বিরাজ করছিলেন কী না। বাঁয়েও মন্দির, বিগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি না। জলে এখনও কেউ কেউ স্নান করছে। একদল কুচো কাঁচা বোধহয় সবখানেই, জল পেলে, হাত পা দাপিয়ে ঝাঁপাই জোড়ে। ওদের বেলা অবেলা নেই। শীতও নেই। তা ছাড়াও, ঘাটের সিঁড়ির এপাশে ওপাশে স্ত্রী পুরুষ কিছু বসে আছে। সবাই তারা তীর্থযাত্রীদের কাছে কিছু পাবার প্রত্যাশায় হাত বাড়িয়ে নেই। দুই চার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দেখছি, মালা জপছে। কেউ বসে আছে চুপচাপ। জপে নেই ধ্যানেও নেই। এমন কি মনে হচ্ছে না, নদী প্রকৃতির মহিমা অবলোকন করছে। ঢলে যাওয়া বেলায় রৌদ্র পোহায়, নাকি কেবল ঘাটের টানেই ঘাটে এসে বসেছে, বুঝতে পারি না। শুয়েও আছে দু' একজন।

দক্ষিণের ভাঙা ঘাটের ওপরেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘর। ভাঙাচোরা ক্ষয়িষ্ণু ঘাট দেখে বোঝা যায়, ওটাই প্রাচীনতম। স্নানার্থীদের ভিড় নেই। গোটা কয়েক নৌকা দাঁড়িয়ে আছে, পুরনো ঘাটের গায়ে। গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে গঙ্গাযাত্রী কেউ নেই, দেখেই বোঝা যায়। অন্তর্জলি দুরস্ত। এমন পুণ্যের আশা আর কারো নেই, গঙ্গায় অর্ধেক শরীর ডুবিয়ে, বাকি অর্ধেক ডাঙায় রেখে তিলে-তিলে স্বর্গে যাবে। গঙ্গাযাত্রার ঘরগুলোতেও আজ আর আর সেই মুমূর্ষুরা নেই, যারা ঘর ছেড়ে ঘাটে এসে শেষ মুহূর্তের প্রহর গুনছে। সেই কারণেই গঙ্গাযাত্রীদের ঘরের আর এক নাম, 'মুমূর্ষুদের ঘর'। কালের বাতাস দিক বদল করেছে। পুণ্যের ওপর আস্থা থাকলেও, সহজ প্রাপ্তির রাস্তা ধরেছে সবাই। ঘরে শুয়ে সাঙ্গ কর ভবলীলা। কাঁধে চেপে চলে এসো একেবারে চিতার অঙ্গনে। গঙ্গার জল ছিটিয়ে দিলেই শান্তি।

এখন যারা ঘরে নেই, পারেও নেই, বসে আছে ঘাটের কিনারায়, তারা গঙ্গাযাত্রীর ঘরে বসে কেউ ধুনো জ্বালাচ্ছে। ব্যোম ব্যোম আওয়াজ দিচ্ছে। তাস পেটাচ্ছে যারা, তারা হতে পারে মালবাহী নৌকার মাঝি। ভবঘুরে ভিখিরিদের সঙ্গে, কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে কুকুর। পুরনো ঘাটের আর একটু দূরের দক্ষিণে, মুক্ত সরস্বতী পশ্চিমগামিনী। একটা নৌকা খেয়া পারাপার করছে। নদীর মাঝখানের চর থেকে এসে, ঘাটের ডান দিকে তার নোঙর।

এবার ভাবো, এই সেই কোনো এককালের বন্দর শহর। মুসলমান আমলের অনেক আগে থেকেই নাকি যার রমরমা। বিপ্রদাসের চোখে দেখা সমুদ্রগামী জাহাজের ভিড়। বিদেশী ভ্রাম্যমানদের চোখের বিস্ময়। মুঘল আমলের নগর। টোলে টোলে ছয়লাপ। সংস্কৃত শিক্ষার মস্ত কেন্দ্র। মুকুন্দরামের তো নাকি ত্রিবেণীর কোলাহলে কানে তালা লাগবারই অবস্থা হয়েছিল।

এই চিত্রেই ইতি না। পুণ্য এক সময়ে রক্তধারায় বহতা ছিল। মুক্ত

বেণীতে মাথা মুড়িয়ে, নারী পুরুষের প্রাণ বিসর্জন। নিদেন, এমনি জলে ডুবে মরতে না পারলে, নিজের গলা কেটে কুমিরের খাদ্য হবার ভাগ্যও নাকি অনেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। কেন না, আসল যাত্রা ও ফললাভ যে স্বর্গ! তারপরে তুমি যতো খুশি বলো না কেন, 'কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর।' কেউ থাকে যুক্তিতে। মুক্তিতে কেউ। তর্ক বৃথা। বিশ্বাসেই মিলে বস্তু।

অতঃপরেও দক্ষিণের গঙ্গাযাত্রীদের পোড়ো ঘরের দিকে তাকিয়ে, সেই নরনারীদের কথা ভুলতে পারছি না। যারা নিদান গুনে. মৃত্যুর অমোঘ যাত্রায় এসে ঠাঁই নিয়েছিল মুমূর্ষু গৃহে। কিন্তু কী বিপদের কথা। নির্ঘাৎ মরণও হাত ফসকে যায়। যমরাজার পরিহাস আর কাকে বলে। ঘর থেকে ডেকে এনে শুইয়ে রাখলো মরণ শয্যায়। অথচ মরণের আর দেখা নেই। যমরাজা পলাতক। তখন উপায়? একবার গঙ্গাযাত্রা করে তো আর ঘরে ফিরে যাওয়া যায় না। গৃহের অকল্যাণ। একবার এলে, ঘরে ফিরে যাবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ। ওদিকে বেপাত্তা যমের অরুচি শরীরে নতুন প্রাণের লক্ষণ। এর নামই কি যমের অরুচি? ভাঁটায় এসে জোয়ারের ভরা। যাকে বলে মরা গাঙে জোয়ার। কিন্তু যাবে কোথায়?

কেন, ওপারের শান্তিপুরে? সত্যি মিথ্যা জানি না। ঘাটে এসেও মৃত্যু যাদের ফাঁকি দিতো তারাই নাকি শান্তিপুরে যেতো। আর তাদের নিয়েই শান্তিপুর পল্লীর পত্তন। আমার কথা না। কেতাবের কথন। আজব কাণ্ড ভেবে গালে হাত দেবো না। সেই নরনারীদের কথা ভাবছি। ঘরে যারা ফিরতে পারেনি, ঘাটে যাদের গতি হয়নি, পুনর্জীবনটাকে তারা কী মন নিয়ে শুরু করেছিল।

মুক্তবেণীর সে-জীবনরহস্য আর জানবার উপায় নেই।

আমি আরও কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামলাম। স্নান সাঁতার কাপড় কাচা যে-রকম চলছে বেশি নিচে নেমে কাঁধের ঝোলা নামানো যাবে না। কারণ নিচের সিঁড়ি ভেজা। হারমোনিয়ামের বাজনা আর মন্দিরার তাল এখন আরও স্পষ্ট। কোথায় বাজছে তাও দেখতে পেলাম। কারণ, নিচের দিকে সিঁড়ির চওড়া পৈঠায় ভিড় করেছে একদল শ্রোতা। তাদের দেখেই নৌকাটি চোখে পড়ল। ঘাট থেকে কয়েক হাত দূরে একটি নৌকা নোঙর করে রয়েছে। খুব ছোটখাটো নৌকা না। বেশ বড় নৌকা। মাথার ওপর ছই কাপড় দিয়ে মোড়া। পালের মাস্তুল বেশ উঁচু। মাস্তুলের পাশেই আর একটি সরু বাঁশের দণ্ড। তার ডগায় উড়ছে লাল নিশান। লাল ত্রিকোণ নিশান। ধর্মের ধ্বজা, সন্দেহ নেই।

ছইয়ের বাইরে চওড়া পাটাতনের ওপর বিছানা পাতা। বিছানাই বলতে

হবে। ঘাটের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একটু দূরে হলেও বোঝা যায়. তোশকের ওপর গেরুয়া চাদর পাতা। এলোমেলো খান কয়েক বালিশ ছড়ানো. কম্বল রয়েছে একাধিক। ঢলে যাওয়া বেলার রোদ সেখানে। শয্যা দেখে, নৌকার অধিবাসীদের জাঁকজমক কিছুটা বোঝা যায়।

ঘাটের দিকে মুখ করে বিছানায় বসে যিনি হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন গায়ে তাঁর গেরুয়া চাদর। কোলের ওপর থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ঝালর দেওয়া মসৃণ কম্বল। মাথার ধূসর রঙের বড় বড় চুল পিঠের ওপর ছড়ানো। জট পড়েনি। বোধহয় স্নানের পরে আঁচড়ানো হয়নি। ধূসর গোঁফদাড়ি মুখে। খড়গনাসা না হলেও উচ্চনাসা বটে। চোখ দুটি টানা। বসে থাকলেও, শক্ত সমর্থ শরীর যে বেশ দীর্ঘ, অনুমান করা যায়। বয়স অনুমান করা কঠিন। মুখে তেমন রেখা ভাঁজ নেই। হাসি আছে। বাজাচ্ছেন তন্ময় হয়ে. কিন্তু খোলা চোখে তাকাচ্ছেন এদিকে ওদিকে। মাঝে মাঝে ভুরু নাচাচ্ছেন। চোখের তারা ঘোরাচ্ছেন। আর মন্দিরার তালে তালে একটু আধটু ঘাড় ঝাঁকাচ্ছেন। কপালে একটা লাল ফোঁটা। বাঁ হাতে লোহার বালা।

পাশে বসে মন্দিরা বাজাচ্ছে একটি নিরীহ গেরুয়াধারী। বয়স কম। মাথার চুল কালো ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো। মুখে গোঁফদাড়ি নেই। শরীরটি হৃষ্টপুষ্ট। কপালে লাল ফোঁটা আর হাতে লোহার বালাও আছে।

গেরুয়া এমন রঙ ধর্মের মত পথের ঠিকানা করা দায়। নিছক গেরুয়া বলাও মুশকিল। একটু যেন বা গাঢ়। কিন্তু নিশানের মতো লাল না। রক্তাম্বর হলে মহাশয়দের শাক্ত ভাবা যেতো। শাক্ত কী না, তা-ই বা কে বলতে পারে। লাল নিশানটা একটু ধন্দোর কারণ। দশনামী সম্প্রদায়ের সব আখড়াতেই ওরকম পতাকা দেখা যায়। এঁরা সেই সম্প্রদায়ের কী না, তা বোঝার উপায় নেই। শৈব হতে পারেন। বৈষ্ণব হতেও বাধা ছিল না। কিন্তু বৈষ্ণবের কপালে লাল ফোঁটা কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

শাক্ত হোন, শৈব হোন এঁদের অঙ্গ জুড়ে সাধক পরিচয়। বাঙালী না অবাঙালী, বোঝবার উপায় নেই। বাজনায় ভাষা বোঝা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই সন্ধান পাচ্ছি না। ছইয়ের মুখছাটের কাছে রীতিমতো দরজা বসানো। তার শিকল আছে, জোড়া কড়া আছে। নিশ্চয় ভিতর থেকেও বন্ধ করার ব্যবস্থা আছে। সামনের দিকে এই চিত্র। এখন জোয়ার চলছে। নৌকার পিছন দিক উত্তরে। সেদিকে পাটাতনের ওপর কাঁথা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে কয়েকজন। কতো জন তা বোঝাবার উপায় নেই। সম্ভবত তারা মাঝি। শুয়েছে গলুই ঘেঁষে। আরও অনেকখানি জায়গা খোলা। সেই খোলা জায়গায় রয়েছে কিছু পিতল কাঁসার নানা পাত্র। আর একজন দাঁড়িয়ে আছে উত্তরে পিছন ফিরে ছইয়ের গায়ে পিঠ দিয়ে।

ঐ আর একজনেই, বাজনার থেকে ঠেক বেশি। সে পিছন ফিরে আছে বটে। কিন্তু উত্তরের অল্প বাতাসে, তার নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে। খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। কোমরের শাড়ির বন্ধনী আর লাল জামার ফাঁকে, পিঠের একটু ফরসা ফালি উঁকি দিচ্ছে। একটি হাত ছইয়ের ওপরে। আর একটি হাত সামনে, আমার চোখের আড়ালে। মুখ দেখতে পাচ্ছি না। ছইয়ের ওপর রাখা ফরসা নিটোল হাত আর ডানা। হাতে একটি লোহার বালা। গেরুয়া বা লাল, যাই হোক, এমন বস্ত্রাবৃত সাধকদের সঙ্গে, রমণীর অঙ্গে নীল শাড়ি লাল জামা কেন। সাধুর সঙ্গে গৃহস্থ রমণী। পরিচয় কি, পরিচারিকা? শাড়ি জামা দেখে ঠিক তেমনটি মনে হয় না। তা ছাড়া, শাড়ি পরার ধরনটা আদৌ আটপৌরে না। পিছন থেকে হলেও, বাঁ কাঁধে আঁচলের বহর আর ডান কাঁধের জামার গলার ছাটে কাটে, কেমন একটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগে রয়েছে। উঁচু ছইয়ের ওপরে কাঁধ দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ শরীর সন্দেহ নেই।

সব কিছুর ওপরে মুখ। তা যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন অনুমানে কাজ নেই। তবু সাধক সাধু যাই হোক, তাঁদের সঙ্গে এই রমণীকে পরিচারিকা ভাবতে পারছি না। সেবিকা? হতে পারে। সেবিকাদের তো কোনো সাধিকা বেশের দরকার নেই। অন্তত এটাই ধারণা।

কিন্তু এতো কৌতুহলই বা কিসের। মুক্তবেণীর ঘাটের একটি ছবি। সাধক বাজান হারমোনিয়াম, মনোরম বাজনা। নৌকার সর্বাঙ্গেই বিলাসের শ্রী। আধুনিক ছাঁদে শাড়ি জামা পরা এক রমণী। বড় ছইয়ের ভেতরে আর কেউ আছে কী না, ছইয়ের মুখছাটের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে না। নৌকায় এসেছেন যখন, নিশ্চয় দূরান্তরের যাত্রী। নোঙর তুলে যখন খুশি ভেসে যাবে। আমার কৌতুহল নৌকার পিছু ধাওয়া করবে না। মুক্তবেণীর একটা ছবি, আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। অতএব, জামা কাপড় খুলে এবার জলে নামি।

কাঁধের থেকে ঝোলাটা নামিয়েই, থমকে যেতে হলো। ঝোলা তো নামাচ্ছি। কব্জির ঘড়ি খুলতে হবে। পকেটে পাথেয় বলতে, যা হোক কিছু কিঞ্চিৎ আছে। মুখের কথায় তো এ সংসার রা কাড়ে না। এখনই আমার মহাপ্রাণী ক্ষুধায় কাতর। অন্তত সেই কারণেও, পাথেয় বস্তুটি অমূল্য সম্পদ। সিগারেট দেশলাইয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সব ঝোলার মধ্যে ঢুকিয়ে জলে নামবো কোন ভরসায়। তা ছাড়া ঝোলার মধ্যেও রয়েছে দু' একখানি বদলাবার পোশাক ছাড়া নিত্য ব্যবহারের টুকিটাকি বস্তু।

থমকে যেতে চোখ পড়লো নৌকার সাধক-বাজনদারের দিকে। সেখানে আমার সংকটের মোচন মুক্তি ছিল না। কিন্তু ধূসর চুলে আর গোঁফদাড়িতে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসলেন। চোখের তারা ঘুরিয়ে ভুরু নাচালেন। অবাক হলাম। কেননা, তাঁর টানা চোখের ভাবের দৃষ্টি যেন আমার দিকেই। কিংবা

তুল দেখছি। আবার মন্দিরা-বাদকের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু ইশারা করলেন। সেই বাবাজীও আমার দিকে হেসে তাকালেন।

'রাখুন, এখানেই সব রাখুন।' পিছনেই গলার স্বর শোনা গেল, 'আমি আছি।'

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, বেজি দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট টানছে। হেসে আবার বললো, 'আমি তো সেই জন্যই এলাম, আপনার ব্যাগ পাহারা দেবার জন্যে। এখেনে কোন শালাকে বিশ্বাস নেই।'

এখন মনে পড়লো, রুকি তাকে 'সঙ্গে যাও' বলেছিল। শক্ত শরীর, বুক খোলা একটা জামার নিচে লুঙ্গি পরা বেজি। মাথার চুল রুক্ষ। চোখের কোল বসা। ও কোন পাড়া থেকে এসেছে, দেখেছি। রুকিদের পাড়ার লোক। সম্পর্কটা কী জানি না। ধবে নিতে পারি, রুকিদের লোক। সেটাই স্বস্তি আর সান্ত্বনা। বিশ্বাস করা না করার প্রশ্ন ওঠে না। এখন বিশ্বাস করাটাই একমাত্র উপায়।

আমি হাতের ঘড়ি খুললেই বেজি হাত বাড়িয়ে দিল, 'দিন, আমার কাছে দিন।

দিয়ে দিলাম। কেবল হাতের ঘড়ি না। পকেটে যা ছিল, সবই তার হাতে তুলে দিলাম। সে সবই নিজের জামার পকেটে ঢুকিয়ে নিল। গায়ের শালটাও নিল হাত বাড়িয়ে। বললো, 'বলে দিয়েছে, আপনি জামা কাপড় ভিজিয়ে চান করবেন। শুকোবার ব্যবস্থা আছে।'

'কোথায় শুকোবো? এই ঘাটে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বেজি হেসে বললো, 'না না, জায়গা আছে। আপনি ডুব দিয়ে আসুন না।'

ব্যবস্থার কথা আগেই শুনেছি। এখন জায়গার কথাও শুনছি। কিন্তু ওসব নিয়ে আর ভাববো না। জামা গেঞ্জি খুলে, কাপড় গুটিয়ে, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামলাম। আবার চোখ পড়লো সাধক বাজনদারের দিকে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ঘাড় ঝাঁকাচ্ছেন। বাঁ দিকের ঘাটের পৈঠায় বসা শ্রোতার দল, মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে দেখলো। বোঝা গেল, সাধক-মহাশয় আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। ঘাড় ঝাঁকানির সংকেতটা বোঝা দায়। নজরই বা কেন?

জলের তলে দুই সিঁড়ি নেমে, আগে জামা গেঞ্জি চুবিয়ে নিলাম। কাচবার কোনো ব্যাপার নেই। কোনোরকমে নিঙড়ে, ছুঁড়ে দিলাম শুকনো সিঁড়ির ওপরে। বেজির স্বর ভেসে এলো, 'ঠিক আছে। এবার ডুব দিয়ে উঠে আসুন।।'

আরও কয়েক ধাপ নেমে জলে ডুব দিলাম। ডুবের আগে শীতের প্রথম শিহরণটা গায়ে একবার সিরসিরিয়ে উঠেছিল। ডুব দিয়ে ওঠার পরেই,

শরীরটা জুড়িয়ে গেল। থামাতে পারলাম না। পর পর কয়েকটা ডুব দিয়ে, গভীর আরামে বুক চাপা নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। পরনের ধুতি দিয়েই গায়ে কিঞ্চিৎ বুলিয়ে নিলাম। তার মধ্যেই সাধক বাজনদারের দিকে একবার চোখ পড়লো। এখন আরও কাছাকাছি। হাত বাড়িয়ে দুবার চাড় দিলেই, সাঁতরে গিয়ে নৌকা ধরা যায়। সাধক হঠাৎ বাঁ হাত তুলে হাসলেন। চোখের তারা ঘুরে গেল। তাল পড়লো সমে। ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিলেন।

এমন বাজানোকে কেবল বাজানো বলে না। সবই দেখছেন, তালে আছেন। আসলে সুরের গভীরে যেন ডুবে আছেন। আমি কোঁচার কাপড় খুলে, সিঁড়িতে উঠে, জামা গেঞ্জি তুলে নিলাম। ওপরে এসে দেখি বেজি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি কোঁচার কাপড় দিয়ে গা মাথা মুছে, ঝোলার ভিতর থেকে বের করলাম অবশিষ্ট আর এক প্রস্থ জামাকাপড়। বড় গামছাটাও টেনে বের করলাম। কে আর দেখছে। গামছা জড়িয়ে আগে ভেজা ধুতি ছাড়লাম। দ্রুতহাতে পরে নিলাম ধোয়া শুকনো জামাকাপড়। বেজি শালটা বাড়িয়ে দিলে, 'নিন, এটাও আগে জড়িয়ে নিন।'

হ্যাঁ, শীতটা একেবারে গা ছাড়া হতে চাইছে না। ঢলে-পড়া বেলার রোদে আদৌ ঝাঁজ নেই। শালটা জড়িয়ে নিয়ে, ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকালাম। হাতড়ে বের করলাম করলাম চিরুনি। কোনরকমে আধভেজা মাথার চুল একটু সাব্যস্ত করে নেওয়া গেল। বেজি সব ধাতে হাত তুলে দিল। ঘড়ি, পয়সাকড়ি, সিগারেট দেশলাই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে, ভেজা জামাকাপড়-গুলো তুলতে যাবো। তার আগেই, কয়েক ধাপ ওপর থেকে অন্য স্বরে শোনা গেল, 'থাক, ওগুলো আর আপনাকে নিতে হবে না, বেজিই নেবে।'

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি বংকা। তার পাশে লম্বা রোগা কালো চুল আছে। সেই ভরতি টাক না বলে, বলা উচিত, সারা মাথায় কিছু গোনাগুনতি কালো চুল আছে। সেই চুলের মাঝখানে একটি সিঁথির আভাস। গোঁফদাড়ি কামানো লম্বা মুখ, সরু চিবুক ঝুলে পড়েছে প্রায় গলা ছাড়িয়ে। পাতলা ঠোঁট দুটি টেপা। গালে লম্বা ভাঁজ। মুখের সঙ্গে মানানসই লম্বা নাকের পাটা আর ছিদ্রদ্বয় বেশ মোটা আর বড়। ভুরু জোড়ায় চুল প্রায় নেই। চোখ দুটি বেশ বড়। কিন্তু আপাতত চোখের পাতা কোঁচকানো। দৃষ্টিতে বিরক্তি বা রাগ ঠিক বুঝতে পারছি না। অথবা তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসা আর সন্দেহের দৃষ্টি আমার দিকেই। কপালে সাদা ফোঁটা। গায়ে একটা ছাই রঙের চাদর জড়ানো। পরনে পাড়হীন গরদের ধুতিটি পুরনো বিবর্ণ। কণ্পুরুষের ব্যবহৃত, সে-হিসাব সম্ভব না। তবে গরদ বলে এখনও চেনা যায়। কৃষ্ণকান্ত মহাশয়ের কৃষ্ণ পদযুগল খালি। বয়স অনুমান, অনধিক ষাট।

কিন্তু বংকার পাশে দাঁড়িয়ে তিনি আমার দিকে ঐরকম চোখে তাকিয়ে দেখছেন কেন। একমাত্র অপরাধীর দিকেই লোকে ঐরকম করে তাকায়। বেজি

নিচু হয়ে আমার ভেজা জামাকাপড় তুলতে যাচ্ছিল। তার আগেই, কৃষ্ণকান্ত মহাশয়ের মোটা কাঁসরের তীক্ষ্ণ স্বর যেন ঝাঁজিয়ে উঠলো, 'থাক, থাক, তুই আর ওসবে হাত দিসনে।'

বেজি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকালো। কৃষ্ণকান্ত মহাশয় বংকাকে কিছু বললেন। বংকা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বেজিকে ডাকলো, 'তুই আর কিছু ছুঁসনে, চলে আয়।'

'শালা বামুনাদের পিটপিটানি দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।' বেজি নিচু স্বরে বললো, 'তায় আবার ছুঁচিবেয়ে গোরা চক্কোত্তিকে ডেকে এনেছে। যা খুশি কর গে শালারা।' সে আমার কাছ থেকে সরে গেল।

আমি বেজির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গোরা চক্কোত্তি কে?'

'ঐ যে শালা, বংকার সঙ্গে এসেছে।' বেজি নিচু স্বরেই বললো।

গোরা চক্কোত্তি! তার মানে গোরাচাঁদ, নাকি গৌরাঙ্গসুন্দর? আর আমি কী না অবলীলায় কৃষ্ণকান্ত ভাবছি। রূপের ভেদে নাম, কোনোকালেই দেখতে পারিনি। চোখের মাথা খাই। বালাই বালাই। কৃষ্ণে আর খ্রীষ্টে কিছু তফাত নাইরে ভাই। যেঁহ গোরা, তেঁহ কৃষ্ণ। মনে মনে এইরূপ ভাবো। তা হলেই চক্ষু মনের বিপদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। কিন্তু জানা নেই, চেনা নেই, গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের আমার প্রতি এমন রুষ্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টি কেন।

গোরা চক্কোত্তি ধাপে ধাপে নেমে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার এক ধাপ ওপরে। আমার ভেজা জামাকাপড়গুলোর দিকে দেখলেন। যেন নর্দমার ময়লা দেখছেন। তারপরে সন্দিগ্ধ কঠিন দৃষ্টি রাখলেন আমার মুখের দিকে। মোটা কাঁসরের স্বরে ধ্বনিত জিজ্ঞাসা 'নাম কী?'

ঠোঁটের কূলে আমার পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'আপনার প্রয়োজন?' কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। অথচ কৃষ্ণকান্ত—থুড়ি, গোরা চক্কোত্তিমশায়ের স্বরে কেমন একটা হুকুমের দাপট। অবেলায় স্নান করে, শরীর মনে একটা স্ফূর্তি বোধ করছি। অকারণ ভেজালে তা নষ্ট করতে চাই না। নাম বললাম।

শুনেই চক্কোত্তিমশাইয়ের গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। পাতলা ঠোঁট-জোড়া ছুঁচলো হয়ে, কঠিন মুখে ধিক্কারের বিকৃতি ফুটলো। লোমহীন ভ্রূকুটি চোখে দুর্বাসার ক্রোধ। প্রথমেই উচ্চারণ করলেন, 'কায়েত?' তারপরেই পিছন ফিরে হাঁক। বংকা, এই বংকা।'

'হ্যাঁ কাকাবাবু।' বংকা দুই লাফে অনেকগুলো সিঁড়ির ধাপ নেমে এলো।

গোরা চক্কোত্তির চোয়াল কাঁপছে। যেন শক্ত চিবুক চিবোচ্ছেন। বংকার দিকে ফিরে বললেন, 'তবে যে বললি, এ বামুনের ছেলে? এ তো কায়েত? তুই কি আমাকে খড়ুইপোড়া বামুন ভেবেছিস?'

বংকার চেহারা স্বাস্থ্য ভালো। চোখের কোলের কালিমা বাদ দিলে, মুখখানিও সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত। বিব্রত হেসে বললো, 'বামুনের ছেলে বলিনি তো কাকাবাবু। বলেছিলাম, বামুনের ছেলে বলেই মনে হল।'

'মনে হলেই হল?' গোরা চক্কোত্তির মোটা কাঁসরে ঝাঁজর বাজলো, 'এখন একে নিয়ে আমি কী করব? বাড়িতেই বা কী বলব?'

বংকা অমায়িক হেসে বললো, 'আহা, ভদ্দরলোকের ছেলে তো। বামুন না হোক, কায়েত। আপনাদের তো অনেক কায়েত যজমানও আছে।'

গোরা চক্কোত্তি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিলেন না। চোয়াল তাঁর নড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে ঠোঁট। তিনি খর চোখে আমার আপাদমস্তক একবার দেখলেন। ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু মেজাজটা খারাপ হতে আরম্ভ করেছে। কে এই গোরা চক্কোত্তি, কেনই বা তাঁর আগমন, কী কারণেই বা জাতপাতের লেবু চটকানি। আমি বংকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

বংকা হেসে চোখ টিপে ইশারা করলো, 'ব্যাপার কিছুই নয়। কাকাবাবুদের আবার সব দিক বজায় রেখে চলতে হয় তো।'

বংকার ইশারায় একটা ইঙ্গিত আছে। ইঙ্গিতটা কাকাবাবুকে শান্ত করা। তা করুক। তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? অতএব, আমার রাগে বিরক্তিতেও কাজ নেই। হেসে বললাম, 'আমার কাজ তো ফুরিয়েছে। এবার আমি চলি।'

'এত কাণ্ডের পর চলে যাবেন কী!' বংকা অবাক চোখে তাকালো, 'তাই কখনো হয়? ওরা আমাকে যা তা বলবে। চোখের ইশারায় শ্মশানের দিকে দেখালো।

'যেন চলি বললেই হয়ে গেল।' গোরা চক্কোত্তির মোটা কাঁসরে বক্রোক্তির ঝাঁজ। হাত দিয়ে আমার ভেজা জামাকাপড়গুলো দেখিয়ে হুকুম করলেন, 'নাও ওগুলো নিংড়ে রাখ। এদিকে ধোয়া জামাকাপড় পরে ফিটফাট তো হয়েছ, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়েছ। ওগুলোকে শুদ্ধ করতে হবে না? যাও, নিচে গিয়ে, গায়ে মাথায় ঝোলায় গঙ্গার জল ছিটিয়ে এস।'

হুকুমের নৌকা কি ডাঙায় চলে নাকি? এত হুকুম হুমকানি কিসের? মানতেই বা যাচ্ছি কেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'বোঝ?' গোরা চক্কোত্তিমশাই বংকার দিকে অবাক চোখে তাকালেন। তারপরেই আমাকে ঝেঁজে বললেন, 'মড়া যখন কাঁধে নিয়েছিলে, তখন ব্যাগটা তো গলায় ছিল। আর এই যে সব জামা-কাপড় পরেছ, এসব তো ব্যাগেই ছিল। ধোয়া না হয় না হল, গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে না? আবার জিজ্ঞেস করছ, কেন?'

মারবেন নাকি? চোটপাটের বহর দেখে, সেইরকমই মনে হচ্ছে। আমারও বাঁকা ঘাড় কেমন শক্ত হয়ে উঠলো। মড়া বয়েছি আমি। শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার

আমার। একটা ঠেক খেয়েছি বটে। একটু পরেই পথের টানে কোথায় চলে যাবো। তখন আমার জামা-কাপড়ে মড়া বহনের কথা লেখা থাকবে না। তবে কেন ওঁর হুকুম মানতে যাবো। আমি তো অশুদ্ধ বোধ করছি না। বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই বংকা হেসে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কাকাবাবু ঠিকই বলেছেন। মড়ার ছোঁয়া সব শুদ্ধ করে নিতে হয়। যান দাদা, একটু জলের ছিটে দিয়ে আসুন ভাই।'

আমি বংকার দিকে তাকালাম। আবার তার চোখে চোখটেপা ইশারা। গোরা চক্কোত্তি হাতে তালি মেরে ঝাঁজলেন, 'আমি তো তবু গঙ্গা জলের ছিটে দিতে বলেছি। অন্য কেউ হলে, আবার জলে ডুবিয়ে নিয়ে আসতো।'

হাততালিটা বোধহয় চক্কোত্তিমশাইয়ের ঔদার্যের আত্মশ্লাঘা। তিনি আমাকে জলের ছিটাতেই নিষ্কৃতি দিয়েছেন। বংকা ঘন ঘন ঘাড় ঝেঁকে আমাকে ইশারা দিয়েই চলেছে। কেন, তাও বুঝতে পারি না। যদি নিয়ম-নীতির কথাই হয়, এত ঝাঁজ চোটপাট হুকুমদারি কেন? আমাকে শুদ্ধ করার এত রোষরুষ্ট ক্ষ্যাপা দাবীই বা তাঁর কিসের।

জিজ্ঞাসাগুলো মনের মধ্যেই দাপাদাপি করতে লাগলো। বংকার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছি না। অথচ অচেনা লোকের অকারণ হুমকি মেনে নিতে পারছি না। কেমন একটা অপমান বোধ করছি। বংকা বলে উঠলো, 'কাকাবাবু, তা হলে আমিই গঙ্গাজল নিয়ে আসি?'

'তুই আনবি গঙ্গাজল?' গোরা চক্কোত্তির স্বরে দ্বিগুণ ঝাঁজ, 'তুই তো এমনিতেই অশুদ্ধ। ওদেরও ছুঁতে বাকি রাখিসনি। তোর জলের ছিটেয় কখনো শুদ্ধ হয়? কেন, ও যাবে না?' তিনি আমার দিকে তাকালেন। একরাশ রেখায় এখন, মুখটা ভাঙাচোরা পাথরের মতো শক্ত। চোয়াল নড়েই চলেছে।

বংকার মুখের হাসিটা কেমন ঝিমিয়ে এসেছে। ইশারা ইঙ্গিত আর করছে না। আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। গোরা চক্কোত্তি মশাই রীতিমতো খেঁকিয়ে উঠলেন, 'দুত্তোর নিকুচি করেছে সব লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলের। গুরুজনের কথা মানতে চায় না।' বলতে বলতেই তরতরিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

আবার একটা কী ঘটতে চলেছে। আমার বাঁকা ঘাড় নরম হয়ে এলো। বংকার দিকে তাকাবার অবকাশ পেলাম না। আমি দেখছি গোরা চক্কোত্তির দিকে। দেখছি, তিনি নিচে নেমে একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। নৌকার সাধকবাদকের দিকে তাকিয়ে কী যেন বললেন। সাধকবাদক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাসছেন। একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। নৌকার পিছনে ছইয়ের পিঠে হেলান দেওয়া রমণীর মুখও এখন এদিকে। ফরসা মুখে রোদের ঝলক। মুখের দুপাশে এলানো খোলা চুল। কালো চোখে, পুষ্ট

ঠোঁটে কৌতুকের ঝিলিক। সাধকবাদকের বাজনা গিয়েছে থেমে। তিনিও যেন চক্কোত্তিমশাইকে কী বললেন। জবাবে চক্কোত্তিমশাই কিছু বলে ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিলেন। তারপরে নীচু হয়ে দু' হাতের গণ্ডূষ ভরে জল নিলেন। উঠে এলেন তাড়াতাড়ি। আর আমার গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিলেন। কাঁধের ব্যাগটা বাদ দিলেন না শুধু, তার মুখ ফাঁক করে ভিতরেও দুফোঁটা ছিটিয়ে দিলেন। কাঁসরে ঝাঁজর বাজলো, 'দু ফোঁটা জল ছিটোতে এত বায়নাক্কা। শাস্ত্র না মানতে পার, গুরুজনের কথা শুনতে নেই? চলো, এবার চলো।'

'হ্যাঁ দাদা, এবার যান।' বংকা বললো।

ক্রোধ চণ্ডাল বলেই জানতাম। কিন্তু সে কর্মেও সজাগ, এমন দেখিনি। আমি হতবুদ্ধি হয়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের কাণ্ড দেখছিলাম। গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই, কথাটা মর্মে পেঁছুবার আগেই, হঠাৎ তাড়া খেয়ে আবার থমকে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবো?'

'যেখানে যাবার, সেখানেই যাবে। আবার কোথায় যাবে?' চক্কোত্তিমশাই আর যাই বলুন করুন, চোটেপাটেই আছেন। 'তোল তোল, ভেজা জামা-কাপড়গুলো তোল।'

বংকাও তাড়া দিল, 'হ্যাঁ, তুলুন দাদা, তুলুন। ছোঁবার উপায় থাকলে আমি নিজেই নিয়ে যেতাম।'

সব কথাই বোঝা গেল। কিন্তু যাবো কোথায়? তাও আবার গোরা চক্কোত্তির সঙ্গে। এবার প্রায় ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে. বলুন তো?'

'যমের বাড়ি, বুঝেছ?' চক্কোত্তিমশাই ঠোঁট বাঁকিয়ে, দু' হাত ঝাড়া দিলেন। মুখের ভিতর জিভের গোত্তায় চোয়াল নড়েই চলেছে। তার আসল কারণটা আগেই বুঝেছি। মশাইয়ের দাঁত নেই। বললেন, 'ব্যাটাছেলে, ভদ্দরলোকের ছেলে, আমার সঙ্গে যাবে, তার আবার এত কোথায়, কী বৃত্তান্ত কী দরকার? ঘাটে দাঁড়িয়ে তো অনেক র‍্যালা হল আর কেন?'

ব্যাটাছেলে এবং ভদ্দরলোকের ছেলে। যেতে হবে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে। তারপরেও আবার জিজ্ঞাসা কিসের? বলেই তো দিয়েছেন, যেতে হবে যমের বাড়ি। আর এও সত্যি, ঘাটে অনেক র‍্যালা হয়েছে। সেই র‍্যালা দেখেছেও অনেকে। না জেনে, এক বারবণিতার শবের চালি কাঁধে নিয়েছিলাম। সেটাকে ভাগ্য বলে মেনেছিলাম। কাঁধের চালি নামলেও কাঁধ এখনও খালি হয়নি। কোন সূত্রে গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের আগমন, জানি না। এখন তিনিই আমার কাঁধে। শব নন, হাঁকে ডাকে চোটেপাটে অতি জীবন্ত মানুষ। কিন্তু মানুষটাকে ঠিক চিনেছি, তা বলা যাবে না। গুরুজনের প্রতি অবাধ্য ছেলেকে নিজে গঙ্গাজল ছিটিয়ে কেমন একটা ধন্দ লাগিয়ে দিয়েছেন। অতএব, এটাও ভাগ্য বলে মানো। চলো যমের বাড়ি।

ভেজা জামাকাপড় তুলে নিলাম হাতে। গোরা চক্কোত্তিমশাই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছেন, আমি একবার বংকার দিকে তাকালাম। সে হাতের ইশারা করে বললো, 'চলে যান।'

যে-রাস্তা দিয়ে চালি কাঁধে এসেছিলাম, চক্কোত্তিমশাই সেই পথেই চলেছেন। খানিকটা গিয়ে, মন্দিরের পাশ দিয়ে ডাইনে। তাঁর লম্বা পায়ের সঙ্গে তাল রাখা কঠিন। তবু পিছনে পিছনে চলেছি। তারপরে বাঁয়ে ঢুকে, কোথা দিয়ে কোথায়, ডাইনে বাঁয়ে করছেন, আমার জানার কথা না। সরু পথ, অলিগলি, পুরনো আর নতুন পাকা বাড়ি কাঁচা বাড়ির ঘিঞ্জি এলাকা পেরিয়ে চলে এলাম প্রায় যেন নিরিবিলি গ্রামের মধ্যে। আসলে গ্রাম না। গাছপালা, পোড়ো জমি, পুকুর, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল। তারই ফাঁকে ফাঁকে পুরনো কোঠা বাড়ি। নতুন ছোটখাটো পাকা বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল, মাটির ঘরও চোখে পড়ে। পোড়ো জমিতে গৃহস্থের গরু বাঁধা। ছাগল চরছে এখানে ওখানে। তার মধ্যেই দু একটি বাগান, ছোটখাটো পুকুর। দেখলে মনে হয় পাড়াটা প্রাচীন।

একটা পুকুরের ধার দিয়ে পোড়ো জমি পেরিয়ে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়ালেন। সামনে একটি পুরনো একতলা বাড়ি। সাবেক কালের গজাল পোঁতা দেউড়িটা খোলা। ভিতরের কাঁচা উঠোনের একাংশ চোখে পড়ে। দক্ষিণ মুখো বাড়িটা পাঁচিলের আড়ালে।

চক্কোত্তিমশাই পিছন ফিরে একবার আমার দিকে দেখলেন। তারপর বাঁয়ে ধুরলেন। বাঁদিকে একটা ঘর চোখে পড়েছিল আগেই। ইঁটের দেওয়াল, মাথায় টালি। সামনের বাঁধানো রকে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। চক্কোত্তি-মশাইকে অনুসরণ করে এগিয়ে দেখি ঘরটা একটা মুদী দোকান। পোড়োর পাশ দিয়েই ইঁট বাঁধানো রাস্তা। দোকানে আসতে হলে সেই রাস্তা দিয়েই আসতে হয়।

দোকানের মাঝখানে চৌকি পাতা। সামনে কিছু বড় বড় টিনের কৌটা, দু চারটে বেতের চুপড়ি, খানকয়েক চটের বস্তা এক পাশে, দেওয়ালের কাঠের থাকে রংবেরঙের কিছু মনোহারি দ্রব্যও আছে আর আছে কিছু কাঁচের বৈয়াম। বাকি ঘরটা প্রায় ফাঁকা। মালপত্রে ঠাসা জমাট দোকান না। বরং কেমন একটা দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা। খরিদ্দারের মধ্যে একটি ফ্রক পরা বালিকা, এক বৃদ্ধা। আর একজন রোগা খাটো মধ্যবয়স্ক গায়ে কাঁথা জড়ানো লোক। একটা কুকুর শুয়ে ছিল রকের এক কোণে। সে একবার চোখ মেলে আমাদের দেখলো। আবার চোখ বুজলো।

দোকানের গদীতে যিনি আসীন, তাঁর মাথায় ঘন কালো চুল না থাকলে, চক্কোত্তিমশাইয়ের যমজ ভাই মনে হতো। তা ছাড়া, গায়ে চাদর মহাজনের

দাঁতে কামড়ে ধরা ছিল জ্বলন্ত বিঁড়ি। চক্কোত্তিমশাইকে দেখামাত্র বিড়ি নামিয়ে হাতের আড়াল করলেন। তাকালেন আমার দিকে।

'এস।' চক্কোত্তিমশাই আমাকে ডাক দিয়ে রকে উঠলেন।

এটাই যমের বাড়ি কী না, জানি না। কিন্তু জিজ্ঞাসা মানেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। সেটা বুঝে নিয়েছি। ওতে জলাঞ্জলি। আমি রকে উঠলাম। চক্কোত্তিমশাইয়ের পিছনে পিছনে দোকানে ঢুকবো কী না ভাবছি। তিনি নিজেই পিছু ফিরে ডাকলেন, 'কী হল ? দাঁড়ালে কেন ?'

কোনো জবাব না দিয়ে ঢুকলাম। দোকানের একটা পাশ ফাঁকা। দেওয়াল ঘেঁষে একটা পুরনো নড়বড়ে বেঞ্চি পাতা। চোখে পড়লো, পিছন দিকে একটা পাল্লা-ভেজানো দরজা। চক্কোত্তিমশাই বেঞ্চিটা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে বস। আমি আসছি।' দরজার দিকে দু পা গিয়ে, গলায় একটা অদ্ভুত শব্দ করে আবার ফিরে দাঁড়ালেন। মুখের ভাঁজে খাঁজে অসীম বিরক্তি। দৃষ্টি আমার হাতের ভেজা জামাকাপড়ে। মোটা কাঁসরের আওয়াজে ঝাঁজ কিঞ্চিৎ কম, 'সেই ঘাটে থাকতে বলেছি, জামাকাপড়গুলো নিংড়ে নাও, কিন্তু কথা শুনতে ইচ্ছে করে না। এরপরে এগুলো শুকোবে কখন ?'

আমি তাড়াতাড়ি রকের দিকে পা বাড়াবার উদ্যোগ করলাম, 'এখুনি নিংড়ে দিচ্ছি।'

'আর থাক।' চক্কোত্তিমশাই বলতে গেলে আমার হাত থেকে ভেজা জামা-কাপড়গুলো ছিনিয়ে নিলেন। ফিরে দরজার ভিতরে যেতে যেতে বললেন, 'ওখানে বস।' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এক পলকের দেখা। মনে হলো, দরজার ভিতরে লম্বা একটা ঘরের মেঝে। লোকজন কেউ নেই। আমি বেঞ্চিতে বসবার আগে একবার গদীতে আসীন মহাজনের দিকে তাকালাম। তিনিও তাকিয়ে ছিলেন। চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। হাতের আড়ালে রাখা পোড়া বিড়িটি আবার দাঁতে কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন। তারপরে, প্রায় সেই মোটা কাঁসরের গম্ভীর ঝংকার, 'কী হল রে কুসি, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? তোর চিঁড়ে গুড় তো দিয়ে দিইচি।'

ফ্রক পরা বালিকা বললো, 'কাপড় কাচা সাবান দেবে না ?'

'অহ্, কাপড় কাচা সাবান চাইলি, না ?' মহাজন ডানদিকে ঝুঁকে একটা বড় টিনের মধ্যে হাত গলালেন। বের করলেন ছোটখাটো একখানি বাতাবী লেবুর মতো সাবান। হাত বাড়িয়ে কুসির দিকে দিলেন।

কুসির বাঁ হাতে ঠোঙা। ডান হাতে সাবান নিয়ে রক থেকে নেমে গেল। মহাজন একখানি লাল খেরোর খাতা তুলে নিয়ে বললেন, 'কুসি, তোর বাবাকে আজকালের মধ্যে দেখা করতে বলিস।'

কুসি তখন পোড়োয়। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'আচ্ছা।'

মহাজন হাতের কাছে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কিছু লিখতে লাগলেন। আর ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করলেন। লেখা হয়ে গেলে, দাঁতে কামড়ে ধরা বিড়িতে ঠোঁট টিপে টানলেন। নিভে গিয়েছে। বিড়িটা হাতে নিয়ে কালো রোগা লোকটির দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, অই যা বলছিলাম, বুঝলি গোবরা, বামুনের দোকান বটে, বামুনের গরু তো নয়, বাঁট টিপলেই দুধ বেরোবে? সাত ছটাক তেলের দাম বাকি। আর এক ছটাকও ধারে দিতে পারব না।'

'বামুনের গরু কি আর সেই গরু আছে দাদাঠাকুর?' বৃদ্ধা হাসলো, 'গরু সব সমান। যেমন খাওয়াবে, তেমনি দেবে।'

মহাজনের দাঁত বেরিয়ে পড়লো। হাস্য না দন্তপেষণ, 'তবু জানবে, বামুনের গরু হল বামুনের গরু। সব গরু এক হলেই হল?'

দরিদ্র বৃদ্ধাটির গায়ে ময়লা একটা থান। ধূসর চুল মাথায় ঘোমটা। হেসে বললো, 'বুইচি দাদাঠাকুর, তুমি কামধেনুর কথা বলচ। তোমাদের গরু হল কামধেনু।' বলতে বলতে ফোগলা বুড়ির খিক্ খিক্ হাসি আর থামে না।

'খুব কথা শিখেছ, না?' মহাজন খ্যান খ্যান করে বাজলেন, 'মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করো না। আমাকে কামধেনু বোঝাতে এসেছ?'

বুড়ি হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো, 'তোমাকে আমি কি শেখাব গো? আমাদের গরু অবোলা জীব, তোমাদের গরু কামধেনু। বাঁট টিপলেই দুধ।'

'তুমি যাবে, না বাচলামো করবে?' মহাজন কাঁসরে ঝাঁজরে দোকান কাঁপিয়ে, প্রায় উঠে দাঁড়াবার উদ্যোগ করলেন, 'চটকলে ছেলের কাজ পাকা হয়েছে বলে ধরাকে সরা দেখছ?'

আমি কেবল অবাক হচ্ছিলাম না। বৃদ্ধার হাসি যেন আমার ভিতরেও চুঁইয়ে ঢুকছে। অনেক সাহসী বৃদ্ধা দেখেছি। কিন্তু এমন রসিকা দেখি নি। তারপরেও বলে কী না, 'এ বয়সে আর কী বাচলামো করব দাদাঠাকুর। তুমি বামুনের গরুর কথা বললে, তাই বললাম। তা, আমার ডাল মশলা দেবে তো।'

'না, দেব না।' মহাজন হেঁকে হাত ঝাড়লেন, 'অনেক দিইচি, আগের টাকা শোধ কর, তারপরে দেখা যাবে। বুড়ি হয়ে মরতে চলল, এখনো মস্করা গেল না।'

বৃদ্ধার হাসিটি তবু অটুট, 'মস্করা করিনি ঠাকুর। পা তো বাড়িয়ে আছি, যমে নেয় না যে। তা, মাল দেবে না তা'লে?'

'না, দেব না। আগের দেনা শোধ কর। অনেক পাওনা হয়েছে।' মহাজনের স্বরের ঝাঁজ বাজ একই রকম, 'ছেলেকে বলবে, এ হপ্তাতেই সব পাওনা মেটাতে হবে।'

বুধো হুস্ করে একটা নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু মুখে হাসি, 'তাই বলব। তুমি মাল দিলে না, এখন যাই আবার ইস্টিশনের মিশিরজীর দোকানে।'

'তাই যাও।' মহাজন বললেন, 'আমার কাছে আর ধারে কারবার চলবে না। এ হপ্তায় আমার টাকা মেটানো চাই।'

বুধো ইতিমধ্যে রক থেকে নিচে পা বাড়িয়েছে। আবার বললো, 'বামুনের গরু, বাঁট টিপলেই দুধ বেরোয়, তোমার কথাই বলেচি, মিছে তো বলি নি।' বলতে বলতে পোড়োয় হাঁটা দিয়েছে।

মহাজনের চোখে আগুন, দাঁতে হিংস্রতা। আর আমি যদি ঠিক দেখে থাকি, হাসির দমকে বুধোর শরীর কাঁপছে। কিঞ্চিৎ খিক্ খিক্ শব্দও যেন শোনা গেল। মহাজন সেই পোড়া বিড়িটাই আবার দাঁতে চেপে ধরলেন। দেশলাই হাতে নিয়ে কাঠি জ্বালাতে গিয়েও জ্বালালেন না। বিড়িটা হাতে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'দেখলি তো গোবরা, একে ছোটলোক, তায় বেইমান। মাগীর রস আর ধরে না।'

'পাগল।' গোবরা নামে লোকটি হেসে বললো, 'বুড়ি যেখেনে যায়, সেখেনেই হ্যালফ্যাল কথা বলে আর হাসে।'

মহাজন ঝেঁজে উঠলেন, 'না না, তুই জানিসনে। বুড়ি প্রায়ই আনকা কথা তুলে আমার পেছনে লাগে। ও আমাকে কী ভাবে ?'

'বুড়িটার স্বভাবই ওইরকম।' গোবরা বললো, 'মানীর মান দিতে জানে না। আপনি ঠিক করেচেন দাদাঠাকুর, ওকে আর ধারে মাল দেবেন না।'

মহাজনের স্বর বদলালো, 'না, তুই ভেবে দ্যাখ। আমি একটা কথার কথা বলেছি, তাই নিয়ে আমাকে ঠাট্টা তামাশা করবে, চিপটেন কাটবে ?'

'নচ্ছার বুড়ি।' গোবরা কথাটা বলতে গিয়ে একবার আমার দিকে দেখে নিল, 'নইলে আপনার সঙ্গে মস্করা করে ?'

মহাজনের স্বর আর এক ধাপ নিচে নামলো, 'হ্যাঁ, বুড়ি আসে, বসে, এপাড়া ওপাড়ার দশজনের কেচ্ছা করে, অনেক মজার মজার কথা বলে, শুনে আমিও হাসি। ওসব গালগপ্পো কেচ্ছা শুনতে কার না ভালো লাগে। তা বলে আমার পেছনে লাগবে ?'

অচেনা বুধোর আঁকিবুঁকি রেখা মুখে হাসি দেখেছি। এখন যেন তার চরিত্রের একটা পরিচয়ও ফুটে উঠছে। রসিকা সে নিঃসন্দেহে। সাহসটা আসলে যুগিয়েছেন স্বয়ং মহাজনই। পরের কেচ্ছা শুনে মজা লুটেছেন। নিশ্চয় বুড়ির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বিস্তর হাস্য করেছেন। আজ কী কুক্ষণে বামুনের গরুর গান ধরলেন। বুড়ি সেইটি নিয়ে কামধেনুর মস্করা জুড়লো। না বুঝেই কি জুড়েছিল ? মনে হয় না। ওটাও একরকমের কেচ্ছার খোঁচা। পরের কেচ্ছায় হাসা যায়। নিজের কেচ্ছা বুকে বাজে। মহাজন ক্রুদ্ধ হবেন, বইকি।

'বজ্জাত বুড়ি।' গোবরাও যেন রেগে উঠলো। মহাজনের মুখের দিকে তাকিয়ে, সে ক্রমে তাগ্ করতে লাগলো। প্রথমে 'পাগল' তারপরে 'নচ্ছার'। এখন 'বজ্জাত'।

মহাজন বললেন, 'ঠিক বলিছিস। কেবল বজ্জাত নয়, হাড় বজ্জাত।'

'খচ্চর বুড়ি।' গোবরার ইতর বিশেষণ আরও তীক্ষ্ণ হলো, 'তেল নিয়ে কথা হচ্ছিল আমার সঙ্গে, আপনার বামুনের গরুর কথা তো মিছে বলেননি। সে কথায় তোর নাক গলাবার কী দরকার? এত বড় সাহস, আপনার সঙ্গে মস্করা করে? হারামজাদীর মুখে ঝাঁটা।'

মহাজন প্রসন্ন মুখেই দাঁতে বিড়ি কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন, 'যা বলেছিস! দে, তোর তেলের বোতলটা দে।'

গোবরা চাদরের ভেতর থেকে বের করলো ঢাউস একটা বোতল। বোতলের গলায় দড়ি বাঁধা। এক ছটাক তেল গায়েই লেগে থাকবার কথা। তবু সার্থক। এক ছটাক তেল আদায়ের জন্য বুঝে সুঝেই তাগ্ কষেছে। বোতলটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'সত্যি বলছি দাদাঠাকুর, ইচ্ছে করছিল বুড়িটাকে মেরে তাড়াই।'

মহাজন তখন ছটাকি মাপের টিনের পাত্রে তেল তুলে বোতলে ঢালছেন। বাহ্‌রে গোবরা। কে বললে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না? সময় আর সুযোগ বুঝে বলতে পারলে, ঠিকই ভেজে। বৃন্ধার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু গোবরা হলো নিরুপায় ছিঁচকে। বৃন্ধার বুকের পাটায় সমাজ দর্পণের রসের খেলা। আর এই মহাজনকে কী বলবো? ঢাকির ঢাক?

ইতিমধ্যে এক গলা ঘোমটা ঢাকা এক কলাবউ আর একটি আট দশ বছরের খদ্দের এসে গেল। গোবরা বোতল নিয়ে চলে যেতে যেতে বললো, 'ওবেলা আসব দাদাঠাকুর।'

কিন্তু আমি এখানে বসে কি এই খেলাই দেখে যাবো? মাঘের বেলায় জামাকাপড় কখন শুকোবে, সেই আশায় বসে থাকা পাগলামি। ঘাটের সিঁড়িতে মেলে দিলে তবু কিঞ্চিৎ ভরসা ছিল। এখন চলে যাবারও উপায় নেই। জামাকাপড়গুলো ফেলে যাওয়া সম্ভব না।

'এস।' গোরা চক্কোত্তিমশাই ভেজানো দরজা খুলে ডাকলেন, 'ভেতরে এস।'

আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা করে উঠে দাঁড়ালাম। এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। চক্কোত্তিমশাই আমার পায়ের দিকে দেখে বললেন, 'স্যান্ডেল দুটো এখানেই খুলে রাখ।'

কোনো জিজ্ঞাসা অবান্তর। আবার চোটপাটের কাঁসর ঝাঁজর বেজে উঠবে। স্যান্ডেল খুলে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে ভেতরে ঢুকলাম। তিনি দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন। দেখলাম, পুব-পশ্চিমে লম্বা দালান।

দেওয়ালের চুনবালি খসা। মাথার ওপরে কড়ি বরগায় ক্ষয় ধরেছে। জায়গায় জায়গায় ছাদ চোঁয়ানো জলের দাগে শ্যাওলার রঙ। দালানের বাইরের রকে নানা খানে ভাঙাচোরা ফাটল। রকের নিচে উত্তরে কুয়োতলা। সীমানার পাঁচিলের নোনাধরা ইঁটে ভাঙন ধরেছে। পাঁচিলের পুব ঘেঁষে একটা আমগাছ। দালানের দক্ষিণ দিকে সারি সারি ঘর। ক'টা ঘর, তার হিসাব এক পলকে পাওয়া যায় না।

'এই যে, এদিকে এস, এখানে বস', চক্কোত্তিমশাই ডাকলেন।

দেখলাম, দরজার কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে মেঝের ওপর আসন পাতা। আসনের সামনে কাঁসার থালায় ভাত। দু তিনটি বাটি আর কাঁসার গেলাস। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ভাত থেকে ধোঁয়া উঠছে। ব্যঞ্জনাদি কী আছে জানি না। কিন্তু যতোই অবেলা হোক জিভে জল এসে পড়লো। ভিতরে ভিতরে মহাপ্রাণীটি সেই ঘাটে থাকতেই খাবি খাচ্ছিল। মনে মনে হোটেলের কথা ভেবে রেখেছিলাম। এতক্ষণে রুকি লতাদের ব্যবস্থার ধরতাই পাওয়া গেল। কিন্তু এত ঝক্কি পোহাবার কী দরকার ছিল?

সে প্রশ্ন পরে। আমি পায়ে পায়ে আসনের দিকে এগিয়ে গেলাম। মেঝের শান ফাটা চটা। অজস্র দাগে ভরা পুরনো গাছের মতো। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'বসে পড়, বসে পড়। বংকা এসে খবর দেবার পরে ভাত বসানো হয়েছে। তখন তো আর আলাদা করে রান্না করার উপায় ছিল না। বাড়িতে যা ছিল, তাই দিয়েছে।'

আশেপাশে আর কারোকে দেখতে পাচ্ছি না। দালানের পুবের সীমানায় ডেয়ো-ঢাকনার ঠুকঠাক শব্দ পাচ্ছি। কোনো ঘরে কারা কথা বলছে নিচু স্বরে। সেই সঙ্গে শিশুর ঘ্যানঘ্যানে কান্না। আমি আসনে বসে বললাম, 'এই যথেষ্ট।'

'যথেষ্ট, কি আর কিছু তা জানিনে বাপু।' চক্কোত্তিমশাই আমার মুখোমুখি উলটো দিকে মেঝেতে বসলেন, 'সব শুনে-টুনে প্রথমে রাজী হই নি। বংকাটা ছাড়ল না। অনেক করে বোঝালে। ফিরিয়ে দিলে পরে আমার পেছনে লাগত। কোন্ পাড়ায় থাকে, তা তো জানোই। তার ওপরে আবার গুণ্ডা মাতাল। কথা না রাখলে কোন্ দিন মাথায় ডাণ্ডা মারতো।'

গরম ভাতের পাতের সামনে বসে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হলো। বললাম, 'গুণ্ডা নাকি? কথাবার্তা শুনে তো ভালোই মনে হচ্ছিল।'

'তা হবে না কেন? ছেলে তো বামুনের ভদ্দর ঘরের। লেখাপড়াও কিছু শিখেছিল।' চক্কোত্তিমশাই চাদরের ভিতরে হাত দিয়ে কোমরের কাছ থেকে বের করলেন একটি ছোট কোটা। ঢাকনার মুখ খুলে, তুলে নিলেন একটি বিড়ি, 'ওর বাপ হল চুঁচড়ো কোর্টের উকীল। আর তার ছেলে দেখ, মেয়েমানুষ নিয়ে বেশ্যাপাড়ায় পড়ে আছে। শ্মশানে একটা মেয়েকে দেখলে

না, দেখতে শুনতে ভালো, নামটা যেন কী? বছর খানেক আগে বর্ধমান থেকে এসেছিল। তো, তাকে নিয়ে কী হুজ্জোত। মারামারি লাঠালাঠি থানা পুলিস কিছু বাকি ছিল না। শেষ পর্যন্ত বংকার কাছে সবারই হার—।' হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার পিছনে মুখ তুলে তাকালেন, 'অ্যাঁ? কিছু বলছ?'

'হ্যাঁ, বলছি আগে খেতে দাও, তারপরে ওসব কথা পেড়ে বসো।' আমার পিছনের ঘর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠ শোনা গেল।

ঘাটের গোরা চক্কোত্তিমশাই, আর এই মশাইয়ে ফারাক। চোয়াল নড়ছে না, গলায় ঝাঁজর বাজছে না। লম্বা কালো মুখখানি এমনিতেই একটু রোখা। কিন্তু রুক্ষতা নেই। বললেন, 'তা ও থাক না। আমি তো কথা বলছি। পুষিকে বলতো, আমাকে একটা দেশলাই দিতে।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খাও, তুমি খাও। আগে গোবিন্দের ভোগটুকু খাও। ওটা আমাদের গৃহদেবতার নিত্যভোগ।'

আমি পাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ভাতের সামনে এক পাশে একটু খিচুড়ি, এক চিলতে বেগুন ভাজা, সামান্য পায়েস। পাতে হাত দেবার আগে, ঘরের থেকে বেরিয়ে এলো ষোল সতেরো বছরের একটি মেয়ে। বয়সটা অনুমান, চোখে লাগছে তরুণী। লালপাড় শাড়ি আর লাল জামা। খোলা চুল পিঠে এলানো। একটি দেশলাই বাড়িয়ে দিল চক্কোত্তিমশাইয়ের দিকে। এরই নাম বোধ হয় পুষি। দেশলাই দিয়ে ঘরে পা বাড়াবার আগে-একবার আমার দিকে তাকালো। তা তাকাক, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসিটি কী কারণে? অপরিচিতের দুর্দশা দেখে? দুর্দশা না হোক, অবস্থাটা এক-রকমের অসহায় তো বটেই। পথে বেরিয়ে কপালে অন্নের লিখন কোথায় কখন কেউ বলতে পারে না। সেই হিসাবে এ পরিবেশটা খুব সহজ না।

না-থাক। গোবিন্দের ভোগ তুলে মুখে দিলাম। আর চক্কোত্তিমশাই তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিলেন, 'আজকালকার ছেলেদের এই হলো হাল। ভোগ মুখে দেবার আগে একবার কপালে ছোঁয়ালে না?'

দেখলাম, মশাইয়ের চোয়াল নড়ছে। মুখেও বিরক্তি। স্থান মাহাত্ম্যেই বোধ হয় ধমকে উঠলেন না। আমি বিব্রত হেসে বললাম, 'খেয়াল ছিল না।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টি আবার আমার পিছনে, ঘরের দিকে। ঈষৎ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, খাও।' ঠোঁটে বিড়ি গুঁজে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরালেন।

বোঝা গেল, আমার পিছনেই ঘরের দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে। একটু-আধটু ফিসফাসও শুনতে পাচ্ছি। অতএব, পিছনে একজনের অধিক বর্তমান। চক্কোত্তিমশাই সেখান থেকে সঙ্কেত পাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিচ্ছেন।

কিন্তু আমার ভিতরটা কেমন গুটিয়ে গেল। গেলেও কোনো উপায় নেই। ভোগ খেতে হলে কপালে ছোঁয়াতে হয়, তেমন সদাধর্মে সজাগ নই। খেতে আরম্ভ করলাম। গোবিন্দদেব ভোগের পরেই পাতের ওপরে উচ্ছে বেগুনের চচ্চড়ি। কথায় বলে, তেতো আর পোড়ার মুখে সবই ভালো। অর্থাৎ বেগুন পোড়া বা যে-কোনো তিক্ত ব্যঞ্জন বা ভাজা। ভোজন রসিকের কথা। বসন্তে কচি নিম পাতা ভাজা বা ঝোল, অন্য সময়ে পলতা পাতা উচ্ছে করলা, নানা প্রকার। পাতের পাশে এক বাটিতে ডাল, বাঁধাকপির তরকারি এক বাটিতে। অন্য বাটিটিতে গাঢ় রঙের ঝোলের মধ্যে কুচো চিংড়ি ভাসতে দেখছি। কুচো চিংড়ির বড়া বা মাখা মাখা ব্যঞ্জনই ভালো জমে। ঝোল কেন?

'আমি অবশ্যি বংকাকে বলেছিলাম, এ অবেলায় মাছটাছ খাওয়াতে পারব না।' চক্কোত্তিমশাই একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তার চেয়ে হোটেলে নিয়ে যা, সবই পাবি।'

পিছন থেকে স্ত্রী-কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তির শব্দ শোনা গেল। তারপরে, 'ওসব কথা পরে বললেও তো হবে।'

চক্কোত্তিমশাই মুখ তুলে একটু বিব্রত হলেন। এবং পরমাশ্চর্য, তাঁর ঠোঁটে ঈষৎ হাসির আভাস। পিছনে ঘরের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা বুজিয়ে মাথা নাড়লেন, 'আহা, আমি খারাপ ভেবে কিছু বলছিনে। ওর খাওয়ার কথা ভেবেই বলছি। বংকাদের ইচ্ছে ছিল, ওকে একটু ভালো মন্দ খাওয়াবে। সেই কথাই বলছিলাম।'

এখন আমি পিছন থেকেই কেবল সাহস পাচ্ছি না। হাঁকডাক চোটপাটের মশাইটির প্রাণের নিরিখও যেন কিঞ্চিৎ পাচ্ছি। পেয়েছিলাম ঘাটেই, যখন নিজে গঙ্গাজল এনে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে বাড়িতে এসে, নিজের হাতেই আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও, মুখ মনের ফারাকটা বোঝা গিয়েছিল। বললাম, 'হোটেলে তো আমি নিজেই যেতে পারতাম। ওরা এসব ঝঞ্ঝাট করতে গেল কেন, তাই বুঝতে পারছি নে।

'না, তা ওরা করবে না। ওদের ইচ্ছে হল, তোমাকে কোন সদ ব্রাহ্মণ গেরস্থের ঘরে খাওয়াবে।' চক্কোত্তিমশাই চোপসানো গালে বিড়িতে টান দিলেন, 'নইলে নাকি তোমার ইজ্জত দেওয়া হবে না। তাই আমার কাছে এসেছিল। কিন্তু এ অবেলায় ভালো মন্দ কী আর খাওয়াব।'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো সিঁধঠাকুর, দুর্গাদেবী, সন্ধেতারা, রুকি আর লতাদের নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ছবি। বংকার দৌড়ে চলে যাওয়া। তারপরে রুকি লতাদের ব্যবস্থার বয়ান। তাছাড়া সিঁধঠাকুরের 'সেবা'র কথাটাও মনে আছে। এই সেই ব্যবস্থা এবং সেবা। ব্যবস্থাটা মন্দ বলবো না। কিন্তু বিস্তর ঘোরাপথের ব্যবস্থা। রুকি বা লতা ভেঙে বলতে

চায় নি কেন ? বোধ হয় আশঙ্কা ছিল ব্যবস্থাটা হয়ে উঠবে কী না। অথবা আমিই বিগড়ে বসি।

পূব দিকের দালানের প্রান্তে উত্তরের খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘোমটা মাথায় এক বিবাহিতা। নীল পাড় তাঁতের শাড়ি জড়ানো। ঘোমটার বাইরে মুখ দেখে মনে হয়, বয়স তিরিশের ঘরে। বাঁ হাতে একটি থালা ডান হাতে পেতলের হাতা। এগিয়ে আসতে দেখলাম, ভাতের থালা। হাতায় করে তুলতে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে, আমার থালা আগলে বললাম, 'আর দেবেন না।'

'আর দেবে না কী হে।' চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ধমকের সুরে বাজলেন, 'ঐ কটা তো ভাত দিয়েছে। ওতে কি পেট ভরে ? দাও না ছোটবউ।'

ছোটবউয়ের মাজা মুখে, ভাসা চোখে হাসি। হাতায় ভাত তুলে ঝুঁকে পড়লেন। আমি আবার বললাম, 'সত্যি আব পারবো না। লাগলে চেয়েই নিতাম।'

'কেমন চেয়ে নিতে, সে তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি।' চক্কোত্তিমশাই পিছনে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ নরম গোবেচারা মুখ দেখেই, সেই বেটিরা তোমার ঘাড়ে চালি চাপিয়ে দিয়েছিল। ওদের ছলাকলা তুমি কি করে বুঝবে ? লোক ভোলানো ওদের পেশা। আর তুমি ভাবলে আহা, মেয়ে-মানুষ মড়া বইছে। বলছে যখন কাঁধ দিই। তুমি কি জানতে, ওরা বেশ্যা ?'

পিছনে স্ত্রী-কণ্ঠে বিরক্তি, 'কী যন্ত্রণা। ওসব কথা পরে হবে। এখন খেতে দাও।'

'আহা, আমি কি ওর হাত ধরে আছি ?' চক্কোত্তিমশাইকে এবার সামলানো গেল না।

'বলুক না, ও কি জানতো, ওরা কারা—কী হে, বলো না, তুমি জানতে ?' আমার দিকে তাকালেন।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, কী বরে জানবো বলুন। জীবনে তো কখনো মেয়েদের শ্মশানযাত্রীই দেখি নি। আর কারো গায়ে তো তাদের পেশা পরিচয় লেখা থাকে না।'

'জানলে কি কখনো নিতে ?' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোখের কোণ কুঁচকে উঠলো। চোয়াল নড়ছে।

বেগতিক, খুব বেগতিক। চক্কোত্তিমশাইয়ের জিজ্ঞাসাটা যেন খাঁড়ার মতো বাঁকা। অধম এই কায়স্থ সন্তানটিকেই তিনি বাড়িতে আনতে প্রথমে রাজী হন নি। পরে কী মনে করে, রাজী হয়েছিলেন। এখন তিনি কী জবাব প্রত্যাশা করছেন, তা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। প্রত্যাশা না, সেটাই তাঁর দাবী। বললাম, 'জানলেও নিতাম না, যদি দেখতাম সবাই বেশ শক্ত অল্প বয়সের।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের কপালে সাপ কিলবিলিয়ে উঠলো। কেশহীন ভুরুতে গাঢ় ত্রিকোণ। জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

'ওসব মানে টানে পরে জানলেও হবে।' পিছনের স্বরে শোনা গেল, 'দাঁড়িয়ে রইলি কেন ছোট, অন্তত একহাতা ভাত দে। একবার তো দিতে নেই।'

অতএব ছোটবউ একহাতা ভাত দিয়ে দিল পাতে। আমার মস্তিষ্কে বিঁধে আছে চক্কোত্তিমশাইয়ের 'মানে'। আমার জবাবটা তাঁকে কিঞ্চিৎ ধাঁধায় ফেলেছে। ছোটবউ চলে যাবার আগেই পিছনের স্বর শোনা গেল, 'আর একটু ডাল আর বাঁধাকপির তরকারি এনে দে।'

আমি ব্যস্ত হয়ে, পিছনে ঘাড় ফেরাতে গেলাম। কাঁধের শাল পড়ে গেল একপাশে। এক মুহূর্তের জন্য চোখে পড়লো, মধ্যবয়স্কা মহিলার গোল ফর্সা মুখ। তাঁরও লাল পাড় শাড়ি। মাথায় ছোট করে ঘোমটা টানা। কপালে সিঁদুরের টিপ। বললাম, 'আমার আব কিছু লাগবে না।'

'তবে থাক।' পিছনের স্বর অনুমোদন করলেন।

ছোটবউ চলে গেল। চাদরটা পরে তুললেও চলবে। কুচো চিংড়ির ঝোল ঢেলে, ভাত মেখে মুখে দিতেই আক্কেল গুড়ুম। ঝাল ঝোল কিছুই না। কুচো চিংড়ি দিয়ে পাকা তেঁতুলের অম্বল! আর আমি ঝাল ঝোলের স্বাদের আশায় ভাত মেখে ফেলেছি বেশি। উপায় নেই। অবিকৃত মুখে গ্রাস তুলে নিলাম।

'হুম, বুঝেছি।' চক্কোত্তিমশাই হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখি, সেই ঘাটের মুখ, কিন্তু হুমকে উঠলেন না। দাঁত না থাকলেও একরকম চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন 'তার মানে জানলেও নিতে। ওসব অল্প বয়স শক্তপোক্ত মন যোগানো কথা। তুমিও তা হলে কর্মনষ্ট দলের লোক?'

কর্মনষ্ট! সেটা আবার কী? দালানের পূর্ব প্রান্তে তখন পুষির আবির্ভাব ঘটেছে। বোধ হয় ঘরের ভিতর দিয়ে দরজা আছে ওদিকে যাবার। হাতে ওর দুই রঙের দুটো বাটি। ডেকে উঠলো, 'বাবা!'

'কেন, তোর মেজদা বাড়ি আছে নাকি?' চক্কোত্তিমশাইয়ের পাতলা ঠোঁট বেঁকে উঠলো, 'থাকলেও আমার কাঁচকলা।' বাঁ হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সোজা চলে গেলেন পশ্চিমে। সেদিকেও দক্ষিণে একটি ঘরের দরজা খোলা। ঘরে ঢোকবার আগে, বলে গেলেন 'ওসব কথার কারচুপি দিয়ে আমাকে ভোলানো যাবে না। বুড়ি বেশ্যাদের ওপর বড় দয়া!'

কী দুর্বিপাক! হাত এখন পাতে, মুখে গ্রাস তুলতে পারছি না। মশাই ধরেছেন ঠিক। পিছনের মূর্তি এবার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ফিসফিস করে বললেন, 'বোকা ছেলে। বললেই পারতে, জানলে নিতুম না। নাও, খেয়ে নাও।' মুখ ফিরিয়ে স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'নিয়ে আয় পুষি।'

গতিক বোধ হয় সুবিধার না। তাড়াতাড়ি খেয়ে এঁটো হাতেও পালাতে পারি। কিন্তু জামাকাপড়গুলো ? বোকা তো আমি নিঃসন্দেহে। অন্যথায় চক্কোত্তিমশাইয়ের মন বুঝেও, নিজের মন খুলে সত্যি বলতে যাই ? কিন্তু এখন আর কথা ফেরাবার ঘোরাবার উপায় নেই। গলার স্বর নামিয়ে বললাম, 'উনি খুব রেগে গেছেন।'

মধ্যবয়স্কা হাসলেন। অটুট দাঁত, ঠোঁটে তাম্বুলের ছাপ। কপালের সামনের চুলে কিছু রুপোলী ঝিলিক। দক্ষিণের পাশের ঘরের দিকে একবার দেখে নিলেন। নিচু স্বরে বললেন, 'ওই রকম। তোমাকে ভাবতে হবে না, খেয়ে নাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

অনুমান, ইনিই চক্কোত্তিমশাইয়ের ভর্ত্রী। মহাদেবের কোপ থেকে বাঁচাতে ইনিই এখন দেবী। মনে মনে প্রার্থনা করলাম, দয়া করে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন। কিন্তু কর্মনষ্ট দলটা কী ? পুষি এগিয়ে এসে সামনে দুটি বাটি রাখলো। একটি পাথরের বাটিতে দই। অন্য কাঁসার বাটিতে এক গুচ্ছের সন্দেশ রসগোল্লা। আমাকে রাক্ষস ভেবেছে নাকি ? কোনো রকমে উঠতে পারলে বাঁচি। উদ্বেগে বললাম, 'ওরে বাবা, এসব আমি কিছুই খেতে পারবো না, নিয়ে যান।'

পুষি তাকালো মহিলার দিকে। তিনি বললেন, 'এসব বংকাব ব্যবস্থা। ও মিষ্টির দোকানে বলে গেছলো, পুষি গিয়ে নিয়ে এসেছে। একটু তো খেতেই হবে।'

কিন্তু খাওয়া যে মাথায় উঠেছে, তা কি উনি বুঝতে পারছেন না ? তাছাড়া, এত দই মিষ্টি খাওয়া কোনো রকমেই সম্ভব নয়। আমি উভয়ের দিকে অসহায় চোখে তাকালাম, বললাম, 'বিশ্বাস করুন, পেটে আর জায়গা নেই।'

'পেটে জায়গা ঠিকই আছে। ভয়েই সব ভরে গেছে।' মহিলা হেসে তাকালেন পুষির দিকে।

পুষি খিলখিল করে হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিল। উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ একটু সামলে বললো, 'তুমি এমন বলো মা। ভয়ে আবার পেট ভরে যায় নাকি ?'

'যায় যায়, ওসব বুঝবিনে।' হাস্যময়ী প্রৌঢ়া হেসে আমার দিকে তাকালেন, 'দই মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও।'

আমি করুণ চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। তারপর পুষির দিকে। পুষি আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল। ওর মা ধমকে উঠলেন, 'এই মুখপুড়ী, হাসিসনে। শুনলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসবে।'

মা-মেয়ের হাসি দেখলে নির্ভয় হওয়া উচিত। আসলে ভয়ের থেকে অস্বস্তি বেশি। কিন্তু এত মিষ্টি খেতে পারবো না। বললাম, 'যদি দিতেই চান, একটুখানি দই আর একটা মিষ্টি দিন।'

চক্কোত্তি-ভত্তুরী বললেন, 'তবে তাই দে, জোর করে লাভ নেই।'

পুষি মুখে আঁচল চেপে পাথরের বাটি থেকে পাতে খানিকটা দই ঢেলে দিল। দুটো মিষ্টি তুলে দিয়ে বললো, 'একটা দিতে নেই।'

নাতিদীর্ঘ ফরসা পুষি মাতৃমুখী। বয়সটা এখনও অনুমান, চোখে তরুণী। স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই আছে। মায়ের মতো। বয়সের হিসাবে পুষি বাজে বেশি। হাসির কারণটা নিতান্ত আমার দুর্দশায় যদি না হয়, তবে ঘটনার ফেরে নিশ্চয়। দুটি মিষ্টি দিয়ে যদি তার শান্তি হয়, আমি খেতে পারবো। কিন্তু আমার মনে পড়ে গেল কর্মনষ্ট দলের কথা। কথাটা শুনে পুষিই বাবাকে সামাল দিয়েছিল। ওকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কর্মনষ্ট দলটা কী?'

পুষি আবার খিলখিলিয়ে উঠলো। আর তৎক্ষণাৎ ওর মা একেবারে হাত তুলে মারের ভঙ্গি করে ধমক দিলেন, 'চুপ।'

পুষিও চুপ। আসলে চুপ না। মুখে আঁচল ঠেসে চুপ। হাসি এখন শরীরের তরঙ্গে। মুখ লাল। মা যদিও চোখ পাকিয়েছেন, তিনিও ঠোঁটের কোণে হাসি টিপে রেখেছেন। তবু ধমক দিয়ে বললেন, 'নে, থাম। ও যা জিজ্ঞেস করেছে তার জবাব দে।'

তথাপি পুষির হাসির তরঙ্গ থামতে কিঞ্চিৎ সময় লাগলো। জবাবটা না শুনে হাতে মুখে এক করতে পারছি না। পুষি মুখের আঁচল সরিয়ে, গলা খাকারি দিল, 'কর্মনষ্ট হলো কম্যুনিস্ট।'

'কম্যুনিস্ট?' সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে পুষির মুখের দিকে তাকালাম।

পুষি কোনো রকমে রুদ্ধ হাসির বেগ সামলে বললো, 'বাবা কম্যুনিস্ট পার্টিকে বলে কর্মনষ্ট পার্টি।' বলেই মুখে আঁচল চাপা। শরীরে তরঙ্গ।

কলকারখানা থেকে গ্রামে গঞ্জে কমিউনিস্ট উচ্চারণের অনেক বিকৃতি শুনেছি। সেগুলো ইচ্ছাকৃত না। অক্ষমতা। কিন্তু এমন একটি আজব উচ্চারণ শুনি নি। কারণ, এটি অক্ষমতা না। ইচ্ছাকৃত তৈরি। ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। হাসিও যে সংক্রামক, এই মুহূর্তে অনুভব করলাম। তবু ঢোঁক গিলে সামলে নিলাম। বললাম, 'একেবারে বুঝতে পারি নি।'

পুষি হাসি সামলাতে না পারার ভয়ে, প্রায় দৌড়ে চলে গেল। চক্কোত্তি-ভত্তুরীও নিজেকে সামলাবার জন্য একটু সময় নিলেন, 'আমার মেজো ছেলে ওই দল করে। বাপ ছেলেতে রোজ এই নিয়ে খিটিমিটি। ছেলে গলায় পৈতে টৈতে রাখে না, কোনো কিছু মানতে চায় না। তোমাকেও তাই ভেবেছে।'

আমার শব্দের ভাণ্ডার বাড়লো কী না, জানিনা। বিদ্বেষের ভাষা কেমন ডিগবাজী খায়, সেটা জানা গেল। কম্যুনিস্টকে কর্মনষ্ট করা সহজ কথা না। হাস্যকরও বটে। তবে দলের কথা আলাদা। সেখানে ক্লান্ত বিদ্রোহের প্রতিবাদ। আমি সমাজের মুখে প্রতিবাদের মুষ্টি তুলে, কাঁধে চালি নিই নি।

সাধ করেও নিই নি। অনিচ্ছা আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যেই, আমার ভিতর থেকে কে যেন ঝাঁকি দিয়ে কাঁধটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বলতে গেলে নিজের সঙ্গে মন জানা-জানি নেই। কাঁধটা যে বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে পুরোপুরি চিনি না। সে কথাটা চক্কোত্তিমশাইকে বোঝাতে যাওয়ার অর্থ, আর এক ঝকমারি। তিনি যদি তাঁর মধ্যম সন্তানের মতো আমাকে কর্মনষ্ট ভেবে থাকেন, তাই ভাবুন।

খাওয়া শেষ। জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে মনে হলো, শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু ওঠবার আগে ঠেক। গোরা চক্কোত্তিমশাইয়ের গৃহ বলে কথা! আমি ভর্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এঁটো থালাবাটিগুলো—।'

'কী করবে?' হতচকিত বিস্ময়ে চক্কোত্তি-গৃহিণীর চোখ দুটো বড় হয়ে উঠলো, 'তুমি এঁটো থালা তুলবে? ওরে ও পুষি, শোন এসে।'

দালানের পূর্ব প্রান্তে পুষি আর ছোটবউ উভয়ে দেখা দিল। গৃহিণীকে তখন হাসিতে পেয়েছে। কোনো রকমে সামলে বললেন, 'জিজ্ঞেস করছে, এঁটো থালাবাসনের কী হবে?' বলতে বলতে মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

পূবপ্রান্তেও মুখে আঁচল চাপা হাসি। কিন্তু চক্কোত্তিমশাইয়ের ঘাটের কথা তো হাস্যময়ীদের জানা নেই। কায়স্থ সন্তানকে বাড়ি আনতেই তিনি আপত্তি করেছিলেন। এঁটো পাত ছেড়ে উঠে, আবার কোন মারমূর্তির মুখো-মুখি হতে হবে, কে জানে। সঙ্গত কারণেই কথাটা মনে এসেছে।

পুষি এগিয়ে এলো। মুখের হাসিটা ঈষৎ গাম্ভীর্যে ঢাকা, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এঁটো পাড়বার লোক নেই ভেবেছেন নাকি?'

কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'না, তা ভাবি নি, তবে—।'

'কোনো তবে টবে নয়।' পুষি ঝংকার দিয়ে উঠলো, 'উঠুন। আসুন. বাইরের রকে, হাত ধোবেন আসুন।'

ওঁ শান্তি। বড় স্বস্তি পেলাম। পথে ঘাটে যাই করি, গৃহস্থের বাড়িতে খেয়ে, এঁটো বাসন কোনো দিন তুলতে হয় নি। আখড়া আশ্রমে কলাপাতার এঁটো পাড়া এক কথা। গৃহস্থের বাড়িতে আর এক কথা। মনে করি, পথে বেরিয়ে ফেলে এসেছি সব কিছু। ওটা মনের সান্ত্বনা। আসলে নিজের সমাজ পরিবারের মন আর চরিত্রটা ভিতর কপাটে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় হলেই সজাগ হয়ে ওঠে। স্বস্তিটা সেই কারণে। আর মনে মনে কৃতজ্ঞতা এই মহিলাদের কাছে।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। পুষি উত্তরের রকে যাবার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'এদিকে আসুন।'

রকে গিয়ে দেখলাম, জলভরা বালতি আর ঘটি রয়েছে। আমি ঘটিতে হাত দেবার আগেই, পুষি ঘটি তুলে বালতিতে ডোবালো, 'নিন, হাত বাড়ান, জল দিচ্ছি।'

'আপনি দেবেন কেন, আমিই নিচ্ছি।' ঘটির দিকে হাত বাড়ালাম।

পুষির কালো চোখে অবাক ভ্রূকুটি। খোলা ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁত, 'আমাকে আপনি করে বলছেন?'

তারপরেই খিলখিল হাসি। ওর হাতের ঘটি থেকে ছলকে জল পড়তে লাগলো।

'কী হলো?' গিন্নী এসে দরজায় দাঁড়ালেন।

পুষি হাসি সামলে বললো, 'উনি আমাকে আপনি আজ্ঞে করছেন!'

'বোধ হয় তোর বাবার ভয়ে।' বলে হেসে উঠলেন।

কতোক্ষণেরই বা পরিচয়। যথার্থ পরিচয় বলা যায় না। যদিও আচরণে আর হাসির বাজনায়, প্রাণে আমার সহজের তাল লেগেছে। কিন্তু এত সহজে একজন তরুণীকে আপনি ছাড়া কী বলা যায়। বয়সটা যাই হোক। মেয়েরা শাড়ি পরলেই রাতারাতি বড় হয়ে ওঠে।

পুষি মায়ের কথা শুনে আবার খিলখিল হাসির মুখে আঁচল চাপলো। তরুণী অঙ্গে তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

গৃহিণী বললেন, 'নে, আর হাসিসনে। জল দে।'

'ওসব আপনি টাপনি বলবেন না, বুঝলেন?' পুষি মুখের আঁচল সরিয়ে গম্ভীর হবার চেষ্টা করলো।

'আমার নাম ভারতী। নিন, হাত ধোন।' ও আবার বালতিতে ঘটি ডুবিয়ে জল নিল।

হাত মুখ ধুতে ধুতে ভাবলাম, চলে যাবার সময় হলো। সম্বোধনের অবকাশই বা কোথায়। কিন্তু সে-কথা তোলা নিরর্থক। হাত মুখ ধুয়ে, পকেট থেকে রুমাল বের করলাম।

'আমাদের তোয়ালে টোয়ালে নেই, গামছা চান তো দিতে পারি।' পুষি বললো।

বললাম, 'রুমালেই হয়ে যাবে। ভেজা জামাকাপড়ের সঙ্গে আমারও গামছা আছে।'

'জানি।' পুষি ঘাড় ঝাঁকালো। শাড়ির আঁচল দেখিয়ে বললো, 'আর আঁচল চান তো, তাও দিতে পারি।'

আমি অবাক সন্দিগ্ধ চোখে পুষির চোখের দিকে তাকালাম। পরিহাস? পুষির মুখে লাল ছটা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে রকের পুব দিকে চলে গেল। লজ্জা পেয়েছে বোঝা গেল। পরিহাস যদি না হয়, তবে উচ্ছ্বাসের ঢেউ ওকে লজ্জার স্রোতে টেনে নিয়ে গিয়েছে।

আমি দালানের ভিতরে গেলাম। পাতের আসনের দুপাশে আমার শাল আর কাঁধের ঝোলা। গৃহিণী দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনের ঘরের দরজায়। আমি শাল আর ঝোলা তুলে নিলাম। এবার জামাকাপড়গুলো পেলেই বিদায় নিতে পারি। গৃহিণী বাঁ হাতে পাশের ঘর দেখিয়ে বললেন, 'ও ঘরে যাও।'

আবার চক্কোত্তিমশাইয়ের কাছে ? বললাম, 'রাগ করবেন না ?'

'করলেই বা কী ? গিয়েই দেখ না।' গৃহিণী হেসে বললেন।

আমি তাঁর চোখের দিকে একবার দেখলাম। তাঁর প্রৌঢ় চোখে এখনও উজ্জ্বলতা, হাসিতে বরাভয়। অতএব, মাভৈঃ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়ালাম। বড় ঘর, পুরনো মেঝে। গোটা বাড়ির চেহারাটাই একরকম। বয়স নিশ্চয় শতবর্ষ অতিক্রান্ত। পূবের দিকে জানালা দরজা সবই খোলা। একটি জানালার কাছে মাদুর পাতা। চক্কোত্তিমশাই মাদুরের ওপর বসে এখনও বিড়ি টানছেন। প্রসন্ন কি অপ্রসন্ন, মুখ দেখে বোঝা শক্ত, একটু যেন উদাস গম্ভীর। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস।'

ঘরের ভিতরে পা দিলাম। চক্কোত্তিমশাই মাদুরের একপাশ দেখিয়ে বললেন, 'বস। পেট ভরেছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।'

বলছেন যখন বসতেই হবে। এলাম, খেলাম, চলে গেলাম, সেটাই বা হয় কেমন করে। আসলে ভয়। মাদুরের ওপর শাল ঝোলা রেখে বসলাম। ঘরে তেমন আসবাবপত্র কিছুই নেই। দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে সাবেক-কালের উঁচু আর দশাসয়ী খাটের ওপর বিছানার চেহারা দীর্ণ। দুটো দেওয়াল-আলমারির কাঠের পাল্লা বন্ধ। দেওয়ালের গায়ে গোটা কয়েক পুরনো ফটো টাঙানো। পূবের খোলা দরজা জানালা দিয়ে দেখছি, উঠোন না, দক্ষিণের বাগান। পেয়ারা বেল নিম আর লেবু গাছ। বেল জুঁই জবা ফুলের গাছ ছাড়াও অপরাজিতার ঝাড় উঠেছে দক্ষিণের সীমানার পাঁচিল ঘিরে। এক পাশে গোটা কয়েক বেগুন আর বিলিতি বেগুনের গাছ। খোলা জায়গায় মাটি দেখলে বোঝা যায়, আরও কিছু শীতের সবজি ছিল। পূব সীমানায় এই ঘরের মুখোমুখি আর একটি ঘর। একতলা বাড়ির আকার বেশ বড়। বাগানে শেষবেলার রোদ। বাঁশের খুটিতে বাঁধা তারে আমার জামাকাপড়গুলো ঝুলছে। তার সঙ্গে বাড়িরও কিছু।

'আমি ওখান থেকে উঠে না এলে তোমার খাওয়া হতো না।' চক্কোত্তিমশাই বিড়িতে টান দিয়ে বললেন।

আমি অস্বস্তি বোধ করলাম, না ভেবেই কিছু বলতে গেলাম। উনি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন, 'তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমি বুঝি। সংসারে যার যেমন ইচ্ছে তেমনি চলবে, আমার কথায় কী আসে যায়। নিজের ছেলেই কথা শোনে না।' কতকটা যেন নিজের মনেই বলে চলেছেন। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বিড়িতে টান দিলেন, 'দিনকাল বদলাচ্ছে। রক্ষে, সব কিছু দেখবার জন্য চির কাল বেঁচে থাকতে হবে না। তবে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম, অন্যায় কিছু করো নি। মড়া মানুষ, সবই সমান। বেশ্যা হোক আর

গেরস্থের বউ হোক। মড়া বয়ে তো সংসারের কারো ক্ষতি করো নি। তোমার বাপ-মা বেঁচে আছে?'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখ শান্ত, স্বর উদাস। চিনতে ভুল হচ্ছে। বললাম, 'বাবা মারা গেছেন, মা আছেন।'

'তোমার মা শুনলে কী ভাববে?' চক্কোত্তিমশাই আমার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন।

আমার চোখের সামনে মায়ের মুখ ভেসে উঠলো। বিধবা, বৃদ্ধা, সংসারের প্রতি অনেকটা নিরাসক্ত। কিন্তু মুখের স্নিগ্ধ হাসি বিলুপ্ত হয় নি। জীবনের অতীতের গল্প বলতে ভালোবাসেন। বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যান। শান্ত মুখে তাঁর স্বামীর ছবির দিকে তাকান। তবু জানি, বেশ্যার শব বহনের কথা মাকে বলতে পারবো না। শুধু কষ্ট পাবেন না, যে সংসারের প্রতি তিনি এখন নিরাসক্ত সেই সংসারের অকল্যাণের শঙ্কায় তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠবে। বললাম, 'মাকে বলতে পারবো না।'

আমাকে চমকে দিয়ে চক্কোত্তিমশাই মোটা কাঁসরের ঢং ঢং শব্দে হেসে উঠলেন। সে-হাসি সহজে আর থামতে চায় না। বললেন, 'সংসারের কী মজা, অ্যাঁ?'

এই সময়ে পুষি এলো ঘরে। ওর ডান হাতে ছোট একটা পেতলের রেকাবি। বাঁ হাত পিছনে। দু চোখ ভরা বিস্ময়। আমাকে আর ওর বাবাকে দেখলো কয়েক মুহূর্ত। চক্কোত্তিমশায় মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'পান এনেছিস? দে।'

পুষি এগিয়ে এসে আমাদের সামনে রেকাবি রাখলো। এক খিলি পান, পাশে ছ্যাঁচা পানের ছোট একটি দলা। জিজ্ঞেস করলো, 'হাসছো কেন বাবা?'

'হাসির কথা শুনে।' চক্কোত্তিমশাই হাত বাড়িয়ে ছ্যাঁচা পানটুকু তুলে মুখে পুরে দিলেন, 'তুই যেন কী একটা দেখাবি বলেছিলি?'

পুষি আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। আপনি পান নিন।'

খাবার পরে আসল নেশাটা রক্তে দাপাচ্ছে। ধূমপান। চক্কোত্তিমশাইয়ের সামনে সাহস পাচ্ছি না। কিন্তু পান চিবোতে পারি না। বললাম, 'ওটা চলে না।'

'খাবার পরে একটা পান চিবনো ভালো।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'ইচ্ছে না করলে খেও না।'

তারপরেই হঠাৎ যেন তাঁর বিষম লাগলো। গলায় একটা শব্দ করে বললেন, 'এই দেখ, ভুলেই গেছি। মাকে বলতে পারবে না শুনে তো খুব হেসে নিলাম। কিন্তু ঘাটের ক্ষ্যাপাবাবা বলছিল, তুমি নাকি ধর্মাত্মা।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক্ষ্যাপা বাবাটা কে?'

'ঐ যে হে, নৌকায় বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'সবাই বলে ক্ষ্যাপাবাবা, নাম বোধহয় শ্যামানন্দ। নৌকার গায়ে লেখা আছে শ্যামাক্ষ্যাপা। আমাকে বললে, এখানে বসে সব দেখলাম। ছেলেটো ধর্মাত্মা, ওকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো। ঘাটে যখন যাবে, একবার দেখা করো।'

শ্যামাক্ষ্যাপা কি ক্ষ্যাপাবাবা, জানি না। স্নান করতে গিয়ে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছিল। চোখ ঘুরিয়ে, ভুরু নাচিয়ে, ঘাড় ঝাঁকিয়েছিলেন। তখন আমাকে একটি কথাও বলেননি। কিন্তু বাজনা থামিয়ে চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলাম। কিসের ক্ষ্যাপা, কেন ক্ষ্যাপা কে জানে। তবে বাবাজীর বাজনা চমৎকার। জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কি নৌকাতেই থাকেন নাকি।

'শোন কথা।' চক্কোত্তিমশাই পুষির দিকে তাকালেন, 'ব্যারোমাস কেউ নৌকায় থাকে নাকি?'

পুষি মুখে হাত চাপা দিল। চক্কোত্তিমশাই আবার বললেন, 'বর্ষা বাদলার সময় ছাড়া শ্যামাক্ষ্যাপা প্রত্যেক মাসেই পূর্ণিমার দিন ত্রিবেণীতে আসে। কয়েকদিন থাকে, আবার চলে যায়। গুপ্তিপাড়া না কালনা, কোথায় নাকি আশ্রম আছে। এবারের মাঘী পূর্ণিমায় এসেছে, এখনও আছে। আমাকে বললে, তুমি নাকি ধর্মাত্মা। বলেছে যখন, একবার দেখা করো।'

'সত্যি তোমাকে ও কথা বলেছে বাবা?' পুষি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে। অবিশ্যি মুখে এখন পান। বললেন, 'তুই কি ভাবছিস, আমি মিছে বলছি? ওর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দেবার জন্য ঘাটে নেমেছিলাম, তখন আমাকে বললে। কী দেখেছে, কী মনে হয়েছে ক্ষ্যাপার, কে জানে।'

'আপনি তাহলে ধর্মাত্মা!' পুষি ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের কোণে তাকালো! ঠোঁটের কোণে টেপা হাসে।

আমি বললাম, 'কথাটার মানে কী, কী দেখে বলেছেন, কিছুই জানি নে। তবে ভদ্রলোক হারমোনিয়াম ভালো বাজান, এটা শুনেছি।'

'আপনি ধর্মাত্মা মানেও জানেন না?' পুষি একইভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো। জবাবের প্রত্যাশা না করেই চক্কোত্তিমশাইয়ের দিকে ফিরে বললো, 'ওঁকে তুমি শ্যামাক্ষ্যাপার কাছে যেতে বলছো বাবা?'

চক্কোত্তিমশাই বিড়িতে টান দিলেন। ধোঁয়া বেরোলো না। বললেন, 'না যাবার কী আছে? দেখা করতে বলেছে, দেখা করবে। তারপরে ওর ভালো মন্দ ও বুঝবে।'

পিতৃদেব ও কন্যার কথার মধ্যে কেমন একটা রহস্যের আভাস। চক্কোত্তি-

মশাইয়ের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পুষির মুখের দিকে তাকালাম। পুষি যেন উদ্বেগে বললো, 'দেখবেন, সাবধান! ক্ষ্যাপাবাবা অনেক তুক-তাক জানে।' হাত তুলে নিজের গলায় কোপ দেবার ভঙ্গি করলো।

আমি হেসে বললাম, 'বলি দেবেন নাকি ?'

'বলা যায় না।' পুষি ঠোঁট টিপলো, 'বলি না দিক, ভেড়া বানিয়ে রাখতে পারে।'

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'আহ্, কী যা তা বলছিস। কয়েক বছর দেখছি, এখনো তো কেউ খারাপ কিছু বলেনি।'

পুষির ঠোঁটে আবার আঁচল চাপা। শরীরে তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎ এমন সাবধানবাণী কেন ? পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে রাখা হতো নাকি কামাখ্যা পাহাড়ে। কোন্ কালে, তা জানি না। কামাখ্যার রমণীরা নাকি ভেড়া বানাবার মন্ত্রগুপ্তি জানতো। কিংবদন্তীর দেশে, গল্পের শেষ নেই। কামাখ্যা কামরূপ ঘুরে এসেছি। ভেড়া হয়ে ফিরি নি। তবে তন্ত্রমন্ত্রের তীর্থ, কোনো সন্দেহ নেই। কিংবদন্তীর সৃষ্টি বোধহয় একেবারে নিছক কল্পনা না। কারণ, দুই চার বালিকাকে দেখেছিলাম, পয়সার জন্য পিছনে লেগেছিল। ওদের পুরো দাবী মেটাতে পারিনি বলে, চোখ ঘুরিয়ে বিড় বিড় করে হাতের আর পায়ের আঙ্গুল মটকেছিল। সেটাই ভেড়া বানাবার তুক কী না জানি না। প্রাণভরে হেসেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘাটের ওই ক্ষ্যাপাবাবা শাক্ত না শৈব ?'

'ও সব জানি নে। শুনেছি আশ্রমে কালী মন্দির আছে।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'গোখরো কেউটে ময়াল, অনেক সাপ নাকি আছে। শুনেছি, শ্যামাক্ষ্যাপা সাপ গলায় জড়িয়ে বসে থাকে। তবে মন্দিরে বলি হয় না। সবই শোনা কথা। দেখেশুনে মনে হয়, আশ্রমের পসার ভালো। অনেক বড়লোক শিষ্য সামন্ত আছে নিশ্চয়।'

পুষি বললো, 'অনেক সুন্দরী মেয়েও আছে।'

পুষির কথা শুনে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো নৌকার সেই ছবি। উপরের ছইয়ের গায়ে হেলান দেওয়া রমণী মূর্তি। চলে আসবার আগে সে মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখছিল।

'অনেক আছে, তোকে কে বললে ?' চক্কোত্তিমশাই ধমকের সুরে বললেন, 'সঙ্গে যাদের নিয়ে আসে, তারা তো বরাবরই আসে। তবে শুনেছি, আশ্রমে অনেক পুষ্যি আছে। তা সে যাই থাকুক, তোমাকে দেখা করতে বলেছে, একবার দেখা করবে। কার মধ্যে কী আছে, বলা তো যায় না। হতে পারে, লোকটার সিদ্ধিলাভ ঘটেছে।'

জীবনে কিছু সাধক দেখেছি। তাঁদের সাধনকর্মও দেখেছি। গুপ্ত মুক্ত সব রকমেরই। কিন্তু সেই সাধনবলে কেমন করে সিদ্ধিলাভ ঘটে বুঝি না।

সিদ্ধপুরুষ কেমন করে হয়, তাও জানি না। সাধক নই। জানবোই বা কেমন করে। যাঁদের তত্ত্ব, তাঁদের তত্ত্ব। আমি দর্শক মাত্র। অতি মানবের বা মানবীর ভড়ং যাঁদের নেই, এমন কিছু সাধক সাধিকার সঙ্গে কথা বলে ভালো লেগেছে। তাঁরা কেউ মন্ত্রের ম্যাজিক দেখাননি। সংসারের বাইরে থেকেও সংসারের সহজ কথাই শুনিয়েছেন।

'কই রে পুষি, তুই যে কী দেখাবি বলছিলি ?' চক্কোত্তিমশাই কন্যার দিকে তাকালেন। এই সময়ে গৃহিণীও ঘরে এসে ঢুকলেন। পুষির পিছনের হাত সামনে এলো। হাতে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। কয়েকটা পাতা খুলে আমার আর চক্কোত্তিমশাইয়ের সামনে রাখলো। আমি অবাক চোখে পুষির দিকে তাকালাম। পুষিও তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের ঝিলিকে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা, ঠোঁটে টেপা হাসি। এ দেখছি, ইঁদুর ধরার কল ! বড় বিব্রত বোধ করলাম। চক্কোত্তিমশাইয়ের চোখে চশমা নেই। পত্রিকাটি চোখের সামনে তুলে নিয়ে দেখলেন। এখনও কি চশমা ছাড়া পড়তে পারেন ? বললেন, 'হুঁম, নামটা তো একই দেখছি। কিন্তু সত্যি নাকি হে ? এই ছাপা নামটা কি তোমার ?' তিনি পত্রিকার খোলা পাতাটা আমার সামনে মেলে ধরলেন। তাকালেন মুখের দিকে।

বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। পত্রিকার দিকে আমার চেয়ে দেখবার দরকার ছিল না। পুষির দিকে তাকালাম। এখন ওর চোখের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। অনুমান আর কীর্তিটা ওরই, কোনো সন্দেহ নেই। একবার দেখলাম চক্কোত্তি-ভর্ত্রীর দিকে। তাঁর চোখেও অবাক জিজ্ঞাসা। বিষয়টিতে লজ্জার কিছু নেই। কিন্তু স্বধর্মী মাত্র বুঝতে পারেন, কুণ্ঠাটা কোথায়। 'না' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। উড়িয়ে দিয়েও পার পাওয়া যাবে কী না জানি না। সেটা ভাবতেই কেমন মনে অপরাধ বোধ জাগছে। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'কী বলেছিলাম মা তোমাকে !' পুষি প্রায় এক লাফে সরে গিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম, ওর ফরসা মুখের হাসিটি বালিকার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বালিকার মতোই খুশিতে বেজে উঠলো, 'বাবা, ঠিক দেখিয়েছি তো ?'

চক্কোত্তিমশাই আমার মুখের দিকেই তাকিয়েছিলেন। আওয়াজ দিলেন, 'হুঁম, ঠিক দেখিয়েছিস। তা, তুমি কোনো চাকরি-বাকরি কর, না এ সবই কর ?'

বললাম, 'হ্যাঁ—মানে, এ সবই করি।'

'এ সব করে চলে ?' চক্কোত্তিমশাইয়ের জিজ্ঞাসা।

পুষির ঝাপটা, 'ধ্যুৎ, বাবা যে কী সব বলে না ? দেখছো তো মা ?'

গৃহিণীর হাসিতে মুগ্ধতা। চকোত্তিমশাই বললেন, 'আহা, এটাও জিজ্ঞেস করতে হয়। তা যাক, এ সব কী লেখা ? ধর্মের কথা-টথা কিছু আছে, না গাল গপ্পো ?'

'আহ্, বাবা, তুমি যে কী বল, তার ঠিক নেই। উনি একজন লেখক।'

চক্কোত্তিমশাই অবাক স্বরে বললেন, 'সেই জন্যেই তো জিজ্ঞেস করছি, কী লেখে ? লেখা তো অনেক রকম আছে। না, কী বলো হে ?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। ওই আপনি যা বলেছেন, গাল গপ্পোই লিখি।'

'বাবা, একদম বিশ্বাস করো না।' পুষি আমাকে চোখ পাকিয়ে হাসলো, 'কোন দিন দেখবে, তোমাকে নিয়ে কোথায় কী লিখে দিয়েছেন।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের ফোগলা মুখের হাসিটি, ছ্যাঁচা পানে লাল। এইটি হিসাবে তৃতীয় হাসি। বললেন, 'আমাকে নিয়ে আর কী লিখবে ? কুচ্ছো করবে, গুচ্ছের গালাগাল দেবে, এই তো ?'

'ছি ছি, এ কি বলছেন ?' আমি ব্যস্ত বিব্রত হয়ে বললাম, 'যাই লিখি, আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

চক্কোত্তিমশাই মাথা ঝাঁকালেন, 'কিন্তু ঘাটে যখন নিজে গঙ্গাজল এনে তোমার গায়ে মাথায় ছিটিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে একটা পেন্নামও করোনি।'

আহ্, অই হে ! কার যে কোথায় বাজে। আমার খেয়াল হয়নি। ধারণাও ছিল না। তেমন কোনো সূর্যবংশীয় প্রতিজ্ঞাও আমার নেই। মহাশয়ের প্রাণে লেগেছে বলেই কথাটা মনে রেখেছেন।

আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাঁর দু-পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকালাম। তিনি শশব্যস্ত হয়ে আমার মাথায় হাত দিলেন, 'আহা, থাক থাক, জয়স্তু।'

পুষি খিলখিল করে হেসে উঠলো। গৃহিণী অকারণেই ঘোমটাটা একটু টানলেন। তাঁর মুখেও হাসি। কিন্তু চোখ দুটো ভিজে উঠছে নাকি ? বললেন, 'কোথা থেকে কী ঘটে যায়, কেউ বলতে পারে না।'

'আর বাবা কেমন পেন্নামটা আদায় করলে দেখ !' পুষি হাসতে হাসতে বললো।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তুই ভাবছিস আদায়। কিন্তু ওর এ সব জানা দরকার। না, কী বলো হে ? তবে আমার মেয়ে বড় সজাগ। তোমার নামটা শুনেই লাফিয়ে উঠেছিল। তোমাকে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেও এসেছিল। আমাকে বললে, ভদ্রলোকের খাওয়া হয়ে গেলে তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। আমি ভাবি—।'

'থাক, ও সব আর বলতে হবে না।' পুষি বাধা দিয়ে বললো। মুখে

ওর লজ্জার ছটা, কিন্তু এখনও একটা উত্তেজনার ঝলক, 'আমি মনে মনে ভগবানকে ডাকছিলাম, যা ভেবেছি, তাই যেন মিলে যায়।'

পিতার গর্ব পুত্রীকে নিয়ে। পুত্রী খুশিতে আটখানা। চক্কোত্তিমশাই একটু নড়েচড়ে বসলেন, 'কিন্তু তুমি তো আমাকে অবাক করলে হে। তুমি একটা লেখক মানুষ, ওদের মড়া বয়ে আনলে?'

কী জবাব দিতাম জানি না। তার আগেই পুষি বলে উঠলো, 'তা নইলে যে আমাদের বাড়ি আসা হতো না।'

গৃহিণী হেসে উঠলেন, 'যা বলেছিস।'

কর্তা গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে হাস্য করলেন। চতুর্থ হাসি। বললেন, 'তোমারি মেয়ের মুখে কথা যুগিয়েই আছে। মানছি, এ হলো দৈবের যোগাযোগ। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও একটা লেখক মানুষ। রাস্তায় ওকে যারা ডাকবে, তাদেরই মড়া বইবে?'

'তা কেন?' আমি বললাম, 'সবাই তো আর ডাকাডাকি করে না। ধরে নিন, এটাও দৈব।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের পঞ্চম হাসি, মোটা কাঁসরে ঢং ঢং বেজে উঠলো, 'এর ওপরে আর কথা চলে না। কিন্তু বংকারা যখন জানবে তখন কী হবে বল দিকিনি?'

আমি আঁতকে উঠে বললাম, 'বংকারা কেন জানবে? কী করে জানবে?'

পিতা মাতা কন্যা, তিনজনেরই দৃষ্টি আমার দিকে। অস্বস্তিতে বললাম, 'এই জানাজানির ব্যাপারটা আপনাদের মধ্যেই থাক। ওদের জানাবার দরকারই বা কী?'

'উনি ঠিকই বলেছেন বাবা।' পুষি বললো, 'ওদের জেনেই বা কী লাভ? আমরা ছাড়া আর কেউ জানবে না।'

চক্কোত্তিমশাই মাথা ঝাঁকালেন, 'ভালো কথা। কিন্তু তোর দাদারা যখন জানবে, তখন কি আর কারো জানতে বাকি থাকবে?'

'দাদাদের আমি বলে দেবো।' পুষি বললো, 'কাদের বলবে আর কাদের বলবে না, সেটা ওরা বুঝবে।'

'আর তুই তো কলেজে গিয়েই সব মেয়েদের ডেকে ডেকে আগে বলবি।' চক্কোত্তিমশাই গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে চোখের পাতা পিট পিট করলেন।

পুষির চোখ আমার দিকে। লজ্জার ছটায় মুখ লাল। একটু ঝেঁজে বললো, 'হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে, আমি কলেজে গিয়েই মেয়েদের বলবো। দেখছো তো মা?'

পুষি যে কলেজে পড়ে, ওকে দেখে বোঝা যায় না। মা বললেন 'তোর বাবার কথাই ও রকম।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কলেজ ?'

পুষির চোখে মুখে লজ্জার ছটা গাঢ়তর হলো, 'হুগলির উইমেন্স-এ, ফার্স্ট ইয়ার।'

বয়সটা তা হলে একেবারে ভুল করিনি। ষোল সতেরো থেকে দু এক বছর বেশি। তারপরেও বলে কী না, ওকে কেন আপনি করে বলবো। নেহাত্ত চেনা বলে, এই কথা। পথের অচেনায় তুমি বললেই, তখন আর এক রূপ দেখতে হতো।

আমি হেসে বললাম, 'এটা কোনো গোপন রহস্যের ব্যাপার নয়। আমার পরিচয়টা জানলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কেমন একটা অস্বস্তি হয়, তাই কথাটা বললাম। পথে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, এই যা। এ বাড়িতে না এলে এতক্ষণে ত্রিবেণী ছেড়ে আমি হয়তো চলেই যেতাম।'

'ইস্, একেবারে নাকের ডগা দিয়ে চলে যেতেন।' পুষির চোখে উদ্বেগ, মুখে হাসি, 'ভাগ্যিস আপনাকে খাওয়াবার জন্য আমাদের বাড়ির কথাটাই ওদের মনে এসেছিল।'

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, আসল কথাটাই জানা হলো না। ত্রিবেণীতে তুমি কোথায় এসেছিলে ? বংকার কাছে শুনেছি, ওরা তোমাকে মসজিদের কাছে ধরেছিল। বাসে করে এসেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কলকাতা থেকে বাসে বাসে ? না কি ট্রেনে চুঁচড়োয় নেমে বাস ধরেছ ?'

চক্কোত্তিমশাই ধরেই নিয়েছেন, আমি কলকাতা থেকে আসছি। ভুল ভাঙ্গাবার দরকারই বা কী ? মিথ্যা না বললেই হলো। বললাম, 'চুঁচড়ো থেকে বাসে এসেছি। ত্রিবেণীতে এসেছি ত্রিবেণী দেখতেই, অন্য কোথাও নয়।'

'শোন্ পুষি, ত্রিবেণী দেখতেও লোক আসে।' চক্কোত্তিমশাইয়ের ষষ্ঠ হাসিটা কিঞ্চিৎ বিদ্রূপে বাঁকা।

পুষি বললো, 'কেন, আমাদের ত্রিবেণী কি ফ্যাল্না জায়গা ?'

'না, তা কেন হবে ?' চক্কোত্তিমশাই জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন, 'বারুণি মকর সংক্রান্তি মাঘী পূর্ণিমায় লোকে আসে পুণ্য করতে। এর সে-বালাই আছে বলে মনে হয় না। তবে মহাশ্মশানটা তো দেখা হলো। ওটাই এখন আসল ত্রিবেণী।' আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, এখান থেকেই ফিরে যাবে, না অন্য কোথাও যাবে ?'

আগের মিথ্যা কথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'ভাবছি, এখান থেকে নবদ্বীপে যাবো।'

'নবদ্বীপ ?' চক্কোত্তিমশাই গৃহিণী আর কন্যার দিকে একবার দেখলেন।

তাঁর লোমহীন ভুরুতে গাঢ় ত্রিকোণ, চোখে বিস্ময়, 'সেখানে কি কারোর বাড়িতে, না বেড়াতে ?'

বললাম, 'বেড়াতেই।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখের ভাঁজে, চোখের তারায় বিস্ময় বাড়তেই থাকে, 'রাত্রে কোথায় থাকবে ?'

বললাম, 'ঠিক করিনি কিছু। হোটেল টোটেল আছে নিশ্চয়।'

চক্কোত্তিমশাই আবার গৃহিণী ও কন্যার দিকে দেখলেন, 'তোমার ঘড়িতে ক'টা বেজেছে ?'

কবজি তুলে বললাম, 'সাড়ে তিনটে।'

'গাড়ি একটা আছে।' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে, 'সময়ও আছে ঘণ্টা দেড়েক। কিন্তু নবদ্বীপে কখনো গেছ ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'তা হলে ?' চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টি আবার গৃহিণী ও কন্যার দিকে, 'পেঁছুতে রাত হয়ে যাবে। অচেনা জায়গা।. কোথায় যেতে কোথায় যাবে।'

গৃহিণী এবার আওয়াজ দিলেন, 'তার চেয়ে আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাও না।'

যাবার এবং সময়ের কথা উঠতেই, আমার ভিতরে ব্যস্ততায় ঘোড়দৌড় লেগেছে। বাগানে তাকিয়ে দেখছি, দ্রুত বিলীয়মান বেলা রক্তিম হয়ে উঠছে। দোয়েল পাখির যা চরিত্র, এখন থেকেই জোড়ের পাখিটিকে ডাকতে আরম্ভ করেছে। পুষির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ওর ব্যগ্র চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হয় না। এখানে কাটিয়ে যাওয়া মানে, এ বাড়িতে থেকে যাওয়া। চক্কোত্তিমশাইয়ের দৃষ্টিও আমার দিকে। আমি বললাম, 'একলা মানুষ, আশ্রয় একটা জুটে যাবেই। সেরকম বুঝলে, ফিরেও যেতে পারি। ও নিয়ে ভাববেন না। আমি বরং এবার উঠি।'

আসলে চন্দ্রাবলীর চালি কাঁধে চেপে, আমার সবই গোলমাল করে দিয়েছে। ত্রিবেণীর ঘাট থেকে অনেক আগেই আমার চলে যাবার কথা। গন্তব্যের কোনো ঠিকানা ছিল না। ভেবেছিলাম মুক্ত বেণীর উজান পথে, যেখানে সন্ধ্যা নামবে, সেখানেই একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো। এখন মনে হচ্ছে, ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

'একটা রাত কি এখানে কাটিয়ে যাওয়া যায় না ?' পুষির মুখে ছায়া, চোখে বিষাদ।

পুষির হাসি খিলখিল, মুখে আঁচল চাপা তরঙ্গটাই ভালো লাগে। মুখের ছায়ায় চোখের বিষাদে কেবল একটা রুদ্ধ পথের গণ্ডীর দাগ পড়ে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'যদি ত্রিবেণীতেই থাকতে হয়, তবে এখানেই ফিরে আসবো।'

পুষির চোখের বিষাদে অবিশ্বাসের ছায়া। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ঝিলিক দিল, 'আপনাকে তো মিথ্যেবাদী বলতে পারি নে।'

কথাটা চমক লাগিয়ে দিল। ভুলে যাচ্ছি, পুষি ওরফে ভারতী চক্রবর্তী কলেজে পড়ে। ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সেটাই বোধ হয় আসল কথা না। কলেজে পড়া বুদ্ধির থেকেও, নারী প্রকৃতির চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় অধিক কিছু আছে। গৃহিণী বললেন, 'ও রকম বলিস নে। মিথ্যে কথা বলবে কেন ?'

'আমিও তো সে কথাই বলছি, উনি তো মিথ্যে কথা বলতে পারেন না।' মেঘের কোলে চিকুর হানা হাসি ওর ঠোঁটে।

চক্কোত্তিমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'তা হলে আর দেরি করিস নে পুষি। ওর জামাকাপড়গুলো এখনো শুকোয় নি। ওর ভেজা গামছাতেই ওগুলো জড়িয়ে বেঁধে দে।'

পুষি পুবদিকের খোলা দরজা দিয়ে বাগানে নেমে গেল। আমি গায়ের শাল আর ঝোলা তুলে নিলাম। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'চলো, বাগানে নেমে সদর দরজা দিয়ে বেরোই।'

'আমার স্যাণ্ডেল জোড়া দোকানে রয়েছে।' পা বাড়াবার আগে পাদুকার কথা ভুলতে পারিনা।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তাও তো বটে। যাও, পায়ে গলিয়ে এসো।'

'স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ভিতরে আসবো ?' আমি দ্বিধার স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তাতে আর কী হয়েছে। বাড়ির ছেলেরা তো ও সব কিছুই মানে না। তুমি আর বাকি থাকবে কেন। যাও, স্যাণ্ডেল পরে এসো।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ঘরের বাইরে এলেন। আমি দোকানের ভেজানো দরজা খুলে, ভিতরে ঢুকলাম। মহাজন মহাশয় তখন অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে গল্প জুড়েছেন। একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আমি স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে, দালানে এলাম। চক্কোত্তিমশাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'দোকানটা কাদের ?'

'আমাদেরই বলতে পারো।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'আমার ছোট ভাইয়ের দোকান। লেখাপড়া যজমানি, কিছুই শেখেনি। বাজার বড় রাস্তা নয়, পাড়ার ভেতরে দোকান। লোকসান ছাড়া কিছু হয় না। তবু একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। এসো।'

সংকোচ হলেও, স্যাণ্ডেল পায়ে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। বাগানে দেখছি পুষি ভেজা গামছার পুঁটলি নিয়ে দাঁড়িয়ে। মুখ ফেরানো ওর দক্ষিণে। ডান গালে, লাল পাড় সাদা শাড়ি আর খোলা চুলে শেষ বেলার রোদ। বাগানের দরজায় পা দিতে গিয়ে ঠেক লেগে গেল। ফিরে এসে

গৃহিণীর সামনে নত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিলাম। তিনি সরে যাবার অবকাশ পেলেন না, ব্যস্ত হয়ে বললেন, হয়েছে হয়েছে। 'ভালো থেকো। আর সত্যি ত্রিবেণীতে থাকলে, চলে এসো।'

আমি ঘাড় কাত করে, চক্কোত্তি মশাইকেও প্রণাম করতে গেলাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, 'একবার করেছো, ওতেই আমি খুশি। এসো।'

আমি আর একবার গৃহিণীর দিকে তাকালাম। তাঁর হাসিটিও ছায়ায় ঢাকা। বললাম, 'চলি।'

'এসো।' তিনি দরজার দিকে এগিয়ে এলেন।

'এ যাত্রায় যদি না হয়, একবার শুধু আমাদের বাড়িতেই এসো।'

পথের টানে কোথায় কখন ঠেক লেগে যায়, বলা যায় না। পথ বেছে, দিনক্ষণ ঠিক করে কোনো দিন আসা হবে কী না জানি না। তবু বললাম, 'এদিকে এলে আসব।'

আমি চক্কোত্তিমশাইয়ের সঙ্গে বাগানে নামলাম। দোয়েলটা কোন ঝোপের আড়াল থেকে ডেকেই চলেছে। মাঝে মাঝে বুলবুলির শিস্। পুষি আমাদের আগে আগে চলেছে। গজালপোঁতা দেউড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আমি কাছে গিয়ে, পুঁটলিটা নেবার জন্য হাত বাড়ালাম। চক্কোত্তিমশাই দেউড়ির বাইরে পা বাড়ালেন।

পুষি পুঁটলিটা দেবার আগে বললো, 'এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ?'

পুষি হাসলো। সকালে ফোটা বিকালের বাসী ফুলের ছবি। কোনো জবাব না দিয়ে পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল। আমি হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত জবাবের প্রত্যাশা করলাম। ও কিছু বললো না। আমি দেউড়ির চৌকাঠে পা দিলাম।

'আবার যদি কখনো ত্রিবেণীতে আসেন—'

আমি পুষির কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলাম, 'তখন নিশ্চয়ই আসবো।'

'না আসতে বলছিনে। আসতে বারণ করছি।' ও মুখ নামিয়ে নিল।

আমার মুখের হাসিটাই যেন বাতাসের ঝাপটায় থতিয়ে গেল। পুষি আবার মুখ তুললো। হাসির ক্ষীণ রেশ ঠোঁটে। চোখের তারা নিবিড়। কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলো। তারপরে কোনো রকমে উচ্চারণ করলো, 'সত্যি।' বলেই পিছন ফিরলো।

আমি ওর দিকে তাকালাম। পিঠের খোলা চুলে আর গায়ে দেউড়ির মাথার ছায়া। ও এখন রোদের রক্তাভার আড়ালে। কিছু বলা নিরর্থক। তবু বললাম, 'আসি।' চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়ে, চক্কোত্তিমশাইকে

অনুসরণ করলাম। পোড়ো পেরিয়ে, পুকুর ধার থেকে পাকা রাস্তায় পা দিলাম। একবার ফিরে না তাকিয়ে পারলাম না। পুষি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। দোয়েলটা ডেকেই চলেছে।

ঘাটের সিঁড়ির নিচের ধাপে, জলের গায়ে রোদ চিকচিক করছে। মাঝখানের চরে, চরের ওপারে এখনও রক্তাভ রোদ। ঘাটের ভিড় কমে নি। আশেপাশে বসে আছে কিছু বৃদ্ধ বৃদ্ধার দল। সেই দুপুরের মতোই। এখনও অনেকে স্নান করছে। পাশের পুরনো ঘাটে নোঙ্গর করা নৌকা থেকে মালের বস্তা পিঠে বোঝাই করে ওপরে উঠছে দুই তিন বাহক। শ্যামাক্ষ্যাপা বা ক্ষ্যাপাবাবা, যা-ই হোন, নৌকা তাঁর এক জায়গাতেই নোঙ্গর করে আছে। কিন্তু চোখের ভ্রম না মনের ধন্দ বুঝতে পারছি না। বজরাতুল্য নৌকার দিক বদল হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণের গলুই উত্তরে। উত্তরের গলুই দক্ষিণে। হারমোনিয়ম মন্দিরা আর বাজছে না। ক্ষ্যাপাবাবা, মন্দিরাবাদক বসে আছেন উত্তর দিকে। তাঁদের কাছে বসে দুই রমণী। একজনকে আগেই দেখেছিলাম। এখন দেখছি আর একজন। দ্বিতীয় রমণী ক্ষ্যাপাবাবার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। সকলের মুখ পুব দিকে। ঘাটের দিকে কারোর নজর নেই। দক্ষিণের গলুইয়ের চওড়া পাটাতনের ওপর, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে চার মাঝি। খাটো ধুতির ওপরে চাদর গায়ে। দুজনের মাথায় শুকনো গামছা জড়ানো। এক পাশে চওড়া টিনের পাতের ওপর কাঠ জ্বালাবার উনোন। কাঁসা পিতলের থালাবাটি ঝকঝকে মাজা। থাকে থাকে সাজানো। পাশেই উপুড় করা পিতলের বড় হাঁড়ির পিছনে লেপে দেওয়া গঙ্গামাটি। এদিকের ছইয়ের মুখ-ছাটেও দুই পাল্লার দরজা। দেখে মনে হচ্ছে ভিতর থেকে বন্ধ।

কিন্তু নৌকার মুখ ঘোরানোর কারণ কী? মুহূর্তেই নিজের ভ্রম ধন্দের মুখে চাঁটি। জলের দিকে তাকিয়ে দেখি, ভাটার টান। দক্ষিণে স্রোতেব ঢল। উজান ভাটির মুখ ফেরাফিরি দেখে চোখ পচে গেল। তবুও কী না ধন্দ। মুখ ঘোরাবার দরকার হয় না। আপনিই ঘুরে যায়। মাঝিকে নোঙ্গরের জায়গা বদলাতে হয়।

'চলো তা হলে ওদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসা যাক।' চক্কোত্তিমশাই শ্মশানের দিকে দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমারও দায়। অন্তত বংকার কাছে। নইলে ভাববে, তোমাকে হয়তো আমি বাড়িতে নিয়ে যাই নি।'

চক্কোত্তিমশাইকে আমি ঘাট অবধি আসতে বারণ করেছিলাম। তিনি শোনেননি। বলেছিলেন, 'তা হয় না। যেখান থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছি, সেখানে পেঁছে দেবো।' আসলে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে এসেছেন।

আমি বললাম, 'সে-কথা তো আমিই ওদের জানিয়ে দিতে পারি।'

'তা তো পারোই।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তবু একবার দেখা দিয়ে

যাওয়াটা আমার কাজ। তা ছাড়া, একটু দেখে যাই, ওদের দাহকার্যটি কেমন হচ্ছে।'

কেবল দায়িত্ব না, কিঞ্চিৎ ভিন্ন কৌতূহলও আছে। কিন্তু ঠেক আমার মনে। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কি আর শ্মশানে যাওয়া যায়? আবার চান করতে হবে না তো?'

'তা কেন হবে?' চক্কোত্তিমশাইয়ের সপ্তম হাসি ঢং ঢং করে বাজলো, 'শ্মশান হলো পুণ্যক্ষেত্র। যখন খুশি যাওয়া চলে। তবে হ্যাঁ, মড়া পুড়িয়ে যারা চান করেনি, তাদের ছোঁয়াছুঁয়ি করা চলবে না। তাহলেই আবার গঙ্গায় ডুব দিতে হবে।'

আশ্বস্ত হলাম। শব অশুচি, শ্মশান শুচি। চক্কোত্তিমশাই সঙ্গে রয়েছেন বলেই, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা। তাঁর বিধান তো জানা নেই। জীবনের শেষ দিনের ঠাঁই বলে কী না জানি না। চলার পথে যেখানেই শ্মশান পেয়েছি, সেখানে একবার পাক দিয়েছি। বৈরাগ্যের কারণে না। যেন নিজের সঙ্গেই একবার মুখোমুখি দেখা করা। আয়ুষ্কালের দিনগুলোতে মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময়।

বাঁয়ে ঘুরে শ্মশানের ঢালুতে পা দিলাম। চক্কোত্তিমশাই আমার হাত চেপে ধরলেন, 'কাণ্ড দেখ, এখনও পিণ্ডি শেষ হয় নি। মড়া নিয়ে এরা এতক্ষণ ধরে কী করছিল?'

পিণ্ডি বা পিণ্ড, বুঝি না। তবে, আমিও আশা করেছিলাম, এসে দেখবো, চন্দ্রাবলীর চিতা এতক্ষণে জ্বলছে। অন্য দিকে এক চিতা নিভেছে। সেই বৃদ্ধার চিতা জ্বলছে, যাঁর প্রৌঢ় পুত্র 'মালের' টাকার শোকে কান্নাকাটি করছিল। এখন তাকে দেখছি না। অথচ চন্দ্রাবলীকে এখনও একটা চাটাইয়ের ওপর শোয়ানো। লাল পাড় শাড়িতে শরীর জড়ানো। বাহিকার দল, আর রুকি লতারা আশেপাশে ছড়িয়ে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। সিদ্ধিঠাকুর মন্ত্রোচ্চারণ শেষ করলো। হাত বাড়ালো সন্ধেতারার দিকে। সে কী একটা গুঁজে দিল সিদ্ধিঠাকুরের হাতে। মহাশয় সেই বস্তু হাতে নিয়ে, চন্দ্রাবলীর চোখে কানে নাকে ও ঠোঁটে ছোঁয়ালো। পায়ের কাছে সরে এসে, শাড়ির ওপর নিম্নাঙ্গে ছোঁয়ালো।

'কে জানে, সোনা না কাঁসা, কী দিয়ে কাজ সারছে।' চক্কোত্তিমশাই নিজের মনেই বললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কী হচ্ছে।'

'পিণ্ডদানের আগে, সোনা বা অভাবে কাঁসা ছোঁয়াতে হয়। চোখে কানে মুখে নাকের ফুটোয় আর, ঐ তোমার ইয়েতে—মানে, ইন্দ্রিয়তে।' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'মনে হচ্ছে সোনাই ছোঁয়ালো, নইলে সিদ্ধি ব্যাটা ওটা ট্যাঁকে গুঁজতো না।'

সিদ্ধিঠাকুর ইতিমধ্যে হাঁক দিয়েছে 'কই, পিণ্ড কই ? কার কাছে ?'

রুকি একটা মাটির মালসা এগিয়ে নিয়ে গেল, 'এই যে।'

দূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি, মালসায় চাল-কলা চটকানো। তার সঙ্গে আরও কিছু থাকতে পারে। সিদ্ধিঠাকুর উঁচু স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করলো, 'অপাহতা অসুরা… ।'

বাকিটা কানে ঢোকবার আগেই চক্কোত্তিমশাই বলে উঠলেন, 'মূর্খ ! ব্যাটা মন্ত্রের কিছুই জানে না, আবার হেঁকে আওড়াচ্ছে। শুরুটা তো বললেই না. ব্যাটা উচ্চারণ করছে অপাহতা। গাধা কোথাকার।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি ওকে চেনেন নাকি ?'

'চিনিনে ? অসচ্চরিত্র, লম্পট।' চক্কোত্তিমশাইয়ের চোয়াল নড়ছে, 'অথচ নাম করা ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে। চিরকাল এই করে কাটালো। এখন বেবুশ্যেদের পুরোতগিরি করা হচ্ছে।'

আমার চোখ তখন সিদ্ধিঠাকুরের দিকে। চন্দ্রাবলীর ঠোঁট ফাঁক করে, মালসার চাল-কলার পিণ্ড গুঁজে দিল। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ। হেঁকে বললো, 'এবার চিতেয় তুলতে হবে।'

চিতা সাজানোই ছিল। বংকা বেজি খেটোর দল ছিল কাছে। তারা এগিয়ে গেল। সন্ধেতারা হাত তুলে কিছু বললো। দেখা গেল শববাহিকারাই চন্দ্রাবলীকে ধরাধরি করে চিতার ওপর শোয়ালো। চক্কোত্তিমশাই নিচু স্বরে গজগজিয়ে উঠলেন, 'হারামজাদার কাণ্ড দেখ। কুশের ওপরে দক্ষিণ শিয়রে না শোয়ালি, আর একবার চানের বদলে গঙ্গাজল দিয়ে গা ভিজিয়ে দিবি তো।'

যাঁর যেদিকে ধ্যান। জীবনে কয়েকবার শব কাঁধে শ্মশানযাত্রী হয়েছি। দাহকার্যও দেখেছি, স্নান শেষে ঘরে ফিরেছি। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম কখনো লক্ষ্য করিনি। চক্কোত্তিমশাই নিজের মনেই বললেন, 'দেখি, এবার মুখাগ্নিটা কে করে ? মেয়েমানুষটার ছেলেপিলে কেউ আছে কী না কে জানে।'

'নেই।' আমি বললাম।

চক্কোত্তিমশাই আমার দিকে ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন, 'তুমি জানলে কী করে ?'

'ওদেরই একজন আমাকে বলেছিল।' ভিতরে ভিতরে সিঁটিয়ে গেলাম।

চক্কোত্তিমশাই কেবল আওয়াজ দিলেন, 'হুঁম।'

'প্যাকাটি, প্যাকাটি কোথায় ?' সিদ্ধিঠাকুর হাঁকলো।

চারুবালা পাঠকাঠির গোছা এগিয়ে দিল। সিদ্ধিঠাকুর হাতে নিয়ে বললো, 'একজন কেউ জ্বালিয়ে দাও।'

বেজি এগিয়ে গিয়ে, দেশলাইয়ের কাঠি ধরালো। পাটকাঠির মুখে ধরতে

একটা জ্বললো। বাকিগুলো সিদ্ধিঠাকুর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেই জ্বালালো। চক্কোত্তিমশাইয়ের স্বরে বিস্ময়, 'ও-ই মুখাগ্নি করবে নাকি?'

চন্দ্রাবলীর মাথা উত্তর শিয়রে। সিদ্ধিঠাকুর দক্ষিণে বসে, পাটকাঠির আগুন তিনবার চিতার ওপর ঘুরিয়ে নিল। তার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ। কিন্তু এবার আর মন্ত্র শোনা গেল না, কেবল ঠোঁট নড়তে লাগলো। তারপরে চন্দ্রাবলীর মুখে আগুন স্পর্শ করলো।

'ফেরেব্বাজ, হারামজাদা মহা ফেরেববাজ।' চক্কোত্তিমশাই বলে উঠলেন, নিজেই পুরোত, নিজেই পিণ্ড খাওয়াচ্ছে, আবার নিজেই মুখাগ্নি করছে। বেশ্যার ধনসম্পত্তি নিশ্চয় কিছু পেয়েছে।'

সন্ধ্যেতারার কথাগুলো আমার মনে পড়লো। কিন্তু বলতে ভরসা পেলাম না। চক্কোত্তিমশাই নিজেই যথার্থ অনুমান করে নিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মুখাগ্নি করলে তো কাছা নিতে হবে।'

'ছাই নিতে হবে।' চক্কোত্তিমশাই ঝেঁজে বললেন, 'বেশ্যার জার, ওর আবার উতুরি কাছা কিসের? দিব্যি খাবে দাবে। তোফা থাকবে। নেহাত নিয়মকানুন মানলে, চার দিনে ভূর্যৎসর্গ করবে, মিটে যাবে শ্রাদ্ধ। ছ' দান দিতে হয় ব্রাহ্মণকে। অন্ন, জল, বস্ত্র, তাম্বুল, দীপ আর আসনদান। তাও নিজেই সে সব নেবে।'

ইতিমধ্যে বংকা বেজিরা ডোমের সঙ্গে কাঠ চাপাতে শুরু করেছে। খেটো একগুচ্ছ পাঠকাঠি জ্বালিয়ে একটা কাঠ জ্বালাচ্ছে। সিদ্ধিঠাকুর চুপচাপ। চন্দ্রাবলীর শরীরের ওপর কাঠ চাপানো দেখছে। শববাহিকারা একসঙ্গে গায়ে গায়ে বসেছে। কাঠের সঙ্গে পাটকাঠিও চাপানো হচ্ছে। খেটোর হাতের কাঠ জ্বলে উঠেছে। ডোমের ইশারায় সে চিতায় জ্বলন্ত কাঠ ছোঁয়ালো। ধূমায়িত-চিতা আস্তে আস্তে জ্বলতে লাগলো। এই সময়েই বংকার চোখ পড়লো আমাদের দিকে। সে বাকিদের দিকে তাকিয়ে কী বললো। সন্ধেতারার দল, আর রুকি লতা, সবাই আমাদের দিকে তাকালো। বংকা ছুটে এগিয়ে আসবার আগেই, চক্কোত্তিমশাই পা বাড়িয়ে আমাকে ডাকলেন, 'এসো'।

আমরা কয়েক পা এগোতেই বংকা কাছে এসে পড়লো। চক্কোত্তিমশাই ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'দেখিস, ছুঁয়ে দিস্‌নে যেন।'

বংকা এক পা সরে গিয়ে বললো, 'সব ঠিক আছে তো কাকাবাবু?'

'দায়িত্ব যখন নিয়েছি, বেঠিক থাকবে কেন?' চক্কোত্তিমশাই গম্ভীর স্বরে বললেন, 'সন্দেহ থাকলে, ওকে জিজ্ঞেস কর।'

বংকা আমার দিকে তাকালো। আমি হাসলাম। এর পরেও বংকার তাকাবার দরকার ছিল না। তবু আমি বললাম, 'আমার জন্য ওঁকে কষ্ট করতে হয়েছে।'

'তুমি আবার ও-সব বলেছো কেন ?' চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'অসময়ে যা পেরেছি, তাই করেছি।'

ইতিমধ্যে সন্ধেতারা, চারুবালা, রুকি আর লতাও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধেতারা চক্কোত্তিমশাইয়ের উদ্দেশে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললো, 'ঠাকুর-মশাই, বাবাকে আপনার বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের উদ্ধার করেছেন।'

চক্কোত্তিমশাই সন্ধেতারার দিকে নির্বিকার মুখে তাকালেন। কোনো জবাব দিলেন না। আমার পিছন থেকে ফিসফিস স্বর শোনা গেল, 'কোনো কষ্ট হয়নি তো ?'

আমি পিছনে মুখ ফেরালাম। রুকি আর লতা পাশাপাশি। দুজনেরই জিজ্ঞাসু চোখ আমার দিকে। প্রশ্নটা কে করেছে, বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'না। যথেষ্ট যত্নআত্যি করেছেন।'

'যাক, এইটুকু শুনে সার্থক হলাম।' লতা চুপি চুপি স্বরে হেসে বললো।

রুকি বললো, 'তুই তো আগে সাথক হবি। বংকাদার ব্যবস্থা যে।'

লতার মুখে লজ্জার ছটা, 'আহা, ও তো তোদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই ব্যবস্থা করেছে।'

'দাদা ভারি চিন্তেয় পড়ে গেছলেন।' রুকি হেসে আমার দিকে তাকালো, 'ভেবেছিলেন, ওঁকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব।'

লতা বললো, 'তা যে যাব না, সেকথা তো আগেই বলেছি। আমাদের ঘরে উনি কখনো যেতে পারেন ?'

পথে বেরিয়ে, পায়ে এমন কোনো বেড়ি পরিনি, দিকশূলের গণ্ডী বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তবু স্বীকার করতে হবে, সব মানুষের, সব ঠাঁই, ঠাঁই না। কোথাও সে মূর্তিমান বেমানান। বললাম, 'চিন্তায় পড়ি নি। সব জায়গায় তো সবাইকে মানায় না।'

রুকি আর লতা চোখে চোখে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। রুকি চোখের পাতা নাচিয়ে বললো, 'শুনলি লতা, আমাদের ঘরে না যাবার ওজর দাদা কেমন সুন্দর করে শুনিয়ে দিলেন।'

'ওজর কেন, সত্যি তো, ওঁকে আমাদের ঘরে মানায় না।' লতা বললো। তারপরেই একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে, কালো চোখের তারা ঘোরালো, 'তবে সত্যি বলছি। তবু যেন ইচ্ছে করে, এমন মানুষকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে দুটো কথা বলি।'

রুকি অবাক চোখে একবার আমাকে দেখে নিল, 'বলিস্ কী লো মুখপুড়ি ? এমন কথা বলতে পারলি ?'

'আহা, আমি কি খারাপ ভেবে কিছু বলেছি ?

লতাও একবার আমার মুখের দিকে দেখে নিল, 'এ রকমের মানুষ দেখেই তো পচে মরছি। এমন মানুষ কি আমাদের কখনো মেলে ? ইচ্ছে করে,

তাই বললাম। রাগ করবেন না যেন।' আমার দিকে তাকিয়ে, সাদা জমির চওড়া লালপাড়ের ঘোমটা একটু টেনে দিল।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চাপা, আর চোখের তারা ঘোরানোর সঙ্গে, জীবনযাপনের ছবিটা স্পষ্ট। তারপরেই ঘোমটা টেনে দেওয়ায় একটা অন্য ছবি ফুটে উঠলো। সহবত বা সম্মান দেখানো, যা-ই বলো। ছলনা হলেই বা ক্ষতি কী? কথাবার্তা যা কিছু ওদের দুজনের মধ্যে। তবু বললাম, 'না, রাগ করি নি।'

'ঠাকুরমশায়ের বাড়ি গিয়ে, নিম পাতা দাঁতে কেটেছিলেন তো?'

লতার জিজ্ঞাসা শুনে আবার ওর দিকে তাকালাম। শ্মশানযাত্রীর ওটা একটা নিয়ম বটে। কিন্তু নিমপাতা তো চক্কোত্তিমশাই আমাকে দেননি। বললাম, 'না তো।'

রুকি লতার গায়ে খোঁচা দিয়ে বললো, 'কী কথা বলিস? ঠাকুরমশাইয়ের কারোকে তো বইতে হয়নি, উনি নিমপাতা দেবেন কেন। আমাদের দেবার কথা।'

লতার মুখে বিব্রত লজ্জার হাসি, 'তাও তো বটে। কিন্তু আমাদের বাড়ি তো যাবেন না। আমরাই আপনার নিমপাতা।'

'মুখপুড়ি, আমাদের দাঁতে কাটবেন নাকি?' রুকি আবার লতার গায়ে খোঁচা দিল।

ঘাট থেকে ফিরে শ্মশানযাত্রীর নিমপাতা দাঁতে কাটা শুদ্ধিকরণের কারণ কী না জানি না। যদি তাই হয়, তবে সেই পুণ্যি পাতায় দাঁত ছোঁয়াই মনে মনে। বললাম, 'কেটে দিয়ে গেলাম।'

লতার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

ওদিকে তখন অন্য বৃত্তান্তের শুনানী চলছে। চক্কোত্তিমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, তোদের এত দেরি কেন। এতক্ষণে তো মড়া অর্ধেক পুড়ে যাবার কথা।'

সন্ধেতারা বললো, 'আর বলেন কেন ঠাকুরমশাই। আমাদের পাড়ার সিংজীবাবু বলে একটা লোক পুলিস নিয়ে এসে হাজির। বলে কি না চাঁদকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে, এ মড়া পোড়ানো চলবে না, চুঁচড়োয় নিয়ে যেতে হবে। বলেন তো কী সব্বনেশে কথা! আসলে পুলিসকে ঘুষ খাইয়ে নিয়ে এসেছে। সিংজীবাবুর বড় জ্বালা, চাঁদ তার ঘর বাড়ি সব সিদ্ধিঠাকুরকে বিক্রি কোবালা করে দিয়ে গেছে। ত, সিদ্ধিঠাকুর ছেড়ে কথা বলবার লোক নয়। সঙ্গে বড় দারোগাবাবু থাকলে আলাদা কথা। তাও ছিল না। এক জমাদার আর দুই সেপাই নিয়ে এসেছিল। সিদ্ধিঠাকুর বললে, 'বেশ, তাই নিয়ে চলো। তবে বিষ খাওয়ানো যদি প্রমাণ না হয়, তবে সিংজী তোমাকে নিজের হাতে বিষ খেতে হবে। আমরাও হইচই জুড়ে দিলাম। চাঁদ আমাদের চোখের সামনে মরেছে। তারপরে সিংজী কী ভাবলে, কে জানে। পুলিসদের

সঙ্গে ফিসফাস করে শাসিয়ে গেল, আমাদের সব্বাইকে নাকি জেল খাটিয়ে ছাড়বে।'

'ঝামেলার কথা আর বলবেন না কাকাবাবু।' বংকা বললো, 'লোকের ভিড় সামলানো দায়। এই সব ঝামেলা কাটাতেই এত দেরি।'

চক্কোত্তিমশাই আস্তে আস্তে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'হুঁম, বুঝেছি। সিদ্ধি যখন একাধারে পুরোত, পিণ্ডি খাওয়াচ্ছে আবার মুখাগ্নিও করছে তখনই বুঝেছি, সম্পত্তির ব্যাপার আছে। যাক, ও সব তোমাদের ব্যাপার। তোমরা বুঝবে, আমরা চলি।'

আমি সিদ্ধিঠাকুরকে দেখছিলাম। চন্দ্রাবলীর চিতায় এখন লেলিহান শিখা। বাতাস তেমন নেই। সিদ্ধিঠাকুর অপলক চোখে ঊর্ধ্বশিখার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের কি সে দেখতে পায় নি? তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি। অভিব্যক্তি বোঝবার উপায় নেই। চন্দ্রাবলী বিরহে কি এখন তার প্রেমের চিতাও জ্বলছে? বোধ হয় না। তার সম্পর্কে ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছি, তা থেকে একটা চরিত্রের ছিটেফোঁটা বোঝা যায়। চন্দ্রাবলী যদি তার সম্পত্তি না দিয়ে যেতো, সম্ভবত সিদ্ধিঠাকুরকে আজ এই শ্মশানে দেখা যেতো না। এখন এই চিতার দিকে তাকিয়ে যদি তার প্রাণ কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে, কিছু বলবার নেই। কিন্তু সেই সম্পত্তির সদগতি কী ভাবে হবে তাও অনুমান করা যায়। যে-লোক সন্তানদের মুখের দিকে তাকায় নি, জীবনে কোনো দায়িত্ব বহন করে নি, এ কৃতজ্ঞতাও তবে ছলনা। কৃতিত্ব তার একটাই। অথবা জাদুকর। সে একজন গণিকামোহন পুরুষ।

চক্কোত্তিমশাই পিছন্ ফিরে হাঁটা দিলেন। আমি সকলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চলি।'

'এসো বাবা। ভগবান তোমার ভালো করুন।' সন্ধেতারার চোখে জল। বুকের কাছে দু হাত জড়ো করা।

রুকি লতার মুখের হাসিতে তেমন ঝলক নেই। দুজনেই কপালে দু হাত ঠেকিয়ে মাথা নিচু করলো। আমিও কপালে হাত ঠেকালাম। লতা বললো, 'বলতে তো পারিনে, আবার আসবেন। তবে নিমপাতা দাঁতে কাটলে, পরে একটু মিষ্টি মুখ করে যেতে হয়।'

বললাম, 'তাও করেছি।'

'মানুষ বুঝে কথা। সবাইকে তো সব কথা বলা যায় না।' রুকি প্রকৃতই গম্ভীর হয়ে উঠলো।

রুকির কথা শুনে আমার নিজের কথাটাই মনে পড়ে গেল, 'সবাইকে তো সব জায়গায় মানায় না।' সমাজ সংসারের ক্ষেত্রে যুক্তির কথা বটে। কিন্তু এক দেহোপজীবিনীর শব বহন করাটাও আমার পক্ষে মানানসই ব্যাপার ছিল না। তবু বইতে হয়েছিল। অতএব, জীবনটা বাঁধা ছকে চলে না। কর্মে

আর দেবে, সেইখানেই মিল অমিলের দ্বন্দ্ব। রুকি আর লতাকে যুক্তির কথা শুনিয়ে গেলাম। তবে হেথা নয়, অন্য কোথাও, ভবিষ্যতে হয়তো ওদেরই অঙ্গনে একদিন দাঁড়াতে হতে পারে। সে-কথাটা এখন আর ওদের বলে লাভ নেই।

আর একবার ওদের দিকে তাকিয়ে, মুখ ফিরিয়ে পা বাড়ালাম।

'তবু যদি মনে থাকে—।' পিছনে লতার স্বর বেজে উঠে থেমে গেল।

আমি আর ফিরে তাকালাম না। মনে তো সবই থাকে। তবু সে নদী-নিরন্তরের তীর। কালের জোয়ারে পলি স্তরে অনেক স্মৃতি ঢাকা পড়ে যায়। আবার ভাটার ঢলে স্মৃতি সহসা ঝলকিয়ে ওঠে। আমার পাশে পাশে ছোঁয়া বাঁচিয়ে•এগিয়ে এলো বংকা। বললো, 'অনেক কষ্ট দিলাম দাদা। অন্যায় কিছু হয়ে থাকলে মাফ করবেন।'

'কিছু না, কিছু না।' আমি তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেলাম।

বংকা হয়তো বঙ্কিম কিংবা বংকুবিহারী। সংসারের বিপরীত সীমানায় চলে গিয়েও এখনও সংসারের সহজ সহবত একেবারে ভুলতে পারেনি। আমি ঘাটের ওপর এসে দাঁড়ালাম। চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়েছিলেন ঘাটের সর্ব্বোচ্চ ধাপে। কাছে যেতেই বললেন, 'মনে হচ্ছে, তুমি আর ট্রেন ধরতে পারবে না। শ্যামাক্ষ্যাপার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে আজ ফিরে যেতেই হবে। অথবা—'

'ও'র সঙ্গে দেখা না করলেই কি নয়?' আমি চক্কোত্তিমশাইয়ের কথা শেষের আগেই বলে উঠলাম।

চক্কোত্তিমশাই একটু যেন জোর দিয়ে বললেন, 'সেটা ঠিক হবে না। সে এদিকেই তাকিয়ে আছে। এবার খানিকক্ষণের জন্য ঘাটে এসে বসবে। রোজই বসে।'

নৌকার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পুবের মুখগুলো এখন পশ্চিমে। শ্যামা-ক্ষ্যাপার লম্বা চুল, মাথার ওপরে ঝুঁটি করে বাঁধা। ডান হাত তুলে আমাদেরই যেন কোনো ইশারা করলেন। চক্কোত্তিমশাই বললেন, 'তোমাকেই দাঁড়াতে বলছে। একটু থেকে যাও। তারপরে যদি ঠিক কর, এখানেই থেকে যাবে, তবে আমাদের বাড়িতেই চলে এসো। আমার পরিবার (অর্থাৎ ও'র স্ত্রী) আর মেয়ের তো খুবই ইচ্ছে। দুই ছেলেই কাজে গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে ওরাও খুশি হবে।'

আমি বললাম, 'যদি থাকি—'

'থেকেই যাও। নবদ্বীপের গাড়ি তো ধরতে পারবে না।' চক্কোত্তিমশাইয়ের অষ্টম হাসিটি দন্তহীন ঠোঁটে অস্তাভার আলোয় ম্লান। বললেন, নাটক নভেল পড়বার দিন চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা পড়ে। তবে তুমি এলে আমারও ভালো লাগবে।'

আমি জানি, আজ আমাকে ফিরে যেতেই হবে। সকালের যাত্রায় কাঁটা পড়ে গিয়েছে দুপুরেই। তবু বললাম, 'চেষ্টা করবো।'

'সংসার বড় বিচিত্র।' চক্কোত্তিমশাইয়ের ঠোঁটে এখনও অষ্টম হাসির স্পর্শ লেগে আছে, 'চেষ্টা করো। এবার আমি যাই।'

তিনি ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াবার উদ্যোগ করলেন। আমার শরীরটা আপনা থেকেই নুয়ে পড়লো। আমি ওঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটে কিছু বললেন। তারপরে পিছন ফিরে চলে গেলেন। সংসারকে ওঁর এই মুহূর্তেই বড় বিচিত্র মনে হলো। তার চেয়ে বিচিত্র উনি নিজে। দুপুরের প্রথম দর্শনে দেখেছিলাম এক মানুষ। এখন চলে গেলেন আর এক মানুষ। মানুষ চেনা দায়। এখনও দেখতে পাচ্ছি, তিনি দক্ষিণে গিয়ে পশ্চিমে মোড় নিয়ে চলেছেন। তাঁর পাশেই যেন দেখতে পাচ্ছি বাগানের দরজায় পুষি দাঁড়িয়ে আছে।...

আমি নৌকার দিকে ফিরে তাকালাম। এখন আবার মুক্তবেণীর ঘূর্ণি-স্রোতের টান। ডুবি কি বাঁচি, জানি না। নিশ্চল হয়ে আছি। ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে নিয়ে কেন ক্ষেপলেন, বুঝি না। আমিও ক্ষ্যাপার মন নিয়ে চলে যেতে পারতাম। কিন্তু চক্কোত্তিমশাইয়ের কথাটা অমান্য করতে পারছি না।

দেখছি, মাঝি ইতিমধ্যেই নোঙ্গর টেনে তুলেছে। এক লগি ঠেলে, নৌকা এগিয়ে আনছে ঘাটের দিকে। আর এক মাঝি ভাটার টান, লগি চেপে রুখছে।

নৌকার উত্তরের গলুই আস্তে আস্তে ঘাটের পৈঠায় ঠেকলো। দক্ষিণের গলুই ঘাটের সিঁড়ির-মাঝামাঝি। ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি ওপরের সিঁড়ির দিকে। প্রথম দেখা গৌরাঙ্গী তাঁর এক পাশে বসে, আর এক পাশে এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী। রমণী বটে, বয়সে যুবতী। মুখোমুখি সেই মন্দিরাবাদক। ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি ঘাটের ওপর দিকে। তাঁর গোঁফদাড়ি নড়া দেখে বোঝা যাচ্ছে, কিছু বলছেন। উত্তরের গলুইয়ের কাছে মাঝি আবার নোঙ্গর তুলে নিল। শক্ত হাতে ছুঁড়ে দিল পৈঠার গায়ে পলি ডাঙ্গার ওপরে। দক্ষিণের সিঁড়ির কাছের মাঝি লগি তুলে রাখলো। দাঁড়ের খুঁটি ধরে সিঁড়িতে নামলো। ভাটার টানের জোর বেশি। সে লগি টেনে নিয়ে জায়গা বুঝে জলের নিচে মাটিতে পুঁতলো। খুঁটির দড়ি টেনে বাঁধলো। নৌকা এখন ঘাটের গায়ে লাগানো।

চক্কোত্তিমশাই চলে গিয়েছেন, অন্তত বিশ মিনিট আগে। এর মধ্যেই ম্লান রক্তিম রোদে ছায়া নেমে এসেছে। চিতার ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে। আমার কাঁধে ঝোলা। হাতে ভিজা জামাকাপড়ের পুঁটলি। দাঁড়িয়ে আছি ঘাটে। পায়ে আমার বেড়ি পরিয়ে রেখে গিয়েছেন চক্কোত্তিমশাই। দেখছি, কতোক্ষণে

শ্যামাক্ষ্যাপা ডাঙ্গায় নেমে আসেন। কে দেন মন্ত্রণা। কে ভোগ করে যন্ত্রণা।

মন্দিরবাদক ঢুকলো ছইয়ের মধ্যে। বেরিয়ে এলো পলকেই। হাতের ভাঁজ করা বস্তুটি দেখে মনে হলো মোটা ভারি শতরঞ্চি জাতীয় কিছু। পা বাড়ালেই চওড়া পৈঠা। নেমে এসে কয়েক ধাপ ওপরে উঠলো। শতরঞ্চির ভাঁজ খুলে পেঠা আর সিঁড়ির খানিকটা জুড়ে পাতলো। ক্ষ্যাপাবাবাও উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে রমণীদ্বয়। প্রথমার মতো, দ্বিতীয়ারও শাড়ি-জামায় আধুনিকতার ছোঁয়া। দুজনেরই দেখছি চুলে খোঁপা বাঁধা। গৌরাঙ্গীর গায়ে একটি কালো শাল। শ্যামাঙ্গীর লাল। উঁচু ধাপ থেকেও দেখতে পাচ্ছি, দুজনের কারো অঙ্গেই কোনো অলংকারের ঝিলিক নেই। ক্ষ্যাপাবাবার গায়ে দুপুরের সেই কম্বলটিই জড়ানো। দাঁড়াবার পরে দেখছি, তাঁর গাঢ় গেরুয়া বা রক্তবাস কচ্ছহীন।

অতঃপর ক্ষ্যাপাবাবা কি দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে নামবেন? না, সে-রকম কিছু করলেন না। দীর্ঘদেহী মানুষটি নিজেই পেঠায় পা দিয়ে নেমে এলেন। বুকের কাছে কম্বলটা আলগা হয়ে গেল। ফাঁকে দেখা গেল, ভিতরে কোনো জামা নেই। গলা থেকে বুকে ঝুলছে রুদ্রাক্ষের মালা। নেমে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরবাদক ওপরে উঠে এলো। আমার সামনে এক ধাপ নিচে দাঁড়িয়ে, রীতিমত ভদ্রোচিত বিনয়-বাক্য নিবেদন, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

'স্মরণ করেছেন' বললেই যেন শোভা পেতো। আমি বিনা প্রশ্নেই সিঁড়ি ভাঙতে লাগলাম। ক্ষ্যাপাবাবা পুব মুখো হয়ে শতরঞ্চির ওপর বসে গিয়েছেন। দুই যুবতীও নেমে এসে বসলো তাঁর এক পাশে, পাশাপাশি। মনে একটা জিজ্ঞাসা ছিল। কাছাকাছি নেমে এসে দেখলাম, যুবতীদের সিঁথি শাদা। মন্দিরবাদক শতরঞ্চি পাতা সিঁড়ির এক ধাপ নিচে নেমে আমাকে আবার ডাকলো, 'এখানে আসুন।'

ক্ষ্যাপাবাবা মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন। ধূসর গোঁফদাড়ি মুখে, উন্নত নাসা, বড় এক জোড়া চোখ আগেই দেখেছিলাম। এখন দেখলাম চোখ দুটি উজ্জ্বল। মাথার চুল চূড়ো করে ঝুঁটি বাঁধা, মুখটি সেইজন্যই যেন লম্বা দেখাচ্ছে। বার্ধক্যের রেখা অল্পবিস্তর থাকলেও মুখে একটি কোমলতা আছে। একদা খুবই সুপুরুষ ছিলেন, দেখলেই বোঝা যায়; এবং এখনও। তাঁর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ের পরেই গৌরাঙ্গী আর শ্যামাঙ্গীর সঙ্গেও সংখ্যায় ছ'চোখের মিলন। হাসি হাসি মুখ। চোখে কৌতূহল। ক্ষ্যাপাবাবা হেসে ডাকলেন, 'এসো হে ধর্মাত্মা, এদিকে এসো।'

ক্ষ্যাপাবাবার স্বর মোটেই ক্ষ্যাপাটে না। বজ্রকণ্ঠের হুংকার নেই। বরং ভরাট গম্ভীর স্বরে কোমলতার আভাস। তবে বিদ্রূপ আছে কী না, বুঝতে

পারছি না। আমি এক ধাপ নেমে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তিনি আমার পাশে মন্দিরাবাদককে বললেন, 'ওরে রতন, ওর হাত থেকে ভেজা কাপড়ের পুঁটলিটা নে। এক জায়গায় রাখ।'

রতন আমার হাত থেকে পুঁটলিটা নিয়ে সিঁড়িতেই রাখলো। ক্ষ্যাপাবাবা ঝুঁকে পড়ে আমার হাত টেনে ধরলেন, 'এসো ধর্মাত্মা, আমার কাছে এসে বসো।'

চক্কোত্তিমশাইয়ের মুখেই শুনেছিলাম, তিনি আমাকে ধর্মাত্মা বলেছেন। শুনলে বিদ্রূপ ছাড়া, আর কিছু মনে আসে না। যে কারণে ধর্মাত্মা মহাত্মা, আমি সে-রকম কোনো ধর্মেও নেই। মহত্বেও নেই। পায়ের স্যান্ডেল খুলে শতরঞ্চির ওপর উঠলাম। ক্ষ্যাপাবাবা টেনে বসিয়ে দিলেন তাঁর পাশে। অন্য পাশে দুই যুবতী। রতনও বসলো আমার কাছাকাছি। পা রাঁখলো নিচের সিঁড়িতে। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ধরেই আছেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'গৌরহরি চক্রবর্তী আমার কথা তোমাকে বলেছিল?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলেছিলেন।' আমি বললাম।

ক্ষ্যাপাবাবা তাঁর বড় উষ্ণ হাতে আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'ভেবেছিলাম আমি নিজেই তোমাকে বলবো। কিন্তু চক্রবর্তীকে দেখেই বুঝলাম, তোমাকে সে নিয়ে যাবে। তাই তাকেই বলতে হল। নইলে, তুমি যখন চা[illegible] করছিলে তখনই বলতাম। ভাবলাম, চক্রবর্তীর সঙ্গে চলে গেলে, ধর্মাত্মাটিকে আর পাবো না।'

ভেবেছিলাম, ঠাট্টা বিদ্রূপ যাই হোক, কিছু বলবো না। কিন্তু মনের গতি ভিন্ন পথে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ধর্মাত্মা বলছেন কেন, বুঝতে পারছি না।'

ক্ষ্যাপাবাবা দুই যুবতীর দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচালেন। রতনের দিকেও তাকালেন। সকলের মুখেই মিটিমিটি হাসি। ভুরুর নাচে কথা আছে। ইঙ্গিতে প্রমাণ। কিন্তু কথা কোন দিকে বহে, বুঝতে পারি না। তিনি বললেন, 'কেমন, যা বলেছিলাম, মিলে যাচ্ছে তো?'

দুই যুবতী আর রতনের হাসি কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হলো। মুখে বাক্যি নেই। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাতে চাপ দিয়ে বললেন, 'সব দেখলাম, খবর নিলাম, তখনই এদের বললাম, দ্যাখ একটা ধর্মাত্মা এসেছে।'

আমি তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ায় এখনও সবই প্রায় স্পষ্ট। তিনিও উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে দেখছেন। গোঁফ-দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসির উঁকিঝুঁকি। বললাম, 'কিন্তু আমি তো কোন ধর্ম-টর্ম করি নে।'

ক্ষ্যাপাবাবা আবার তাঁর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হেসে ভুরু নাচালেন, 'কী গো গঙ্গা যমুনা, ওরে রতন, মিলে যাচ্ছে তো?'

গঙ্গা আর যমুনা নিশ্চয় দুই যুবতী। সকলেই ঘাড় ঝাঁকিয়ে হাস্য করলো।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাতটা একবার তুলে ধরলেন। আবার নামিয়ে নিলেন, 'জানি, তুমি দেবদেবী ভজো না, পুজো আর্চা করো না, ফোঁটা তিলক কাটো না। আমার মতো ভেকধারীও নও, কেবল বেশ্যার মড়া তোমার কাঁধে চেপে বসে।' ভরাট গলায় হা হা হাসলেন। হাসি না, টপ্পা অঙ্গের বড় দানা।

গঙ্গা যমুনা রতনের চোখ আমার দিকে। তাদের হাসিতে আওয়াজ নেই, কেবল ঠোঁটের কোল ছাপিয়ে অঙ্গে ঢেউ তোলে। ক্ষ্যাপাবাবার হাসি লয়ে এসে থামলো, 'তুমি যদি বলো, মড়া তোমার ঘাড়ে কেউ জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে, আমি মানবো না। কর্মের নাম ধর্ম, তোমার ধর্ম। তুমি কাঁধে নিয়েছ। এখন তুমিই ভেবে দেখ, তোমার মধ্যে সেই ধর্ম কোথায় আছে।'

আমি বললাম, 'ধর্ম তো কোথাও নেই। একজন বইতে পারছিল না। আমাকে কাঁধ দিতে বললো। আমি থাকতে পারলাম না।'

'অই অই, ওটিই তোমার ধর্ম।' ক্ষ্যাপাবাবা এবার দু হাত দিয়ে আমার হাত ধরলেন, 'মনের কলে বইসে ধর্ম, করিয়ে নেয় আপন কর্ম। তখন ঘণ্টা বেজে ওঠে। মন্দিরে ঢুকে যে যার ঘণ্টা বাজিয়ে যায়। কারো কারো ঘণ্টা কে বাজায়, দেখা যায় না। কিন্তু শোনা যায়। এখন, তোমাকে আমার [illegible]ত্মা মনে হয়েছে, তাতে তোমার আপত্তিটা কিসের? আমার মনে হলে আমি [illegible] না?' তিনি মুখ এগিয়ে এনে আমার দিকে তাকালেন।

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলাম না। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে নিবিড় হয়ে আসছে। আমি তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি দেখতে পাচ্ছি। গোঁফদাড়ির [illegible] ভাঁজে বিচ্ছুরিত হাসি। বাকিদের মুখের হাসিও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাদের হাসি এখন ঠোঁটের কূল উপছানো না। বরং চোখের কৌতুহল গভীর। আমি হেসে বললাম, 'আপনার কথা আপনি তো বলবেনই।'

'তবে?' ক্ষ্যাপাবাবার মুখ যেন আরও ঝুঁকে এলো।

আমি অস্বস্তিতে হাসলাম, 'আমার লজ্জা করে।'

ক্ষ্যাপাবাবার ভরাট গলায় আবার সেই টপ্পা অঙ্গের বড় দানা হাসি। আমার হাত ছেড়ে, দু হাত দিয়ে কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিলেন, 'করবেই তো। ওটাও তোমার ধর্ম। তুমি কি আমার কথায় ধেই নেত্য শুরু করে দেবে? এবার বলো তো ওবেলা আমার বাজনা কেমন শুনলে?'

বললাম, 'খুব সুন্দর। অনেক নাম-করা বাজিয়েদের থেকেও আপনার হাত আশ্চর্য রকমের ভালো।'

'আশ্চর্য রকমের ভালো।' ক্ষ্যাপাবাবা দু হাত তুলে তেমনি হাসলেন, 'তোমার প্রশংসা শুনে আমার কিন্তু লজ্জা-টজ্জা করছে না। তাহলে, সত্যি ভালো বাজাতে পারি, অ্যাঁ?' আবার হাসি, 'মনে আনন্দ হলেই বাজাই। ও বেলা তখন আনন্দ হয়েছিল, বাজাতে বসে গেলাম। সুরে কোনো ভুল-টুল হয় নি তো, অ্যাঁ?' তিনি আবার মুখের কাছে ঝুঁকে এলেন।

যাঁর হাতের আঙুলে ঐরকম অপরূপ সুর বাজে তিনি আমাকে ভুলের কথা জিজ্ঞেস করছেন। ঠাট্টা না তো? বললাম, 'ভুলের বিচার জানি নে, মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম।'

আবার সেই টপ্পা অঙ্গের বড় দানা হাসি, 'তোরা শোন, শোন, ও মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। ওর ধর্মটা বুঝে নে।'

গঙ্গা যমুনা রতনের হাসি এখন ঠোঁটের কূল ছাপিয়ে অঙ্গে খেলছে। এখন আর কারোর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত নামছে। মাঝদরিয়ায় চরের রেখা ঝাপসা। ওপারে অন্ধকার। আমিও মনে মনে ব্যস্ত হলাম। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বুঝে নিয়েছি তোমাকে। তা ধর্মাত্মা—'

'দোহাই, ওই বলে আমাকে ডাকবেন না।' আমি বলে উঠলাম।

ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বাজলেন, 'কানে বাজে, না? বেশ, ডাকবো না। নাম বলো।'

নাম বললাম। তিনি বললেন, 'খাসা নাম। তা বাপ আমার, এবার বলো তো, কোথা থেকে আসছিলে, কোথায় যাচ্ছিলে?'

বললাম, 'বেশি দূরে থেকে আসিনি, ইচ্ছে ছিল, ত্রিবেণী ঘুরে, ঘুরতে ঘুরতে উত্তরে যাবো।'

'ঘুরতে ঘুরতে উত্তরে?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে বিস্ময়, 'খোলসা করে বলো বাপ। ঘুরতে ঘুরতে মানে কী? কেমন করে? কোথায়?'

এখানে সত্যি বলতে অসুবিধা নেই। বললাম, 'কোথায়, সে জায়গা ঠিক করে বেরোইনি। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম? কষ্ট হলে রিক্‌শায় চাপতাম। তেমন দেখলে রেলগাড়ি ধরতাম।'

'অ্যাঁ? রাত হয়ে গেলে থাকতে কোথায়?'

'জায়গা একটা জুটিয়ে নিতাম।'

'তার মানে, আহার যত্রতত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে?'

হেসে বললাম, 'তা বলতে পারেন। তবে ঐ হট্টমন্দিরকে একটু ভয়। নিরিবিলি পেলে ভালো।'

'তা বাপ আমার, কী কাজ করা হয়? পেটের ভাবনা ভাবতে হয় তো?'

'তা হয়। কাজও কিছু করি।'

'তারপরেও এইভাবে বেরিয়ে পড়া?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে বিস্ময় বাড়ছে, 'কী কাজ করা হয়?'

এখানেই ঠেক। হঠাৎ জবাব এলো না মুখে। ক্ষ্যাপাবাবা নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলতে অসুবিধা আছে?'

হেসে বললাম, 'না, অসুবিধে আর কি। কাগজপত্রে একটু লেখালেখি করি। আর বাকিটা সবই অকাজ।'

'ওলো, তোরা শোন। শুনছিস?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে যেন খুশি

বিস্ময়ের ঢেউ, 'ও কাজ করে, আবার অকাজও করে। তবে অকাজটাকেই ধরি। রতন।'

রতনের তৎক্ষণাৎ জবাব, 'বাবা।'

'ওর ভেজা জামাকাপড়ের পুঁটলিটা নৌকোয় ছুঁড়ে দে।' ক্ষ্যাপাবাবা আদেশের স্বরে বললেন।

আমি ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'কেন?'

'সে-জবাব পরে।' ক্ষ্যাপাবাবার স্বর গম্ভীর।

মুখ দেখতে পাচ্ছি না। গাম্ভীর্যটা কপট মনে হলো। বললাম, 'কিন্তু আমাকে যে ফিরতে হবে।'

'কোথায়?'

'ঘরে।'

'মানে, অকাজে বেরিয়ে আবার কাজে?'

'কী করবো বলুন। রাত্রে আর কোথায় যাবো।'

'সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। কী হলো রে রতন।' ক্ষ্যাপাবাবা তাড়া দিলেন।

রতন আমার পুঁটলিটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণ ভেবেছিলাম, নামেই ক্ষ্যাপা। মানুষটি আসলে শান্ত সদাশয়। এখন দেখছি, সত্যি ক্ষ্যাপাবাবা। আমি তাড়াতাড়ি রতনের দিকে হাত বাড়ালাম, 'না না, ওটা নেবেন না। আমার যাবার পথে ও-বেলাই কাঁটা পড়ে গেছে। আজ ফিরেই যাবো।'

'ফেরাচ্ছি।' ক্ষ্যাপাবাবার হাত আমার কাঁধে চেপে বসলো, 'ধরা যখন পড়েছ, ছাড়া পাচ্ছো না। সময় পেলে উত্তরের হাঁটাপথে জায়গা জুটিয়ে নিতে। সে-জায়গা আমিই জুটিয়ে দিচ্ছি।'

বলেও বিপদ। রতন সত্যি সত্যি আমার জামা-কাপড়ের পুঁটলিটা নৌকার পাটাতনে ছুঁড়ে দিল। আমি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। ক্ষ্যাপাবাবা ক্ষ্যাপা স্বরে বললেন, 'গঙ্গা, দড়ি নিয়ে আয়, এ পালাবার চেষ্টা করছে।'

আমার চোখ ছানাবড়া। দেখি গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো। সত্যি দড়ি আনবে নাকি? বেঁধে নিয়ে যাবেন! পরমুহূর্তেই আমার গালে গলায় গোঁফদাড়ির স্পর্শ। ক্ষ্যাপাবাবা দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। প্রায় আদর করে গালে গাল ঠেকিয়ে বললেন, 'কেন বাপ এমন করছ? তোমার অকাজের যাত্রাটা আমাদের সঙ্গেই কর। ডাঙাপথে না করে, জলপথে যাবে। খেতে কষ্ট হবে। তা হোক, ও সব কষ্টে তোমার কিছু যায় আসে না, বুঝে নিয়েছি। কিন্তু হট্টগোলে থাকতে হবে না। কথা রাখো বাপ।'

ঘাটে এখনও এদিকে ওদিকে লোক। সবাই যে যার মনে। এমন কি দু একজন স্নানও করছে। ওপরের বিজলী আলোর রেশ নিচে এসে তেমন পৌঁছয়নি। এখানে কী ঘটছে, কারো মাথা ব্যথা নেই। দেখা করতে

এসে এমন ফাঁদে পড়ে যাবো, বুঝতে পারি নি। মন খুলে কথা বলার কী ঝক্কি।

কিন্তু এমন নেই-আঁকুড়ে আদরবাসার লোকও দেখিনি, যাঁকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। কী বলবো, বুঝতে পারছি না। এদিকে গোঁফদাড়ির সুড়সুড়িতে অস্বস্তি।

'দাঁড় কি আনবো বাবা?' অন্ধকারে গঙ্গার স্বরে যেন বীণার ঝংকার। বীণার ঝংকারে, দাঁড়ের প্রশ্ন।

অন্য স্বরে মন্দিরার মৃদু ধ্বনি যেন বেজে উঠেই থেমে গেল। যমুনা হাসছে? ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'দাঁড় আনবি কি হাতে ধরে নিয়ে যাবি, সব ওর ওপরে নির্ভর করছে।' স্বর চড়িয়ে বললেন, 'কই রে লোচন, বাতি-টাতি জ্বালবি নে?'

নৌকা থেকে জবাব এলো, 'ভেতরের হারিকিন জেবলে দিইচি বাবা। বড় বাতি জ্বালতে নেগেচি।'

'তা হলে চলো বাপ, ভেতরে গিয়ে বসি।' ক্ষ্যাপাবাবা মুখ সরিয়ে নিলেন, 'এ ঠাণ্ডায় বসে কষ্ট হবে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'এখনই নৌকা ছেড়ে দেবেন নাকি?'

'না, কাল ভোরে রওনা দেবো।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ভয় নেই, হাটে না হোক, অনেক ঘাটে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবো।' তিনি আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন।

আমাকেও উঠে দাঁড়াতে হলো। বললাম, 'কিন্তু আমার জন্য আপনাদের অসুবিধে হবে।'

'তা বটে। সেই জন্যই তো তোমাকে নিয়ে আমার এত টানাটানি।' ক্ষ্যাপাবাবার আবার সেই হাসি, 'ব্যাটা ধর্ম ছেড়ে নড়ে না।'

যমুনা উঠে দাঁড়ালো। গঙ্গা বললো, 'দাঁড়ান বাবা, আমি ভেতরের আলোটা বের করে আনি।'

গঙ্গার সঙ্গে যমুনাও গেল। ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ধরে এক ধাপ নামলেন। রতন শতরঞ্চিটা তুলে ভাঁজ করলো। সকলেরই খালি পা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার স্যাণ্ডেল জোড়া কী করবো?'

'গঙ্গায় ফেলে দিতে হবে না। পায়ে পরে নৌকায় ওঠো।' ক্ষ্যাপাবাবা নিজেই আমাকে হাত ধরে সরিয়ে আনলেন।

আমি পায়ে স্যাণ্ডেল গলিয়ে নিলাম। রতন নৌকায় উঠে গিয়েছে। গঙ্গা ছইয়ের ভিতর থেকে আলো নিয়ে এগিয়ে এলো। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে দেখলাম, নৌকা আরও হাতখানেক নিচে নেমেছে। ভাটার টলে জল নামছে। গঙ্গার স্বর শোনা গেল, 'সাবধান, নিচের সিঁড়ি পেছল আছে।'

'লক্ষ্য রাখিস রতন।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত জোরে চেপে ধরলেন, 'পা বাড়িয়ে দাও, উঠে পড়ো।'

স্যাণ্ডেলের নিচে পলি আর শ্যাওলার পিছল টের পাচ্ছি। সাবধানে পা বাড়িয়ে নৌকায় উঠলাম।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার হাত ছেড়ে দিলেন। তারপরে নিজে উঠলেন। রতন উঠলো সব শেষে। পাটাতনে পা দিয়ে বুঝলাম, মাজা মিহি পরিচ্ছন্ন কাঠ। ছইয়ের ভিতরে ঢোকবার মুখে, নারকেল দড়ির পাপোষ। সরে গিয়ে স্যাণ্ডেলটা রাখলাম গলুইয়ের ধারে।

শ্মশানের দিকে তাকালাম। চিতা দেখতে পাচ্ছি না। নৌকা অনেক সরিয়ে আনা হয়েছে। আগুনের আলো দেখতে পাচ্ছি। চন্দ্রাবলীর দেহ পুড়ছে। আগুনে সব একাকার। চন্দ্রাবলীর শরীরে কতো পুরুষের সুখ পুড়ছে? চন্দ্রাবলীর নিজের কোনো সুখ ছিল কী? তবে তাও পুড়ছে। দুঃখ যন্ত্রণা ধিক্কার, সব পুড়ছে। ওপরের দিকে তাকালাম। মন্দিরে ঘণ্টা কাঁসর বাজছে। দোকানে রাস্তায় ঘাটের ওপরে, আলো জ্বলছে। লাল পাড় শাড়ি, কপালে সিঁথেয় সিঁদুর, প্রৌঢ়ার কথা মনে পড়ছে, 'আজকের রাতটা এখানেই থেকে যাও।' ত্রিবেণীতে থেকেও বৈপরীত্যের স্রোত কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে। তারপরেও আমার চোখের সামনে ভাসছে, একটা পুরনো বাড়ির দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তো আমাকে 'মিথ্যেবাদী' বলতে পারে না। তাই বোধ হয়, তাদের বাড়ি যেতে বারণ করেছে। করেও 'সত্যি' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। দোয়েলটা এখন আর ডাকছে না নিশ্চয়ই। সঙ্গীকে নিয়ে বাসায় ফিরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

সংসারের কূলে বসেও যেন অকূলে ভাসছি। নৌকার ছইয়ের ভিতরে ছোট একটি হ্যাজাকের আলো ঝুলছে মাথার ওপরে। আলো ঝলকানো ছোট একটি ঘরের মতো। মোটা নরম গদী পাতা। বালিশ কম্বল ছড়ানো। মাঘের শীতে সুখের ওম করা। সুগন্ধ ধূপকাঠি জ্বলছে নিরাপদ কোণে। উত্তরের পাটাতনে ইতিমধ্যেই একটি মাত্র বাঁশের ওপর ত্রিপল দিয়ে নিশ্ছিদ্র তাঁবু খাটানো হয়ে গিয়েছে। তবু পাছে উত্তরের হাওয়া আসে, তাই উত্তরের ছইয়ের মুখ-ছাটের দরজা বন্ধ। দক্ষিণের দরজা খোলা। সেখানে কাঠের উনোন জ্বলছে। রান্না বসেছে।

দক্ষিণের দরজার দুপাশে গঙ্গা যমুনা বসেছে। রতন মাঝিদের সঙ্গে বাইরে। রান্নার প্রয়োজনীয় দ্রব্য গঙ্গা যমুনা এগিয়ে দিচ্ছে। রতনের ওপরেই রান্নার ভার বটে। তবু গঙ্গা যমুনা মাঝে মাঝে উঠে যাচ্ছে। আবার এসে বসছে। ক্ষ্যাপাবাবা বসেছেন মাঝামাঝি জায়গায়। আমি তাঁর মুখো-মুখি। ভাটার ঢলে নৌকা একেবারে স্থির থাকতে পারে না। ঢলের সঙ্গে

অল্প ঢেউয়ে, নৌকা মৃদু মৃদু দুলছে। ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে আমার কথা চলছে।

আমার কথা শুনে ক্ষ্যাপাবাবাও দুলছেন, আর নিঃশব্দে হাস্য করছেন, 'গৌরহরি কেবল ওইটুকুনি বলেছে? আমার শ্যামা আছে, আমি সাপ গায়ে জড়িয়ে থাকি। আমার মন্দিরে বলি হয় না। শ্যামাক্ষ্যাপা নামও বলেছে। কিন্তু আসল কথাগুলোই তো বলে নি। আমি মদ ভাঙ গাঁজা খেয়ে পড়ে থাকি, রূপসী যুবতী মেয়েদের নিয়ে র‍্যালা করি, এ সব কি বলেছে?'

ঠোঁটে হাসি, চোখে কৌতুক, গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার দিকে দেখছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে। গঙ্গা যমুনা রূপসী নিঃসন্দেহে। গৌরাঙ্গী গঙ্গার মুখ একটু গোল, পুষ্ট ঠোঁট, ভাসা চোখ, টিকলো নাক। যমুনার মুখ ঈষৎ লম্বা, টানা চোখ, কচি আমপাতা রঙ। বাকি সবই একরকম। তবু, গঙ্গার স্বাস্থ্যে দোহারা গড়ন। যমুনা সেই তুলনায় একহারা দোহারার মাঝামাঝি। বয়স অনুমান বৃথা। বিশেষ যুবতী, কাল যৌবন। বয়সের হিসাব সেই কালের গভীরে বহে।

ক্ষ্যাপাবাবা নিঃসন্দেহে রঙ্গ করছেন। না হলে নিজের কথা এমন করে বলতেন না। বললাম, 'না, তা বলেনি।'

ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি অবাক চোখে একবার দেখলেন গঙ্গার দিকে। আর একবার যমুনার দিকে। 'শুনছিস তোরা? গৌরহরি কেমন লোক বুঝতে পারছিনে।'

গঙ্গা যমুনা চোখাচোখি করে হাসলো। একবার আমার দিকে দেখে, আবার ক্ষ্যাপাবাবার দিকে। তাঁর চোখে সেই ভ্রূকুটি বিস্ময়। আমাকে বললেন, 'ডাকাতের দল পুষি, লুটে পুটে খাসা আরামে আছি, সে-সব কিছুই বলেনি?'

আমি হেসে মাথা নাড়লাম। ক্ষ্যাপাবাবার চোখে তেমনি ভ্রূকুটি বিস্ময়। একটু বা হতাশা, 'ও গঙ্গা, অইরে যমুনে শুনছিস? গৌরহরিটা কোনো খবর রাখে না, খালি হাঁকডাক করে।'

বাইরে থেকে রতনের গলা ভেসে এলো, 'গোরাবাবুর ভারি কান, বোকা মানুষ। কিছু জানে শোনে না।'

'এই হারামজাদা, তুই চুপ কর।' ক্ষ্যাপাবাবা ধমকে উঠলেন। চোখে ঝিলিক হানছে।

গঙ্গার স্বরে বীণার ঝংকার। যমুনার স্বরে মন্দিরা। হাসি চাপতে গিয়ে মুখে হাত। ক্ষ্যাপাবাবা চিন্তিত মুখে বললেন, 'গোটা ত্রিবেণীর লোক যা জানে, গৌরহরি তা জানে না? তা হলে তো তাকে একদিন আশ্রমে নেমন্তন্ন করে নিয়ে যেতে হয়।'

'কেন?' গঙ্গার ভাসা কালো চোখে অবাক দৃষ্টি।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'তাকে একবার আমার সব কিছু দেখিয়ে আনতে হয়।'

'কারোকে দেখিয়ে আনবার কী দরকার বাবা?' যমুনা একবার চকিত কটাক্ষে আমাকে দেখলো, 'উনি তো যাচ্ছেন, কাগজেপত্রে লিখে দিলেই সবাই সব জানতে পারবে।'

ক্ষ্যাপাবাবা টপ্পা অঙ্গে বড় দানায় বেজে উঠলেন, 'বাহ্, বেশ বলেছিস। সাধে কি আর বলি, মায়ের ডাকিনী যোগিনীগুলো আমার ভালোই জুটেছে।'

"ও, মেয়েরা এখন ডাকিনী যোগিনী হয়ে গেল?' গঙ্গা ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে ঠোঁট ফোলালো।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকালেন, 'রাগ দেখেছো? আসলে যে সবাই এক, তা বোঝে না। তখন তোমাকে চারহেতে ল্যাংটা মেয়ের কথা বলছিলাম না? এতখানি জিভ বের করা। সে আর এরা সবাই তো এক। নামে আলাদা। বোঝে না, কিছু বোঝে না। আচ্ছা, আয় দুজনেই কাছে আয়।'

ডাক শুনেই গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার কোলের কাছে এগিয়ে এলো। তিনি দু হাতে দুজনের বাঁহাত ধরে তুলে নিজের মাথায় রাখলেন, 'নে, এবার রেগে যা খুশি তাই বল, শাপশাপান্ত কর। কিন্তু মিথ্যে বলি নি। ডাক যোগের কথা যারা জানে না, তারা ডাকিনী যোগিনী বুঝবে কেমন করে?'

গঙ্গা যমুনা দুজনেই ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে দিল। ক্ষ্যাপাবাবা হাসছেন, কিন্তু চোখের কোণে জল। এ রহস্য বোঝা আমার কর্ম না। ক্ষ্যাপাবাবা দুজনের হাত দুটি ধরে নিজের বুকে কয়েক মুহূর্ত রাখলেন, 'যা, নিজেদের জায়গায় গিয়ে বোস। নইলে ছেলেটা ভাববে, এ আবার কী ন্যাকামি শুরু হলো।'

দুজনেই সরে বসলো। গঙ্গা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'সত্যি তাই ভাবছেন?'

'তা কেন ভাববো।' আমি হেসে বললাম, 'আমি দেখলাম, মেয়েদের অভিমান, বাবার আদর।'

গঙ্গা যমুনা ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো। তিনি ওদের দিকে হেসে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'ও তো ধর্মে নেই, অথচ ও রকম ভাবাটাই ওর ধর্ম।' আমার দিকে মুখ ফেরালেন, 'হ্যাঁ, শাক্ত শক্তি সাধন নিয়ে যেন কী কথা হচ্ছিল?'

বললাম, 'আমার কথার জবাবে আপনি বলছিলেন, আপনি শাক্ত। শক্তি সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা।'

'পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন সাধনা।' ক্ষ্যাপাবাবার উজ্জ্বল চোখের

দৃষ্টি আমার দিকে, 'শক্তি তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানা আছে নাকি ?'

এই মুহূর্তে আমার অনেক কথা মনে পড়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠলো কিছু মুখ। কিন্তু সে-সব কথা আমি বলতে চাই না। হেসে বললাম, 'কেমন করে জানবো বলুন। আমি তো অনধিকারী।'

'অনধিকারী !' ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো, 'অনধিকারী ? এ কথা কেন বললে ? কেন অনধিকারী, কিসের ?'

বলেও ফ্যাসাদ করলাম দেখছি। আমি হেসেই বললাম, 'সব বিষয়ে সকলের জানার অধিকার নেই, তাই বলছি—।'

'বুঝেছি, বুঝেছি বাপ আমার, তোমার কথা বুঝেছি।' ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বিষয়ে যে সকলের জানার অধিকার নেই, এ কথাটি কোথা থেকে জানলে ?'

বললাম, 'শুনেছি।'

'কার কাছে ? কোথায় ?' ক্ষ্যাপাবাবার দৃষ্টি আমার চোখের দিকে।

অই হে, আমার অবস্থা দেখছি, এঁড়ে গরু, না টেনে দো। এঁড়ে গরুকে কি দোহন করা যায় ? যতো এড়িয়ে যাই, পা ততোই ফাঁদে। বললাম, 'প্রথম শুনেছিলাম আমার বাবার কাছে।'

'তার মানে, তুমি শাক্ত পরিবারের ছেলে।'

'আমার বাবা শাক্ত ছিলেন।'

'বুঝলাম। তারপরে কার কাছে শুনেছো ?'

আমি চুপ করে রইলাম। অস্বস্তিতে হাসলাম। ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গা আর যমুনার দিকে একবার দেখে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'তার মানে বলতে চাও না। বেশ। কী শুনেছো ?'

আমি মুখ ফিরিয়ে গঙ্গা আর যমুনার দিকে দেখলাম। ওদের চোখ আমার দিকে। ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'শুনেছি শক্তিতত্ত্ব গোপন তত্ত্ব। কেবল সাধক সাধিকারাই জানেন।'

'ও গো তোরা শোন, ও তো ধর্মে নেই, কিন্তু এমনি কথার কথা বলে।' ক্ষ্যাপাবাবার গলার স্বরে আবেগ, 'আর একটু খোলসা করো বাপ।'

বললাম, 'আর তো আমার খোলসা করার কিছু নেই। আমি তো অনধিকারী, গোপন তত্ত্ব আমার জানবার কথা নয়। তবে—।' নিজের কাছেই ঠেক খেলাম। ঠিক জায়গায় থামতে জানি না।

'বলো, তবে ?' ক্ষ্যাপাবাবার স্থির দৃষ্টি আমার দিকে।

বললাম, 'নারীর সম্মানের কথা শুনেছি, আর কোথাও যা শুনিনি, পড়িনি।'

'কী শুনেছো ?' ক্ষ্যাপাবাবার গলা যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

বললাম, 'শুনেছি নারী ত্রিলোকের জননী, তিনিই জগতের স্বরূপিণী,

তিনি বিদ্যা, তিনি পরম ব্রহ্ম, তিনিই শক্তির আধার। তাঁকে সর্বদা সেবা করা উচিত।'

ক্ষ্যাপাবাবার হা হা হাসির স্বরে এবার যেন পাখোয়াজের উচ্চদ্রুত তালধ্বনি। চোখে জল। প্রায় ঝাঁপ দিয়ে এগিয়ে এসে আমার দু কাঁধে হাত দিলেন, 'আবার বলো, আবার বলো।'

আবেগের অনুভূতিটা কি সংক্রামক? বললাম, 'শুনেছি, যিনি শক্তি, তিনিই প্রেম। প্রেমই শক্তির আধার।'

ক্ষ্যাপাবাবার গোঁফদাড়িসুদ্ধ মুখ আমার মুখের ওপরে। দু হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। কথা বলতে পারছেন না। তাঁর চোখের জল আমার গালে লাগছে। আমার চোখ পড়লো গঙ্গা যমুনার দিকে। দেখছি, ওদের চোখেও জল, দৃষ্টিতে মুগ্ধতা। দক্ষিণের মুখ-ছাটের দরজার সামনে রতন এসে বসেছে। কিন্তু গোঁফদাড়িতে বড় গোল। ক্ষ্যাপাবাবা রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'ওগো তোরা শোন। ও তো ধর্মে নেই। এমনি করে বলে।' বলেই সরে গিয়ে, আমার দিকে চোখ রেখে হাঁকলেন, 'রতন।'

'বাবা।' রতন জবাব দিল।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'এটাকে গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আয়, নইলে কথা বেরোবে না।'

আমি রতনের দিকে তাকালাম। রতন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'রান্না হয়ে গেছে বাবা। আগে খাইয়ে নিই, তারপরে চুবোব।'

'হারামজাদা!' ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বললেন। তাঁর চোখের কোলের জল, গোঁফদাড়িতে চিকচিক করছে, 'তবে দে, খেতে দে। সবাই একসঙ্গে বোস।'

সুগন্ধি চাল আর ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ির গন্ধ নাকে লাগছে। এখনও কিছু ভাজা হচ্ছে। তার ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ পাচ্ছি। গঙ্গা যমুনা উঠে গেল দক্ষিণের পাটাতনে। সেখানেও, ছইয়ের ওপর থেকে গলুই পর্যন্ত বাঁশ রেখে ত্রিপলের তাঁবু খাটানো হয়েছে। দেখতে দেখতে জায়গা হয়ে গেল। ঝকঝকে থালা-বাসন দেখে ভেবেছিলাম, খাদ্য পরিবেশন ওতেই হবে। কিন্তু দেখছি, সবলের জন্য কলাপাতা। মাঝিরা সব এক পাশে গিয়ে বসেছে। গঙ্গা আর যমুনা পরিবেশন করলো। গরম খিচুড়ির মধ্যে আলু আর কপি। বেগুন আর বড়ি ভাজা। আমি খাবারে হাত দেবার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'সকলের যে একসঙ্গে বসার কথা?'

গঙ্গা যমুনা চোখাচোখি করে হাসলো। যমুনা আরও দুটি পাতা নিজেদের সামনে পেতে নিল। গঙ্গা বললো, 'আপনারা আর একটু এগোন, তারপরে আমরা বসছি।'

ক্ষ্যাপাবাবাই সব থেকে কম খেলেন। সব শেষে নলেন গুড়ের মাখা সন্দেশ আমাদের পাতে দিয়ে গঙ্গা যমুনা নিজেদের পাতায় খিচুড়ি নিল। একজন

মাঝি নৌকার ধারের ত্রিপল তুলে ধরলো। আর একজন জলের বালতি থেকে ঘটিতে জল তুলে হাতে ঢেলে দিল। রতন বাইরে রইলো, আমি ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে ছইয়ের ভিতরে এসে বসলাম। ধূমপানের নেশাটা তীব্র হয়ে উঠলো। পকেটেই রয়েছে। বের করতে ভরসা পাচ্ছি না। কিন্তু থাকতেও পারছি না। উত্তরের পাটাতন দেখিয়ে বললাম, 'আমি একটু ওদিকে যাবো ?'

'কেন ?' ক্ষ্যাপাবাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাহ্যে, পেচ্ছাব করবে ?'

এই মুহূর্তেই সেই বেগ নেই। পরে নিশ্চয় আসবে। বললাম, 'না, মানে —আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি একটু সিগারেট খাবো।'

'তার জন্যে ওখানে যাবার কী দরকার ? আমার সামনেই খাও।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'আমাকেও একটা দাও।'

গঙ্গার মুখ দক্ষিণের ছইয়ের দরজায়, 'বাবা।'

'না, বাবা বাবা করিস নে। আজ আমার নিয়ম ভঙ্গ।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে, হেসে হাত বাড়ালেন।

আমি গঙ্গার দিকে একবার দেখে, ক্ষ্যাপাবাবার হাতে একটি সিগারেট দিলাম। তিনি সিগারেট নিয়ে গোঁফে হাত বোলালেন। সিগারেট দুই আঙুলে ধরে ঠোঁটে চাপলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি ধূমপান বারণ ?'

'বারণ আমার কিছু নেই, সবই ছেড়েছি।' ক্ষ্যাপাবাবা চোখের পাতা আধবোজা করে বললেন, 'সবই ছেড়েছি। মদ ভাঙ গাঁজা মাছ মাংস—সব। বিকেল থেকে তো দেখলে। পুজো আহ্নিক কিছু করতো দেখেছো ?'

আমি মাথা নাড়লাম। তিনি বললেন, 'বিশ বছর আগে ও সব পাট চুকেছে। এখন শুধু বাজনা বাজাই, সাপ খেলাই আর ভিক্ষে করি। সংসারটা অনেক বড় তো। চালাতে পারিনে। দাও, আগুন দাও।'

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে তাঁর সিগারেটে ধরলাম। তিনি লম্বা টান দিলেন। আমিও সিগারেট ধরালাম। গঙ্গা এগিয়ে এসে একটা মাটির গেলাস আমাদের সামনে রাখলো। যমুনা আর রতনও ভিতরে এসে বসেছে। ছইয়ের মুখ-ছাটের দরজা বন্ধ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার তো আশ্রম, সংসার কিসের ?'

ক্ষ্যাপাবাবার মুখ থেকে ধোঁয়া গোঁফদাড়িতে ছড়িয়ে পড়লো, 'আশ্রম না কাঁচকলা। সংসার, সংসার। এই যে দেখছো তিনজন। এ রকম অনেক ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার সংসার। আমি হলাম কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। একগাদা ছেলে এখনও ঘাড়ের ওপর। তোদের ক'টাকে পার করেছি গঙ্গা ?'

'কুড়ি বছরে সাঁইত্রিশটা।' গঙ্গা হেসে জবাব দিল।

ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হাসলেন, 'কুড়ি বছরে সাঁইত্রিশটা মেয়েকে পাত্রস্থ করেছি। এখনও গোটা বারো চৌদ্দ আছে। তার

মধ্যে এই পেত্নী দুটোও।' বলেই মস্ত জিভ কাটলেন, 'ইস, ছি ছি ছি! তখন ডাকিনী যোগিনী বলেছি, এখন আবার পেত্নী।'

যমুনা বললো, 'দু চক্ষের বিষ যারা, তাদের আর কী বলা যায়।'

আমার মুখ ফসকেই বেরিয়ে গেল, 'আসলে রূপসী মেয়েদের বাবারা মনে মনে খুব অহংকারী হন, লোককে শোনাবার জন্য অন্য রকম কথা বলেন।'

'শোন্ শোন্, ও তো ধর্মে নেই, কিন্তু এই রকম করে বলে।' ক্ষ্যাপাবাবা হেসে আমার দিকে তাকালেন। দুষ্টু ছেলের মতো চোখে ঝিলিক হেনে, গলা খাটো করে, ঝুঁকে বললেন, 'চোখে ধরবার মতো রূপ আছে, না?'

আমি ঠেক খেয়ে গেলাম। মনে সন্দেহ। এ জিজ্ঞাসার পিছনে, আমার প্রতি কোনো কটাক্ষ নেই তো? গঙ্গা আর যমুনার দিকে তাকালাম। আমার এ তাকানোটাও উলটো তালে বাজলো। গঙ্গা আর যমুনা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বুদ্ধিভ্রংশের বিপাক। কিন্তু আমি রূপ যাচাই করার জন্য তাকাই নি। নিজেকে স্ববশে টানলাম, বললাম, 'তা তো আছেই।'

'বাবার মন রাখছেন?' গঙ্গার বাঁকা ঘাড়ে, চোখের দৃষ্টিও যেন কিঞ্চিৎ বাঁকা।

বললাম, 'না, তা হলে ওঁর অহংকারের কথা বলতাম না।'

'বলো বলো, ছুঁড়ি দুটোর চুলের ঝিটকি নেড়ে দিয়ে বলো।' ক্ষ্যাপাবাবা যেন ক্ষ্যাপা স্বরে ধমকে বললেন, 'তোমাকে বাজিয়ে দেখতে চায়।'

গঙ্গা যমুনার উচ্ছল হাসির সঙ্গে রতনের গলাও ডুগির শব্দে বাজলো। ভুলে যাচ্ছি, ত্রিবেণীর ঘাটে আছি। ভাটার ঢলের জলে ভাসে নৌকা। এখনও হয়তো শ্মশানে চিতা জ্বলছে। মহাশ্মশানের চিতা তো নেভে না। নদীর মাঝখানে ভাসছে চরের সংসার। বাইরে অন্ধকার রাত্রি, তার মাঝখানে এই হাসির শব্দে যেন একটা অলোকিকতার ধ্বনি। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'তবে, যমুনে মিথ্যে বলে নি। দু চক্ষের বিষ, এগুলোকে এখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচি।' যমুনার দিকে আঙুল দেখালেন, 'এটাকে যখন কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তখন পাঁচ বছর বয়স। আর ওই গঙ্গে—ওটাকে পেয়েছিলাম তিন বছরের। রতনটাকে তো কে বছর খানেকের ফেলে পালিয়ে গেছলো। নাম যা শুনছো, সবই আমার দেওয়া। বিশ বছর ধরে এই করছি। তা হলেই বোঝ, এত গণ্ডা গণ্ডা ছেলে মেয়ে যার, তার ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় কী? কপালের বরাত জোর, ভিক্ষেটা জুটে যায়। লোকে অবশ্য বলে, ডাকাতের দল পুষি। নইলে সাপ নাচিয়ে বাজনা বাজিয়ে হেসে খেলে আছি কেমন করে। তার মধ্যে মেয়েদের মানুষ করা, বিয়ে দেওয়া আছে। ছেলেদের কাজ যোগাড় আছে, চিরকাল তো পুষতে পারি নে। তবে হ্যাঁ, নদীয়ায়, বর্ধমানে, চব্বিশ পরগণায় ভিক্ষের দান কিছু ছিটেফোঁটা জমি পেয়েছি। কিছু ছেলেকে সে-সব জায়গায় আশ্রম গড়তে লাগিয়েছি। সে-সব ছেলের চাকরি বিয়ে-থা হবে

না, ওদেরও এই রকম সংসার চালাতে হচ্ছে। আশ্রম তো কথার কথা, সবই আসলে সংসার। সংসারের যজ্ঞকাণ্ড।' অনেকক্ষণ কথা বলে থামলেন। চোখ বুজে, সিগারেটে মুঠি পাকিয়ে টান দিলেন।

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠলো। ক্ষ্যাপাবাবার আসল নাম যা-ই হোক, বিশ বছর আগে এক রকমের সাধক জীবন কাটিয়েছেন। সে-ইঙ্গিত পেয়েছি তাঁর কথা থেকেই। 'মদ ভাং গাঁজা মাছ-মাংস'-এর উল্লেখ একটা দিক নির্দেশ করে। সে কি তাঁর শক্তিসাধনার পঞ্চ-ম-কার? তারপরে আর এক কর্ম সাধনা। বুঝতে অসুবিধা নেই, অনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর আশ্রম। বরাত জোরে ভিক্ষা জোটে। দাতার সংখ্যা তাহলে কম না।

অতঃপর শোবার ব্যবস্থা। ছইয়ের মধ্যে এক পাশে ক্ষ্যাপাবাবা আর আমি। অন্য পাশে গঙ্গা যমুনা। রতন উত্তরের তাঁবু খাটানো পাটাতনে। সেই জায়গাটা আমি চেয়েছিলাম। ক্ষ্যাপাবাবা উল্টো ভেবে, রতনকে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, নৌকার গায়ে কোথায় সিঁড়ি পাতা আছে। প্রাকৃতিক কর্মের ব্যবস্থা। তারপরেও যখন বললাম, আমি তাঁবুর নিচেই ভালো থাকবো, তিনি না-মঞ্জুর করলেন, 'বাপ আমার, তুমি ডেকে আনা অতিথি। তুমি থাকবে আমার কাছে।'

শোবার আগে বললেন, 'গঙ্গে যমুনে, এবার একটু গুনগুন করে একটা কিছু ধর।'

গঙ্গা যমুনার স্বর শুনে মনে হয়েছিল, ওরা গান জানে। সেই প্রমাণটাই এখন মিললো। ছইয়ের ভিতরে এখন উষ্ণ অন্ধকার। প্রথম কোনো স্বর গুনগুনিয়ে উঠলো। তারপর বীণাস্বরে প্রথম শোনা গেল:

'এ কোন নগরে নামিয়ে গেলে ভাই।'
মন্দিরা স্বর যোগ দিল,
'পাটনী হে, আঁধারে পথের দিশা নাই।
এ বাঁকে পথ ও বাঁকে পথ
ঘুরপাক খাচ্ছে আপন মত
যে পথে যাই ধাঁধায় ফিরি এক ঠাঁই
বলেছিলে দেখিয়ে দেবে
কী খেলা চলছে ভবে
ছ' পথ ঘুরে দশের মোড়ে কিছু দেখি নাই।
বিজলি চমক জগত হেরি
ধড়ে মুণ্ডে গড়াগড়ি
প্রকৃতি প্রসূতি অঙ্গে জন্ম দিচ্ছে নিরন্তরেই।'

আমার কাছ থেকেই ক্ষ্যাপাবাবার রুদ্ধ স্বর শোনা গেল, 'হে মহাকাল। হে মহাকালী।'......

গান আর শোনা গেল না। ভিতরে স্তব্ধতা। আমি চোখ বুজে শুয়ে কেবল দুটো কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, 'মহাকাল নিরন্তর' ধ্বংস সৃষ্টি নিরন্তর।······

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙলো, তখন একটা বিস্মরণের বিভ্রান্তি। উঠে বসে চোখ কচলে তাকিয়ে দেখলাম, উত্তরের পাটাতনে রোদ। তাঁবু নেই। সেখানে ক্ষ্যাপাবাবাকে ঘিরে বসে গঙ্গা যমুনা রতন। সকলের হাতেই ধূমায়িত চায়ের পাত্র। রকমারি রঙের পাথরের গেলাস। তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। প্রথমেই দৃষ্টি বিনিময় হলো ক্ষ্যাপাবাবার সঙ্গে। তিনি এদিকে মুখ করে বসেছিলেন। বলে উঠলেন, 'উঠেছে রে, উঠেছে।'

সবাই উঁকি দিয়ে দেখলো। আমি বাইরে এলাম। গায়ে আমার অবিন্যস্ত কোঁচকানো ধুতি পাঞ্জাবি। আয়না বিনে নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি না। সকলের দিকে তাকিয়ে দিনের প্রথম হাসিটি নিবেদন করতে গিয়ে ঠেক! এ আবার কোন্ জায়গা? ত্রিবেণীর ঘাট কোথায়? পশ্চিমের উঁচু পাড়ে এখনও ভাটার ঢল, পলি কাদা। তার ওপরেই আঁশশ্যাওড়া কালকাসুন্দের জঙ্গল। আরও উঁচুতে গাছপালায় নিবিড়। পুবে তাকিয়ে দেখি, অনেক দূরে একটি ক্ষীণ চরের রেখা। তারপরে গ্রাম।

'চেনা জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না?' গঙ্গা হেসে উঠে বললো। এমন একটি আসরের মাঝে না হলে, এ জিজ্ঞাসাটাই শোনাতো, 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'উঠে যদি দেখতো, চেনা ঘাটে রয়েছে, অমনি বাপ আমার তলপি তলপা গুটিয়ে ওখান থেকেই পালাতো।'

সবাই হেসে উঠলো। ক্ষ্যাপাবাবা সত্যি বললেন, কি ভুল বললেন জানি না। কিন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কোন্ জায়গা, কখন এলাম?'

'এটা হলো তোমার ডুমুরদহের সীমানা।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'কুন্তী নদীর মুখটা ছাড়িয়ে এসেছি। কাল রাত এগারোটা নাগাদ জোয়ার এসেছে। রাত দুটো নাগাদ নৌকো ছেড়ে এক ঘণ্টার টানে এ পর্যন্ত এসেছে। এখন আবার ভাটা। যাও, নিচে নেমে বাঁদিকে জঙ্গলে একটু ঘুরে এসো। মুখ-টুখ ধোও। তারপরে চা খাবে।'

তার মানে, সকলেরই নিচে নেমে বাঁদাড় জঙ্গল ঘোরা, মুখ ধোয়া সারা। যাকে বলে প্রাতঃকৃত্যাদি। গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো, 'আপনার কাঁধের ঝোলা চাই তো?'

এত সহজে বুঝলো কেমন করে? দাঁত ঘষার ব্রাশ আর মাজনটা চাই। আমি ছইয়ের মধ্যে ঢুকতে গেলাম। গঙ্গা বললো, 'দাঁড়ান, আমি এনে দিচ্ছি।'

এগিয়ে এসে, আমার পাশ কাটিয়ে ছইয়ের মধ্যে ঢুকলো। অস্বস্তি বোধ করে লাভ নেই। দেখলাম, ছইয়ের ওপরে আমার ভেজা জামাকাপড় মেলে ছড়ানো।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ব্যস্ত হয়ো না। অতিথির সেবার ভার ওদেরই। তবে মনে রেখো, এবেলা আর নৌকোয় রান্না খাওয়া নেই। যতো দেরিই হোক, সেই একেবারে আশ্রমে গিয়ে। তবে হ্যাঁ, কিছু মুড়ি মুড়কি মিষ্টি এখন পাবে। এখন ভাটি ঠেলতে ঠেলতে যাওয়া, আর থামা নেই। অবশ্য, ইচ্ছে হলে একবার ডুমুরদায় নামতে পারো।'

'আবার ডুমুরদায় থামা কেন বাবা?' যমুনা তার খোলা চুলের গোছা পিছনে টেনে বললো।

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বলিস্ কী গো যমুনে? এ জায়গা যে সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের সাধনভূমি, ঠাকুরের গ্রাম। শ্রীরামাশ্রম যদি ও দর্শন করতে চায়, করতে পারে। তা ছাড়া আছে শ্রীশ্রীউত্তমানন্দের উত্তমাশ্রম। ডুমুরদা তো সহজ জায়গা নয়!'

শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথের নাম শুনেছি, দর্শন পাই নি। ডুমুরদহ তাঁর গ্রাম, এবং সাধনভূমি, এ কথা জানা ছিল না। সাধক উত্তমানন্দ বা তাঁর আশ্রমের কথাও শুনি নি। বরং ডুমুরদহ নামের সঙ্গে, বিশে ডাকাতের কথা শুনেছি। তা হলে আর এ গ্রাম সহজ জায়গা কেমন করে হবে। একদা যে গ্রামের ডাকাতের নাম শুনলে, মানুষের অন্তরাত্মা কাঁপতো, এখন সেই গ্রামের নামে অন্তরে ভক্তির ধারা বহে। কালের গতির এমনি ধারা। গত রাত্রের গঙ্গা যমুনার গানের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

গঙ্গা আমার ঝোলাটা নিয়ে, ছইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো, 'কিন্তু বাবা, উনি এখন ডুমুরদায় নামলে আমাদের যেতে দেরি হয়ে যাবে না?'

আমারও সেই কথা। একসঙ্গে সব মেলে না। বললাম, 'এখন যেখানে যাত্রা, সেখানেই যাই। ফেরার পথে ঘুরে যাবো।'

'তোমার ইচ্ছে বাবা।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'ডুমুরদার মাহাত্ম্য জানিয়ে দিলাম, একবার ঘুরে যেও।'

গঙ্গা আমার দিকে ঝোলা বাড়িয়ে দিল। আমি ঝোলা নিয়ে বললাম, 'ডুমুরদার বিশে ডাকাতের কথা শুনেছি।'

'গেলে এখনও তার বাড়ি দেখতে পাবে।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'সেকালের বড়লোক জমিদার মানেই ডাকাত।'

আমি দাঁতের বুরুশ আর মাজন বের করলাম, হেসে বললাম, 'আবার ইংরেজরা দরকার বুঝলে, অনেককে ডাকাত বানিয়ে দিতো। এ রকম এক ডাকাতের নাম ছিল বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধায়, নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন।

ইংরেজরা তাঁর মাথার দাম ঘোষণা করেছিলেন দশ হাজার টাকা। অবিশ্যি পরে দলের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই, সৈন্য সামন্ত নিয়ে এক সাহেব তাঁকে ধরেছিলেন। তবে তিনি ডুমুরদহের বিশে ডাকাত বলে শুনিনি।'

'আহা, যদি অমন ডাকাত হতে পারতাম।' ক্ষ্যাপাবাবা গোঁফ ডুবিয়ে চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন।

গঙ্গা যমুনার মধ্যে চোখে চোখে কথা ও হাসি। তারপরে গঙ্গার বয়ান, 'আপনাকে তো অনেকে ডাকাত বলেই।'

'কিন্তু সৈন্য সামন্ত নিয়ে কেউ ধরতে এলো না।' ক্ষ্যাপাবাবার স্বরে যেন আফশোস্।

গঙ্গা বললো, 'কেন, আমরাই তো ডাকাতকে ধরে রেখেছি, পালাবেন কী করে?'

ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে তাকিয়ে বললেন, 'রাক্ষুসী।' বলেই জিভ কেটে চোখ বড় করলেন, 'ইস্, ডাকিনী যোগিনী পেত্নী, শেষে রাক্ষুসী! ছি ছি, এবার গঙ্গাজলে মুখ ধুতে হবে।'

আমি গঙ্গা যমুনার মুখের দিকে তাকালাম। এখন তাদের রোদ ঝলকানো মুখে অভিমানের ছায়া নেই।

যমুনা হেসে বললো, 'যা খুশি তাই বলুন, ডাকাতকে জেলে তো পুরেছি।'

এ প্রসঙ্গে আমার মুখ খোলবার কথা না। কিন্তু মুখ ফস্কেই বেরিয়ে গেল, 'সে জেলের নাম কি? মায়াডোর?'

'অই, অই শোন, ও তো ধর্ম জানে না, কিন্তু এমনি করে বলে।' ক্ষ্যাপাবাবা চোখের তারা ঘুরিয়ে হাসলেন।

গঙ্গা যমুনা খিল খিল হাসিতে বাজলো। আমি দাঁতে বুরুশ ঘষতে শুরু করলাম।

গুপ্তিপাড়া আর কালনার মাঝামাঝি জায়গায় নৌকা এসে যখন থামলো, সূর্য তখন পশ্চিমে ঢলে গিয়েছে। হাতের ঘড়ির কাঁটা বেলা দুটোর সীমানা ছাড়িয়ে। খবর বোধ হয় আগেই ছিল। ঘাটে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিল। পাড়ে উঠে একটি ছোট গ্রাম। তার ভিতর দিয়ে কয়েক মিনিটের পথ হেঁটেই আশ্রমের সীমানা। প্রথমেই চোখে পড়ে মন্দির। ভিতরে মন্দির সংলগ্ন নাটঘর। নাটঘরের দু'পাশে ঘর। একপাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সামনে বাগান। নানা বয়সের মেয়ে পুরুষ কাজে ব্যস্ত।

বিকালের দিকে আশ্রমের চৌহদ্দি আর ছেলেমেয়েদের বাসস্থান দেখলাম। সীমানার চৌহদ্দির মধ্যে বিরাট বাগান, একটি পুকুর। কিন্তু পানীয় জলের জন্য দুটি টিউবওয়েল রয়েছে। মাঝখানে মন্দিরকে রেখে একদিকে মেয়েদের

বাসস্থান। বিপরীত দিকে ছেলেদের। কিন্তু ছেলেমেয়েরা ছাড়াও বয়স্ক মেয়ে পুরুষের সংখ্যাও ডজনখানেক হবে।

মন্দিরের প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজা কালীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নাটমন্দিরের উত্তরের একটি ঘরে ক্ষ্যাপাবাবা থাকেন। পাশের ঘরে আমার আশ্রয় জুটলো। আমার দায়দায়িত্ব সবই গঙ্গা যমুনা আর রতনের ওপর। কিন্তু অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও দূরে সরে থাকলো না।

ক্ষ্যাপাবাবাকে ঘিরেই যেহেতু আশ্রম, সকলের ভিড়, অতএব নাটমন্দিরেই। তিনদিন থাকতে হলো। কেননা, ক্ষ্যাপাবাবার বিধান, তেরাত্রি কাটিয়ে যেতে হবে। যজ্ঞকাণ্ড নিঃসন্দেহে। তবে, ক্ষ্যাপাবাবা বসলে, তিনি ঝাঁপি খুলে বসেন। আর সাপ কিলবিলিয়ে বেড়ায়। সৌভাগ্য তাঁকে ঘিরে, তাঁর গায়েই বেড়ায়। তবু কেমন গা সিরসির করে। ছেলেমেয়েদের সমবেত গান ছাড়া গঙ্গা যমুনার আলাদা গান একটি আকর্ষণের বিষয়। তার থেকেও বেশি, ক্ষ্যাপাবাবার হারমোনিয়ামের বাজনা।

দুটো দিন কেটে গেল, যেন নতুন জগতের বিচিত্র এক যজ্ঞক্ষেত্রে। ভোর-বেলাটা আশ্চর্য সুন্দর। মাঘের বুকে এখনই এখানে বসন্তের সাড়া জেগেছে। গাছে গাছে আমের বোল। কোকিলের স্বরে সপ্তমের রাগ। বাতাসে নানা ফুলের গন্ধ। পত্রহীন গাছে নতুন পাতার চিকচিক উঁকিঝুঁকি।

তৃতীয় দিন ভোরবেলা, নাটমন্দিরের সামনের বাগানে গঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে বললো, 'আসুন, এখনও একটা জায়গা দেখা আপনার বাকি রয়েছে বাবার অনুমতি কাল রাত্রে পেয়েছি। নইলে দেখাতে পারতাম না।'

'কোথায় ?'

'কাছেই।'

নাটমন্দিরের বাগানের সামনে কয়েকটি ছোটখাটো পুরনো ঘর। আশে-পাশে গাছের ঝুপসি। এগুলো দর্শনীয় বলে মনে হয়নি। গঙ্গা সেই সব ঘরের আশপাশ দিয়েই ঘন ঝোপের মধ্যে এগিয়ে গেল। দেখছি, ওর বাসি চুল খোলা, পিঠে ছড়ানো। সামান্য শাড়ি জামা, নিতান্ত আটপৌরে ধরনে পরা। আশ্চর্য! এদিকটায় একবারও আসি নি। ক্রমে গাছপালা নিবিড় হয়ে এলো। ভোরের আলো এখানে এখনও ছায়াঘন অন্ধকার। চোখে পড়লো, চারদিকে লোহার শিকঘেরা একটি ছোট ঘর। তার পাশেই বিরাট গাছ। কী গাছ চিনতে পারলাম না। আমাদের সাড়া পেয়ে গাছে গাছে পাখিরা ত্রস্ত হয়ে পাখা ঝাপটিয়ে উড়ে পালালো। গঙ্গা লোহার শিক ধরে দাঁড়ালো। আমি ওর পিছনে দাঁড়ালাম। ও ডাকলো, 'কাছে আসুন।'

আমি গঙ্গার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গঙ্গা আমাকে বিশাল গাছের গুঁড়ি দেখিয়ে বললো, 'কুড়ি বছর আগে ঐখানে বাবার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। সচরাচর কারোকে এ জায়গা তিনি দেখাতে চান না।'

'কেন ?'

'তিনি বলেন, লোকে মন্দির দেখবে, ঠাকুর দেখবে, এসব জায়গা সকলের দেখবার নয়। অবশ্য আপনার কথা আলাদা।' গঙ্গা হাসলো।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কি নিজে দেখাতে বলেছেন ?'

'না, আমিই বাবাকে বলেছি।' গঙ্গা আমার দিকে তাকালো, 'না বললে, বাবা নিজে থেকে বলতেন না।'

আমি গাছটির দিকে তাকালাম। বট অশথ নিম চিনতে পারছি। বাকি শিকড় ও পাতা চিনতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কি পঞ্চমুণ্ডির আসন ?'

'হ্যাঁ।' গঙ্গা শিক ধরে ধরে অন্য দিকে গেল।

আমি ওকে অনুসরণ করলাম। গঙ্গা বললো, 'আপনি মাঝে মাঝে এলে বাবা খুশি হবেন।'

'তখন হয়তো আপনি আর এখানে থাকবেন না।' আমি গঙ্গার দিকে তাকালাম।

গঙ্গা ওর ভাসা চোখে আমার দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। ইঙ্গিতটা বুঝে নিয়ে সহজ ভাবেই বললো, 'তা বলা যায় না।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও মুখ ফিরিয়ে নিল। এখন ওর মুখে হাসি নেই। যেন নিশ্বাস আটকে আছে বুকের কাছে। মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'বাবা অবশ্য আমার বিয়ের কথাই ভাবেন। আমিও ভাবি। ভেবে মনে মনে অনেক কল্পনা করি। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। ভয় হয়।'

'ভয় ?'

'হ্যাঁ। চিরকাল আশ্রমে থাকবো, সেটাও যেন মানতে পারিনে। আবার বিয়ের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয়, আমি আশ্রম ছাড়া কোথাও কারো কাছে থাকতে পারবো না।' গঙ্গা হাসলো, কিন্তু ওর গভীর ভাসা চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠলো। যেন বিশাল কালো শান্ত সরোবরের এক ধারে রোদের কিরণ।

আমি অবাক চোখে ওর দিকে তাকালাম। গঙ্গা আবার বললো, 'আমি আমার বাবা মা কারোকে চিনিনে। সংসার কেমন বুঝিনে। অথচ—।' থেমে গেল। আমার দিকে তাকালো। চোখের জলেই হাসতে গিয়ে, দৃষ্টিতে লজ্জা ফুটলো, 'অথচ আপনাকে বলতে সংকোচ নেই—আমার মতো একটা মেয়ের যে-কামনা বাসনা থাকা উচিত, আমার তাও আছে। কিন্তু আমি সেখানেও যেতে পারবো না।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো।

গঙ্গা তাহলে কোন্ জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ? একবার ওর

কথা শুনে কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিল। আবার একবার মনে পড়লো। ওর দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরই মন ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় ভরে উঠলো।

কিন্তু আমি নবকুমার না। ক্ষ্যাপাবাবা কাপালিক নন। ইতিমধ্যে যেটুকু শুনেছি, আর জেনেছি, অনুমান, যাকে বলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ, তা তাঁর ঘটেছে। সিদ্ধপুরুষ এখন অনাথ বালক বালিকাদের নিয়ে আর এক সাধনায় মেতেছেন। তাঁর সেই সাধনায়, গঙ্গা ওর নির্দিষ্ট পরিণতি জেনেও, এক গভীর সংকটের মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গাকে নিয়ে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা কেবল ওর কথাগুলো শুনে। চিরাশ্রিত আশ্রম জীবন একদিকে, আর একদিকে কামনা বাসনা। তার মাঝখানে গঙ্গা দ্বিধাচারিণী। ওর জীবন-দিকনির্ণয়ের কাঁটাটা কোন্ দিকে মুখ করে আছে?

গঙ্গা হঠাৎ সনিঃশ্বাসে হেসে উঠলো, 'আসুন, আপনি আবার সাত পাঁচ ভাবতে আরম্ভ করেছেন।'

ও পঞ্চমুণ্ডির আসন ঘেরা ভূমি বেষ্টনী লোহার শিক ধরে ধরে এগিয়ে গেল। আমি দেখলাম, ও যেন শিকের আড়ালে বন্দিনী হয়ে আছে। আমি ওকে অনুসরণ করলাম।

কিন্তু আমি ওকে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'ক্ষ্যাপাবাবা কি আপনার মনের কথা জানেন?'

'মুখ ফুটে কখনো বলি নি।' গঙ্গা লোহার শিকল ধরে, পায়ে পায়ে সেই বেষ্টনীকে পাক দিতে লাগলো, 'কিন্তু তিনি সবই বোঝেন। বুঝতে পারি, আমাকে নিয়ে তাঁর বড় দুশ্চিন্তা। মাঝে মাঝে রেগে উঠে বলেন, তোকে আমি সাপ দিয়ে খাওয়াবো। আবার কখনো আদর করে বলেন, ভাবিস নি। তার যখন সময় হবে তখন সে আপনি তোর কাছে ছুটে আসবে, তুইও ঠিক চলে যাবি।'

আমি গঙ্গার কয়েক হাত দূরে, ওর পিছনে পিছনে, সাধনভূমির বেষ্টনী লোহার শিকের গায়ে গায়ে চলছি, 'আর যমুনা?'

'ওর তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। বাবার ভক্ত, কলকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে।' গঙ্গা না থেমে বললো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'যমুনার মত আছে?'

'আছে। ডাক্তারের সঙ্গে এখানে ওর কথা হয়েছে। তাঁকে ওর ভালো লেগেছে। দুজনেরই দুজনকে।' গঙ্গা লোহার শিক ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গেল, 'আসুন, রোদে যাই।'

সিদ্ধক্ষেত্রের নিবিড় গাছপালার বাইরে, ছোট একফালি খোলা জমির সামনে এসে পড়লাম। রোদে যেন সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগলো। কেবল আরাম নয় একটা আচ্ছন্নতা থেকে যেন জেগে উঠলাম, 'আপনার বাবাই ঠিক বলেছেন, সে নিশ্চয়ই ঠিক সময়ে আসবে। আমি বলি, যেন তাড়াতাড়ি আসে।'

গঙ্গা দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। এখন ওর চোখে মুখে রহস্যের হাসি, 'কেউ যে আসেনি, তা তো নয়। অনেকে এসেছে, গেছে, আরও আসবে। ঠিক তাকেই চিনে নিতে পারবো কি?' আমার চোখের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে, হঠাৎ শব্দ করে একটু হাসলো, 'নিজেকেই চিনতে পারিনি, তাকে চিনবো কেমন করে? জীবনটা সকলের একরকম নয়।' ও আবার পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করলো।

আমি কিছু বলতে গেলাম। পারলাম না। গঙ্গার কথাগুলোই আমার মস্তিষ্কের সীমানায় প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ও চোখের আড়ালে চলে গেল। রৌদ্রালোকিত শূন্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হলো, আমার চোখের সামনে, সংসারের দিগন্ত এক অসীমে হারিয়ে যাচ্ছে।

চলো মন রূপনগরে

খোরাকির বরাদ্দ বড় কম। যতোটা চাই, ততোটা জোটে না। আর, এ এমন এক খোরাক, অঢেল দিয়েও কেউ ভরিয়ে দিতে পারবে, সে-কথা কেউ কবুল করতে চাইবে না। বেফাঁস বলে বিপদে পড়ে যাবে। এ বরাদ্দ ঝোলায় ভরে দেবার না। তা হলে, ঝুলি পূর্ণ হলেই, তুষ্টি। এবার বিদায় হই।

না, এ খোরাক সে-রকম না। পেট ভরানোর বরাদ্দ যাকে বলে। তবে ঐ কি এক কথায় যেন বলে, শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। পেট ভরানোর বরাদ্দকে কস্মিনকালেও বাদ দেবার না। ঐটিতে মহাপ্রাণীর ক্ষণজন্মের প্রথম থাবা। সে-মহাপ্রাণীটিকে সবাই চেনে, যাবত জীব সকলে। কারণ, প্রাণের মধ্যেই বসে আছেন সেই মহাপ্রাণীটি। চেনাচিনিরই বা কী কথা। জান্ পহ্চানের ধার ধারে না সে। সময় মতো নিজেই জানিয়ে দেয়, সে আছে বড় বিষম করে। ভুলে থাকবার কথা আসেই না। মরতে বসলেও, সে যমের মতোই নাছোড়। কথাটা উলটা কলের মতো শোনাচ্ছে। মরতে যে বসেছে, সে তো যমেরই হাত ধরা। তবু, কথায় বলে, যমে ছাড়ে না। যমের মতো না-ছোড় কথাটা হলো তুলনা। আসলে, সে যে যমেরও অধিক। বলি বটে, যমে ছাড়ে না। আসলে কথাটা কী? প্রাণ ছাড়ে না। মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেও, কে কবে প্রাণ দোহনে পরাঙ্মুখ?

কথা পাড়তে গেলেই, কথার গতিকে কথা আসে। যে কথাটা পেড়ে বসতে গিয়েছি, তার প্রথম বয়ান খোরাকির বরাদ্দ নিয়ে। সেটা এক অভর খোরাকি। তার সঙ্গে পেট ভরানোর খোরাকিটাকে একটু মাত্র খাটো করে দেখাটা, বিষম ঠেক দিল। সেই জন্য মহাপ্রাণীর কথাটা এলো নিজের গরজেই। ঠোঁটে বাঁকা হাসি, চোখে ভ্রূকুটি। যেন এমন একটা জিজ্ঞাসা, বড় এলেমদার খোরাকির খাউনতুরে বটে! আমি কোথায় হে?

তৎক্ষণাৎ করজোড়ে প্রণিপাত। হে মহাপ্রাণী, তুমি সকলের অগ্রে। তুমি অভ্যন্তরে। বাহিরে। তুমি সর্বব্যাপী। তুমি তাবৎ জীবের গর্ভাধানকালে থাকো গর্ভবতীর ভুক্ত ভোজ্যে। জন্মমাত্র জননীর বুকের ধারায়। তারপরে এ সংসারে তুমি অন্ন নামে বিরাজ কর। তোমার বয়স নেই, জাতপাত নেই, লিঙ্গ ভেদ নেই। তোমার দেশ নেই, কালাচার নেই। তোমার কাছে ধনগর্বী নির্ধন নির্বিচার। তুমি গাঢ় অন্ধকার। মহা তেজযুক্ত আলো। কলঙ্ক। অকলঙ্ক পুণ্য। বীভৎস। সুন্দর। অপমান। সম্মান। ক্রুর নিষ্ঠুর। সীমাহীন দয়ালু। তুমি অশেষ। আদি ও অন্তহীন। সেই কারণেই মানুষ নামক জীবের কাছে তুমি দেবী ও দেবতা।

হলো ? বাব্বা ! এর চেয়ে বেদ আর উপনিষদ থেকে বেছে বেছে কিছু উদ্ধৃতি দিলেই হতো। নাও, এবার ঘর করতে দিবানিশি যা বলি, তুমি তা-ই।' তুমি ক্ষুধা। তোমাকে বাদ দিয়ে, খোরাকির কথা পাড়িনি। তাবৎ জীবের এ ক্ষুধাকে জৈবিক বললে খাটো করা হয় না। তার জন্যে, অন্নচিন্তা, চমৎকার। কিন্তু এ চমৎকারিত্ব দিয়ে, মানুষের সকল চমৎকারিত্ব ভরে ওঠে নি। সে তো কেবল পেটে বাঁচে না। মনে বাঁচার গতি কি ? অমোঘ রূপে ভরা এ জগতটার সামনে দাঁড়িয়ে, জিজ্ঞাসাটা তো কেবল আমার মতো বুকে ধরা গরলধারীর না। যবে থেকে মনের উন্মেষ, তবে থেকে এ জিজ্ঞাসা। আর এ জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে, কতো জনে কতো দান দিয়ে গিয়েছেন। সেই সব দান নিয়ে যখন নাড়াচাড়া করি, তখন অন্যতর ক্ষুধায় মনটা আতুর হয়ে ওঠে। এ দান নিতান্ত বস্তুতে ভরে না। তাই ঐ বচন। যতোটা চাই, ততোটা জোটে না। এ খোরাকির রকম ভিন্ন। সেইজন্যই বলা, অঢেল দিয়েও কেউ এ খোরাকির বরাদ্দ ভরিয়ে দেবে, এমনটা কেউ কবুল করবে না। যদিও বা করে, ঝোলায় ভরে দেবার বস্তুতে, তবে সেখানেই তার ইতি তুষ্টি।

রূপের ফেরে পড়েছি যে ! পড়েছি জন্মে অবধি। আর এই রূপের ফেরে পড়ে, সেই কোন্ সকালে যাত্রা করেছি। বেলা হয়ে গেল। বেলা তো বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। সকলে যখন জাগতিক ক্ষেত্রে শিকড় গেড়ে, স্ব-ভাবে বসছে, আমি তখনও কাঙাল হয়ে ফিরছি। কেন না, মন মজেছে, কিন্তু মন ভরেনি। ভরছে না। কেউ গেয়ে গেলেন, জনম অবধি রূপ দেখেও, চোখের তৃষ্ণা মিটলো না। চোখের তৃষ্ণা। কেবল যদি রূপ হতো, তবে চোখ অনেকখানি। কিন্তু অরূপের কথাটাও কোথা থেকে যেন, রূপের ঘরে এসে মিশেছে। তার রূপ কী ? কেমন ? সে কি এই প্রকৃতিতে বিরাজ করে ? পথে প্রান্তরে, গ্রামে জনপদে, আর মনুষ্য সমাজে ? রূপের এই ধারাবাহিক গতিময়তার মধ্যে, অরূপের রূপ কেমন ? সে কি বচনে আছে ? অবলোকনে ? না কি, কেবল অনির্বচনীয়তায় ?

জানি না। রূপের ফেরে পড়েছি। রূপের সুধা পাইনি। কথাটা শুনলে লোকে বাতুল বলবে। কিন্তু, মিছে কেন বলবো ? আর কাকেই বা বলবো ? রূপের ফেরে পড়া, বড় জ্বালা। তার বাড়া জ্বালা, রূপের সুধা যখন পাই না। জ্বালায় জ্বলি। পাগলও হলাম। রূপের বিষে উথালি-পাতালি বুক। না, কেউ জোর করে এ রূপের বিষ পান করিয়ে দেয়নি। সেই গানটার মতোও না, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান। এ বিষের জন্ম কোথায়, কোন্ ধারায় বহে, জানি না। কেমন করে, কোন্ অবকাশে বুকের মধ্যে চুঁইয়ে ঢোকে, টের পাওয়া যায় না। কখন কী ভাবে তার ক্রিয়া শুরু হয়, আগে থেকে তার কোনো ঘোষণা থাকে না। ক্রিয়া যখন শুরু হয়ে যায়, তখন দেখি, আমি রূপের বিষে মত্ত মাতাল। ঘর ছেড়ে পথে পথে ফিরছি।

এই ফিরতে ফিরতে দেখি, এ বিষে আমাকে একলা খায়নি। অনেককে খেয়েছে। আর যে যার মতো ফিরছে। এ ফেরাটা ইংরেজির 'রিটার্ণ' না। যে বোঝে সে বোঝে। এ ফেরাটা, পথে পথে। কেমন করে রূপের বিষ বুকে ঠাঁই করে, যেমন জানা যায় না, তেমনি ফেরাটা তোমার হাতে নেই। অনেক-বার কসম খেয়ে বলেছি, আমি ঘর বিবাগী বৈরাগী না। পুণ্য সঞ্চয়ের তীর্থযাত্রী না। সংসার আমাকে ঘিরে। আমি সংসারের জীব। চোখে দেখা যায় না, কিন্তু সারা অঙ্গে কত বেড়ি, কেউ দেখতে পায় না। দশজনের বাইরে আমি নেই। দশজনের একজন হয়ে, সংসারের আঙ্গিনায়, এ জন্মটার শোধ দিচ্ছি। নাকি, সংসার আদায় করে নিচ্ছে?

একটা কিছু হবে। তবু, তার মধ্যেই দেখি, সেই যে রূপের বিষে খেয়েছে, তার নেশায় মাতাল হয়ে রয়েছি। হঠাৎ সেই মাতালটাকে কে হাতছানি দিয়ে বাইরে ডেকে নিয়ে যায়। আর সেই ডাকটা এমন নির্ঘাৎ, কোনো ওজর মানে না। কাজের ঘরে তুক। কাজে মন বসে না। কর্তব্য দায় দায়িত্ব? ঢের হয়েছে। ঐ সেই পুরনো গানটার মতোই, 'শুনিয়া বাঁশির গান / মন করে আনচান / গৃহকার্য রয় না আমার স্মৃতিতে।'...এই ডাকের নিয়ম কানুন বেবাক আলাদা। সেই কারণে বলি, এই পথের ফেরাটা তোমার হাতে নেই। কেন না, তখন তুমি রূপের হাত-ধরা। রূপ তোমাকে যেমনি চালাবে, তেমনি চলবে।

অতএব চলো।

চলবো তো। চলতে গিয়ে, মুখপাতের কথাটাই তাই আগে মনে এলো। খোরাকির বরাদ্দ বড় কম। ডাকের বহর দেখে মনে হয়, অলক্ষের হাতছানি বুঝি এই দুনিয়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে। একেবারে গৃহটার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো। ছাই! হুগলী জেলার উত্তর বাগে এসে, বলতে গেলে বিপথে ছেড়ে দিয়ে বলে, চলো। যা রয়, তাই সয়। ঘরের কোণটা দেখ। খোরাকির বরাদ্দ কতোটা কম, তার ওজন ঠাহর হবে পরে। এ খোরাকির মাপ গুণে। কুনকে পাল্লায় না।

কথাটা মিথ্যা না। মনভাসির টান খেয়া পেরিয়ে, মুক্তবেণীর উজানে গিয়ে আবার ফিরে যাত্রা। দেখছি, রূপের ফেরেই আছি। তবে মুক্তবেণী থেকে শ্যামা ক্ষ্যাপার তরীতে ভেসে গিয়েছিলাম বলে, স্থলের টানটা থেকে গিয়েছিল। ভেসে যাওয়া এক কথা। তার রকম ভিন্ন। আর পায়ে চলা, আর এক কথা। তার রকম ভিন্ন। পাখির মতো ডানা নেই বটে। তবু থেমে থেমে, খুঁটে খুঁটে দানা খাওয়া যায়। জলের স্রোতের ডিঙায় ভেসে, দানা খুঁটে খাওয়াটা তেমন মনের মতো হয় না।

শ্যামা ক্ষ্যাপার আশ্রম থেকে ফেরার সময়টায়, বাতাসে উত্তরের হিমেল

-নখের আঁচড় ছিল। সেই সময়েই কুন্তী আমাকে টেনেছিল। উজানের টানে ভাসতে গিয়ে, কুন্তীর খরস্রোতা গতরটিকে গঙ্গায় এলিয়ে পড়তে দেখেছিলাম। ফেরার পথে, কুন্তী আমাকে নামিয়ে নিয়েছিল। আসলে দামোদরের কন্যাটিকে যতোটা খরস্রোতা দেখেছিলাম, আদৌ ততোটা না। তার মাঘের শীর্ণতায় কেমন একটা ম্লান হাসির কিরণ ছিল। অথবা, সেটা বেলাশেষের মায়া। তার ঢালু আদুরে গা দু পারের চড়ায় তখন রবি খন্দের সবুজ আঁচল।

কেন তার নাম কুন্তী, কে জানে? কুন্তী নামে তো একজনকেই জানি। সে আমাদের ইতিহাসের প্রাচীন রমণীশ্রেষ্ঠা, প্রাতস্মরণীয়া কন্যা। প্রাণটি তার বড়ই বহতা ছিল। মনে চির রমণীর দেহের লীলা। খরস্রোতা নিঃসন্দেহে। না হলে আইবুড়ো কন্যেটি এক অপরূপ পুরুষকে ডেকে, তার অঙ্কশায়িনী হতো না। সোজা কথা না। বিয়ের আগে মেয়ে এক-বিয়োনী হয়ে গেল। তারপরেও, অভিশপ্ত অক্ষম স্বামীর পত্নীটি, পর পুরুষদের ডেকে, তিনটি সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিল। পুরাণ বলে, রহস্যের আবরণে ঢাকা দিয়ে রেখো না। *পুরাণ তোমার ইতিবৃত্ত। সে ইতিহাসের লিখন বড় জটিল।* ভেদ করতে পারলে, কুন্তীর প্রার্থিত পুরুষদের পরিচয় পেলেও পাওয়া যেতে পারে।

সে যাই হোক। ইতিহাসের কুন্তী থাক। এই দামোদরের কন্যাটির নাম কেন কুন্তী, সেটা কখনও জানতে পারি নি। এমন অনেক কন্যারই নামের কারণ জানা যায় না। মাঘের সেই বেলা শেষে, কুন্তীর কিশোরী অঙ্গে তখন রক্তিম আভা। রেল ইস্টিশন ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম বড় রাস্তার সাঁকোর ওপরে।

এইখানে একটা কথা। ধরতাইটা না ধরিয়ে দিলে, গোলেমালে হরিবোল হবার সম্ভাবনা। এই বৃত্তান্ত সেই ইংরিজি পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝির সময়। উনিশশো পঞ্চান্ন। তখন গ্রাম নিত্যানন্দপুরের পাশে কারখানা হয়নি। আশেপাশে এখনকার মতো এত বসত ভিড় গোলমাল ছিল না। গাড়ির চল ছিল কম। সাঁকোর রাস্তাটার গায়ে তখনও নতুন গন্ধ। রাখাল আলস্যে ফিরছিল গরুর পাল নিয়ে। দু-চার মানুষের আনাগোনা। চারদিকে গ্রামের নিঝুমতা। মৎস্যজীবী ঘেরা জাল পাতছিল কুন্তীর বুকে। বিকেলে চুল বাঁধা সাঙ্গ করে, বউটি ঘাটের তালের গুঁড়িতে পা ডুবিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ উত্তর থেকে একটা মোটর বাস এসে থেমেছিল সাঁকোর ওপারে। কয়েক যাত্রীর ওঠা নামা। তার মধ্যে একজন কী কারণে সাঁকোয় এসে দাঁড়ালো। সে আমার বেলাশেষের মোহ কী না, বুঝে উঠতে পারিনি। মনে হয়েছিল কুন্তী নিচে থেকে, লাল জামায় নীল শাড়ি জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাস্তববাদী বাবুরা ভোজবাজীতে বিশ্বেস করেন না। কিন্তু সংসারে হোক, আর সংসারের বাইরে হোক, গোটা ব্যাপারটা বৃহৎ সংসারেরই। আজ পর্যন্ত, সে-সংসারের যাবৎ বিষয়ের যুক্তি কেউ দেখাতে পেরেছেন বলে জানি না।

দেখেছিলাম, চোখে তার কৌতুকের ছটা। মুখে সারাদিনের ঘুরে ফেরা

ধ্লোর প্রলেপ। এলোমেলো অবিন্যস্ত। অথচ মুখের হাসিটি তাজা। সারা শরীরে লাবণ্যের নম্রতা। কথা কি বলেছিলাম? শুনেছিলাম কি দুই চার অস্ফুট উক্তি? মনে পড়ে না। কেবল, আজও দেখছি, কুন্তী নদীর সাঁকোয় এক সন্ধ্যায়। সে অম্লান হয়ে আছে।

সেই মাঘে ফিরে গিয়েছিলাম। আবার চৈত্র শেষেই ফিরে এলাম। কুন্তীর কূলে আর যাইনি। নদী পেরিয়ে ইস্টিশন, নাম ডুমুরদহ। গাড়ির এঞ্জিন ফোঁস ফোঁস করছে। গার্ডবাবু বাঁশি বাজিয়ে নিশান দেখিয়ে দিয়েছেন। এক্ষুনি কুক্ দিয়ে গাড়ি ছাড়ল বলে। পকেটে টিকেট রয়েছে গুপ্তিপাড়ার। থাকলেই বা। ভোরের প্রথম ট্রেনের যাত্রী। এখন তো সবে সকাল। গ্রামটা হাতছানি দিচ্ছে। গাড়ি নড়ে উঠলো। ঝট-পা বাড়িয়ে নেমে পড়লাম। একরাশ ধোঁয়া ছড়িয়ে, গাড়ি চলে গেল মাঠের বুকে ঝুকুস ঝুকুস শব্দ তুলে।

যাত্রী যারা নেমেছিল, তারা কে কোথায় চলে গেল। দেখলাম, পশ্চিমে দূরগামী সড়ক। পুবে গ্রাম। ইস্টিশনের ঘরটা দক্ষিণে। হালের ডুমুরদহ গাঁয়ের কথা যদি কেউ ভাবো, তা হলে গোলমাল। এই আশি দশকের সংক্রান্তিতে, ডুমুরদহ ইস্টিশনের সামনের চেহারা বিলকুল বদলে গিয়েছে। পশ্চিমে রাস্তার মোড়ে বেশ কিছু দোকানপাট। পুবে গাঁয়ের পথে, দু পাশে, পাকা বাড়ি। পিচের রাস্তা, বিজলি আলো। গঞ্জ গঞ্জ ভাব। ট্রানজিস্টারে গান বাজে। এন্তার সাইকেল চলে। বড় সড়কে নিমেষে নিমেষে ছোট বড় মোটর গাড়ির ছুটোছুটি। কল-কোলাহলে, আর সাজ বদলে, শহর হয়ে ওঠার ইচ্ছেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি সেই সকালে যখন নামলাম, নিঝুম গ্রামের বুকে, নিঝুমতর ইস্টিশন। দক্ষিণে গিয়ে, ইস্টিশনের সামনে গিয়ে দেখলাম, কপালে লেখা ১৯৪৬। বোধ হয় ইস্টিশনের জন্ম সাল। পশ্চিমের মোড়ে, একটা ঘর। দু পাশে জঙ্গল। রাস্তার ধারে একটা সাইকেল রিকশা।

ওদিকে আমার টান নেই। আমি পুবের রাস্তা ধরলাম। দুই চারজন চাষীবাসী, মাটি ঘাঁটা মানুষ আপন মনে এদিকে ওদিকে চলে। বারেক চোখ ফিরিয়ে অচেনা লোকটাকে দেখে যায়। চোখে কৌতূহল। কিন্তু সে তো মেটবার না। আমিও মেটাতে পারি না। তবে বুঝতে পারি। নজরে জিজ্ঞাসা, কোথা থেকে আগমন? কোন্ বাড়িতে গমন? কার গৃহে?

কোনো গৃহে না। এই গ্রামের ধারে, পুবের নদীতে গত সাল ভেসে ভেসে গিয়েছিলাম। নদীর বুক থেকে দেখেছি। এবার কূলে ভিড়েছি। সেই একই কথা। ফেরাটা তোমার হাতে না। কেন যে নেমে পড়লাম, তার কোনো জবাব নেই। যেমন একটা হাতছানি পেলাম। নেমে পড়লাম, কী আছে, কী নেই, সে-বিবেচনার ধারে বাছে নেই।

পূব দিকে একটু গিয়ে, এক পথ দক্ষিণে। আর এক পথ সোজা পূবে গিয়ে, উত্তরের বাঁকে। পথে দু একটা কাঁচা ঘর। বাদ বাকি দু পাশে ঘন জঙ্গল। ডাইনের রাস্তাটা খানিক গিয়ে, বাঁয়ে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে। পূবের সোজা রাস্তাটা, প্রায় অর্ধবৃত্তাকারে উত্তরে বাঁক নিয়েছে। অনেক দূর অবধি দেখা যায়। রাস্তাটা ইঁট সুরকির বাঁধানো বটে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ গভীর আর এবড়ো খেবড়ো। চৈত্রে ধুলা জমেছে।

কোন্ দিকে যাব? উত্তরের বাঁকটাই টানছে। পথের ধারে বাড়ি ঘর দেখতে পাচ্ছি না। পূবে নিবিড় গাছপালা। গ্রাম কি ওদিকেই? এত খোঁজ-খবরে দরকার কী? উত্তরের বাঁকে এগিয়ে গেলাম। সকালে এখনও চৈত্রের তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে না। বাতাসে যেন অনাগত ঝড়ের সংকেত। কিন্তু আকাশ ঝকঝকে নীল। এক ঝাঁক পায়রা বাঁ দিকের ধান কাটা মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। রোদের ঝলকে চিত্র গ্রীবায় ঝিলিক রঙের ঝিলিক। তবে ধান কাটা মাঠ একেবারে রিক্ত খাঁ খাঁ না। এখনও রবি শস্যের ছিটে ফোঁটা কোথাও কোথাও রয়ে গিয়েছে।

উত্তরে বাঁক নিয়ে, ডান দিকে তাকিয়ে দাঁড়ালাম। গাছপালা ঘেরা বাগান। ভিতরের দিকে ঘর দরজা দেখা যায়। অথচ লোকজন চোখে পড়ে না। গৃহস্থের বাড়ি হলে, এত নিরিবিলি দেখাতো না। এত চুপচাপ থাকতো না। রাস্তার ধারে, বাগান ঘিরে, সীমানায় তারের বেড়া। অথচ ভিতরে যাবার পথ খোলা। ভিতরের ডান দিকে একটা টিউবওয়েল রয়েছে। সোজা-সুজি তাকালে, একটা বটের ছায়ায় চালা ঘর। আরও দূরে, জলের রেখায় রোদ চিক্‌চিক্ করছে। গঙ্গা?

'কে? কোথায় যাওয়া হবে?' বেশ ভারি আর মোটা গলা একেবারে কানের কাছে। চৈত্রের ঘোর দুপুর না, যে ভূতের আবির্ভাব হবে। নিঝুম দুপুরের একটা নিরাকার জীবন্ত রূপ আছে।

সেই রূপে ঘোর লাগে। সেই ঘোরে অনেক স্বপ্ন। ভূত বোধ হয় সেই স্বপ্ন থেকেই উঠে আসে। কিন্তু, এই সকালবেলায়, ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, যেন মাটি ফুঁড়ে একটি মানুষ উঠে এসেছেন। দাঁড়িয়েছেন একেবারে গায়ের কাছাকাছি। মাথার অবিন্যস্ত চুল কাঁচা পাকা। কয়েক দিনের আকাটা গোঁফ দাড়ির রঙও সেইরকম। মখে কিছু গাঢ় রেখার হিজিবিজি। মোটা ভুরুর নিচে, চোখ দুটি বেশ বড়, আর তারা দুটি উজ্জ্বল। দৃষ্টি গভীর। একটু কি ঢুলুঢুলু ভাব? মুখে কিঞ্চিৎ হাসির ছোঁয়া। খড়গ নাসা না হলেও বেশ চোখা। অথচ চোখে মুখে তেমন একটা জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি নেই। ঈষৎ কৌতুহল মাত্র। গায়ে একটি বুক খোলা জামা। সামান্য ধুতির কোঁচা হাঁটুর কিছু নিচে। পায়ে এক জোড়া পুরনো ধুলা মাখা চটি।

'কোন্ দিক দিয়ে এলেন ?'

বললাম, 'বিশেষ কোথাও যাবার নেই। এখানেই বেড়াতে এসেছি।'

'বেড়াতে ?' যেন অনেক দিনের চেনা, এমনি একটি হাসি ছড়ালো মুখের ভাঁজে। তারপরেই আবার মোটা ভুরু কুঁচকে উঠলো। ভারি আর মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কারোর বাড়িতে ?'

বললাম, 'না। এমনি, বেড়াতে—মানে—।'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মহাশয়ের বড় চোখে, তখনো ভ্রূকুটি। অস্বস্তি বোধ করলাম। এমনি বেড়াতে মানে কী ? চেনা পরিচিত কেউ নেই। গ্রামের মধ্যে আন্‌কা লোকের প্রবেশ। সন্দেহ করতে দোষ কী ? কিন্তু মহাশয়ের মুখে হাসি ফুটলো। হাসি বাজলো দরাজ গলায়। তারপরে হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। দেখতে দেখতে আবার হাসি, 'বেড়াতে ? মানে, এমনি বেড়াতে ? বাঃ বেশ বেশ। ভালো কথা। কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?'

জবাব দিতে সবে মুখ খুলতে যাবো, তার আগেই মহাশয়ের হাত উঠে এলো মুখ থাবাড়ির ভঙ্গিতে। ঘাড় ঝাঁকিয়ে আওয়াজ দিলেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি কলকাতা।' কিন্তু মধুমাস চৈত্রের বাতাসেও কি মধুর গন্ধ ছড়ায় ? আমার নাসারন্ধ্র স্ফীত হলো। এতক্ষণে চোখে ঠেকলো, মহাশয়ের ডাগর উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন কিঞ্চিৎ রক্তাভ। ঢুলুঢুলু আগেই দেখেছি। তা বলে এই সাত সকালে ? না কি রাত্রের বাসি রসের মৃদু গন্ধ ? অথবা আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে গোলযোগ ? বুঝে ওঠার আগে, তাঁর কথার জবাব দিতে গেলাম।

মহাশয়ের হাত নড়ে উঠলো, 'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। কাঁধের ঝোলায় কী আছে ?'

জিজ্ঞাসার সঙ্গে মোটা ভুরু জোড়ায় ঢেউ খেললো। চোখের ঝিলিকে, আর ঠোঁটের হাসিতে রহস্য। হঠাৎ এমন প্রশ্ন ? কিছু মন্দ সন্দেহ করছেন নাকি ? ওদিকে, অনেকক্ষণ থেকেই কালা পাখির কুহু শুনতে পাচ্ছিলাম, দূর থেকে ভেসে আসা বাতাসে। এখন হঠাৎ কানের কাছে সপ্তমে বেজে উঠলো, কুহু কুহু। বললাম, 'ঝোলার মধ্যে—?'

'রঙ তুলি কাগজ আছে তো ?' মহাশয় যেন আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিত। চোখ বুজে মাথা ঝাঁকালেন। আবার চোখ খুলে হেসে বললেন, 'বুঝেছি। এই সেদিনেও তোমার মতন এক ছোকরা এসেছিল। তার ঝোলায়ও রঙ তুলি কাগজ ছিল। আমিই তাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিলাম। এসো, তোমাকেও জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। হুঁ, কেবল নৈসর্গ নয় হে, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখতে হবে। এসো, দেখাচ্ছি।'

এবার বেজায় ঠেক লাগলো। নৈসর্গ, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা, কথাগুলো, কেমন যেন ধন্দ লাগিয়ে দিল। দেখে তো মহাশয়কে চালচুলোহীন

ছন্নছাড়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। তাঁর মুখে এমন বচন! হাঁড়ির হাল দেখে কিছু বোঝা যায় না। খাসা চালের ভাণ্ডে, খাসা চালের কথা লেখা থাকে না। এ দেখছি সেই রকম। আমার টনক নড়লো। মনের অবাক কোণে শ্রদ্ধাবোধ। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, উনি আমাকে কিছুদিন আগের ছোকরা আগন্তুক শিল্পীর মতোই একজন ভেবেছেন। দেখছি, উনি উত্তরে পা বাড়াচ্ছেন। আমি ডেকে বললাম, 'শুনুন, আমার ঝোলায় রঙ তুলি কাগজ নেই।'

'নেই?' থমকে দাঁড়িয়ে, পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। ভ্রূকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা, 'তা হলে কী আছে?'

সত্যি লজ্জা পেয়ে গেলাম। বিব্রত হেসে বললাম, 'নিত্য ব্যবহারের কিছু সামগ্রী।'

'অ! তুমি ছবি আঁকতে আস নি?' মহাশয়ের স্বরে হতাশার সুর, 'শুধু গ্রামে বেড়াতে এসেছ?'

নিজেকে নিতান্তই দীন মনে হলো। কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'এক রকম তাই। তবে আপনি ঐ যে বললেন, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা, সেটাও দেখবার খুব ইচ্ছে।'

মহাশয়ের ভ্রূকুটি চোখে আলোর ঝিলিক ফুটলো। মুখের খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ির ভাঁজে হাসি বিস্তৃত হলো। খুশির সুরে বাজলেন, 'অ, তুমি খালি দেখে বেড়াও?'

'আঁজ্ঞে—।'

'রাখো কোথায়?' চোখের পাতা নিবিড় হলো। মুখের হাসিতে যেন দুষ্টুমি ভরা।

কী জিজ্ঞাসা হে। জবাব দিতে গিয়ে, কথা খুঁজে পাই না। জবাবটা উনি নিজেই দিলেন। ঢুলুঢুলু চোখ আমার চোখে রেখে, নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকালেন। তর্জনী ছোঁয়ালেন দুই ভুরুর মাঝখানে, 'এই তোমার রাখবার জায়গা, তাই তো?'

মুগ্ধ প্রাণের জবাব নেই। তার চেয়ে অধিক আমার বিস্মিত জিজ্ঞাসা। বুকে আঙুল ঠেকানো ঠিক আছে। কিন্তু ভুরুর মাঝখানে তর্জনীর স্পর্শ যেন এক গভীর সংকেত। স্থানটি যে ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। মাথাটা পেতে দেবো নাকি ধুলা মাটির চটি জোড়ায়?

'বুঝেছি। এসো।' হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। পা বাড়ালেন উত্তরে।

ইতিমধ্যে দুই চার গ্রামবাসী যাতায়াতের পথে, মুখ তুলে আমাদের দেখে গিয়েছে। কালামুখো পিক্ কি? কুহু যাদের স্বরে। তারা তো ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেলছে। এদিকে, বুঝতে পারছি, মহাশয় আমাকে গুণ করেছেন। ধন্দ সঙ্গ বরবাদ। চুম্বকের টানের মতোই, তাঁর পিছু নিলাম।

মহাশয়ের কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। পিছন ফিরে দেখছেন না, আমি আসছি কী না। খানিকটা গিয়ে ডানদিকে ফিরলেন। সরু কাঁচা পথের দু ধারে বনশিউলির ঝাড়। গা জড়িয়ে নাম-না-জানা লতাপাতা নিবিড়। প্রজাপতি উড়ছে বনগাঁদার ঝাড়ে। চৈত্রেও ফুল ফুটেছে। মহাশয় থমকে দাঁড়ালেন। তখনই শিস শুনতে পেলাম। তিনি পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন। চুপি চুপি ইশারার ভঙ্গিতে হাত তুলে ডাকলেন। ডেকে, দু হাতে বনশিউলির ঝাড় সরিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। কী আছে ওখানে? হাত দিয়ে ঝাড় সরিয়ে তাঁর গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাকে মুখে মাথায় মাকড়সার জাল জড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কৌতূহল মাত্রা ছাড়া। •আবার শিস শোনা গেল। চেনা পাখির শিস। একটি ডানা ঝাপটা দিয়ে, ঝোপের মধ্যে উড়ে গেল।

মহাশয় আমার দিকে বালকের মতো খুশি চোখে তাকিয়ে, আঙুলের ইশারায় একদিকে দেখালেন। আমি ঝাড়ের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে, ঝুঁকে উঁকি দিলাম। দেখি, কুটোকাটি শুকনো লতায় জড়ানো এক পাখির বাসা। তার ওপরে অকুতোভয়ে বসে আছে লাল পাছা কালো বুলবুলি। কালো বুলবুলি অনেক দেখেছি। চিরদিন জানি, এ পাখি বড় ভীরু। কিন্তু এখন দেখছি, সে বড় দুঃসাহসী। মানুষ দেখেও নড়ে না। বরং পাখা দুটো ছড়ানোর মধ্যে, কেমন একটা যুদ্ধং দেহি ভাব। আর গলায় অদ্ভুত ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ।

শিস দিয়ে যে-পাখি ডাকে, তার গলায় এমন শব্দ কেন? তখনই আর একটি বুলবুলি, বাসার কাছে উড়ে এসে বসলো। আর বাসার ভিতর থেকে শব্দ আসছে, কৃষ্ণকলি ফুলের বাঁশির মতো। মৃদু, অস্ফুট, কচি স্বরের পিক্ পিক্ শিস। মাথা আর একটু তুলতেই রহস্য উদ্ধার। ভীরু বুলবুলির এত সাহসের মর্ম বোঝা গেল। ডিম ফোটা বুকের বাছা আগলাচ্ছে মা। তাই এত সাহস। সাহস না, রীতিমতো ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ। ভঙ্গি আক্রমণাত্মক।

'দেখলে?' মহাশয় চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন।

পাখির চেয়েও অবাক চোখে তাঁকে দেখলাম। মহাশয়ের নাম কী, করেন কী? কৌতূহল বাড়ে বই কমে না। অচেনা লোককে ডেকে, প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখান। মানুষ তো অনেক দেখলাম। এমন মানুষ তো চোখে পড়েনি। আমিও প্রায় চুপি চুপি স্বরে বললাম, 'সুন্দর।'

মহাশয় হাতছানি দিয়ে, ঝাড়ের বাইরে গেলেন। আমি আর একবার, বাসার ওপরে ঘাড় বাঁকানো পাখা ছড়ানো বুলবুলিকে দেখে, বেরিয়ে এলাম। মহাশয়ের মাথায়, খোঁচা গোঁফদাড়িতে, বনশিউলির শুকনো ভাঙা পাতা, কুটোকাটি। আমার মাথায় মুখেও নিশ্চয় লেগেছে। মাকড়সার জালে যতো ঝামেলা। হাত দিয়ে মাথায় মুখে বুলিয়ে নিলাম। মহাশয় তাঁর চোখ

দুটো বড় করে হাসলেন, 'ভারি মজার ব্যাপার, তাই না ? সংসারে কতো কী যে আছে।'

জবাবের প্রত্যাশা না করে, পশ্চিমের পায়ে হাঁটা পথে চললেন। অদ্ভুত মানুষ। দেখে বোঝবার উপায় নেই, এমন সব আশ্চর্য মজার ব্যাপার দেখে বেড়ান। এ সব মজার রস পেলেন কোথায় ? আর চললেনই বা কোথায় ? আমি যাবো কী না বুঝতে পারছি না। অথচ আমাকে গেঁথেছেন মোক্ষম। কৌতুহল বাড়তেই থাকে। ছেড়ে যদি চলে যান, বলার কিছু নেই। কৌতুহল নিয়ে চলে যাবো। কিন্তু ডুমুরদহের বনশিউলীর ঝাড়ে, তাঁর বুলবুলির মাতৃলীলা দেখানো ভুলবো না।

'কী হলো ? এসো।' মহাশয় খানিকটা গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন, 'একবার পাড়ার মধ্যে যাবে না ? গঙ্গার ধারে ?'

তিনি ডাকলেই যাই। ডাক পেয়েই, পা চালিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। প্রায় বোকার মতোই জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি এ-সব দেখে বেড়ান ?'

'অকম্মার আর কাজ কি বল ?' মহাশয় হেসে বাজলেন, 'এখন বাতিলের খাতায় নাম উঠেছে। কলকাতায় একটা চাকরি করতাম, অনেক আগে। পোষায় নি, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ধর্মে মন দিয়েছিলাম। তা সেটা বোধ হয় ভগবানের ইচ্ছে নয়, ধর্মে মন বসেনি। তাই এসবই দেখে বেড়াই।'

এর পরে হয়তো জিজ্ঞেস করা উচিত, তাঁর দিন চলে কেমন করে। কিন্তু ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে। দিন চলার কথাটা এত সহজে জিজ্ঞেস করা যায় না। তবে, সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'এ সবে বুঝি মন বসে ?'

'টানে।' মহাশয়ের হাসিমুখে কৌতুকের ছটা।

ছোট কথা। মাপে অগাধ। মনটা মজে গেল। চোখে তাঁর কৌতুকের ছটা দেখে বুঝলাম, ঐ টানেই তিনি মজে আছেন। অথবা বলতে চাইলেন, ওটিই তাঁর ভগবানের ইচ্ছা। প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখেন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাছেই কোথায় ধুপ্ ধুপ্ শব্দ হচ্ছে। মহাশয় ডান দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। তাকিয়ে দেখি, সেই ধুপ্ ধুপ্ শব্দের ঘর। মাথায় খড়ের চাল, চারদিক খোলা। লাল শাড়ি, নীল শাড়ি, দুটি তরুণী। পিছন ফিরে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। একজন ডান হাতে, একজন বাঁ হাতে, পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সামনে বাঁশের খুটির চৌকাঠ। বাকি দু হাত দিয়ে দুজনে বাঁশ ধরে রেখেছে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার তালে, তাদের শরীরে যেন নাচের ছন্দ। মাথায় তাদের ঘোমটা নেই। বাসি খোঁপার ফিতে আলগা। একজনের রঙ কালো। আর একজনের মাজা মাজা ফরসা। দুজনে মুখোমুখি তাকিয়ে কী যেন বলছে। আর হাসছে। ঢেঁকির সামনে যে চেলে দিচ্ছে, তাকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের ঝাড়ালো গাছটার উঁচু ঝোপে, কুউ-উ-কু-উ-উ···। ঝরা পাতা উড়ছে।

আমি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকালাম। মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা। মোটা ভুরু নাচিয়ে, নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন ?'

বুলবুলির বাচ্চা দেখার মতোই চুপি চুপি বললাম, 'অপরূপ !'

মহাশয় আমাকে হাতছানি দিয়ে, পা বাড়ালেন। আমি আর একবার দুই তরুণীর ঢেঁকি পাড়ের নাচের ছন্দ দেখে, তাঁকে অনুসরণ করলাম। তিনি এবার গলা খুলে বললেন, 'যামিনী রায়ের জ্যান্ত মডেল, তাই না ? এ রকম জোড়া মেয়ের ঢেঁকি পাড় দেওয়া এঁকেছেন কি না জানি নে। সেদিন যে ছেলেটা রঙ তুলি নিয়ে এসেছিল, সে বেচারি এমন সাবজেক্ট পায় নি।'

আমার আক্কেল গুড়ুম ঠকাস ! মহাশয়ের মুখে যামিনী রায়ের নাম ? গ্রামের নাম ডুমুরদহ। আমার চোখে অজ পাড়া গাঁ ছাড়া আর কিছু না। সামান্য ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। নিতান্ত এক চালচুলোহীন গ্রাম্য মানুষের মতো। যামিনী রায় এমনটি এঁকেছেন কি না জানেন না। কিন্তু তাঁর জ্যান্ত মডেল দেখিয়ে দিলেন। এ নজরের আয়তন কতো দূর ? মহাশয়ের বিচরণের ক্ষেত্রই বা কতোখানি ? কতো রাজপথে আর অলি গলিতে ? অবিশ্যি প্রকৃতির গভীরে যিনি জীবলীলার খেলা দেখেন, তাঁর নজর বিচবণের মাপ করতে যাওয়াটাই বেয়াকুফি। ভাগ্যিস, কোনো রকম খাপ খুলতে যাই নি ! আমার স্ব-ভাবেও সেটা নেই। কিন্তু এ যে অপ্রত্যাশিত। চরণে মাথা ঠুকবো নাকি ?

সাহস হয় না। এ সব মানুষের মর্জি বোঝা ভার। কেবল কৌতুহলই বাড়তে থাকে। দ্বিধা কাটিয়ে বলি, 'আমারও ঠিক জানা নেই, যামিনী রায় এমন ছবি এঁকেছেন কি না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ছবিটা চেনা।'

'কেন এমন মনে হলো বলো তো ?' মহাশয়ের চোখে কৌতুকের জিজ্ঞাসা। চলতে চলতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

কিন্তু কেন এমন মনে হলো, তা তো জানি না। অতএব সরল স্বীকারোক্তি, 'তা জানি নে।'

'জানো, মনে করতে পারছো না।' মহাশয় হেসে হেসে বাজলেন, 'ঐ ওরা যারা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে, ওদের তুমি অনেক জায়গায় অন্য কাজে দেখেছো। মাঠে ঘাটে নানা কাজে। তাই চেনা চেনা মনে হয়েছে।'

চিন্তার কি ঐশ্বর্য ! আবেগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, 'আপনার দৃষ্টি—'

'উঁহু !' হাত তুলে থামিয়ে দিলেন আমাকে, 'শক্তি-টক্তি বলো না। নজরটা কেড়ে নেয়। মনটা ভরে যায়।'

অথচ এমন নজর ক'জনের কাড়ে ? দেনন্দিন জীবনযাপনের এমন একটা সামান্য ছবি, ক'জনের মন ভরিয়ে দেয় ? বলি, মহাশয়, দরজা খুলুন। খুলেছেন যখন, আর একটু খুলুন। আপনাকে প্রাণ ভরে দেখি।

নিজেই একটু দরজায় হাত দিয়ে ঠেলি। জিজ্ঞেস করি, 'আপনার কি রঙ-তুলিতে—'

'উঁহু উঁহু—।' মহাশয় ঘাড় নাড়লেন, 'কোনো দিন হাত দিইনি। ঐ নজরেই টান। তুলির টানে ধরতে শিখিনি। সৃষ্টিকর্তার সগোত্র হওয়া কি সহজ কথা? রঙ তুলিওয়ালারা তো তাই। ওঁরা ঈশ্বরের সগোত্র। তোমার মনে হয়নি কখনো?'

তাঁর মতো মনের ঐশ্বর্য আমার নেই। পুরনো কথাই নতুন করে শুনছি কী না ঠাহর হয়-না। কিন্তু আমার কানে একেবারে নতুন। মুগ্ধ বিস্ময়ে বলি, 'আপনার মতো ভাবতে শিখি নি।'

'এটা শেখার বিষয় নাকি?' মহাশয় মোটা ভুরু কাঁপিয়ে, দুষ্টু ছেলের মতো হাসলেন, 'দেখলেই তো মনে আসে। মনো করো, সেই দা ভিঞ্চি থেকে রবি ঠাকুর—অ্যাঁ? মনে আসে না, সব তাঁরই সগোত্র?'

এখানে জবাব অপ্রয়োজন। দরজা খুলছে। চুপ করে থাকো। কিন্তু আমার বুকের কোথায় ফাটছে। মুখে ফুটছে না। মানুষের আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষাটা বুদ্ধিজাত না। প্রবৃত্তিজাত। দশটা শিশুকে খেলতে দেখলে, অপুষ্ট শিশুটিরও প্রাণে ঢেউ জাগে। ওটা বুদ্ধি বিবেচনা না। শিশু-প্রবৃত্তি। আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা। তবে কী না, এই মানুষে, সেই মানুষ আছে। নির্ভয়ে খেলতে নেমে যাওয়া যায়। আমার মুখ ফুটলো, 'এখন মনে হচ্ছে, রঙ তুলি কাগজ নিয়ে বেরোলেই ভালো হতো। অনভ্যাসে হাতটা ইদানীং আড়ষ্ট। এক সময়ে সচল ছিল।'

মহাশয় দাঁড়িয়ে পড়লেন। ডাগর গভীর চোখে ভ্রূকুটি দৃষ্টি। আমাব চোখে চোখ। গতিক কেমন? বেজায়গায় হাত দিয়েছি? উনি হা হা স্বরে বাজলেন, 'বুঝেছি। একটা গোলমাল কোথাও না থাকলে, এভাবে কেউ গ্রাম বেড়াতে বেরিয়ে পড়ে? তুমি কি ভেবেছো, গায়ে পড়ে এমনি এমনি তোমাকে মজা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি? ইস্টিশন থেকে নামলে। পায়ে পায়ে এদিকে এলে। আমি তোমার পেছনে পেছনে। ভাবি, অচেনা মুখ ছেলেটা আশ্রমের সামনে দাঁড়িয়ে কী দেখছে?'

আমি অবাক প্রশ্ন করি, 'আশ্রম?'

'হ্যাঁ, ঐ যেখানটাতে প্রথম দাঁড়িয়েছিলে, ওটা আশ্রম। উত্তমাশ্রম।' মহাশয়ের চোখের গভীরে যেন চিকচিক বিজলি ঝিলিক, 'তারপরে আওয়াজ দিয়েই টের পেলাম, এটা একটা ঠিকানা খোয়ানো ছেলে।'

আরও অবাক জিজ্ঞাসা করি, 'ঠিকানা খোয়ানো?'

'হ্যাঁ, ঠিকানা খোয়ানো। বেয়ারিং চিঠি না।' মহাশয় আবার হা হা স্বরে বাজলেন, 'দ্বিগুণ পয়সা দিয়ে নিতে হবে, বা ফেরত দিতে হবে, সে-রকম না। ঠিকানা খোয়ানো। আর ঠিকানা যারা খুইয়েছে, তাদের চোখেই ঐ

রঙটা আছে।' বলে তর্জনী তুলে আমার চোখের দিকে দেখালেন। তারপরেই ভ্রূকুটি নজর বিঁধিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা, 'এক সময়ে সচল ছিল, মানেটা কী? তোমার আবার এক সময়, দুই সময় কিসের, অ্যাঁ? সবে তো ফুটেছ ধন, এর মধ্যেই, ইদানীং হাত আড়ষ্ট আবার কী। হাতের জাম ছাড়াও। দেখবে, চালালেই চলবে।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই, একটা কুকুর তেড়ে এলো ঘেউ ঘেউ করে। মহাশয় মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, 'অ! এর আবার কর্তব্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। থাম বাবা, থাম। এসো, বসে কথা বলি।'

সামনেই দেখতে পাচ্ছি, গৃহস্থের খড়ের ঘরের চাল। মাটির দেওয়ালের আড়াল। গাছপালায় নিবিড় ছায়া। কালামুখোর ডাক আর থামে না। বাতাসে ঝরা পাতার দৌড়ঝাঁপ। মহাশয় যতো এগোন, সারমেয় ততো পেছোয়। কিন্তু ডাকতে ছাড়ে না। আর তার লক্ষ্য মহাশয় না, আমি। সে মহাশয়কে পাশ কাটিয়ে আমাকেই তাড়া করতে চায়। আমি ভয়ে ভয়ে একেবারে মহাশয়ের গায়ে গায়ে। আর উনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। নেমকহারামি জানিস নে। এখন একটু চুপ কর বাবা। এসো হে।' আমাকে ডেকে তিনি মাটির দেওয়ালের পাশ দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন।

অনুমান করলাম, মহাশয়েরই গৃহ। কিন্তু তিনি গলা তুলে ডাকলেন, 'গোবিন্দ আছ নাকি? কৈলাস কোথায়?'

গৃহরক্ষী সারমেয়র ডাকের কামাই নেই। তার মধ্যেই পুরুষ স্বর শোনা গেল, 'আসুন দাদাঠাকুর।'

'তোমার ঐ কেলো না ভুলো, ওকে একটু থামাও ভাই।' মহাশয় বললেন। আমার দিকে ফিরে, হাতছানি দিলেন।

এ তা হলে মহাশয়ের গৃহ না? ভিতরে ঢুকে দেখি, দুই পাশে উঁচু দাওয়া ঘর। মাঝখানে গোবর মাটি দিয়ে নিকানো পরিচ্ছন্ন উঠোন। উঠোনের এক পাশে কিছু ধান রোদে দেওয়া হয়েছে। কাছ ঘেঁষে কিছু খোসা শুদ্ধ সুপুরি। আমরা ঢোকবার মুখেই, এক ঘর থেকে উঠোন পেরিয়ে আর এক ঘরে যাচ্ছিল বাড়ির বধূ। এক পলক ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, ঝটিতি মাথার ঘোমটা টেনে বাড়িয়ে দিল। পুবের দিকে খোলা। কয়েকটা নারকেল সুপুরি গাছের ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যায়। রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। উঠোনের দক্ষিণে বাঁশের খুঁটিতে বড় একটা মাছ ধরার জাল শুকোচ্ছে। ডানদিকের ঘরের ছেঁচতলায় একটা বেঠা। গোবিন্দ বা কৈলাস, যে-ই হোক, খালি গা, গুটিয়ে পরা ধুতি। হাতে তার জাল বোনার সুতো আর কাটি। পাশে দাঁড়িয়ে একটা ল্যাংটা ছেলে। সে-ই তাড়া করলো কুকুরটিকে, 'হেই ভুলো, মারব সসালা!'

দু ফুট উঁচু ল্যাংটা শিশুর তাড়া খেয়ে, ভুলো নেমে গেল পুবের ঢালুতে।

প্রতাপ আছে বলতে হবে। মুখের বচনও জব্বর! 'স্‌সালা' উচ্চারণটি স্পষ্ট। গোবিন্দ বা কৈলাসের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি আমার দিকে। আপ্যায়ন করে দাদা-ঠাকুরকে, 'বসুন দাওয়ায় উঠে বসুন। দুটো আসন পেতে দাও গো।' ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো।

'আসন লাগবে না গোবিন্দ, দাওয়াতেই বসা যাবে।' মহাশয় আমার দিকে তাকালেন। আমার জামা কাপড়ের দিকেও। তারপরে বললেন, 'এই বাবুটির জন্য একটা আসন দাও। গাঁয়ের অতিথি, বিদেশী মানুষ, পাট ভাঙা জামা কাপড়।'

বাবু বলে উপহাস করছেন না তো? লজ্জায় আর অস্বস্তিতে বললাম, 'আমার আসন দরকার নেই।'

দরকার যাদের, তারা নিজেদের কাজ করে যায়। ঘরের ভিতর থেকে একটি কিশোরী বেরিয়ে এসে দাওয়ার ধারে দুটো আসন পেতে দিল। চটের গায়ে রঙীন সুতোর নক্‌শা করা আসন। কেবল তো বসতে দেওয়া না। হাতের কাজের শিল্প প্রদর্শনও বটে। মহাশয় বললেন, 'এ ছোকরাবাবু ছবি আঁকতে আসেন নি, গাঁ দেখতে এসেছেন। একটু চা খাওয়াবে তো গোবিন্দ?'

গোবিন্দ লোকটির বয়স চল্লিশ হতে পারে। কালো শক্ত-পোক্ত শরীর। মাথায় ঘন কালো চুলে, দুই-চার রুপোলি ঝিলিকটা তাই বেশি চোখে পড়ে। হাসতে গেলে, গাল কুঁচকে যায়। বললো, 'তা খাবেন। আগে বসেন তো। তা এত সকালে···এই বাবুকে আনতে গিছলেন নাকি?'

'বাবুকে আনতে? কোথা থেকে?' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে একবার দেখেন আমাকে, আবার গোবিন্দকে।

গোবিন্দ বললো, 'ইস্টিশন থেকেই হবে বোধ করি?'

'বাবু কারোর আনা নেওয়ার মানুষ নয়।' মহাশয় হেসে বাজলেন, 'নিজের থেকেই এসেছেন। আমি আসছিলাম পশ্চিমের পঞ্চুর বাড়ি থেকে। পঞ্চু কাল নেমতন্ন করে রেখেছিল কী না, তাই।'

গোবিন্দর চোখে কৌতুকের ঝিলিক, গালে হাসির ভাঁজ। একবার আমাকে দেখে নিয়ে বললো, 'সকালের রস বেশ টাটকাই ছেল তা'লে?'

'উঁম!' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন আমার দিকে। তারপরে গোবিন্দর দিকে ফিরে বললেন, 'তা চোত্‌ মাসের সকালের তালের রস কি বাসি হবে? ও তো তাড়ি নয়, নীরা। বাখর মশলা কিছু মেশানো হয়নি। তবে বেশি খাইনি। এক কলসী।'

তা হলে আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়টি নেহাত ভোঁতা না। মধু মাসে মধুর গন্ধটা ঠিকই পেয়েছিলাম। মধুতে কিঞ্চিত বাসিরসের গন্ধ মনে হয়েছিল। এখন বুঝলাম, বাসি না, রস টাটকা। কিন্তু এক কলসী! পেটে এত জায়গা কোথায়? থাকে। সবাই সব জানতে পারে না। তবু বলতে হবে, ঈষৎ

লাল চোখে ঢুলঢুলু নজরে, তাঁর প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখতে ভুল হয় নি। বরং ভাবের ঘরটি খাসা আছে।

গোবিন্দ বললো, 'পঞ্চু মন্ডলের পেরাণটি দরাজ। নিজে খেতে ভালোবাসে, পরকে খাওয়াতেও ভালোবাসে।'

'ভালোবাসা ঐরকম।' মহাশয় গোবিন্দর কৌতুকহাস্য দেখলেন না। আমাকে বললেন, 'বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?' বলে নিজেই আগে বসলেন।

আমি দাওয়ায় উঠে তাঁর পাশের আসনে বসলাম। এমন সময়ে পুবের ঢালু থেকে, ভেজা কাপড় গায়ে জড়িয়ে উঠে এলো এক রমণী। তারুণ্যের দীপ্তি তার শরীরে। উঠে আসছিল আনমনে। হঠাৎ দাওয়ায় আমাদের দেখেই ঠেক। নিজেকে সামলাবার আর সময় ছিল না। এক দৌড়ে, অন্য ঘরের পিছনে অদৃশ্য হলো। মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কৈলাস কোথায় ?'

'ভূতো কেষ্টকে নিয়ে জাল তুলতে গেছে।' গোবিন্দ জাল বুনতে বুনতে জবাব দিল।

মহাশয় বললেন, 'তা হলে চা হোক, আমি এর সঙ্গে একটু কথা বলি।' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কথার আগে নাম কামটা আগে জেনে নিই ?'

নাম বললাম। কামেই ঠেক। মহাশয়ের ডাগর চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। কী জবাব দেবো, বুঝতে পারছি না। উনিও চোখ সরান না। দেখছি গোবিন্দরও কান খাড়া। শেষ পর্যন্ত মুখ খোলবার উদ্যোগ করতেই, মহাশয়ের সেই মুখ থাবাড়ি হাতের ভঙ্গি, 'থাক, আর বলতে হবে না। আমি পত্র-পত্রিকার পাতা ওলটাই হে।' তারপরেই আমার একটা হাত ধরে, কয়েক পলক মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। থাকতে থাকতেই হঠাৎ হা হা স্বরে বেজে উঠে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'অ গোবিন্দ, তোমার ঘরের অতিথি বড় এলেমদার হে। শুধু চায়ে হবে না, কিছু খাবার ব্যবস্থা কর।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, খাবার দরকার নেই।'

'তুমি চুপ কর।' মহাশয় বেশ হুকুমের সুরে বললেন, 'খাবার কি আর এ ঘরে ক্ষীর ননী পাবে ? মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা। তারপরেই আবার আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটি নজর, 'বলতে হয়, অ্যাঁ! তাই ভাবি, এই সাতসকালে কার ঘাড়ে এমন ভূত চাপে, গ্রাম বেড়াতে বেরোয় ? কথাটা তা হলে ঠিকই বলেছিলাম, অ্যাঁ ? ঠিকানা খোয়ানো ছেলে। এসে পড়েছে ডুমুরদয়। আর পড় তো পড় আমারই চোখে।'

গোবিন্দর জাল বোনা হাত থমকেছিল। চোখে বিভ্রান্তি, 'ঠিকানা খোয়ানো মানে কি দাদাঠাকুর ?'

'যার কোনো ঠিকানা নেই, সে-ই ঠিকানা খোয়ানো।' মহাশয়ের খোঁচা

গোঁফদাড়ির হিজিবিজি মুখে হাসি। চোখে সেই কৌতুকের ছটা, 'বুঝলে গোবিন্দ, এ হারিয়ে গেছে।' আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালেন।

গোবিন্দর ধন্দ কাটে না। জিজ্ঞেস করে, 'আপনার কথা তো কোনোদিন বুঝতে পারিনে দাদাঠাকুর। বই পড়ে পড়ে, কথা সব চালে খুদে এক। উনি কি কাজ করেন, সেটা তো বুঝলাম না।'

'তোমাকে কী বলে বোঝাবো বলো তো গোবিন্দ, অ্যাঁ?' মহাশয় আমার দিকে তাকালেন, 'কা, তুমি কী কর বলো তো? তুমি সেটেলমেণ্ট অফিসের বাবু কী? না কি রেজিস্ট্রি অফিসের আমিন?'

এ রহস্য জিজ্ঞাসার জবাব আমার জানা নেই। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে, বিব্রত হয়ে হাসি। মহাশয় মজা পেয়ে, হেসে বাজেন। বলেন, *'গোবিন্দ, এ লেখে।'*

গোবিন্দর বিভ্রান্ত জিজ্ঞাসা, 'লেখেন?'

'হ্যাঁ, লেখে। ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর লেখে।' মহাশয়ের চোখে তেমনি কৌতুকের ছটা, 'বুঝলে গোবিন্দ, এ বই লেখে। তোমার কথাও লিখবে। কী, লিখবে না?' ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকান।

কী জবাব দেবো, ভেবে পাই না। গোবিন্দর মুখের দিকে তাকাই। ধন্দটা পুরোপুরি কাটেনি। কিন্তু মুখে যুক্ত দন্ত হাসি। আমি দূরের গঙ্গার দিকে একবার দেখি। জোয়ার ভাঁটা বুঝতে পারি না। চৈত্রের গঙ্গার রুপোলি স্রোতে, ইস্পাতের ঝলক। আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাই মহাশয়ের মুখের দিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত তুলে, আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন, 'বলতে হবে না। বুঝেছি। সংসারে সব কথার জবাব মেলে না। ভাবের কথা, ভাবের ঘরে, ব্যক্ত করা যায় না।'

এই সময়ে সেই কিশোরীর আবির্ভাব। অচেনা লোক দেখেই বোধ হয়, গায়ে এখন ধোয়া ডুরে শাড়ি। আমাদের সামনে নামিয়ে দিল, মুড়ি ভরতি বড় এলুমিনিয়ামের থালা। তার সঙ্গে আস্ত কাঁচা লংকা আর কাটা পেঁয়াজের টুকরো। উঠোনের ওধারের ঘরের দাওয়ায় এক বধূ। লালপাড় শাড়ির ঘোমটা তোলা মুখ। চোখে অবুঝ কৌতুহল। আমি তাকাতেই ঘোমটায় টান। পিছন ফিরে ভিতরে গমন। নিকানো উঠোনে ইতিমধ্যে কয়েকটা উড়ে আসা ঝরা পাতা। উত্তরের চালের কাছে, সজনের ডালে চড়ুইয়ের ঝাঁক। কালামুখোদের কুহু গাঁয়ের আকাশ জুড়ে।

'খাও হে। খাও, কথা আছে অনেক।' মহাশয় নিজেই আগে মুঠো-ভরতি মুড়ি মুখে পুরলেন।

যে-কথার জবাবটা তাঁকে দিতে পারিনি, সেই জবাবটাই নিজেকে দিচ্ছিলাম। তিনি কাগজপত্র ঘাঁটা মানুষ নিঃসন্দেহে। না হলে নাম শুনেই এমন অখ্যাতকে ঝটিতি চিনতে পারতেন না। কিন্তু সেটা তাঁর বড় পরিচয় না। তিনি

আমাকে প্রকৃতির গভীরে জীবলীলার খেলা দেখিয়েছেন। দুটি চিত্র। ভোলবার না। তবু মন নিরন্তর স্রোতে ধায়। পলি পড়ে। সময়কে অবজ্ঞা করি, এমন সাহস নেই। হয় তো কোনোদিন সেই স্মৃতির ঝাপটায় পলি ধুয়ে যাবে। তখন ডুমুরদহের কোনো কথা না লিখি, তাঁর কথা লিখবো।

মহাশয় আমার ডান হাতটা টেনে, মুড়ির থালায় গুঁজে দিলেন। আমি হেসে মুড়ি নিলাম মুঠো করে। তিনি বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। গোবিন্দ এগিয়ে এসে, গম্ভীর মুখে বলল, 'দাদাঠাকুর, বই লিখলে তো সবাই পড়বে?'

'তা যাদের পড়ার তারা পড়বে।' মহাশয়ের চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা।

গোবিন্দ একটু হাসবার চেষ্টা করলো। তারপরেই আবার মুখ শক্ত, 'তা হলে বাবুকে বলে দিন, শরৎ দাস যে আমার মরা বাপের অতবড় বিনু জালটা আকোচে কেটে দিয়েছিল, সেটা যেন লিখে দেন, হ্যাঁ।'

মহাশয় তাকালেন আমার দিকে। আমিও দেখলাম তাঁকে। তিনি আবার তাকালেন গোবিন্দর দিকে। গোবিন্দর মুখে এখন আড়ষ্ট হাসি। আমার দিকে একবার দেখে, মহাশয়কে আবার বললো, 'আর গত সনে, তিন দিনের জ্বরে ছোট মেয়েটা মারা গেল, সেই কথাটাও।'

মহাশয় আবার তাকালেন আমার দিকে। এখন তাঁর কপালে ভ্রূকুটি নেই। ডাকর চোখে অবাক ব্যগ্র জিজ্ঞাসা। গোবিন্দর কথাগুলো কানে ভাসছে। তার প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি আমার দিকে। মুখটা হা করা। লিখে দেবার জন্য দুটো কথা তার মনে এসেছে। একটা, হারানোর ক্ষোভ। আর একটা শোক। পর পর দুটো হারানোর কথাই কেন মনে এলো, সেই জবাবটা তার চোখে খুঁজেছি। মুলে হয় তো চোখে নেই। ঐ দুটোই মনে গেঁথে আছে। মহাশয়ের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'লিখবো।'

'লিখবে।' মহাশয় গোবিন্দকে বললেন। আবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের?'

'জীবলীলার খেলাটা কেমন?' যেন সেই চুপিচুপি স্বরেই জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, 'বিচিত্র।'

মহাশয় হেসে বাজলেন, 'চিবোও, মুড়ি চিবোও দেখি।' নিজে মুঠি করে মুড়ি নিয়ে মুখে পুরলেন। চিবোতে চিবোতে বললেন, 'এবার তোমার সেই কথাতে আসি। অনভ্যাসে হাত সরে না বলছিলে? তা দেখ, এই ডুমুরদ গ্রামটায় একটু ধর্মের ভাব বেশি। পাশে দেখলে উত্তমাশ্রম। ঐ আশ্রমের কল্যাণে এ গ্রামের উন্নতি। অনেকের সাধন লাভ হয়েছে। এখন আছেন বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী। পারো তো একবার দেখা করে যেও।'

নাম শুনেই এক স্বভাব কবি বন্ধুর কথা মনে পড়ে গেল। দেখা হলেই, ঠাকুরের নামে কবিতা বলে। বললাম, 'শুনেছি।'

'তিনিও এই গ্রামের মানুষ।' মহাশয় বললেন, 'কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি, ভগবানের বোধহয় ইচ্ছে নয়, আমি ধর্ম নিয়ে থাকি। নইলে, কাকে গু না খেতে পঞ্চু মণ্ডলের বাড়ি রস খাবার নেমন্তন্ন রাখতে যায় না।' হা হা হাসিতে বেজে উঠেই, আবার মুখে এক মুঠো মুড়ি। আর চিবোতে চিবোতেই, মুখের মুড়ি বাগে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'রবিঠাকুরে ভক্তি কেমন?'

আমি মুড়ি গিলে, বলে ফেললাম, 'তেমন নেই। প্রেমে আছি।'

'অ বাবা। আমাকেও খেলা দেখাচ্ছো?' মহাশয় আমার হাঁটুর ওপরে একটা আলতো চাপড় মারলেন, 'আসল কথাটা বলেছো। জীবনে একবার তাঁকে দেখেছিলাম। অই—উইখানে।' হাত তুলে দেখালেন গঙ্গার উত্তর-পুবে।

একটু কেমন ধন্দ লেগে গেল। তাঁর হাতের নিশানায় আমিও তাকালাম। যতো দূরে দেখালেন, দৃষ্টি সেখানে যায় না। গাছের আড়ালে আটকে যায়। জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর ঈষৎ লাল ঢুলু ঢুলু চোখের দিকে তাকালাম।

'হ্যাঁ! গঙ্গার ওপারে। এটা হলো কতো?' মহাশয় এক মুহূর্ত চোখ বুজলেন। আবার খুললেন, 'নাইনটিন ফিপটি ফাইভ। সেটা ছিল থার্টিথ্রি, অক্টোবর মাস, রাসের সময়। তুমি কি বিশ্বাস করছো না?'

তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে বলি, 'আজ্ঞে—।'

'পুরোটা করছো না।' মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা, পঞ্চু মণ্ডলের রসের এত ক্ষমতা নেই, সেই সন্ধেটা ভুলিয়ে দেবে। তারিখটা ইস্তক মনে আছে, ঊনতিরিশে অক্টোবর। এই ডুমুরদর উত্তরে খামারগাছি গ্রাম। সেই খামারগাছির ওপারে তাঁর বজরা নোঙর করেছিল। খবর আমরা পেয়েছিলাম আগেই, যখন তিনি ত্রিবেণীর ঘাট পেরিয়ে আসছেন।' মহাশয় থেমে এক মুঠো মুড়ি মুখে পুরলেন।

আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। নিজেকে ধিক্কার। মহাশয়কে এক মুহূর্তের জন্য ভুল বুঝেছিলাম।

তা বাইশ বছর আগের কথা। আমার বয়স তখন তোমার মতন হবে। কমও হতে পারে কিছু।' মহাশয় মুখের মুড়ি তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেন, 'কয়েকজনের সঙ্গে আমিও নৌকোয় করে ওপারে গেলাম। বজরার গায়ে গিয়ে নৌকো ভিড়লো। উনি তখন ভিতরে। খবর গেল। বললেন, দেখা হবে না। তা বললে কি হয়? বুকের ওপর দিয়ে চলে যাবেন, দেখা পাবো না? উপরোধে গেলায় ঢেঁকি। কী আর করেন? বজরায় ডাকলেন। দোখ গায়ে একটা কালো জোব্বা। আমার মনে তখন বিস্তর কথা। ভুলে গেছলাম, বিস্তর কথার ধারে কাছে উনি নেই। আমাদের ক্লাব লাইব্রেরির

কথা শুনে, একখণ্ড কাগজে নিজের নামটি সই করে, নিচে ডুমুরদহ লিখে তারিখ বসিয়ে দিলেন। সেটা এখনো গাঁয়ের লাইব্রেরিতে রাখা আছে। কিন্তু আমি শুধু চেয়ে দেখলাম, একটা কথাও মুখে ফুটলো না। শুনলাম, উনি শান্তিপুরে যাচ্ছেন। ঐ বয়সে শান্তিপুরের রাস দেখতে কী না, তা জানিনে।' কথা থামিয়ে মুড়ি মুখে পুরলেন।

আমি মহাশয়ের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছি। ঐ দেখাটা আমার জীবনে কখনও হয়নি। মহাশয় বললেন, 'ঘটনাটা ওখানেই শেষ। ধর্মে আমার মন বসেনি, কিন্তু মনটা অন্যদিকে টানতো। রবিঠাকুরের কোনোকিছুই ভোলবার নয়। তবে দুটো ব্যাপার আমাকে চিরদিন বড্ড ভাবিয়েছে। একটা কথা তিনি এক সময় বলেছিলেন, "আমাকে যদি কেউ বলে, তোমাকে দুটোর একটা হারাতে হবে, দৃষ্টি অথবা শ্রুতি। আমি বলবো, দৃষ্টি ছাড়তে পারি, শ্রুতি নয়।" যদ্দুর মনে পড়ে প্রমথনাথ বিশীর কোনো লেখায় কথাটা পড়েছিলাম। তারপরে অনেক দিনে-রাত্রে চোখ বুজে, কান পেতে থেকেছি। তাঁর মতো করে বুঝতে পারি নি, শব্দের কি মহিমা। কিন্তু অবাক হয়ে অনেক গান শুনেছি।'

ডুমুরদহ গ্রামে, সম্ভবত এক মৎস্যজীবীর ঘরের দাওয়ায় বসে আছি। সামনে আমার একব্যক্তি। এখনও তাঁর নাম জানি না। দেখলে মনে হয় চালচুলোহীন ছন্নছাড়া। পঞ্চু মণ্ডলের তালের রস পান করে এসেছেন। এখন চোখ বুজে আছেন। রবিঠাকুরের দৃষ্টিহীন শব্দের কথা বলেন। কিন্তু কী গান তিনি শুনেছেন? জিজ্ঞেস করি, 'গান?'

'হ্যাঁ, গান।' মহাশয় মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'সে-গানের তাল আছে, লয় আছে, মান আছে। একেবারে সুরে বাঁধা। শুনেছো কোনোদিন?' চোখ মেলে তাকালেন।

শুনেছি কী? সংশয়ের চোখে তাকিয়ে থাকি। স্থান কাল ভুলে যাই। মনে হয়, কী ধ্বনি যেন কানে বাজে। মহাশয়ের চোখে কৌতুকের ছটা, 'শুনেছো, মনে করতে পারছো না। না শুনলে লিখতে পারতে না। রবিঠাকুরও পারতেন না। ধ্বনি ছাড়া কাব্য হয় না। তাই ঐ কথাটা কখনো ভুলতে পারিনে। আবার আর একটা উলটো উৎপত্তি দেখ, শেষ বয়সে তাঁর ছবি আঁকা। কোথা থেকে কোথায়! সারা জীবন অক্ষরে লিখে, শেষে রঙ তুলি ধরেছিলেন। তোমাদের সেই কি একটা কথা আছে না, পূর্ণতা? পাওয়া যায় কি না, জানিনে বাপু। কিন্তু ওঁর ছবি আঁকার কারণটা বোধহয় তাই, পূর্ণতা। ক্ষ্যাপামি না?'

অবাক হয়ে বললাম, 'ক্ষ্যাপামি?'

'তা নয় তো কী?' মহাশয়ের হিজিবিজি মুখে যেন দুষ্টুমির হাসি, 'ঈশ্বর তো ক্ষ্যাপাই। তবে ঈশ্বর নিজেও পূর্ণ কী না, আমি জানিনে।' মুঠো করে মুড়ি নিয়ে মুখে পুরলেন। কচ্‌কচ্‌ করে পেঁয়াজ চিবোলেন।

আমি তাজ্জব হয়ে মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। রবিঠাকুরের নামেই ভয় হয়, এমন প্রেমিক অনেক দেখেছি কলকাতায়। ঠাকুরের ভর হলে, অনেক আড় মাতাল-কথা শোনা যায়। কিন্তু এমন প্রেমিক দেখিনি। তাও এক পাড়াগাঁয়ের, গৃহস্থের দাওয়ায় বসে।

'আর তুমি বলছো কি না, অনভ্যাসে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আর চলে না?' মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে প্রায় ধমক দিলেন, 'খবরদার, রঙের হাত ছেড়ো না। চালালেই চলবে। নাও, মুড়ি চিবোও।'

এই সময়ে কিশোরীটি নেমে গেল দাওয়া থেকে। ওধারের দাওয়ায় ঘোমটা ঢাকা কলাবউয়ের হাতে দুটি কাঁচের গেলাস। খয়েরি রঙ চা থেকে ধোঁয়া উঠছে। কিশোরী গেলাস দুটো এনে আমাদের সামনে বসিয়ে দিল।

মহাশয় জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁরে, বাপকে দিবিনে?'

'আজ্ঞে আমি এখন আর চা খাব না।' গোবিন্দ বললো, 'চাড্ডি ভাত খেয়ে খামারগাছির হাটে যাব।'

মহাশয় মাথা ঝাঁকিয়ে, একটা গেলাস তুলে নিলেন। চুমুক দিয়ে আরামের শব্দ করলেন। পকেট থেকে বের করলেন বিড়ি দেশলাই। দেখে, এতক্ষণে আমার নেশাও চাপলো। কিন্তু মহাশয়ের সামনে কি উচিত হবে।

'এ বস্তু চলে?' মহাশয় নিজেই জিজ্ঞেস করলেন বিড়ি দেখিয়ে।

কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'আমার আছে। আপনি অনুমতি দিলে—।'

'অনুমতি?' হা হা স্বরে হেসে বাজলেন, 'পথ চলতে তো তা হলে জনে জনের কাছে তোমাকে অনুমতি চাইতে হবে। নাও, বের কর।'

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলাম। মহাশয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলাম, 'যদি ইচ্ছা করেন।'

'কী, গোবিন্দ, ইচ্ছা কর?' মহাশয় গোবিন্দর দিকে তাকালেন।

গোবিন্দ একেবারে লজ্জায় এতোটুকু। হাসি গালের ভাঁজে। মহাশয় একটি সিগারেট নিয়ে তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'নাও।'

গোবিন্দ এগিয়ে এসে বললো, 'আপনি নেন দাদাঠাকুর।'

'আহা, আগে তুমি নাও।' মহাশয় ধমকে বাজলেন।

গোবিন্দ প্রসাদ নেবার ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়ালো। বাঁ হাত ডানের কনুইয়ে। মহাশয় সিগারেট দিয়ে প্যাকেটটি আমাকে দিলেন। দাঁতে কামড়ে ধরলেন বিড়ি, 'যার যাতে মৌতাত। তুমি সিগারেট ধরাও। কিন্তু চা টা ঠাণ্ডা করো না।'

আমি সিগারেট না ধরিয়ে চায়ের গেলাসে চুমুক দিলাম। মহাশয় নিজের বিড়ি ধরিয়ে, গোবিন্দর সিগারেটে আগুন ছোঁয়ালেন। আমার মনটা অনেকক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। অচেনা লোককে পথ থেকে ডেকে যিনি প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখান, ডেকে এনে বসান চেনা গৃহস্থের দাওয়ায়, রবিঠাকুরের

শ্রুতি আর ছবি আঁকা যাঁকে ভাবায়, তাঁর পরিচয়টা এখনও পাইনি। চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে গলা খাকারি দিলাম। বললাম, 'আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনো পেলাম না।'

'আমার পরিচয়?' মহাশয় বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে অটুট দাঁতে অবাক হাসলেন, 'এখনো চিনতে পারোনি?'

কী অর্থ এই পাল্টা জিজ্ঞাসার? বলতে গেলে, একরকমে চিনেছি তাঁকে নিশ্চয়ই। হয় তো সেই চেনাটাই আসল। তারপরে আর বাকি কিছু থাকে না। পথের দেখায় সেটাই অনেকখানি। ঘুরে ফিরে, শেষ পর্যন্ত মানুষের সামনে অবাক হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছি। সকল মনুষ্যে তাই নমস্কার বারংবার। আমি তাঁর ডাগর গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'পরিচয় তো আমার চেহারায় জামা কাপড়েই লেখা আছে।' মহাশয়ের চোখে সেই কৌতুকের ছটা, 'তা ছাড়া শুনলেই তো, ভোর না হতে পঞ্চু মণ্ডলের বাড়িতে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গেছলাম। আসলে তুমি নামটা শুনতে চাইছো, তাই তো?'

আমি ঘাড় ঝাঁকালাম।

'নামে কি কিছু আসে যায়?' মহাশয়ের বিড়িতে আগুন নেই। তবু কয়েকটা টান দিলেন। ফুকো টান। বললেন, 'এমন অনেক অম্বিকা বাঁড়ুজ্জেকে তুমি বাঙলা দেশের হাটে ঘাটে ঘুরতে দেখবে। পৈতে আছে, দু বেলা গায়ত্রী জপা হয় না। শুনেছি পূর্ব পুরুষেরা ডাকাতি করতো। হ্যাঁ, ডুমরদ এক সময়ে ছিল ডাকাতের গ্রাম। ডাকাতি করেই জমিদার। এখনো গাঁয়ের ভেতর এমন বাড়ি দেখতে পাবে, গঙ্গা থেকে যাদের বাড়ির ভেতর ছিপ নৌকো ঢুকে যেতো সুড়ং-এর মধ্য দিয়ে। বিশে ডাকাতের নাম শুনেছো?'

বললাম, 'শুনেছি। বিশে ডাকাত যে কতোজন, তার হিসেব করা মুশকিল।'

'যথার্থ বলেছো।' মহাশয় ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাও আবার সে-ডাকাত যদি হয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ডুমুরদতেও এক ডাকাত ছিলেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

এবার আমার চোখে ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসা। অম্বিকা বাঁড়ুজ্জে মশাই মুখ থাবাড়ি হাত তুললেন, 'বুঝেছি। তুমি যে-বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ভাবছো, ইনি তিনি নন। ইনি নিতান্তই ডাকাত ছিলেন। তুমি যাঁর কথা বলছো, তিনি আসলে ডাকাত ছিলেন না। গরীব রায়তদের নেতা ছিলেন। ইংরেজ কোম্পানি তাঁর মাথার বরাদ্দ দিয়েছিল দশ হাজার টাকা। কোম্পানির ফৌজ নিয়ে যে সাহেব তাঁকে ধরেছিল, নামটা তার মনে করতে পারছিনে। ক্যাপটেন ট্যাপটেন হবে। তবে বিশ্বনাথের দলের লোকই

ছবিশটা দিয়েছিল। সে-শুনে তো আমাদের ঘাট নেই। যে বিশ্বনাথ বাঁড়ুজ্জের ফাঁসি হয়েছিল, তুমি তাঁর কথাই বলছো তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বিলেতে জন্মালে তিনি রবিনহুডের সম্মান পেতেন। এ দেশে বিশে ডাকাত। ইংরেজরা আমাদের মানুষ করেছিল ভালো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ধূসর খোঁচা গোঁফ দাড়ির ভাঁজে বিদ্রূপের বক্র রেখা। দাঁতে কামড়ে নিভে যাওয়া বিড়িতে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ছোঁয়ালেন। তারপরেই চোখে যেন কিঞ্চিৎ সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, 'ইংরেজের দোষ ধরলে, তোমার আবার মনে লাগে না তো?'

হেসে বললাম, 'সেই মানুষ করার বোঝা নিয়েই তো চলছি।'

'বটে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হেসে বাজলেন, 'বোঝাটাই বিস্তর তুক। জলপড়া মাদুলির থেকেও বেশি শক্তি ধরে। তোমার সঙ্গে আমার পটবে দেখছি। এবার শোন আর একটা মজার কথা বলি। রবিবাবু যে খামারগাছির ওপারে বজরা বেঁধেছিলেন, তার কারণ বোধহয়, ডুমুরদর ডাকাতির নাম ডাক শুনে।' বলেই, অট্টহাস্য করলেন, 'কিন্তু ডাকাতের বদলে এখন ডুমুরদ সাধু সাধকের গাঁ। একে বলে চালের দান ফেরতা। অবিশ্যি আমার মতো মানুষও আছে। না হলাম সাধু সাধক, আঁট ঘাট বাঁধা গেরস্ত।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কেবল প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা দেখে বেড়াচ্ছেন।'

'যা বলেছো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মোটা ভুরু নাচিয়ে, দুষ্টু শিশুর মতো হাসলেন, 'তাইতে সকলের খুব রাগ। বড় ছেলে কলকাতায় চাকরি করে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট ছেলে চুঁচড়োর কলেজে পড়ে। ছেলেরা কেউ কথা বলতে চায় না। গিন্নির কেবল মুখ ঝামটা। দেবেই তো। সারাটা জীবন খালি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলাম। অল্প বিস্তর যা জমিজমা আছে, তাও দেখাশোনা করতে পারিনে। এমন মানুষ দিয়ে কী কাজ?'

সত্যিই তো সংসারের দাবী নেই? তার ওপরে আবার রবিঠাকুরের শ্রুতি আর ছবি আঁকা নিয়ে ভাবনা। চোখ বুজে প্রকৃতির গান শোনেন। এমন কি সে-গানের তাল মান লয়ও ধরতে পারেন। এর চেয়ে সংসারে আর অযোগ্য লোক কে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, গাঁয়ের পাঁচ কথায়ও থাকেন না। অতএব লোকেই বা মানবে কেন।

'তবে হ্যাঁ, ব্রাহ্মণী খাবার পরে মুখ ঝামটা দেন।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চোখের পাতা নিবিড় করে হাসলেন, 'ওটাও প্রকৃতির জীবলীলা।' বলেই হা হা স্বরে বাজলেন। হাত উলটে হতাশ ভঙ্গি করলেন, 'কাকেই বা মুখ ঝামটা। এ জন্মটা এভাবেই কেটে যাবে। ক'টা বাজলো বলো তো?'

এটি বোধহয় গা ঝাড়া দেবার সংকেত। স্বাভাবিক। পথ থেকে ধরে নিয়ে এসে, পড়ে পাওয়া ষোল আনা দিয়েছেন। জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন কী না জানি না। তবে এ জন্মটা যে এভাবে কেটে যাচ্ছে, তাতে তাঁর আফশোস নেই। থাকলে, পথ চলতি এ মানুষের সাক্ষাৎ পেতাম না। হাতের ঘড়ি দেখে বললাম, 'সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আমি চলি।'

'বসো।' আমার হাত চেপে ধরে, গোবিন্দর দিকে তাকালেন, কী হলো, কৈলাস কখন ফিরবে?'

গোবিন্দ একবার গঙ্গার দিকে দেখলো। বললো, 'ফিরবে। সোমায় পেরায় হয়ে এল। জাল তুলবে, আবার পেতে ফিরবে। আপনার তাড়া কিসের?'

'না, আমার আবার তাড়া কিসের? ভোরবেলা বেরিয়েছি, ঘর এখন গরম হয়ে আছে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মুখ টিপে হাসলেন, 'হাতে করে কিছু নিয়ে ঢুকতে পারলে গরম ঘর ঠাণ্ডা হবে।'

কথার খেই ধরতে পারি না। গোবিন্দর দিকে তাকাই। গোবিন্দ জাল বুনতে বুনতে আমার দিকে চেয়ে হাসলো। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার হাতে ঝাঁকুনি দিলেন। চোখে কৌতুক, স্বর নিচু, 'জীবলীলায় কিছু ছল চাতুরি আছে, জানো, নিশ্চয়?'

ছল চাতুরি? ওঁর কাছে তো সেটা প্রত্যাশিত না। আমার অবাক জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই বললেন, 'ঐ জাল ঝাড়া দেওয়া কিছু যদি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে বাড়ি ফিরবো। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছি তো। একটু আঁসটে গন্ধ নিয়ে ঢুকতে পারলে, একেবারে বশীকরণ।'

প্রথমে কিঞ্চিৎ ধন্দ। কথা ধরতে জানা চাই। জাল ঝাড়া আর আঁসটে গন্ধ হলো মাছ। কৈলাস নদী থেকে জাল তুলে ফিরলে, কিছু আশা আছে। আর সেই মাছ দিয়েই ব্রাহ্মণীকে গুণ করবেন। বিবাদের সন্ধি না। মনোহরণের তুক। একে বলে জীবলীলার ছল চাতুরী। এ ছল চাতুরী রসিকের রসের ভিয়েন। শিল্পীর শিল্প। হাসি সামলাতে পারলাম না।

'খুব মজা পেলে, না?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চোখ কুঁচকে বললেন, 'তুমি তো ঐ গুণ বশীকরণের শিরোমণি। মজা পাবেই।'

সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলাম। আমি গুণ বশীকরণের শিরোমণি? মুখ খুলতে যাবার আগেই, সেই মুখ থাবাড়ির হাত তোলা। 'আহা, আমাকে আবার তুক করা কেন? তোমার কি আমার ভাগ্য জানিনে, দুজনের সাক্ষাৎটা হয়ে গেল। কিন্তু তোমাকে একটু আধটু চিনি তো। ভুল কিছু বলিনি। মিছিমিছি আমাকে ঘাঁটিও না।'

না, ওঁকে ঘাঁটাবার সাহস আমার নেই। সিগারেটটা ধরিয়ে বললাম,

'তবে এই দেখা সাক্ষাতের ভাগ্যটা আমারই। এই ভাগ্যের রহস্যটা যে কোথায় তা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।'

'বেশি বোঝার কী দরকার?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় মাথা নাড়লেন 'রহস্য যেখানে যা খুশি থাক, আমি খুশি তোমাকে পেয়ে। এবার কাজের কথায় আসা যাক। গ্রামটা কি ঘুরে যাবে?'

বললাম, 'ইচ্ছেটা তাই।'

'তারপরে কি ফেরা?'

'না, উত্তরে যাবো।'

'জায়গা ঠিক করা আছে?'

'তেমন কিছু ঠিক করা নেই। পায়ে হেঁটে কি গুপ্তিপাড়া যাওয়া যাবে?'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন গোবিন্দের দিকে। তারপরে আমার দিকে, 'তা যাওয়া যাবে। কিন্তু কেন? কোনো গাঁয়ে যাবে? কারোর সঙ্গে দেখা করার আছে?'

বললাম, 'না, সেরকম কিছু নেই। এমনি ঘুরতে ঘুরতে- ।'

'হুঁ, হেঁটোর জোর কেমন?'

'আজ্ঞে?'

'বলছি পায়ের নড়ায় শক্তি কতো?'

সহসা জবাব দিতে পারলাম না। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি বিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখলেন। তারপরে গোবিন্দর দিকে তাকালেন, 'বিস্তর শহুরে মাথা খারাপ লোক দেখেছি, এমনটা দেখিনি বাবা। বলে কী না, গুপ্তিপাড়ায় হেঁটে যাবে?'

গোবিন্দ হেঁ হেঁ করে হেসে বাঁচে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, কেউ যায় না?'

'যাবে না কেন? যাদের দায়, তারা যায়। তাদের যাওয়া আর তোমার যাওয়া?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখে অমোঘ বিরক্তি, 'কথা শুনলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

গোবিন্দ বললো, 'তাই বা কে যায় দাদা ঠাকুর। পথ তো একটুখানি নয়।'

'তুমি আমাকে বলবে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় তেমনি বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন, 'রেলে চেপে গেলে, সোজা পথে কম করে বারো চোদ্দ মাইল। গুপ্তিপাড়া হলো, হুগলি জেলার শেষ সীমানা। পায়ে হাঁটা পথ অনেক ঘোরা। তার মধ্যে আছে বেউলে নদী, সুখড়িয়ার গঙ্গেটিয়া খাল। হেঁটে গেলেই হলো? বাপ মা মরা দায় তো নেই?'

তা নেই। পিতৃহীন বটে। সে-দায় কাটিয়ে এসেছি। মা এখনও সজ্ঞানে জীবিত। গত মাসে শ্যামা ক্ষ্যাপার সঙ্গে নৌকোয় ভেসে গিয়েছিলাম।

এবারে ইচ্ছা ছিল স্থলে যাওয়া। যাকে বলে, দানা খুঁটতে খুঁটতে যাওয়া। সেই কথাটাই বললাম, 'ত্রিবেণী থেকে নৌকায় করে গুপ্তিপাড়া ছাড়িয়ে গেছি। এবার ভেবেছিলাম, ডাঙা পথে ঘুরতে ঘুরতে যাবো। এই যেমন এখানে ঘুরে গেলাম।'

'তা হলে আজ রাত্রের মধ্যে আর গুপ্তিপাড়া পেঁছুতে হবে না। বড় জোর, শ্রীপুর পর্যন্ত দৌড় হতে পারে। এই চোত মাসের রোদ আর ধুলো। খাবে থাকবে কোথায়?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রূকুটি চোখে বিঁধলেন আমাকে।

গোবিন্দ চিন্তিত মুখে বললো, 'শ্রীপুর না হলেও হাট গোবিন্দগঞ্জ ওরা যেতে প্যারেন।'

'আরে ধ্যেত্ তোর হাট গোবিন্দগঞ্জ। থাকবে কোথায়?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধমক দিয়ে উঠলেন।

গোবিন্দ বললো, 'বলাগড় ইস্টিশনে রাতটা কাটাতে পারেন।'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন। চোখের ভ্রূকুটি জিজ্ঞাসাটা পড়তে অসুবিধা নেই। কুণ্ঠিত হেসে বললাম, 'তা একটা রাত্রি ইস্টিশনে থেকে যেতে পারবো।'

'যা খুশি তাই করো গে।' তিনি আবার একটি বিড়ি বের করে, দাঁতে কামড়ে ধরলেন। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, বিড়ি ধরিয়ে, ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

গোবিন্দ আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে যেন ধন্দে পড়ে গিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে তাকালো উঠোনের ওধারের ঘরের দাওয়ায়। দুই বধূ আর কিশোরীও এই দিকে তাকিয়ে। এক বধূর ঘোমটা খসা। তিন জনের চোখে ধন্দ। পাশাপাশি তিন মূর্তি, সেও এক চিত্র। সংকটে পড়েছি আমি। কিন্তু সংকটই বা কিসের? এবার উঠে বেরিয়ে পড়লেই তো হয়।

'তোমার মতলবটা কি বলো তো?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এবার একটু শান্ত, 'ঘুরে বেরিয়ে দেখে ফেরা, তাই তো?'

আমি হেসে মাথা ঝাঁকালাম। মহাশয় গম্ভীর স্বরে বললেন, 'হেসো না। আমার হাসি দেখলে ব্রাহ্মণীর গা জ্বালা করে। এখন তোমাকে দেখে আমার তাই করছে।'

গোবিন্দ একলা হেসে উঠলো না। উঠোনের ওপারের দাওয়ায়, হাসির ঝনাৎকার বাজলো। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এখন আর জীবলীলা দেখছেন না। রুষ্ট চোখে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, 'তোমরা তো হেসে খালাস। এ ক্ষ্যাপা ছোকরাকে কী বলবো বলো তো? যেন নারদের ঢেঁকি চেপে বেরিয়েছে, যেখানে খুশি, যেমন খুশি চলে যাবে। মামদোবাজী নাকি?'

উঠোনে দাওয়ায় আবার হাসি। হাসি বোধহয় সজনের ডালে ডালেও।

কু-উ-উ কুউ-উ তো কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। নিকানো দাওয়ায় ঝরা পাতার ভিড় বেড়েছে। উঠোনের এক পাশে ছড়ানো ধানের দিকে কয়েকবারই পায়রা উড়ে এসে বসতে গিয়ে, পাখা ঝাপটে পলাতক। লোভের নজরে প্রথমে মানুষ চোখে পড়ে না। কিন্তু মহাশয় দেখছি সত্যি বিচলিত। অন্যথায় 'মামদোবাজী' উগ্রোতেন না। অস্বস্তি আমারও।

'দেখ বাপু, তুমি যদি ভেবো থাকো, সবই বৃন্দাবন, আর সবখানেই কালাচাঁদ, তাহলে ভুল করবে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গম্ভীর মুখে বললেন, 'গোবিন্দ বলল, আর তুমিও অমনি বলে দিলে, ইস্টিশনে থাকবে। ওরকম বলা যায়, থাকা যায় না। বুঝি, তোমার মতলব হলো, আহার যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। তা চিড়ে মুড়ি মুড়কি জুটবে, কিন্তু হট্টমন্দির বলতে যা বোঝাচ্ছ, তা পাবে না। আমার কথা শুনবে?'

বললাম, 'বলুন।'

'আশেপাশের গাঁয়ে ঘুরে যদি দেখতে চাও, দেখে এস। তার আগে উত্তমাশ্রমে একবার কথা বলে যাও।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় রীতিমতো ভেবে চিন্তে যুক্তি দিয়ে সলা পরামর্শ দিলেন, 'হয় তো হৃষিদা—থুড়ি, বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজী রাত্রে আশ্রমে খেতে থাকতে দিতে পারেন। হৃষিকেশ মুখুজ্জে ছিল ওঁর গৃহাশ্রমের নাম। এখন বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী, আশ্রমের অধ্যক্ষ। গ্রাম সুবাদে এক সময়ে আমাদের হৃষিদা ছিলেন। সে যাই হোক, একটু কড়া মেজাজের লোক। তা তোমার সে গুণে ঘাট নেই, ওঁর পায়ে ঠাঁই নিতে পারবে। তা হলে গোবিন্দর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তে পারো। ও তো খামার-গাছির হাটে যাচ্ছে। ওখান থেকে বাঘনা সিজে ঘুরে আসতে পারো। কিন্তু দেখবার কিছু নেই।'

গোবিন্দ বলে উঠলো, 'বাঘনা সিজে দু জায়গাতেই জগন্নাথ ঠাকুর আছেন।'

'তা কী হয়েছে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় বিরক্ত মুখে তাকালেন, 'চৈত্রমাসে রথযাত্রা দেখাবে তুমি?'

গোবিন্দ ঠেক খেয়ে, মাথা নেড়ে হাসলো, 'তা কি করে দেখাব।'

'তা হলে বলছিলাম কি—।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় উঠোনের ওপারের দাওয়ায় মুখ ফেরালেন, 'বুঝলে গোবিন্দর বউ, গোবিন্দর সঙ্গে একেও দুটি ভাত খাইয়ে দাও।'

আমি চমকে উঠে বললাম, 'কাকে? আমাকে?'

'কেন এদের বাড়িতে খেলে জাত যাবে?' মহাশয়ের চোখ ঘাড়, দুইই বাঁকা।

হেসে বললাম, 'যা নেই, তা নিয়ে মাথা ব্যাথাও নেই এখন আমি ভাত খেতে পারবো না।'

'তবে দুপুরবেলা কে কোথায় তোমার জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রেঁধে ভাত নিয়ে বসে থাকবে ?'

হেসে বললাম, 'সেই আশা নিয়ে বেরোইনি। তবে ঐ যে শ্রীপুর আর সুখড়িয়ার কথা বলছিলেন, ঐ গ্রাম দুটো দেখার ইচ্ছে আছে। শুনেছি, মুস্তোফিদের অনেক কীর্তি আছে সেখানে।'

'কোথায় শুনেছো ?'

একটু ঠেক খেয়ে গেলাম, 'শুনেছি, মানে পড়েছি।'

'কিন্তু এটা জানো না, সে সব এখন কিছুই নেই। জঙ্গলের মধ্যে সব ভাঙাচোরা। তবে কিছু নেই বলবো না। এখনো অনেক কিছুই আছে। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি অবাক চোখে তাকালেন, 'সব তো ঠিক করেই বেরিয়েছো। তবে, পায়ে হেঁটে যাবার পাগলামিটা মাথায় চাপলো কেন ?'

'ভেবেছিলাম—।'

'বুঝেছি।' সেই মুখ থাবড়ি দেওয়া হাত তুললেন, 'ভেবেছিলে হেঁটেই মেরে দেবে। রাস্তাঘাট কেমন কতো দূর, সে-সব মাথায় নেই। পাড়াগাঁয়ে ঘোরা এত সহজ নয়। এখন যা বলছি শোনো। তা হলে আর গোবিন্দর সঙ্গে যাবার দরকার নেই। মুস্তোফিদের কথা যখন জানো, তখন তাঁদের কীর্তিই দেখ। একদিনে, একবেলায়, কিছুই দেখা হবে না। দুপুরের ট্রেনে চেপে বলাগড়ে গিয়ে নামবে। সেখান থেকে শ্রীপুর সুখড়িয়া, আরো অনেক গ্রাম পাবে। কিন্তু ইস্টিশনে নেমে, ডমুরদর মতো এত কাছে নয়। হাঁটতে হবে। ওখানে গঙ্গা আরো দূরে। যদি মনে কর, একবেলাতেই সব সেরে, শেষ গাড়ি ধরে গুপ্তিপাড়া যাবে, তাও যেতে পারো। কিন্তু—।' নিভে যাওয়া বিড়িতে আবার দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে ছোঁয়ালেন, 'পারবে না। রাতও হয়ে যাবে। গাঁয়ের যতো বড় মানুষই হোক, আন্‌কা অচেনা লোককে কেউ থাকতে দেবে না। আর তেমন পাল্লায় পড়লে, হাতের ঘড়ি, কাঁধের ঝোলা, সবই যাবে। জীবলীলার অনেক খেলা।' চোখের পাতা কুঁচকে হাসলেন। ওদিকে বিড়ির আগুনে ছাই।

সাত-পাঁচ ভেবে পথ বেরোই না। ভাবলে, বেরোনো চলে না। তবে, বাঁড়ুজ্জে মহাশয় জীবলীলার একটা দিক দেখেন না। অনেক দিকে লক্ষ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে মনুষ্য প্রকৃতিও দেখতে ভোলেন না। কথায় বলে, উপদেশ নিতে হলে তিন মাথার কাছে যাবে। এ তিন মাথা, তে-মাথার মোড় না। হাঁটু-মাথা একাকার হয়েছে, এমন বৃদ্ধের আর এক নাম তিন মাথা। বয়সের ভাঁড়ারে জমা থাকে অনেক অভিজ্ঞতা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের এখনও দু' হাঁটুতে মাথা ঝুলে পড়েনি। কিন্তু এখন দেখছি, তিনি আমার তিন মাথা। অতএব তাঁর উপদেশ শিরোধার্য। কাঁধের ঝোলা গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'তবে তাই যাই।'

'কোথায় যাবে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাত টেনে ধরলেন, 'রেলগাড়ি কি তোমার ইচ্ছেয় আসবে? এ কি তোমার ব্যাণ্ডেল হাওড়া লাইন পেয়েছো, ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ি? সেই দুপুর একটার পরে গাড়ি। কী রকম ছেলে বলো দিকিনি?' মুখ ফেরালেন গোবিন্দর দিকে।

গোবিন্দ বললো, 'বাবু একটু ব্যস্ত হয়েছেন।'

'জলে পড়ে নেই তো।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ভ্রূকুটি করলেন, 'ব্যস্ত হবার কী আছে?'

বললাম, 'এ গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে যাই।'

'এ গ্রাম ঘুরতে তোমার বেশী সময় লাগবে না। ইস্টিশনে যাবার আগে, একবার দক্ষিণ দিকে ঘুরে এস, তা হলেই হবে।' তিনি গোবিন্দর দিকে তাকালেন. 'তার আগে একে একবার আশ্রমে নিয়ে যাও। বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজী এতক্ষণে বোধহয় মন্দির থেকে বেরিয়েছেন।'

গোবিন্দ বললো, 'আপনি নিয়ে যান না কেন?'

'আমি!' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় যেন বিভীষিকা দেখলেন, 'আমি যাবো আশ্রমে, স্বামীজীর সামনে?'

'গোবিন্দ হেসেই বাঁচে না। উঠোনের ওপারের দাওয়ায়ও সেই হাসির ঢেউ লাগলো। ব্যাপার বুঝলাম না। দেখলাম, বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ভ্রূকুটি সন্দিগ্ধ চোখের দৃষ্টি উঠোন থেকে ওপারের দাওয়ায় হানছে। তারপরে আমার দিকে দেখলেন অনুসন্ধিৎসু চোখে। আবার গোবিন্দর দিকে, 'হুঁম, আমার পেছনে লাগছো?'

গোবিন্দর হাসি তবু থামে না। 'তা একবার গেলে কী আর হবে? না হয় একটু বকা ধমক করবেন।'

'বকা ধমক?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের চোখে আবার বিভীষিকা, 'খড়ম পেটা করে তাড়াবেন।'

উঠোনে আর ওপারের দাওয়ায় হে' হে' খিলখিল বাজনা বেজে উঠলো। আমার চোখে যে-ধন্দ সেই ধন্দ। তবু, পেছনে লাগার ব্যাপারটা পরিষ্কার। আর সেই কারণে গৃহস্থদের হাসিটা আমার মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। খড়ম পেটা খাওয়াটা বিভীষিকা বই কি! কিন্তু তার কারণ কী?

'বুঝলে?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন।

আমি গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লাম। মহাশয় আবার দেখলেন গোবিন্দর দিকে, 'আমার পেছনে লাগছে, বুঝতে পারছো না? আমাকে বলে আশ্রমে যেতে! জানে, বিজ্ঞানানন্দজী আমাকে দেখলেই তাড়া করবেন।'

'কেন?' আমি সংকুচিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি নষ্ট হয়ে গেছি না?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এক সময়ে তো স্বামীজী খুব ভালবাসতেন আমাকে। কিন্তু ঐ যে বললাম,

ধর্মেকর্মে আমার মতি নেই। তার ওপরে আবার নেশাভাঙ করি। খবর তো সবই রাখেন। আশ্রমে আমার প্রবেশ নিষেধ। দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। গোবিন্দ ব্যাটা ছুঁচো, সব জানে তো। তাই তোমাকে নিয়ে আমাকে যেতে বলছে।'

গোবিন্দও জীবলীলা দেখছে, আর হাসছে। ওপারের দাওয়ায়ও ভিন্ স্বরে হাসি বাজছে। বড় ছোঁয়াচে জিনিস। কিন্তু আমাকে রাম গড়ুরের ছানা হয়েই থাকতে হয়। তা নইলেই ছুঁচো ব্যাটা। গোবিন্দর দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছি। তবে তার রসজ্ঞানের গোড়ে সালাম। বিটলে আছে।

'খুব হুয়েছে, এখন হাসি থামাবে ?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধমকে বাজলেন।

গোবিন্দ জালের সুতোকাটি সহ হাতজোড় করলো, 'রাগ করলেন নাকি দাদাঠাকুর ?'

'না বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি আমাকে স্বামীজীর কাছে পাঠাচ্ছিলে।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখে রুষ্ট বিরক্তি কত, 'এখন কাজের কথা যা বলছি, তাই শোন। তোমার হাটে যাবার সময় হল। তুমি একে আশ্রমে পেঁছে দিয়ে এস, তা হলেই হবে। তারপর এ স্বামীজীর কাছে দাঁড়ালেই হবে।'

কী হবে, তা বুঝতে পারছি না। আশ্রমে যেতেও আপত্তি নেই। কিন্তু স্বামীজীর কাছে গিয়ে দাঁড়াবো কেন ? আমার শ্রদ্ধা ভক্তির অভাব নেই। কিন্তু ব্রহ্মচর্য আশ্রমের মানুষ নই। আশ্রমিক নিয়ম নীতিকে দূর থেকেই সমীহ করি। ওখানে আমার কৃত কিছু নেই। আমি সাধন ভজনে নেই।

গোবিন্দ আমাকে ডাকলো, 'চলেন তা'লে।'

'দাঁড়াও কথা শেষ হয়নি।' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় আমার দিকে তাকালেন, 'এ বেলা আশ্রমেই দুটি অন্ন জুটে যাবে, বুঝলে ? স্বামীজীকে গিয়ে প্রণাম করে বস।'

আমি হাতজোড় করলাম, 'তা বসবো, তবে অন্নের জন্য নয়।'

'আচ্ছা, তুমি গিয়ে বসো তো। তারপরে দেখা যাবে।' হাত নাড়া দিলেন, 'কিন্তু আসল কথাটার নিষ্পত্তি হয়নি। থেকে ফিরতে না পারো তা হলে ?'

বললাম, 'তখন ভেবে দেখবো।'

'ভেবে দেখবে কাঁচকলা।' মহাশয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একটা বেষ্ণবদের আখড়া আছে। গোলকদাসের নয়। শ্রীপুরের আসল নামটা জানা আছে ক

বললাম, 'আঁটিশেওড়া।'

'হুম্ !' মহাশয় নিবিড় চোখে তাকা আছে দেখছি। আঁটিশেওড়ার পাট বলে আছে ?'

,ও

দের বউ,

র আসবে।'

বা

দিকে তাকালাম।

লেন। যেন উঠোনের

র, ওপারের দাওয়া থেকে।

াম, 'তবে আসি।'

দেখলে বোঝা যায়, জোয়ার এসেছে।

নাকোয় ভেসে গিয়েছিলাম। নৌকো

মা ক্ষ্যাপার মুখে উত্তমাশ্রম আর

গাঁয়ের ডাঙ্গায়। চৈত্রের রোদে নদীতে

কটা নৌকো।

বললাম, 'আছে। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে যাবার পথে, আঁটিশেওড়ার এক বটগাছের নিচে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। সেখানেই আঁটিশেওড়ার পাট। আঁটিশেওড়ার পাটের আরো একটা কথা পড়েছি।'

'আঁতুড়ের ধোঁয়া?' বাঁড়ুজ্জে মহাশয় হাসলেন।

তার মানে, আমার কেতাবী খবরের থেকে, তিনি কিছু কম জানেন না। প্রবাদ এই রকম, আঁটিশেওড়ার ঘাটের কাছে, গৃহস্থরা কোনো রকম সূতিকাগার করতে পারবে না। তার ধোঁয়ায়, পুণ্যস্থান নাকি অপবিত্র হবে। অথচ শুনে আসছি, আঁতুড়ে নিয়ম নাস্তি। লৌকিক আচারে ওটা বোধহয় জরুরি ব্যবস্থা। মানুষের জন্মস্থানের ধোঁয়াও অপবিত্র হয়? বললাম, 'হ্যাঁ।'

'হুঁম্, কেতাবের বজ্র আঁটুনি, আসলে ফস্কা গেরো।' মহাশয় হেসে মাথা ঝাঁকালেন, 'এবার শোন, আজ আর ফেরবার চেষ্টা করো না। গোলকদাস বাবাজীর আখড়ায় চলে যেও। আখড়াটা গঙ্গার ধারের কাছে। বাবাজী মানুষ ভালো। চালার মন্দিরে গৌর নিতাইয়ের মূর্তি আছে। শিষ্য আছে অনেক, আখড়া চলে ভালো। বাবাজী সহজিয়া বৈষ্ণব। প্রকৃতি আছে। তবে নেহাত নেড়া নেড়ির আখড়া নয়। বুঝলে কিছু?'

বললাম, 'শুনেছি সহজ সাধন সহজ নয়। বাউলের তত্ত্ব। তবে বাউলের তো বিগ্রহ নেই বলে জানি।'

'সহজিয়া বৈষ্ণবের থাকে। রাধাকৃষ্ণ গৌর নিতাই। তবে বাউলের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই। এঁরাও যোগে বিশ্বাসী।' মহাশয় হাত নাড়া দিলেন, 'সে তুমি ওখানে গেলেই সব দেখতে পাবে। একেবারে সোজা গোলকদাসের কাছে গিয়ে মাথা ঠুকো, তা হলেই হবে।'

এতক্ষণে একটা কথা বুঝেছি। অম্বিকা বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথার
করে ত... নিরর্থক। গোলকদাস বাবাজীর আখড়ায় যাই না যাই, এখন ঘাড়
আমাকে ...লো। তিনি তো মন্দ চাননি। এবারের যাত্রায় তাঁর সঙ্গে প্রথম
অলৌকিক, কোনো ধ...ড়কে জীবলীলা দেখিয়েছেন। কেবল কি তাই? লৌকিক
গোড়ায়। আধুনিক ম...র্ম নেই। জীবলীলার নামে বসে আছেন মানব ধর্মের
চোখে এই সামান্য গ্রামীণ ব...নুষের সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তর বাগবিতণ্ডা। আমার
সহজে ছাড়তে ইচ্ছা করে না ...ক্তিটি এক অসামান্য আধুনিক। এমন মানুষকে
যন্ময়। আমার ডান হাতটা সহ...। কৃতজ্ঞতাও বোধ করি। কিন্তু সময় বহে
'তা হলে উঠি।' ...জেই চলে যায় তাঁর ধুলা মাথা পায়ের দিকে,

'কিন্তু এটা আবার কী?' মহা...

বলললাম, 'আন্তরিকতা।' ...শয় আমার হাত চেপে ধরলেন।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয় এক মুহূর্ত ...

হাতটা ছেড়ে দিলেন। আমি ওঁর ...আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।
পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ছোঁয়ালাম।

৯

মহাশয়ের ডাগর চোখে বিষণ্নতা। বললেন, 'খুব ইচ্ছে করছে, তোমার সঙ্গে চলে যাই।'

বললাম, 'চলুন না।'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। আমি দাওয়া থেকে নেমে এলাম। মহাশয়ও নেমে এলেন, 'তোমার মনে থাকবে কিনা জানিনে, আমার থাকবে।'

বললাম, 'আমারও থাকবে।'

'সত্যি ?' মহাশয় আমার বুকে একটা হাত রাখলেন। আবার তাঁর চোখে সেই কৌতুকের ছটা। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হুঁম্! তুমি ডাক দেবেই, কারণ তোমাকে ডাকছে আর কেউ। আমি এখন ডানা ভেঙে বসে আছি। তোমার মত আগুন থাকলেও, ছুটতে পারছি নে। তাই পণ্ডু মণ্ডলের বাড়ি যাই, গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই। আর ব্রাহ্মণী যাকে বলে বইয়ের পিণ্ডি, তাই চটকাই। যাই হোক, তোমার আর দেরী করাবো না। তবে রঙের হাতটা ছেড়ো না, ওটা চালু রেখো।'

আমি গোবিন্দর দিকে তাকালাম। গোবিন্দ পুব দিকে পা বাড়িয়ে ডাকল, 'আসেন।'

একবার উঠোনের ওপারের দাওয়ার দিকে তাকালাম। সহবতের সঙ্গে হৃদয়ের একটা যোগ আছে। ঘোমটা খসে পড়াটা এখন অসহবত নয়। সেই ঢেঁকি পাড় দেওয়া দুই রমণীর ছবি ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ওধারের দাওয়ায়ও দেখছি, আর একটা ছবি। একজনের ঘোমটা টানা অবকাশেই শোনা গেল, 'চাড্ডি ভাত খেয়ে গেলে হত।'

গোবিন্দ থম্কে দাঁড়ালো। দৃষ্টি মহাশয়ের দিকে। ল্যাংটা ছেলেটা আবার উঠে এসেছে গঙ্গার ঢালু পাড় থেকে। সঙ্গে সেই সারমেয়। এখনও তার গলায় গোঁ গোঁ। ঘেউ ঘেউ নেই। মহাশয় বললেন, 'গোবিন্দর বউ, ওর যাত্রা অন্যদিকে। তোমার ঘরের অন্ন কপালে থাকলে আবার আসবে।'

আমি ওপারের দাওয়া থেকে চোখ ফিরিয়ে মহাশয়ের দিকে তাকালাম। তিনি হাত তুলে হেসে, দাওয়ার চালার আড়ালে চলে গেলেন। যেন উঠোনের কাছেই বিদায় নিয়ে বললাম, 'যাই।'

'যাই না, আসি।' কথাটা এলো রমণী স্বরে, ওপারের দাওয়া থেকে। ঢালুতে নেমে যাবার আগে, পিছন ফিরে তাকালাম, 'তবে আসি।'

গঙ্গার পাড় বেশ উঁচু। স্রোতের টান দেখলে বোঝা যায়, জোয়ার এসেছে। গত মাসে ত্রিবেণী থেকে, শ্যামা ক্ষ্যাপার নৌকোয় ভেসে গিয়েছিলাম। নৌকো ছিল প্রায় মাঝ দরিয়ায়। তখনই শ্যামা ক্ষ্যাপার মুখে উত্তমাশ্রম আর রামাশ্রমের কথা শুনেছিলাম, এখন সেই গাঁয়ের ডাঙ্গায়। চৈত্রের রোদে নদীতে ইস্পাতের ঝিলিক। দূরে ইতস্তত কয়েকটা নৌকো।

গোবিন্দ গঙ্গার বুকে দেখতে দেখতে, দক্ষিণে চলেছে। কিছুটা গিয়ে, ডান দিকে ঢালু থেকে ওপরে উঠলো। আমি ওর পিছনে। বাঁ দিকে একটা বড় বট গাছ। কাছে একটা চালা ঘর। বট গাছের নিচে বসে আছে একটি অল্প বয়সের বউ। জীর্ণ শাড়িটি গায়ে অকুলান। দৃষ্টি ছিল দূর দরিয়ায়। আমাদের দেখে, শাড়িটি টানাটানি শুরু করলো। কিন্তু সে তো টানলে বাড়ে না। কেবল লজ্জাই বাড়ে।

বাতাসে এখন উত্তাপ। পাতা ঝরার কামাই নেই। অথচ গাছে গাছে শ্যাম কচিতে চিকণ কিরণ। কুহু কেবল কানে কি মধু ঢালে ? ওরা বসন্তের দূত কী না জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ঐ ডাকে একটা বুক ফাটা আর্তি আছে।

গোবিন্দ দাঁড়ালো। দেখলাম, ডান দিকে ছোট পাচিল। কোমর সমান হবে। ভিতরে বাগান আর উঠোন। পশ্চিমে মন্দির। মন্দিরের চারপাশে লাল মেঝের রোয়াক। উত্তরে একতলা ঘর। পুবেও একটি মন্দিরের তুল্য আবাস। দেখলাম, কয়েকজন গেরুয়া ধারী এদিকে ওদিকে বসে আছেন, বা কাজে ফিরছেন। গোবিন্দ বললো, 'মহারাজ এখনো মন্দির থেকে বেরন নাই। আপনি ভেতরে যান।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যাবেন না ?'

'আমি আর যাব না।' গোবিন্দ নিরীহ সংকোচে হাত জোড় করলো, 'আপনি গিয়ে স্বামীজীদের সঙ্গে কথা বলেন, তা হলেই হবে।'

গোবিন্দর অনিচ্ছা নেই। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, কোথায় একটা বাধা তাকে টেনে রাখছে। বললাম, 'তাই যাচ্ছি।'

'আমি তা'লে আসি।' গোবিন্দ জালের সুতো কাটি শুদ্ধু দু হাত কপালে ঠেকালো। আমিও দু হাত কপালে ঠেকালাম। গোবিন্দ যে-পথে এসেছিল, সেই পথেই নেমে গেল। আমি পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আশ্রমের ঢোকবার সেই গেট। এগিয়ে গিয়ে, ডান দিকে পাচিলের শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকবার পথ। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ঢুকবো কিনা বুঝতে পারছি না। ইঁট বাঁধানো সরু পথ করা রয়েছে। মন্দিরের সামনে ছাদ ঢাকা লাল ঝকঝকে রোয়াকের ওপর একজন স্বামীজী বসে আছেন। কয়েক পা গিয়ে স্যাণ্ডেল খুলে রেখে, তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলাম। স্বামীজী বললেন, 'জয়স্তু।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'বিজ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীজীর দর্শন পাবো ?'

'তিনি তো এখন ধ্যানে আছেন।' স্বামীজী মন্দিরের বন্ধ দরজা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?'

বললাম। তিনি বললেন, 'বসুন। তিনি বেরোলে দেখা হবে।'

বললাম, 'আমি তা হলে একটু ঘুরে আসি।'

'আসুন।' স্বামীজী নিরাসক্ত স্বরে বললেন।

আমি ফিরে এসে, স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে, প্রাঙ্গণের বাইরে এলাম। ডান দিকে আম বাগান। চারদিকে গাছপালায় নিবিড়। আশ্রমের শান্ত গাম্ভীর্যের থেকেও চৈত্র প্রকৃতির উচ্ছ্বাসটাই যেন মাতিয়ে দিচ্ছে। আম গাছে অজস্র কচি আম। কাঁঠাল গাছে কচি এঁচোড়গুলো লোমশ ধাড়ি ইঁদুরের মতো ঝুলছে। গায়ে মাথায় ছড়িয়ে পড়ছে শুকনো পাতা কাটির টুকরো।

পায়ে পায়ে আশ্রমের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ডান দিকে আর একটু এগিয়ে বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আশেপাশে আঁস, শ্যাওড়া, ঝাঁটি, বাবলার ঝাড়। চড়ুইয়ের ঝাঁক উড়ছে। পশ্চিমে মাঠের ওপারে ইস্টিশনটা দ্বীপের মতো। দেখছি কিছু সাঁওতাল রমণী পুরুষ, মাঠের মানুষ মাথায় বোঝা নিয়ে চলে যাচ্ছে। উত্তরে। খামারগাছির হাটে যাচ্ছে বোধহয়।

পরে জেনেছি, গ্রাম কালনার গৃহী, নীলকান্ত রায় পরবর্তীকালে সাধক উত্তমানন্দ। উনিশশো ন' খৃষ্টাব্দে তিনি এ স্থানটি আশ্রমের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তখন ছিল ঘোর জঙ্গল। এক বিঘা চার কাঠা জমি কেনা হয়েছিল, তাঁর শিষ্য ধ্রুবানন্দ গিরিমহারাজের নামে। প্রথমে দুটি মাটির চালা ঘর, এখন পাকা মন্দির কোঠা ঘর শ্রীবৈভবে পূর্ণ।

দক্ষিণে হাঁটা দিয়ে গ্রাম ঘুঁরতে ঘুরতে, আবার গঙ্গার ধারে। একবার ঘণ্টা শুনে মনে হয়েছিল ভিতরে কোথাও ইস্কুল আছে। আশ্রমে ফিরে যাবার আর ইচ্ছা ছিল না। মহাপ্রাণীর হাহাকারটা ছিল। বেলা বারোটা তখন উত্তীর্ণ। গাঁয়ের পথের ধারে, একটা দোকান চোখে পড়লো। চিঁড়ে মুড়কি পাওয়া গেল। ঠোঙা হাতে সোজা ইস্টিশন। লাইন পেরিয়ে পাকা রাস্তার ধারে একটা চালাঘর। সেটাও দোকান। মুড়ি বিস্কুট চা মেলে। পান বিড়িও আছে। উনোনে আগুন জ্বলছে। বাইরের চেত্রের বাতাসেও উত্তাপ বাড়ছে।

দোকানের ভিতরে চওড়া কাঠের বেঞ্চির ওপরে যে বসে আছে, সে-ই বোধহয় মালিক। কালো রঙ, খালি গা। হাঁটুর ওপরে ধুতি। আর এক দিকের ছোট বেঞ্চিতে বসে দুই জোয়ান। তাদেরও খালি গা, পরনে লুঙ্গি। রাস্তার ওপারে পশ্চিমে একটা পুকুর। মেয়ে পুরুষরা স্নান করছে। হাঁসের দল ভাসছে মাঝ পুকুরে। পুকুরের ওপারে কিছু খড়ের চাল, মাটির ঘর। গোটা কয়েক ছাগল বাঁধা পুকুরের ধারে বটের ছায়ায়।

দোকানের মাঝবয়সী মালিক তাকিয়েছিল জিজ্ঞাসু চোখে। জিজ্ঞেস করলাম, চা পাওয়া যাবে?'

'যাবে।' সংক্ষিপ্ত নিচু স্বরের জবাব।

ভিতরে ঢুকে, দুই জোয়ানের পাশে বসলাম। চায়ের তেমন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন পানীয় জলের। চা হলো প্রবেশাধিকারের টিকেট।

ঠোঙা খুলে, চি'ড়ে মুড়কি ঘে'টে নিলাম। কিন্তু শহুরে মনে কোথায় একটা শিবধা। না বলে পারলাম না, 'আপনার দোকানে বসে একটু চি'ড়ে মুড়কি খেয়ে নিচ্ছি।'

'খান না।' লোকটি হলদে চোখে তাকিয়ে হাসলো। সামনের ওপরের পাটির কয়েকটা দাঁত নেই। বেঞ্চি থেকে নেমে, নিচে থেকে বের করলো ঝকঝকে মাজা ঘটি। কোণে রাখা কলসী থেকে জল গড়িয়ে, রেখে দিল আমার বেঞ্চির ওপরে।

একে বলে না চাইতে জল। যেন একটা অনিবার্য করণীয়। সাত পাঁচ ভাবনা আমার। লোকটির সে-সব জানবার দরকার নেই। আবার গিয়ে বসলো নিজের জায়গায়। তারপরে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'চা কি খাবেন? তা হলে জল গরম করব।'

বিদ্রূপ না তো? হলদে চোখের খয়েরি তারা দুটোর দৃষ্টি সরল। সহজ জিজ্ঞাসা। অথচ ওটাকেই আমি প্রবেশাধিকারের টিকেট বলে জেনেছি। এখন 'না' বললে, নিজেকে কেমন মিথ্যাবাদী মনে হবে। এও সেই ছল চাতুরী। বললাম, 'খাবো।'

'যা গরম!' দোকানিটি যেন একান্ত অনিচ্ছায় কালি মাখা কেতলিটা উনোনের ওপর বসিয়ে দিল।

তবু না বলা যায় না। অথচ, এর থেকে আর বেশি সে তোমাকে কী বলতে পারে। নিজেকে দিয়ে তার বিচার। তাই না. চাইতেই জল গড়িয়ে দিয়েছে। তোমার টিকেটের গলায় দড়ি। সে নিজেই জানে, এ গরমে চা অচল। অবিশ্যি আমার নিতান্ত অচল না। কিন্তু দেখা গেল, দোকান খুলে বসলেই, বুকের কপাটে কুলুপ আঁটতে হবে, এমন কথা নেই। শহুরের অভিজ্ঞতাটা এখানে তেমন বিকোয় না। আতিথেয়তা করবে বলে সে দোকান খুলে বসেনি নিশ্চয়। তবে রাস্তার ধারে তার ঘরে বসে খেলে, তার মূল্য নিতে শেখেনি এখনও। জল দান তো পুণ্য।

আমি ভেতরে ঢোকার আগে, জোয়ান দুটি কিছু বলাবলি করছিল। এখন একেবারে চুপ। মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছে আমাকে। আমি তখন মুড়কির মিঠে স্বাদে, দাঁতে চি'ড়ে কাটছি। হঠাৎ ইস্টিশন থেকে ভেসে এলো ঠং ঠং ঘণ্টাধ্বনি। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সবাই অবাক চোখে আমার দিকে তাকালো। দোকানি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন?'

বললাম, 'বলাগড়।'

সে ওপর পাটির শূন্য মাড়ি দেখিয়ে হাসলো। হাত তুলে আশ্বস্ত করলো, 'বসেন। এটা ডাউনের গাড়ি আসছে।'

অর্থাৎ কলকাতাগামী গাড়ির ঘণ্টা। এইবার এক জোয়ান আওয়াজ দিল, 'শালার গাড়ি ঘণ্টা কাবার করে আসছে।'

'এ গাড়িটা তো তাই আসে।' দোকানি বললো, 'একদিনও টাইমে আসতে দেখিনি। কাসেম যাবে বলছিল না ?'

জোয়ান বললো, 'চাচা গিয়ে ইস্টিশনে বসে আছে।'

আমি ইতিমধ্যে আশ্বস্ত হয়ে বসলেও, না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আপ্-এর গাড়ি ক'টায় আসবে ?'

'সে শালার গাড়িও রোজ লেট করে।' লুঙ্গি পরা খালি গা জোয়ান বললো। গাড়ি সবই তার শ্বশুর নন্দনের। সত্যিকারের ব্যাপার হলে, বিবির কপালে অশেষ দুর্গতি ছিল। কিন্তু গাড়ি লেট করে এলে গেলেও, তার যে বিশেষ কিছু যায় আসে, মনে হচ্ছে না। আমার কথার জবাব না পেয়ে দোকানির দিকে তাকালাম। সে বললো, জোয়ানকে, 'না, এটা রোজ তেমন লেট করে না। হাওড়া থেকে টাইম মতন ছাড়ে। ব্যাণ্ডেলের ফাঁড়া কাটাতে পারলেই আর লেট করে না। সোয়া একটার মধ্যে এসে যাবে।'

কবজি উলটে দেখলাম। ঘড়িতে বারোটা চল্লিশ। কাঁটা বোধ হয় কিঞ্চিৎ জোর কদমে চলছে। পকেটে অবিশ্যি টিকেট আছে। তবু চিঁড়ে মুড়কির মুখ চালালাম তাড়াতাড়ি। দোকানি এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আসছেন কোথা থেকে ?'

বললাম। শুনে হলদে চোখে অবাক জিজ্ঞাসা ফুটলো। দুই জোয়ানও তাকালো। দোকানি জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কারুর বাড়ি গেছলেন বুঝি ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, এমনি বেড়াতে এসেছিলাম।'

বুঝতে পারলাম, দোকানি আর জোয়ান দুজনের মধ্যে অবাক দৃষ্টি বিনিময় হলো। হবারই কথা। তাদের তো রেলগাড়ির সময় ধরে হিসাব। এতক্ষণ ধরে একটা লোক কেবল গ্রাম বেড়িয়ে ফিরলো ? নেহাত বেড়ানো ? কারণ কী ? দৃষ্টি বিনিময়ের কারণ বুঝতে পারছি। ঘরে বসতে দিতে পারে। ঘটিতে জল গড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এখানেই ঠেক। গ্রামীণ মনটা সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। উদাস নির্বিকার থাকতেও পারে না। সন্দেহ খচ্ খচ্ করে। অথচ এ কৌতূহল মেটাবার উপায় নেই। এমনি গ্রাম বেড়িয়ে ফেরা নিতান্ত অবিশ্বাস্য। আমারই বা এত সরল স্বীকারোক্তির দরকার কী ছিল।

'এতক্ষণ ধরে গেরাম বেড়ালেন ?' দোকানির দাঁত শূন্য মাড়ির হাসিটি আর তেমন খোলতাই নেই।

ঝোপ বুঝে কোপ। বললাম, 'হ্যাঁ। উত্তমাশ্রমে গেছলাম।'

'তা-ই বলেন।' এবার হলদে চোখে, কালো মুখে হাসির ঝলক। জোয়ানদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ভাবি, এমনি আবার কেউ গেরাম বেড়াতে আসে নাকি ? শীতের দিনে হুগলি চুঁচড়োর লোকেরা আসে চড়ুই-ভাতি করতে। সে আলাদা কথা।'

আমারও অস্বস্তি কাটলো। ডাউনের গাড়ির কু শোনা গেল। দুই জোয়ান উঠে বাইরে গেল। এদিকে আমার ঠোঙার চিড়ে মুড়কি আর যেন ফুরাতে চায় না। বেজায় ঝক্‌ঝক্‌ শব্দে গাড়ি এসে দাঁড়াবার শব্দ ভেসে এলো। দোকানের ভিতর থেকে ইস্টিশন দেখা যায় না। কিন্তু তেমন হই চই নেই। এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ খানিকক্ষণ। তারপরে আবার কু-ঝিক্‌-ঝিক্‌। জোয়ান দুটি বোধহয় ইস্টিশনেই গিয়েছে। চার আনার মুড়কি আর আট আনার চিঁড়ে শেষ করা সম্ভব না। জলের ঘটি তুলে উচুঁ করে গলায় ঢাললাম। আহ। শান্তি। এত সহজে পেট ভরে। তারপরেও পেটের চিঁড়ে ফুলবে।

'বলাগড়েও কি বেড়াতে যাচ্ছেন?' দোকানি গেলাসে চা ছাঁকছে।

বললাম, 'না। শ্রীপুর সুখড়িয়া যাবো।'

'শ্রীপুর সুখড়িয়া?' দোকানির হাতের কেতলি থমকে গেল, 'বলাগড়ে নেমে, দু জায়গায় যাবেন কেমন করে? সুখড়িয়া যেতে হলে, আপনাকে সোমড়াবাজারে নামতে হবে। সুখড়িয়া সেখান থেকেই কাছে পড়বে। তবে, শ্রীপুর থেকে হেঁটেই সুখড়িয়া চলে যেতে পারেন। হাঁটতে হবে অনেকটা। তা, সেখানেও কি বেড়াতে যাচ্ছেন?' সে নেমে এসে আমার হাতে ধুমায়িত চায়ের গেলাস তুলে দিল।

বললাম, 'হ্যাঁ। শুনেছি ওখানে অনেক পুরনো মন্দির আছে।'

'তা আছে।' দোকানি তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো, 'তবে কী আর দেখবেন? সবই ভেঙে চুরে গেছে। সেই বলে না, কালে খেয়েছে তাই। মুস্তোফিবাবুরা আর কত রক্ষে করবেন। তাঁদের কি আর সেদিন আছে? আর মন্দির মঠের কি অভাব আছে। জিয়েট বলাগড় সোমড়া গুপ্তিপাড়া, সবখানে বিস্তর রয়েছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

চায়ের গেলাসটা মুখের কাছে তুলেছিলাম। বললাম, 'বলুন।'

'আপনি কি গরমেণ্টের লোক?' দোকানির হলদে চোখে কৌতুহল বেশ গাঢ়।

লোকটি কি আমাকে প্রত্ন বিভাগের কর্মী ভেবেছে নাকী? তার পক্ষে এত দূর ভাবা সম্ভব? বললাম, 'না। কেন বলুন তো?'

'আজকাল আপনার মঠ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি নিয়ে গরমেণ্ট ঘাঁটাঘাঁটি করছে তো।' দোকানি বললো, 'এতকাল ঠাকুরের ভোগ জাত নিয়ে কথা ওঠে নি। এখন ঠাকুরের জমিজমা নিয়ে গরমেণ্ট হিসাব করছে।'

যার যেদিকে মন। মঠ মন্দির দেখতে এসেছি। অতএব সরকারের জমি-জমা তদন্তকারী কেউকেটা নিশ্চয়ই হবো। আর গরমেণ্টের লোক কোনকালেই সন্দেহের উর্ধ্বে না। বিশেষ জমিজমার বিষয়ে। সরকারি লোক দেখলেই ভয়, খাবলা মেরে তুলে নেবে। অবিশ্যি এই সামান্য দোকানির মনোভাব কী জানি না। চায়ে চুমুক দিয়ে, মুখের ভিতরটা বিস্বাদে ভরে গেল। তার চেয়ে,

চিঁড়ে মুড়কির মুখে, মিষ্টি জলের স্বাদ ভালো ছিল। এখন নিরুপায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা দেবোত্তর জমি কি সরকারে যাচ্ছে?'

'তদন্ত হচ্ছে। যাচ্ছেও কিছু কিছু।' দোকানি হাঁটু মুড়ে, দু হাত দিয়ে চেপে ধরলো, 'তা না যাবেই বা কেন বলেন? ঠাকুরের নামে নিজেরা কনুই ডুবিয়ে খাবে, আর ঠাকুর দাঁতে কাটি দিয়ে পড়ে থাকবেন জঙ্গলে। এত পাপ সয়?'

খুব যুক্তিযুক্ত কথা। একে বলে, পো'র নামে পোয়াতি বর্তায়। ঠাকুর দাঁতে কাটি দেন কিনা, সে-রহস্য অজানা। ঠাকুর বলে যখন মেনেছো, তখন তাঁর সেবা করতে হবে। তাঁকে খরচের খাতায় রেখে, নিজের খরচা বাঁচানোটা অনধিকার চর্চা। হয় ছাড়ো, নয় রাখো। তিক্ত চা কোনরকমে শেষ করে বললাম, 'অন্যায় কথা।'

'বলেন।' দোকানি হাতে মোড়া হাঁটু ঝাঁকালো, 'ঠাকুর তো তোমার কিছু নিয়ে পালাচ্ছেন না, দিতেই আছেন। ওঁয়াকে কেন অচ্ছেদ্দা? অবশ্য সকলের কথা বলছিনে। অনেকে নিত্য সেবাও করে।'

এই সময়ে ইস্টিশনে ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ ঘণ্টা বেজো উঠলো। ঝটিতি উঠে দাঁড়ালাম। ওদিকে আমার ঠাকুরের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চায়ের দাম কতো?'

'দশ পয়সা।' দোকানি বললো, 'ব্যস্ত হবেন না। গাড়ি এখনো ব্যান্ডেলে নয় তো বাঁশবেড়েয়। এবার টিকেট ঘরের জালনো খুলবে।

সে-ভাবনা আমার নেই। টিকেট আমার পকেটে। আইনত একটা অপরাধ করেছি। সেটা ব্রেক জার্নি। কিন্তু মূলে ফাঁকি দিইনি। বিনা টিকিটের যাত্রী নই। পকেট থেকে দশটা পয়সা বাড়িয়ে দিলাম।

'পান খাবেন না?' পয়সা না নিয়ে দোকানি বিশেষ সমীহ করে জিজ্ঞেস করলো। বললাম, 'পান খাইনে'। 'পয়সা রাখেন। একটু চা বই তো নয়।' দোকানি নেমে দাঁড়ালো। শূন্য দাঁতের মাড়িতে আর হলদে চোখের হাসিতে যেন গুপ্ত রহস্য। গলা নামিয়ে বললো, 'চোখে কান খোলা রেখে খোঁজ খবর লিবেন। আপনাকে আর আমি কি বলব। পেরায়ভেট দেবোত্তরে অনেকেই এক কুড়ি এগার বিঘে দেখিয়ে দেয়। কজনায় আর দু কুড়ি এগার বিঘে দেখিয়ে উকিল ম্যানেজার রেখে দেবোত্তর এস্টেট চালায় বলেন? খরচ করতে হবে না?' কালো মুখে হাসি বিস্তৃত হলো।

এ দেখছি, শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর। আমাকে গরমেণ্টের লোক বলে সে ধরেই নিয়েছে। কী দেখে? হ্যাট কোট বুট কিছু নেই। ধুতি পাঞ্জাবী কাঁধে ঝোলা। চোখে কালো ঠুলি। সামনে বসে ঠোঙা থেকে চিঁড়ে মুড়কি খেলাম। বাকিটুকু ঝোলায় রাখতে ভুলিনি। কখন কী অবস্থায় পড়তে হবে কে জানে। সঞ্চয় থাকা ভালো। তবুও ভবী ভোলবার না।

বাবু নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী। তার চোখকে ফাঁকি দেবে? এ মানুষের ভুল ভাঙানো সম্ভব না। হেসে বললাম, 'তাই বুঝি? কিন্তু পয়সাটা নিন।'

দশ পয়সার মুদ্রাটি একরকম হাতে গুঁজেই দিলাম। বেরিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। দেবোত্তর সম্পত্তির হিসাব নিকাশ তার নখদর্পনে। যার বিন্দু-বিসর্গ বুঝি না। একরকম বুঝিয়ে তো দিল। সংসারের সীমায় এটাই তো স্বাভাবিক। যে যার নিজের মতো জগতকে দেখে। রাস্তার ধারে ঝুপড়ি করে বসে আছে। আসল টান জমির দিকে। মাটি তার নাম। রক্তের টান। আমাকে চিনতে ভুল করতে পারে। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাকে খারাপ বলতে পারি না। এটাই তার খাঁটি পরিচয়। অতএব, মানুষকে নমঃ নমঃ।

দোকানি গাড়ির কথাও কিছু ভুল বলেনি। কু ঝিক ঝিক আওয়াজ বেশি। গতি পেট বোঝাই ময়ালের মতো। এলো কুড়ি মিনিট পরে। একটাই প্ল্যাটফর্ম কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। যাত্রীর ভিড় বেশ। জায়গা অবিশ্যি একটা পাওয়া গেল। কিন্তু ছোট একটা পুঁটলি কোলে এসে পড়লো। পাশের মায়ের কোলের শিশুটির নজর আমার কাঁধের ঝোলায়। থাবা দিয়ে সেটাকে ধরবার ব্যর্থ চেষ্টা। মা বিড়ি ফুঁকতে ব্যস্ত। আর রেলগাড়িতে ফেরিওয়ালা কোথায় নেই। যাবতীয় খাদ্যবস্তু থেকে, ওষুধ পথ্যি কিছু বাদ নেই। আমাকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে ইস্টিশনের দিকে।

প্রথমে এলো খামারগাছি। ইস্টিশনের থেকে হাট দূরে। কিছু লোক ওঠা নামা করলো। ভিড়ের কিছু কম হলো না। পুব দিকে তাকিয়ে, মনে হলো, ওদিকেই বোধহয় বাসনা, সিজা গ্রাম। খামারগাছির পরের ইস্টিশান জীরাট। লোকে বলে জিরেট। কেতাবের খবর, 'জিরায়ৎ' থেকে জীরাট। জিরায়ৎ বোধ হয় ফার্সি শব্দ। যার অর্থ নাকি আবাদী বা ফসলের জমি। তা হলে এমন কিছু প্রাচীন গ্রাম না। পাঠান আমলে জঙ্গল কেটে বসত। নাম করার মতো দুই বন্ধু, অভয়রাম আর রামকানাই, এ গ্রামে এসেছিলেন। বয়স তখন উভয়ের সত্তর। জিরেটের পাশে কেলেগড় গ্রাম। ভালো কথায় কালীগড়। সেখানে সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী কালীনাথ অধিকারীর দুই কন্যাকে দুজনে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অভয়রাম ঘোর শাক্ত। বীরাচারী। রামকানাই নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীর বংশধর। পরম বৈষ্ণব। অভয়রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালী। রামকানাই রাধা-গোপীনাথ।

পরবর্তী সংবাদ বাঙলার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পৈতৃকবাস ছিল এখানে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাঁর নাম। আদিবাড়ি অবিশ্যি দিগসুই গ্রামে। মুখুজ্জেদের এক পুরুষ রামজয় বিয়ে করেছিলেন জিরেটের গোস্বামী পরিবারে। কারণের হদিশ মেলে না। রামজয় মারা গেলে, তাঁর

ছেলে বিশ্বনাথ, কেন বিধবা মায়ের সঙ্গে চলে আসেন জিরেটে। বিশ্বনাথ হলেন আশুতোষের ঠাকুর্দা। বিশ্বনাথের চার ছেলে। দুর্গাপ্রসাদ হরিপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ রাধিকাপ্রসাদ। আর এখানেই আমার মনে একটা ঠেক।

কলকাতার নিকট মফস্বলে বরাবর একটা গল্প শুনে এসেছি। আশুতোষ মুখুজ্জের সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ছিল ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। সেই সূত্রেই নাকি দুই বন্ধুর কবুল, তোষ-এর বংশধরদের নাম অতঃপর থেকে প্রসাদ যুক্ত হবে। আর প্রসাদ-এর সঙ্গে তোষ। সেই কারণেই নাকি আশুতোষের বংশধরেরা সব প্রসাদ। আর হরপ্রসাদের বংশধরেরা বেবাক তোষ। হালফিলের পরিচয়ে সেটা জানা যাচ্ছে বটে। তবে গল্পটা বোধহয় গল্পই। জগত জুড়ে ওটাও বোধহয় জীবলীলার ধর্ম। গল্প বানাতে চায় সবাই। নইলে আশুতোষের জন্মের আগেই, তাঁর বাবার নাম গঙ্গাপ্রসাদ হতো না। আরও এক কথা। আশুতোষ যখন তাঁর বিধবা কন্যার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তখনই নাকি হরপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর আড়ি। হরপ্রসাদের বিধবা বিয়েতে আপত্তি। এটা ঘটলেও ঘটতে পারে। হরপ্রসাদ—বঙ্কিমচন্দ্র নৈহাটির অধিবাসী। উভয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু আশুতোষ জিরেটে আর বিধবা কন্যা কমলার বিয়ে আর এক ঘটনা। আশুতোষের নিজের গাঁয়ের কুলীন বামুনরা বিধবা বিয়ের কথা শুনেই দৌড়। অতএব আশুতোষেরও দৌড়। সেই যে জিরেট ত্যাগ করলেন, আর একদিনের জন্যও আসেন নি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গোঁ তো। সেই থেকে জিরেটের বাড়ি অনেককাল জঙ্গলের গ্রামে ছিল। এখন সাফসুরত করে 'আশুতোষ স্মৃতি মন্দির।'

'আরে ধেত্‌তারি, সরে বসবে তো।' একজনের বিরক্ত ঝাঁজ বাজ শোনা গেল, 'বলাগড় এসে গেল, নামতে দেবে না ?'

বলাগড়। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে বাংকে মাথার ঠোক্কর। কোলের কাছে ধুতি ভেজা। কারণ কী ? শিশুটির প্রাকৃতিক কর্ম। বোধহয় কাঁধের ঝোলাটা বাগাতে পারেনি বলেই। কোলের ওপর পুঁটলিটা তুলে নিল পার্শ্ববর্তিনী। গাড়ি ইতিমধ্যে প্ল্যাটফরমে ঢুকেছে। ব্যস্ততার কিছু ছিল না। ভিড় যা, তা গাড়ির মধ্যেই। যাত্রী ওঠা নামার তেমন ভিড় হুড়োহুড়ি নেই। গাড়ির মেঝেয় বসা নরনারী, মালপত্র ডিঙিয়ে নেমে এলাম। আমার পিছনে এক চৈত্র গাজনের সন্ন্যাসী। গলার নতুন গামছাটা মাসের শেষে পুরনো দেখাচ্ছে। হাঁটুর ওপরে গেরুয়া বস্ত্র। এক হাতে মালসা, কাঁধে ঝোলা। আর এক হাতে ছোট একটা ত্রিশূল। গাড়ি থেকে নেমে বললো, 'জয় বাবা, বুড়োশিবের জয়।'

ফিরে তাকালাম। দৃষ্টি তার ইস্টিশনের ঘরের দিকে। এক মুখ কালো

দাড়ি। গোঁফ জোড়া তার চেয়ে বড়। মুখে উপোসের ছাপ। ভিন্ গাঁয়ে ভিক্ষে সেরে ফিরলো বোধহয়। অথবা এলো নতুন জায়গায়। বুড়োশিবের আওয়াজ দিল। কিন্তু নড়লো না।

আমি পা বাড়ালাম। ইস্টিশনের ঘরের দিকে। যে কজন যাত্রী নেমেছিল, তারা কোথায় হারিয়ে গেল। গাড়ি কু দিয়ে এমন গর্জন করলো, যেন আকাশ পাতাল ফুঁড়ে ছুটবে। অথচ গতি সেই পেট বোঝাই ময়ালের মতো। ইস্টিশনের ঘরটা প্ল্যাটফরমের গায়ে। ডুমুরদর মতো নয়। ফাঁকা প্ল্যাটফরমটা রোদে পুড়ছে। পুড়তে পুড়তে ঝিমোচ্ছে। সকালের সেই বাতাসটা কোথায় যেন থমকে আছে। নিঝুম দুপুরটাকে হঠাৎ হঠাৎ কোকিলের ডাক চমকে দিচ্ছে। অন্যথায় ঘুঘুর ডাকে দুপুর যেন বিষণ্ন আতুর। এ ডাকটাই এক এক সময়ে, শোকাতুরা জননীর সেই কান্নার কথা মনে করিয়ে দেয়, 'খোকা কোথা···খোকা কোথা···'। তখন ঘুঘুর নাম হয়ে যায় 'খোকা কোথা পাখি।'

ইস্টিশনের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। ধুতির ওপর হাফশার্ট। লক্ষ আমার দিকে। সম্ভবতঃ ইনি টিবেট সংগ্রাহক। পকেট হাতড়ে টিকেট বের করলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন। টিকেট নিয়ে দেখলেন। ভুরু কুঁচকে উঠলো, 'এ তো গুপ্তিপাড়ার টিকেট। এটা বলাগড়।'

বললাম, 'জানি। আগেই নেমে পড়লাম।'

টিকেটের গন্তব্য ছাড়িয়ে যাইনি। অতএব দোষ বোধহয় ঘটেনি। তবু গুপ্তিপাড়ার টিকেট নিয়ে বলাগড়ে নামলে, অবাক হবার কথা। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'যাবেন কোথায় ?'

'শ্রীপুর।'

'তা হলে গুপ্তিপাড়ার টিকেট কেন ?'

বেকায়দার প্রশ্ন। কিন্তু যুক্তিযুক্ত। আসলে খুঁটির দড়িটা লম্বা করে রেখেছিলাম। সীমানা যেখানে হোক, চরে বেড়াতে পারলেই হলো। কিন্তু সে-কতা বোধহয় এক্ষেত্রে টেঁকে না। অতএব সেই ছল চাতুরি, 'কোনোদিন আসিনি তো, বুঝতে পারিনি। পরে শুনলাম, শ্রীপুর যেতে হলে বলাগড়ে নামতে হয়।'

'তা হলে আর এ টিকেট নিয়ে আমি কি করব।' ভদ্রলোক টিকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'আপনার কাছেই রেখে দিন। গুপ্তিপাড়ার টিকেট বলাগড়ে জমা হয় না। আজই ফিরে আসবেন তো ?'

বললাম 'তাই তো ইচ্ছে।'

'তা হলে এই টিকেটেই গুপ্তিপাড়া চলে যাবেন।' আমার হাতে টিকেট ধরিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক হাঁকলেন, 'এই যে, যাচ্ছ কোথায় ?'

পিছন ফিরে দেখি, বুড়োশিবের গাজনের সন্ন্যাসী। উত্তর দিকে হাঁটছে। হেসে বললো, 'যাব আর কোথায় ? বাবাকে ডেকে ফিরছি।'

'ওই বলে নিত্যানন্দপুর মেয়ের বাড়ি, অমুক বাড়ি ঘুরে আসছে।' কথাটা বললে আর একজন।

দেখলাম ভদ্রলোকের পিছনে, নীল হাফ প্যান্ট আর হাফ শার্ট পরা একজন। পোশাকে প্রমাণ, রেলের কর্মচারী।

ভদ্রলোক বললেন, 'সে কি আর জানি নে? চৈত্র মাসে এখন রোজই রেল গাড়িতে চাপতে হয়। কেন, আশেপাশের গাঁয়ে বাবার নাম করা যায় না?'

'রাম ছুতোরকে আপনি চেনেন না মাস্টারমশাই?' নীল কুর্তা হাসলো, 'ওকি আর বাবার নাম নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়? ঘরে ওর অভাব কিসের? চোত্ মাসে সন্নেস নিয়ে শালা যত কুটুম বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আজ নিত্যানন্দপুর, কাল বাঘনা পাড়া, পরশু দাঁইহাট।'

যার সম্পর্কে কথা হচ্ছে, সে ততক্ষণে উত্তরে অনেক দূরে। মাস্টার মশাই বোধহয় ইস্টিশন মাস্টার। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'যত সব ছ্যাঁচড়ার দল।'

নীল কুর্তা একবার আমাকে দেখে ভিতরে ঢুকে গেল। বাকি রইলো, বারান্দার ছায়ায় বেঞ্চিতে একটা ঘুমন্ত মানুষ। তার নিচে একটা কুকুর। আমি টিকেট হাতে নিয়ে ইস্টিশনের বাইরে এলাম। পুবের কাঁচা রাস্তাটার ধারে গোটা দুই তিন চালাঘর। বাঁ দিকেও একটা রাস্তা গিয়েছে। সেদিকে আঁসশ্যাওড়া ঝাঁটি বাবলার জঙ্গল। পাশে একটা মাঠ। একটা চালা ঘরে চায়ের দোকান। খরিদ্দার নেই। দুজন লোক বসে আছে। আর একটা ঘরও তাই। তবে ক্যালেণ্ডার আর সামান্য কিছু মনোহারি বস্তুতে একটু নজর কাড়ে। বাকি আর একটা ঘরে ঝাঁপ অর্ধেক বন্ধ। একজন গাজনের সন্ন্যাসী বসে বিড়ি বাঁধছে। যানবাহনের কোনো প্রশ্নই নেই। ডান দিকে, গাছতলায় একটা গরুর গাড়ি মাটিতে মুখ নামানো। খুঁটিতে বাঁধা বলদ দুটো ঘাস চিবোচ্ছে।

কোকিলের ডাক থামলেই, ঘুঘুর বিরহী স্বর। চড়ুইয়ে ডাক যেন ঘুঙুরের ঝংকার। দূরের গাছপালার ফাঁকে, দু চারটি ঘর দেখা যাচ্ছে। একটা পাকা দোতলা বাড়ির অংশও। কিন্তু যাবো কোন্ দিকে? সোজা পুবে? না বাঁ দিকের উত্তর পুবে? কেমন একটা ধারণা ছিল, বলাগড় বেশ সম্পন্ন গ্রাম হবে। কিন্তু সেরকম কিছু দেখছি না। হয় তো ভিতর দিকে আছে। পঞ্চমুণ্ডির আসনযুক্ত চণ্ডীমন্দির। গায়ে তার টেরাকোটার অপরূপ কাজ। আছে রাধাগোবিন্দর মন্দির। জিরেট বলাগড়, দু গাঁয়েই বৈষ্ণবদের ঠেক্ আছে। বংশধরেরা সবই সেই নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাদেবীর।

আমি দোকানের দিকে পা বাড়ালাম। পিছনে শোনা গেল, 'জয় বাবা বুড়ো শিবের লাগি-ই-ই।' তাকিয়ে দেখি সেই গাজনের সন্ন্যাসী। নাম

যার রাম ছুতোর। ছুতোর নিশ্চয় পদবী না। পেশাগত পরিচয়। ফিরে তাকিয়ে দেখি, সন্ন্যাসীর কালো গোঁফ দাড়ির ভাঁজে আর ছোট চোখে হাসি। আমার দিকেই এগিয়ে এলো। দোকানের লোকেরা তার দিকে তাকালো। নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে। কিছু বলছে। কেবল বিড়ি বাঁধছে যে সন্ন্যাসী, সে নির্বিকার। রাম ছুতোর আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, 'ইস্টিশান মাস্টার আপনাকে ধরেছিল বুঝি ?'

'ধরবে কেন ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

রাম ছুতোর চতুর হাসি একটু বিব্রত হলো, 'না, দেখলাম কিনা, আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

'দাঁড় করিয়ে রাখেনি তো। আমার গুপ্তিপাড়ার টিকেট, নেমেছি এখানে।'

রাম ছুতোরও অবাক হলো, 'অ! যাবেন গুপ্তিপাড়া, নেমে পড়লেন এখানে ? আমি ভাবি ভদ্দরলোক মানুষকে কেন মাস্টার দাঁড় করালে।'

আর তাই রাম ছুতোর আমাকে তার দলের দলী ভেবে নিয়েছে। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'তা বাবু, এখেনে লেমে পড়লেন কেন ?'

বললাম, 'শ্রীপুর যাবো। বলাগড় গ্রামটা কি ভেতরে ?'

'বলাগড় ?' রাম ছুতোরের ছোট চোখে বিস্ময়, 'বলাগড় তো এখেনে লয়। এটা ইস্টিশন। গেরাম তো আধ কোশ দক্ষিণে, জিরেটের গায়ে।'

চমৎকার। এ জায়গায় সে-জায়গা নেই। ইস্টিশনের নাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে এটা কোন্ গ্রাম ?'

'এটাকে হাট গোবিন্দগঞ্জ বলতে পারেন।' রাম ছুতোর বললো, 'ছিরপুর মৌজা। আপনি কি বল্যাগড়েও যাবেন ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না, শ্রীপুরেই যাবো। কোন্ পথে যাবো ?'

রাম ছুতোর সামনের রাস্তার দিকে তাকালো। আর একবার পুব উত্তরের দিকে। দাড়ি চুলকে বললো, 'দু দিক দিয়েই যেতে পারেন। তবে এই পথেই সোজা যান। কিছুটা গেলে, বাঁ দিকে রাস্তা পাবেন। আমিও যাব।' সে আমার আপাদমস্তক দেখলো। অনুসন্ধিৎসু চোখে সমীহ, 'কার বাড়িতে যাবেন বাবু ?'

বললাম, 'কারো বাড়িতে না, এমনি একটু বেড়াতে যাবো।' বলেই যেন ভিজে কাপড় লেগে গেল। এও আবার গরমেণ্টের লোক ভেবে বসবে না তো! ভাবলে অবিশ্যি কিছু করার নেই। রাম ছুতোরের চোখে সন্দেহ, মুখে হাসি, 'আমি ভাবলাম বুঝি বাবুদের কারুর বাড়ি যাবেন। আপনি এ পথে এগোন, আমি আসছি।'

কিন্তু আমার পেটের চিঁড়ে জল চাইছে। চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে বললাম, 'একটু খাবার জল পাবো ভাই ?'

দোকানের দুজনেই কৌতূহলী চোখে দেখছিল। একজন বেঞ্চি থেকে উঠে গেল। রাম ছুতোর গেল, আর এক সন্ন্যাসীর কাছে। চায়ের দোকানের আর একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবেন ?'

বললাম, 'শ্রীপুর। কতো দূর হবে ?'

'মাইলটাক।' লোকটি আমার আপাদমস্তক দেখলো, 'সোমড়াবাজারে নেমেও যেতে পারতেন। তবে উনিশ আর বিশ।'

অন্য লোকটি একটি কাঁচের গেলাস ধুয়ে, ঘটি থেকে জল ভরে দিল। ছোট গেলাস, তলায় চায়ের খয়েরি দাগ স্থায়ী হয়ে গিয়েছে। এক গেলাসে হলো না। আর এক গেলাস নিলাম। পেটের চিঁড়ে উঠলো। ধন্যবাদের প্রশ্ন নেই। মনে মনে বললাম, 'জয় হোক।'

পুবের রাস্তায় পা বাড়ালাম। দেখলাম বিড়ি বাঁধছে যে সন্ন্যাসী, রাম ছুতোর তার সামনে বসে কী বলছে। বিড়ি কারিগর সন্ন্যাসী মাথা ঝাঁকিয়ে শুনছে। মুখে কথা নেই।

রাস্তায় একটা লোক চোখে পড়ে না। নিঝুম গ্রামের দুপুর। নিদাঘ বেলা। ভূতে মারে ঠ্যালার মতো। ডান দিকে বাগান গাছপালা। মাঝে মধ্যে দু একটা মাটির ঘর, খড়ের চাল। গেরস্থের দেখা নেই। ঝোপে ঝাড়ে চড়ুই দলের ঝাঁপাঝাঁপি। কুহু ডাকের বিরতি নেই। মাঝে মাঝে বুলবুলির শিস কাছে পিঠে। হঠাৎ হঠাৎ দুর্গা টুনটুনির চড়া শিস। রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলার উপায় নেই। স্যাণ্ডেল শুদ্ধু পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে ধুলায়। কোথায় যেন শুনেছিলাম, বর্ষায় কর্দমাক্ত, বাকি সময় ধুলাসিক্ত। ধুলি সিক্ত কেমন করে হয়, জানি না। সিক্ত লিপ্ত কিছুই না। ধুলি গাঢ় পথ। গরুর গাড়ির চাকার দাগ। পথের ধারের ঘাসগুলোও ধুলিধূসর। তবু তার ওপর দিয়েই চলতে সুবিধা। সূর্য পশ্চিমের ঢালে। রোদ বেশ চড়া। সকালের বাতাসটা কোথায় বন্দী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা আসছে। তখন আমিও ধুলায় ধূসরিত। নাকে মুখে চাপা দিয়েও নিষ্কৃতি নেই। দাঁতে কিচ্ কিচ্ করে। শুকনো পাতা উড়ে যায় গায়ে ঝাপটা দিয়ে।

বাঁ দিকে ছোট একটা পাড়া। গায়ে গায়ে বেশ কিছু মাটির ঘর। এক ঘরের দাওয়ায় বসে দুই নেংটি পরা জোয়ান আর বুড়ো। সামনে দুটো মেটে কলসী। পাশে একটা ল্যাংটো শিশু ঘুমোচ্ছে। দু'জনের মধ্যে কিছু কথা হচ্ছিল। আমাকে দেখে কথা থামালো। বুড়ো হঠাৎ টলতে টলতে নেমে এলো। নিচু হয়ে দু'হাত কপালে ঠেকালো। আমাকেই নাকি ? আশেপাশে আর কারোকে তো দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে আবার মুখ তুলে, দন্তহীন মাড়িতে লাজুক হাসি। কালো মুখে লাল চোখ। দ্রব্যগুণে নজরে ভুল। এ ভুল ভাঙাতে যাওয়া আর এক বিপত্তির সম্ভাবনা। অতএব

আমারও কপালে দুই হাত। পা থামাইনি। তারপরেই খিলখিল হাসি। রমণীর স্বর। নিদাঘ বেলায়, সেই হাসিতে কেমন একটা নিশির ডাকের অলৌকিকতা। দেখি, অন্য ঘরের দাওয়ায় দুই রমণী। একজনের ডুরে শাড়ির বুকের আঁচল খসা। কোলের শিশুর মুখে, একটি ভরাট অমৃতের বোঁটা। অপরটি উদাস। অচেনা মানুষ দেখে, আবৃত করার কোনো উদ্যোগ নেই। চুল তার খোলা। আর একজন তার গায়ে লেপ্টে বসে। খোলা চুলের ওপর দু হাত ঢুকিয়ে বসেছে। উকুন মারা হচ্ছে। পাশে পড়ে আছে এক গুচ্ছ বাঁশের সরু কাটি আর ধারালো হাত দা। তাদের শরীরে বা মাটির দাওয়ায় তেমন নিকোনো লেপা মোছা, চাকচিক্য নেই। একটু যেন ধুলা ধুসর। অথচ নিতান্ত শ্রীহীন না। জোড়া গলার হাসি বেজেছে ঐ দাওয়া থেকেই। পেরিয়ে যাবার আগে শুনতে পেলাম, 'বুড়ো সেই সকাল থেকে খাচ্ছে।'

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের জীবলীলার কথা মনে পড়ে গেল। অলস বেলার একটি ছবি। আরও কিছু দূর এগোতেই, বাঁ দিকে একটা রাস্তা চোখে পড়লো। দাঁড়ালাম। দেখছি, একটু দূরে, গাছতলায় একটা চালা ঘর। সেখানে তিন চারজন বসে আছে। শ্রীপুরের রাস্তা কি বাঁ দিকে? জিজ্ঞেস করার জন্য চালা ঘরের দিকে পা বাড়াতে গেলাম। পিছন থেকে শোনা গেল, 'ওদিকে লয় বাবু, বাঁয়ে চলেন।'

ফিরে দেখি রাম ছুতোর, গাজনের সন্ন্যাসী। একটু আশ্বস্ত হলাম। বাঁয়ের পথ ধরে চললাম। এ কাঁচা রাস্তা তেমন চওড়া না। তবে গরুর চাকার দাগ আছে। ধুলা একটু কম। গাছপালা নিবিড়। রোদের থেকে ছায়া বেশি।

'মাস্টার মশাই আর ঘণ্টাওয়ালা কী বলছিল বাবু?' রাম ছুতোর কিঞ্চিৎ দূরত্ব বাঁচিয়ে হাঁটছে।

কী জানতে চাইছে, বুঝি। তবু জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যাপারে?'

'আমার কথা কিছু বলছিল না?' রাম ছুতোরের মুখে হাসি।

বললাম, 'হ্যাঁ। আপনি বিনা টিকেটে কুটুমবাড়ি ঘুরে বেড়ান, সে-কথা বলছিল।'

'আমাকে আপনি করে বলছেন বাবু?' রাম ছুতোর ভারি লজ্জিত হলো, 'ছি ছি ছি। বলবেন না। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ বাবু, গতরে খেটে খাই। জাতে ছুতোর, তবে মাঠের কাজই বেশি করি। ছিটে ফোঁটা জমি আছে। বাবুরা কেউ আমাদের আপনি বলে না।'

এটাই হয় তো রীতির কথা। রেওয়াজ যাকে বলে। কিন্তু ভিন্ দেশী লোক আমি। চেনা শোনা থাকলে আলাদা কথা। আপনি বললেই যে সম্মান দেখানো হয়, সেটা যথার্থ না। ওটা ওপর চট্কা ভদ্রতা। সম্পর্ককে নিকট

বাঁর না। আমি অনায়াসেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ নিত্যানন্দপুরে মেয়ের বাড়ি যাওয়া হয়েছিল বুঝি ?'

'ওই ঘণ্টাওয়ালা তারক বলল বুঝি ?' রাম ছুতোর হেসে আওয়াজ দিল, 'ঠিকই বলেছে। তা বাবু, একটা কথা। সব সোমায় তো আর বিনা টিকিটে যাইনে। এখন সন্নেস লিয়েছি। সন্নেসির কি টিকিট লাগে ?'

যুক্তির অভাব নেই। গৃহস্থ এখন এক মাসের সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর তো টাকাকড়ি থাকে না। তবে টিকেট কাটবে কেন ? আমি তার মুখের দিকে তাকালাম। কালো চকচকে চোখে কৌতুকের ঝিলিক। বললাম, 'তা আইনকানুন মানতে গেলে—।'

'সাধু সন্নেসিদের আবার আইন কানুন কিসের বাবু ?' আমাকে বাধা দিয়ে, কাছে চলে এলো রাম ছুতোর, 'কত সন্নেসিরা রেলে চেপে হিল্লি দিল্লি করে। তারা কি টিকিট কাটে ? আমি তো এখন সন্নেসি।'

রাম ছুতোরের এটাই যখন সিদ্ধান্ত, তখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তর্ক করতে গেলে বলতে হয়, সে তো ঘর বেবাগী সন্ন্যাসী না। গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে বিনা টিকেটে কুটুমবাড়ি বেড়ানোটা তার মতো গৃহীকে মানায় না। সে-কথা বলা বৃথা। এক মাসের জন্য হলেও, সন্ন্যাসী তো। অতএব তার বিনা টিকিটে ভ্রমণের অধিকার আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'দাঁইহাট আর বাঘনা পাড়ায় কে আছে ?'

'অ্যাঁ ?' রাম ছুতোর যেন ঠেক খেল। তারপরে হা হা করে হেসে বাজলো, 'ওই তারক বলছিল বুঝি ? ও শালা আমার সবই জানে। দাঁইহাটে শ্বশুরবাড়ি, বাঘনাপাড়ায় বোনের বাড়ি। এই এক মাস একটু কুটুম্বিতে সেরে লিই। সংক্রান্তির পর থেকেই তো কাজ। আর তো বেরতে পারব না।' সেয়ানা হতে পারে। কিন্তু সরল স্বীকারোক্তি। এদিকে পথ ফুরায় না। এক মাইল কি আসিনি। জিজ্ঞেস করলাম। 'শ্রীপুর আর কতো দূর ?'

'কত আর ? এখেন থেকে আর আধ কোশটাক হবে।'

আধ কোশ। অর্ধ ক্রোশ মানে তো এক মাইল ? অথচ ইস্টিশনে শুনে এলাম শ্রীপুরের দূরত্ব এক মাইল। এই শ্রীপুরের কথা শুনেছিলাম প্রথমে এক বন্ধুর কাছে। সাত আট বছর আগে। তখন বন্দুকের কারখানায় কাজ করতাম। সহকর্মীর পদবী ছিল মুস্তোফি। তাদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। শ্রীপুরের মুস্তোফিদের মন্দিরের কথা সে বলেছিল। এবারে আমার যাত্রা আসলে বর্ধমানেরই এক গ্রামে। পথে দু এক জায়গায় ঠেক দিয়ে যাওয়া। এই ঠেক দিতে গিয়ে ঠেকায় না পড়ে যেতে হয়।

একটা জায়গায় এসে পথ দু দিকে বাঁক নিয়েছে। রাম ছুতোর বললো, 'আপনি এই বাঁয়ে চলে যান। আর বেশি দূর লেই। আমি যাব ডাইনে।

গোবিন্দগঞ্জের ছুতোরপাড়ায় আমার বাড়ি। সোজা পথে যেতে পারতাম। তা কি মনে হল, আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে গেলাম।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ নিজেকে কেমন একলা মনে হলো। গাজনের সন্ন্যাসী কপালে দু হাত ঠেকিয়ে নিজের পথ ধরলো। আমি এখনও গ্রামের বাইরে। শস্যহীন মাঠ দেখা যাচ্ছে, গাছপালার আড়ালে। সামনে একটা পুকুর। ঘাট বলতে কিছু নেই। জলে সবুজ শ্যাওলার আস্তরণ। রাস্তার দু পাশে ঘন ঝোপ জঙ্গল।

বাঁয়ের পথে মোড় নিয়েছি। সমবেত নিচু স্বরে মেয়ে গলায় গান ভেসে এলো। ভাষা বুঝতে পারছি না। ঘোর দুপুরের ঘোরটা তখনও একেবারে কাটেনি। বেলা যদিও ঢলে আরও পশ্চিমে এই মুহূর্তে, নির্জন ঝোপ জঙ্গল মাঠের পথে গান গায় কোন্ রমণীরা? শরীর আছে তো তাদের? নাকি অশরীরিণী? গানের সুরে তেমন ওঠা নামা নেই। একটানা সুরে একটা দোলার ঢেউ আছে। বাউল কীর্তন ঢপ না। জারি সারি ভাটিয়ালি না। অথচ একটানা সুরে যেন মাটির গন্ধ। কী একটা অলৌকিক মোহ রমণীদের নিচু গানের সুরে। নিদাঘ বেলার নির্জন নিশি না তো?

আরও কয়েক পা যেতেই, শুকনো পাতার খস্‌খস্। বাঁ দিকে একটি চিত্র? শাড়ির আঁচলে গাছ কোমর বাঁধা তিন যুবতী। কালো তাদের রঙ। মাথার চুলে ফুল গোঁজা। তিনজনের হাতে হাত ধরা। সরু পায়ে হাঁটা পথে এগিয়ে আসছে। দেখলেই চেনা যায়, ওরা সাঁওতালি। বেশ খানিকটা পিছনে জনা কয়েক পুরুষ। হাতে তাদের পুঁটলি, বাঁশ।

যুবতীরা আমাকে দেখলো আচমকা। আমিও দেখলাম। তাদের গানের সুরে একটু ভাটা পড়লো। কিন্তু একেবারে থেমে গেল না। মুখে ফুটলো সলজ্জ হাসি। নিজেদের সঙ্গে একবার দৃষ্টিবিনিময়। যেমন আসছিল, তেমনি আসতে লাগলো। এবারের যাত্রায় দেখছি, এমনি সব রূপের ছড়াছড়ি। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের ভাষায় প্রকৃতির গভীরে জীবলীলা। হয় তো কোনো কাজ সেরে ফিরছে। চৈত্রের ধুলা, ঝোপ ঝাড় গাছের আর কাঁচা আমের গন্ধে মাখামাখি। ওরা ডেকেই চলেছে, কুহু কুহু।

রঙ তুলি থাকলেও কি ধরে রাখা যেতো? বোধহয় যেতো। আক্ষেপে লাভ নেই। কেবল আর্ত প্রার্থনা, দৃষ্টি শ্রুতি কিছুই হারাতে চাই না। হারালে এ রূপ দেখা হতো না। গান শোনা হতো না। যদি বা, ভাষা বুঝতে পারছি না। ভাষা ওদের চোখে মুখের সলজ্জ হাসিতে। চলার অলস ছন্দে।

রাম ছুতোর চলে যাওয়ায়, মনটা খারাপ হয়েছিল। এখন আর হচ্ছে না।' সামনে এক প্রাচীন গ্রাম। বন জঙ্গল কাঁটা ঝোপে ভরা। পুরনো দিনের সমৃদ্ধির স্মৃতি ভারে বিষণ্ণ। অথচ আমার মনটা ভরে উঠছে এক অনির্বচনীয় আনন্দে। এগিয়ে চলি। পিছনে ওদের গান বাজতে থাকে।

মুস্তৌফিদের গড় বেষ্টিত বৃহৎ অট্টালিকার গায়ে এখন কালের থাবা। গড় জঙ্গলময়। কিন্তু দীঘির জল কালো। দীঘি ছাড়াও পথ চলতে ঘাট বাঁধানো পুকুর চোখে পড়ে আশেপাশে। ঘাটগুলো শ্যাওলা ধরা, ভাঙা ফাটা। ফাটল দেখলে ভয় লাগে। তবু, সেই সিঁড়ি ভেঙেই অনায়াসে বিকেলের গা ধোয়া বাসন মাজা চলছে।

মুস্তোফি না মুস্তৌফি। বাদশাহী খেতাব না। নবাবের রাজস্ব বিভাগের একটি পদ। কানুনগো বলা চলে। ইংরেজিতে বোধহয় অডিটার। ইতিহাসের পাতায় এ বংশের উল্লেখ আছে। আসল পদবী মিত্র। পরে মিত্র-মুস্তৌফি। এখন কেবল মুস্তাফি। পলাশী যুদ্ধের সাতান্ন বছর আগে, মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকায়। ঔরঙজেবের ছাড়পত্রে, তিনি তখন দেওয়ান। তারও অনেক আগে, শায়েস্তা খাঁর আমলে রামেশ্বর মিত্র ঢাকার মুস্তৌফি দপ্তরের প্রধান। তখন বাড়ি ছিল গঙ্গার ওপারে, উলায়। তাঁর ছেলে রঘুনন্দন উলা ছেড়ে এ পারে। কারণ বোধহয় একটাই। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে অসদ্ভাব। অন্য একটা ওজরও ছিল। গঙ্গা নাকি সরে যাচ্ছিল উলার ডাঙা ছেড়ে। এ পারের নাম তখন আঁটিশেওড়া।

তার আগে রামেশ্বর গিয়েছিলেন দিল্লি। দরবার ঔরঙজেবের। মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে শাহজাদা আজিম উস্‌শানের হিসাব নিয়ে বিবাদ। সেই হিসাব মেটাতে রামেশ্বর ঔরঙজেব সকাশে। সম্রাট হিসাব দেখে চমৎকৃত, অতএব, 'তুমিই মুস্তৌফি'। খেলাত জায়গীর সবই দিয়েছিলেন। মহাশয়ের আরবী পারসী শিক্ষা ছিল। বড় ছেলে রঘুনন্দনও বাপকা বেটা। সংস্কৃত পারসী ভালো জানতেন। তবে মুস্তৌফির পদে আর বোধহয় যান নি। মতি ছিল ধর্মে কর্মে। সিদ্ধপুরুষ বলতো লোকে। আঁটিশেওড়ায় এসে গড় কেটে প্রাসাদ তাঁর তৈরি। খৃষ্টাব্দ সতরো শো সাত। মন্দির করেছিলেন কয়েকটি। কুলদেবতা গোবিন্দজীউর মন্দির। কিন্তু শিব চণ্ডী বাদ ছিল না। বৈষ্ণব আর শাক্ত মেশামিশি। রাঢ়ের এই বৈশিষ্ট্য।

কোথায় যেন ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। সেই সঙ্গে ছেলেদের কলস্বর। নিশ্চয় ইস্কুলের ছুটি। বন্দী মুক্তি। মন্তব্যটি ভালো না। অভিভাবকেরা ভ্রূকুটি করতে পারেন। সব কিছুতেই নিজেকে দেখি কী না। রূপের অঙ্গে স্বরূপ দর্শন। দুর্গামণ্ডপ কিংবা চণ্ডীমণ্ডপের দোচালার সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, প্রথম নজরে রসকসের মুখ। পিছনে টিং টিং ঘণ্টি। সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে রোগা লম্বা এক যুবক। চোখে কৌতূহলী জিজ্ঞাসা।

আমি তখন দোচালা মণ্ডপটির সামনে পাকা চাঁদনি দেখছি। চাঁদনির কড়িকাঠের মুখে অদ্ভুত রাক্ষস মূর্তি। মণ্ডপটির চালা ছিল এক সময়ে খড়ের। নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, এখন টিনের চালা। মণ্ডপের গায়ে কাঠের কারুকার্যে রূপের ছড়া। দেব দেবী যক্ষ রক্ষ রাক্ষস। বাঙলা দেশে নাবিতে

পাথর নেই। তবু অনেক জায়গায় পাথরের মূর্তি দেখেছি। কিন্তু এমন কাঠ খোদাই কাজ দেখিনি। টিনের চালাটা একটু বেমানান। ভিতরে উঁকি দিয়ে, রূপে বিভোর হয়ে যাই। কড়িকাঠে আর ফ্রেমেই কেবল মূর্তি খোদাই নেই। চালের নিচে বাঁশের চিকন কাঠি আর বেতের সূক্ষ্ম কাজ। যাকে বলে সিলিং, চিকন কাঠি আর বেতের সূক্ষ্ম কাজ বোধহয় সেইজন্যই। এখন প্রায় ধ্বংসোন্মুখ। কাঠের দেব দেবী, পুরাণের কাহিনী চরিত্রদের গায়ে কালের দোসর উইপোকা জায়গায় জায়গায় হানা দিয়েছে। একজন শিল্পীর কাজ না। অনেকের। কারোর নাম লেখা নেই। এ দেশে কোথাও কোনো মঠ মন্দিরের গায়ে শিল্পীর নাম লেখা থাকে না। থাকে কেবল প্রতিষ্ঠাতাদের। তা থাক। কিন্তু নাম না জানা, এই সব শিল্পী কারিগরদের এমন রূপের বাহার রক্ষা করবে কে ?

চোখে ভেসে উঠছে, আরব সাগরের কূলে, বান্দ্রার পাহাড়ি টিলার ওপরে এক গৃহ। আধুনিক ইমারত। কিন্তু কাঠের কড়ি বরগায়, অপরূপ কারুকার্য। শুনেছিলাম, গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের তক্ষণশিল্পীদের কাজ। স্বীকার করতে হবে, বাঙালী শিল্পীর হাতে জাদু ছিল বেশি। কোথায় আছে এই শিল্পীদের বংশধরেরা ?

মণ্ডপের এক পাশ থেকে বেরিয়ে এলেন এক প্রৌঢ়। আদুর গা, গলায় পৈতা। পরনে ধুতি। চোখের চশমার কাঁচে জিজ্ঞাসা। দেখলেই সজ্জন বলে মনে হয়। কাছে এগিয়ে এলেন, 'কোথা থেকে আসছেন ?'

বললাম। শুনে একটু যেন অবাক হলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেবল এই সব দেখতে ? আজই আবার ফিরে যাবেন ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।' বলেই তাড়া লেগে গেল। গাছের শীর্ষে রোদের ঔজ্জ্বল্য কমে আসছে। প্রৌঢ় কি কুলদেবতা গোবিন্দজীউর পূজারী ? তিনি সাইকেলওয়ালা যুবকের দিকে তাকালেন, 'তুমি নিয়ে এসেছ ?'

'না, দেখলাম উনি একলাই আসছেন।' যুবক উত্তর দিল।

আমি কাছে একটি পাকা ঘর দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটি কী ?'

'হোমঘর।' প্রৌঢ় বললেন, 'আর যজ্ঞকুণ্ড। ঐটি বোধন দালান।' আর একটি বাড়ি দেখালেন হাত তুলে। তিনিই ঘুরে দেখালেন গোবিন্দজীউর মন্দির। সামনে দুর্গা-দালানের মতো চওড়া চাতাল। মন্দিরের দরজা তিনিই খুললেন। কালো পাথরের গোবিন্দ, অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকা। বিগ্রহের পায়ের নিচে লেখা দেখালে, 'মিত্র দাসস্য।' মন্দিরের সামনে দোলমঞ্চ আর নহবতখানা। রাসমঞ্চও আছে। শ্রীপুরের রাসযাত্রায় বড় মেলা হয়।

গোবিন্দজীউর গল্প আছে। গঙ্গার ধারের জেলেপাড়ার মৎস্যজীবীদের জালে তিনি উঠেছিলেন। সেই পাড়া কিছু দক্ষিণে। মৎস্যজীবীরা গোবিন্দজীউকে নিজেদের গাঁয়ে রেখে, রঘুনন্দনকে খবর দিয়েছিল। রঘুনন্দন

সেখান থেকে বিগ্রহ এনে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ জেলে-পাড়ায় ছিল। তাই সেই গ্রামের নাম রাখা হয়েছিল গোবিন্দগঞ্জ। পরবর্তী এক বংশধর গোবিন্দগঞ্জে একটি বাজার দিয়েছিলেন। সেই থেকে হাট গোবিন্দ-গঞ্জ। রাম ছুতোরের গাঁ।

আর এক কাহিনী, বর্গীর হাঙ্গামার সময় গোবিন্দজীউ গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হন। পরে মাছধরাদের জালে উঠে আসেন। দুই কিংবদন্তীতেই একটা মিল। গঙ্গার জল থেকে, মাছের জালে তাঁর আবির্ভাব। অসম্ভব না। সেটাই বোধহয় সত্যি।

দোলমঞ্চের উত্তরে বারোয়ারি গৃহ। কাছে শিব মন্দির। বুড়োশিবের মন্দির। সামনে মাঠ। আসন্ন গাজনের উৎসব এখানেই হবে। রাসের মেলাও এখানেই বসে। সংবাদ সবই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের। কিন্তু বেলা পড়ে আসছে। আর দেরি করা যায় না। সাইকেলসহ যুবক চলে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ বললেন, 'শেষ ডাউন ট্রেনটা পাবেন কিনা সন্দেহ। লেট থাকলে পেয়ে যেতে পারেন।'

সেটাই দুশ্চিন্তা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের গোলকদাস বাবাজীর আখড়ার কথা মনে আছে। এখন সিদ্ধান্ত নাও। বলাগড় ইস্টিশন, না বাবাজীর আখড়া। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়কে তিন মাথার মোড় মেনেছি। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণকে বাবাজীর আখড়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম না। বললাম, 'দেখি কী করি। সুখড়িয়া ঘুরে দেখবার ইচ্ছা ছিল।'

প্রৌঢ়ের চশমার কাঁচে অবাক ঝিলিক, 'সুখড়িয়া? সে তো বেশ দূরে। সেখানে এখন ঘুরতে যাবেন? আপনি কি খবরের কাগজের লোক?'

হেসে বললাম, 'না। এমনিই একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

'তা হলে তো আপনার আজ ফেরা হবে না।' প্রৌঢ় বললেন, 'সুখড়িয়া যেতেও অন্ধকার হয়ে যাবে। না গেলেও ট্রেন পাবেন কি না সন্দেহ। রাত্তিরটা এখানেও থেকে যেতে পারেন। ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

বড় নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। তবু একবার বাবাজীর আখড়াটা দেখবার ইচ্ছা। বললাম, 'গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবো।'

'দেখুন। যদি আসেন, গোবিন্দজীউর মন্দিরে আসবেন।' প্রৌঢ়ের অনাড়ম্বর আমন্ত্রণে বাহুল্য নেই। কিন্তু একটা নিবিড় আন্তরিকতা আছে।

মানুষ চেনা সহজ না। অথচ কতো সহজে মানুষ নিজেকে চিনিয়ে দেয়। মনে বলি, রূপে মজেছি। কোন্ রূপের ফেরে আছি, বুঝতে পারি না। ফিরতে গিয়ে, মনে হয়, মানুষের এই রূপের খোঁজেই আছি। এ রূপ অন্তঃসলিলে বহে। বললাম, 'নিশ্চিন্ত হলাম। কোথাও ঠাঁই না পেলে আপনার কাছেই আসবো।'

'আসবেন।' তিনি চোখ তুলে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, পূবে হাঁটা দিলাম। এক জায়গায় ঘন গাছপালার মধ্যে দেখি দুটি মন্দির। কালের গ্রাসে জীর্ণ। মুখ থুবড়ে পড়ার অপেক্ষায়। মাথার পাঁচ চূড়ার কোনোটাই গোটা নেই। ভিতরে ঝাপসা অন্ধকার। সাবধানে কাছে গিয়ে দেখলাম, ভিতরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পিছন ফিরে, এগোতে গিয়ে, সামনে এক অসুর মূর্তি। কালো কুচকুচে গাট্টাগোট্টা খালি গা। গোঁফ জোড়া পাকানো। কোমরের কাপড় নেংটির মতো গোটানো। কিন্তু চোখ পাকানো নেই। বরং চোখে মুখে নিরীহভাব। দৃষ্টিতে অনুসন্ধিৎসা। জিজ্ঞেস করলাম, 'গোলকদাস বাবাজীর আখড়াটা কোথায় ?'

'পূবে পাটনি বাড়ির কাছে।' অসুরদেহী প্রায় বালকের স্বরে বললো, 'নদীর ধারে।' হাত তুলে দিক নির্দেশ করলো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কতো দূরে ?'

'দূর কোথায় ? ওই তো ওই পুকুরের ধার দিয়ে চলে যান।' সে হাত তুলে দেখালো, 'পাটনি বাড়ির কাছে একটা আম বাগান আছে। বাগানের গায়ে, দোতলা মন্দির। মাথায় নিশেন আছে।'

যাক, মাথার নিশানই নিশানা। এগিয়ে গেলাম। পুকুর পেলাম, যাকে ঘিরে কিছু মাটির ঘর। একটা পাড়া। কিন্তু বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গোলকদাসের দোতলা মন্দিরের কথা বলেন নি। আম বাগান পেলাম রাস্তার ধারে। গাছের ফাঁকে, নদী দেখা দিল। নিশানও চোখে পড়লো। লাল ঝাণ্ডা বলে ভ্রম হয়। দোতলাই বটে, তবে মাটির বাড়ি। মাথায় খড়ের চাল। অনেকটা জায়গা ঘিরে উঁচু মাটির দেওয়াল। সীমানার মধ্যে, দোতলা ছাড়াও কয়েকটা ঘর রয়েছে। ভিতরে একাধিক খোল আর করতাল বাজছে। তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ। এখনও সন্ধ্যে হয়নি। এর মধ্যেই পূজা আরতি শুরু হয়ে গেল নাকি ? ঢোকবার দরজাই বা কোন্ দিকে ?

ডাইনে বাঁয়ে তাকালাম। বাঁ দিকে ঝাঁটি বাবলার জঙ্গল। ডান দিকে, পাঁচিলের ভিতরে একটা পেয়ারা আর স্বর্ণচাঁপা গাছ মাথা তুলে আছে। সে-দিকেই গেলাম। পাঁচিলের পূবে মোড় নিতেই দেখলাম, কয়েকজন গ্রামবাসী দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে দেখি, পাঁচিলের গায়ে দরজা খোলা। আমাকে দেখে সবাই ফিরে তাকালো। ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি গোলকদাস বাবাজীর আখড়া ?'

'হ্যাঁ।' একজন বললো। বাকিরা কেমন জড়োসড়ো। দরজা ছেড়ে দাঁড়ালো।

সামনেই বাগান। বড় গাছ দুটিই। বাকি সব ফুলের গাছ। বেশি কৃষ্ণচূড়ার ঝাড়। গোটা কয়েক টগর। মাধবী লতার ঝাড় উঠেছে দোতলা ঘরের গা বেয়ে। কাছাকাছি একটা চাল কুমড়োর মাচা। অনেকখানি খোলা উঠোন। তিন দিকেই ঘর। দোতলা ঘরের সামনে তুলসী মঞ্চ। একটা

ঘরের সামনে উঠোনের ওপর দুটি ছোট মূর্তি অঙ্গভঙ্গি করছে। বোধহয় নাচছে। একজনের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। গায়ে পীতবাস। আর একজনের নীল শাড়ি, লাল জামা। মাথার চুল চূড়ো করা। তাতে টগরের মালা জড়ানো। বাজনদারদের দেখতে পাচ্ছি এক পাশে, মাদুরের ওপর। দাওয়ায় কারা বসে আছে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। বাইরে যারা দাঁড়িয়েছিল, তাদেরই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হচ্ছে ?'

'রাধা কিষ্টের যুগল নাচ হচ্ছে।' একজন বললো। কিন্ত নাচের চেয়ে তাদের অবাক জিজ্ঞাসু নজর এখন আমার দিকে।

ভিতরে প্রবেশ কী সমীচীন হবে ? না হবারই বা আছে কী। একটা অনুষ্ঠান তো হচ্ছে। উঁচু চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে গেলাম। বাগান পেরিয়ে, উঠোনে। গোবর মাটি নিকানো তকতকে উঠোন। কৃষ্ণকলি আর মাধবীর মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে। বেলা পড়ে এলো। এখন কৃষ্ণকলি মাধবীর ফোটার সময়। এবার দাওয়ার মানুষদের দেখতে পেলাম। পুরুষদের মধ্যে প্রধান হয়ে বসে আছেন একজন। মাদুরের ওপর দু পাশে তাঁর তাকিয়া। সমুখে গড়গড়া, তাতে নল। পুষ্ট গৌর অঙ্গটি নধর। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ নিটোল। মাথার ধূসর চুল ঘাড় অবধি লম্বা। মাঝখানে সিঁথি। কপালে রসকলি আঁকা। চোখ দুটি উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ন। মোটা হলেও নাক উঁচু। গলায় তুলসীর মালা। উপবীতও আছে। উর্ধ্বাঙ্গ মুক্ত। নিম্নাঙ্গে কচ্ছহীন গেরুয়া বস্ত্র। বয়স অনুমান ষাট। তুলনায় শক্ত পোক্ত। দেখলেই মনে হয়, ভোগী। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ইনি কি গোলকদাস বাবাজী ? তাঁর আশেপাশে বসে আছেন নানা বয়সের, আকৃতি ও বর্ণের বাবাজীরা। সকলের কপালে, গায়ে রসকলি আর নানা ছাপ।

পাশাপাশি আর এক ঘরের দাওয়ায় রমণীগণ। নানা বয়সের। কারোর গেরুয়া লাল পাড় শাড়ি। কারোর বা পাড়হীন। সাদা থানও আছে কারোর অঙ্গে। এমন কি সাধারণ গৃহস্থ সধবা বধূও। সকলেরই মাথায় ঘোমটা। অধিকাংশেরই কপালে রসকলি আঁকা।

এক লহমায় দেখা। কিন্তু ওদিকে বাজনার তালে গোল। নাচে ঠেক। সকলের দৃষ্টি আমার দিকে। আমার দিকে, আবার প্রধান পুরুষের দিকে। তাঁর গড়গড়ার নল থমকানো হাতে। ভ্রূকুটি চোখে অবাক জিজ্ঞাসা। চকিতেই বুঝে নিলাম, আমি এখানে কেবল বেমানান না। মূর্তিমান রসভঙ্গকারী। ঝটিতি খুলে সরিয়ে দিলাম পায়ের স্যাণ্ডেল। সকলের উদ্দেশ্যে কপালে দু হাত ঠেকালাম। প্রধান পুরুষ এক বাবাজীকে কী ইঙ্গিত করলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠে এলো আমার কাছে। চোখে ধন্দ, স্বরে সন্দ, 'কোথা থেকে আসছেন ? কিসের খোঁজে ?'

নিজের ঠিকানা জানিয়ে বললাম, 'গোলকদাস বাবাজীর দর্শনে এসেছি।'

'ওই যে বসে আছেন।' ঐ প্রধান পুরুষকে দেখিয়ে দিল। 'আসেন।' সমীহ করে হাত দিয়ে পথের ইশারা করলো।

আমি তাকে অনুসরণ করসাম। গোলকদাস বাবাজী নড়ে চড়ে বসলেন। চোখে এখন ভ্রূকুটি নেই। অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসা। আমি জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বললাম, 'একজনের কাছে শুনে আমি আপনাকেই দেখতে এসেছি। এখন এই যুগল নাচ দেখি, তারপরে কথা হবে।'

গোলকদাস প্রসন্ন হলেন। গড়গড়ার নল শুদ্ধ হাত তুললেন অভয় ভঙ্গিতে। বললেন, 'বস বাবা।'

বসে পড়লাম। ইঙ্গিত পেতেই, খোল করতালের বাজনা তাল ফিরে পেলো। রাধা কৃষ্ণের পায়ে এলো নাচের ছন্দ। কৃষ্ণের বয়স বছর দশেক। মুখে আর হাতে নীল রঙ মাখা। চোখে কাজল। কপালে গালে চন্দনের কারুকাজ। রাঙানো ঠোঁটে কেন একটা কৃষ্ণকলি ফুল বোধগম্য হলো না। দু' হাতে ধরা মোহন বাঁশি। রাংতা দিয়ে মোড়া, বাঁশির একটা মুখ মকরের না হাতীর, বুঝতে পারছি না। রাধা বোধহয় একটি বালিকা। বয়স সাত আট হবে। তার মুখে হাতে শাদা রঙ। ফুলের সাজই বেশি। একটি কৃষ্ণকলি ফুল তার ঠোঁটেও টেপা। কৃষ্ণ বোধহয় ত্রিভঙ্গ হতে গিয়েই, একবার বাঁ পা ডাইনে, আবার ডান পা বাঁয়ে করছে। করতে করতে ঘুরছে। রাধা পাশে পাশে দু হাত উত্তরীয় উড়িয়ে, একবার ডাইনে হেলছে। আবার বাঁয়ে। দুজনের পায়ের ঘুঙুর বাজছে। এই হলো নাচের ফর্মা।

ছেলেবেলায় দেখা কেষ্টযাত্রার কথা মনে পড়ে যায়। তার থেকে বেশি, অভঙ্গ বঙ্গের ঢাকা শহরের লক্ষ্মীনারায়ণজীউর বিশাল নাটশালার রাধাকৃষ্ণের নাচ। ঠিক প্রায় এমনটিই। তফাৎ, বাদকেরাও সঙ্গে নাচতো। কিন্তু সে-সবের কোনো বিশেষ উপলক্ষ থাকতো! এখানে আজ কিসের উপলক্ষ? বিশেষ এই চৈত্র মাসে? নিশ্চয়ই আছে কিছু। সব কি আর জানি।

তবে আসরের তেমন জমজমাটি ভাবটি নেই। দরজার কাছ থেকে যেমন দেখছিলাম। বাজনদারদের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে আমার দিকে। তাদের কিছু সঙ্গীরও। রমণী পুরুষ দর্শকরাও এই বিঘ্নটিকে মাঝে মাঝে দেখছিল। গোলকদাসের নলে ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ হচ্ছে। সামনে বসে, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।

পথ চলতে গিয়ে এই বা মন্দ কী। এসেছিলাম আড়াই শো বছরের পুরনো গ্রাম শ্রীপুর দেখতে। এটি উপুরি পাওনা। কিছুই নিরঙ্কুশ হারায় না। রাঢ়ের গঙ্গার কূলে এক আখড়া। তার উঠোনে দেখছি শৈশবের চিত্র। সেই মনটা নেই। কিন্তু অনেক স্মৃতি, অনেক মুখ ভেসে উঠছে। আর একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের কাছে আটকে থাকছে। নানা স্রোতে বহতা জীবন। তার নানা কূলে নানা নতুনকে পেয়েছি। এখন মনে হচ্ছে, হারিয়েছি বেশি।

প্রাপ্যে অনেক ফাঁকি। এমন করে ঘুরে ফেরায়, সেই পুরনো দিনের ঘণ্টা বাজে। মজেছিলাম যে অনেক আগেই। এ চিত্রও সেই এক রূপ। কৌতুকে হেসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কৌতুকের রঙ্গ দেখতে গিয়ে, মনটা ভারি হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ খোল করতাল থামলো। আমার পিছন থেকে গোলকদাস স্বর চড়িয়ে বলে উঠলেন, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

বাজনদারদের আসন থেকে, এক দাড়ি বাবাজী উঠে দাঁড়ালো, 'যে আমারে যেমনি ভজে আমি তারে তেমনি কৃপা করি।' সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা হলো। তারপরে, 'তাই মদনমোহন শ্রীরাধিকার মান ভাঙাবার জন্যে বিস্তর ব্যাগত্তা করলেন। তখন—।'

খোলে চাটি পড়লো তালে। নাচ তখন বন্ধ। রাধা সরে গেল একটু দূরে। ব্যাগত্তার মানেটা ঠিক বুঝলাম না। বোধহয় বিস্তর অনুরোধ উপরোধ। নাটকীয় মুহূর্ত। বাবাজী কথা ছেড়ে গেয়ে উঠলো, 'তখন মানিনী রাধারানী মান পাশরিলা/শ্রীরতিপতি মদনমোহন গলবস্ত্র হৈলা।'

কীর্তনের সুরে গান। কৃষ্ণ গলার উত্তরীয় দু হাতে ধরে জোড় হাত করলো। রাধা ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। এখন আর কোনো দর্শকের চোখ আমার দিকে নেই। সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখছে। গায়ক গাইলো, 'তথাপি শ্রীরাধিকা না চাহে নয়নে/এবে কৃষ্ণ পড়িলেন শ্রীমতীর চরণে।'

কৃষ্ণ রাধিকার পায়ে পড়লো। গায়ক গাইলো, 'কী কর কী কর নাথ/চরণে না দিও হাত/তুমি জগতের পতি/আমার পরম গতি/তোমার চরণে রাখ নাথ/'...

রাধা কৃষ্ণের পায়ে পড়লো। গায়ক গাইলো, 'উলসিত শ্রীহরি অঙ্গে রাধা যাঁচে/উভয়েতে কোলাকুলি মহানন্দে নাচে।'

খোল করতাল আবার আগের মতো বেজে উঠলো। কৃষ্ণ রাধাকে জড়িয়ে ধরে, জোড়ে নাচ শুরু করলো। এই নাচটা একটু ধেই ধেই ধেইতা নাচনের মতো। পিছন থেকে গোলকদাস আওয়াজ দিলেন, 'রাধে মাধব, রাধে মাধব!'...

রমণী পুরুষ সমবেত স্বরে প্রতিধ্বনি করলো, 'রাধে মাধব, রাধে মাধব।'

কেষ্টযাত্রার ঢঙ। কিঞ্চিৎ অভিনব গোলকদাসের শ্লোক। পালাটি নিশ্চয় অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। এবার গোলকদাসের সঙ্গে সবাই 'হরি হরি বল।'......অনুষ্ঠান শেষ। সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া নামছে। রাধা কৃষ্ণ কোন দিকে গেল, দেখতে পেলাম না। রমণী পুরুষেরা এদিক ওদিক উঠে গেল। একটি আলোর রেখা গায়ে পড়লো। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক রমণী। মাথায় ঘোমটা, হাতে প্রদীপ। মুখ দেখা যায়। শ্রীময়ী।

শ্রীঅঙ্গে ঢল ঢল, কিন্তু কাঁচা না, যৌবনের লাবণ্য। প্রদীপ নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে গেল উঠোনে। তুলসী মঞ্চের কাছে গিয়ে, প্রদীপ রেখে, জানু পেতে নত নমস্কারে যেন স'পে দিল। বাঁ দিকে শঙ্খধ্বনি। ফিরে দেখি, দাওয়ার নিচে নেমে আর এক রমণী শাঁখ বাজায়। তিনবারে শেষ। তুলসী মঞ্চ থেকে রমণী উঠে এলো। ঘরে গিয়ে ঢুকলো। গোলকদাস বিড়বিড় করে কী বললেন, শুনতে পেলাম না। ঘর থেকে সেই রমণীই আবার একটি হ্যারিকেন নিয়ে এলো। আমাদের সামনে রেখে, আবার ঘরে প্রবেশ।

গান বাজনা নাচের পর, হঠাৎই কেমন একটা নিঝুমতা নেমে এলো। গোলকদাস বললেন, 'ফিরে বস বাবাজী। কাছে এসে বস।'

ফিরে বসলাম। হ্যারিকেনের রক্তিম আলোয় গোলকদাসের অঙ্গে বেদনার রঙ। চোখে অনুসন্ধিৎসা। আমি বললাম, 'বড় অসময়ে এসে পড়েছি। আখড়ায় কি আজ কোনো উপলক্ষ ছিল নাকি?'

'যুগল নাচ দেখে বলছ?' গোলকদাস হাসলেন। অটুট দাঁতের পাটি দেখা গেল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না বাবা। ওটা সখ আহ্লাদের ব্যাপার। মাঝে মধ্যে ছেলে মেয়েদের সাজিয়ে একটু রাধাকৃষ্ণের নাচ দেখি। অসময়ের কী কথা। তা বল, এবার তোমার কথা শুনি। কোথা থেকে আসছ? নাম কী? কে তোমাকে আমার কথা বলেছে?' তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ম হলো।

নাম ধাম জানিয়ে বললাম, 'ডুমুরদর এক ভদ্রলোক, নাম অম্বিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'নাথ' অবিশ্যি আমি জুড়ে দিলাম। 'চরণ'ও হতে পারে। গোলকদাস বাবাজীর তীক্ষ্মদৃষ্টি। চোখে চিন্তার ছায়া। মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'ডুমুরদর অম্বিকানাথ? চেন নাকি নিতাই?'

দাওয়ারই এক পাশে ছায়া অন্ধকার থেকে পুরুষের স্বর শোনা গেল, 'মনে করতে পারছি না গুরুদেব।'

এত মনে করা করির কী আছে? বাঁড়ুজ্জে মহাশয় বলেছিলেন। কথা রাখলাম। আমার বিপত্তারণ বসে আছেন গোবিন্দজীউ স্বয়ং। অবিশ্যি প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে। ঘর থেকে ভেসে এলো রমণী স্বর। স্বরে কিঞ্চিৎ কৌতুকের সুর, 'গোঁসাই ঠাকুরের মনে নেই। দু' বছর আগে, রাসের সময় সেই একজন এসেছিল না? আখড়ায় দু'দিন ছিল। সেই যে গো—।'

'অই অই।' গোলকদাস হেসে বাজলেন, 'দেখ নিতাই, মনোহরার ঠিক মনে আছে। সেই মাতাল নাস্তিক বামুন। তবে শাস্ত্রজ্ঞান টনটনে। শ্রীমদ ভাগবত গীতাখানি প্রায় মুখস্ত বলেছিল।'

নিতাই অন্ধকার থেকে বলে উঠলো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। তুলসী ঠাকুরুণের টিয়ে পাখি যে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণের জীবকে নাকি খাঁচায় পুরে রাখতে নেই।'

ঘরের মধ্যে দুই তিন রমণীর রিনি ঠিনি হাস্য শোনা গেল। কাছে পিঠেই আছে অনেকে। দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখে, পলকের জন্য ভেসে উঠলো বনশিউলির ঝাড়ে সেই রাগী বুলবুলি মা। প্রকৃতির গভীরে যিনি জীবলীলা দেখেন, খাঁচার পাখির মুক্তি তাঁর হাতেই। গোলকদাস আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'তা বাবা, তুমি আসছ কলকাতা থেকে। ডুমুরদহর অম্বিকার সঙ্গে তোমার দেখা হল কোথায় ?'

জিজ্ঞাসায় যেন সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসা। বললাম, 'ঘুরতে ঘুরতে ডুমুরদহর গেছিলাম, পথে দেখা হয়ে গেল। শ্রীপুরে আসছি জেনে আপনার কথা বললেন।'

'শ্রীপুরে কেন ? আমার কাছে ?' গোলকদাসের চোখের দৃষ্টি আমার বুকে বিঁধছে।

বললাম, 'শ্রীপুরে এসেছিলাম একটু ঘুরে দেখতে। আপনার আখড়াও দেখা হলো।'

'ঘুরে দেখতে ? কী ঘুরে দেখতে ?' গোলকদাসের স্বরে নিবিড় ঔৎসুক্য।

ঐখানেই ঠেক। বড় ব্যাজ। বাধা। বললাম, 'যা বলেন। পুরনো গ্রাম, দেব দেউল মন্দির মানুষ, এইসব আর কি।'

'এই সব দেখে বেড়াও ?' গোলকদাসের ঔৎসুক্যে, এবার যেন রহস্যের ঝলক। হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনটা তুলে ধরলেন আমার মুখের সামনে। দেখলেন তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসায়।

এ আবার রাধে মাধবের কী রহস্য ? যেন পুলিশের গোয়েন্দার সামনে, চোর দায়ে ধরা পড়েছি। এবার কি আরও জিজ্ঞাসাবাদ ? তৎপরে ধোলাই ? গোলকদাসের ঠোঁটে হাসি। মাথা ঝাঁকালেন আস্তে আস্তে, 'কিন্তু তুমি তো বাবা মাতাল নাস্তিক নও।'

মাতাল না হতে পারি। নাস্তিক নই, তা কী করে বুঝলেন ? জবাবের প্রয়োজন নেই। কিন্তু এবার দয়া করে হ্যারিকেনটা সরান। গোলকদাস আবার মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, হুঁ, বুঝেছি। খুঁজছ, পাচ্ছ না।' সেই অটুট দাঁতের হাসি। হ্যারিকেনটা নামিয়ে রাখলেন।

এবার আমার মস্তিষ্কে ঝংকার। গোলকদাসের চোখের দিকে তাকালাম। তিনি হেসে মাথা ঝাঁকালেন। চোখ বুজলেন, 'রাধে মাধব। সব তোমার ইচ্ছে।'

মস্তিষ্কের ঝংকারটা লেগেছিল, 'খুঁজছ পাচ্ছ না' কথায়। কিন্তু ওঁর খুঁজে না পাওয়ার নিরিখটা বোধ হয় ভিন্ন গোত্রজাত। এ সব কথা ভাবের মানে কোনো দিন বুঝতে পারিনি। রহস্য জানার ব্যগ্রতাও নেই। অতএব, আমারও রাধে মাধব। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে বললাম, 'আজ তা হলে উঠি।'

'কোথায় ?' গোলকদাসের চোখ জোড়া বড় হলো। কপালে কিলবিল রেখা।

বললাম, 'কোথাও একটা আস্তানা দেখে নেবো।'

'তাই কখনো হয়?' ঘরের ভিতর থেকে রমণী স্বর শোনা গেল, 'এখানে এসে আবার অন্য আস্তানার খোঁজ?'

গোলকদাসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এক জায়গায় ব্যবস্থা আছে।'

'তা বললে হয় না গোঁসাই ঠাকুর।' রমণী স্বরে আপীলের সুর, 'ডুমুরদর সেই বামুন ঠাকুর পাঠিয়েছে। চলে যেতে দেওয়া যায় না।'

আমার দৃষ্টি গোলকদাসের দিকে। গোলকদাস হাসলেন, 'পাবে পাবে। খোঁজা বৃথা যাবে না। নিতাই!'

'বলেন গুরুদেব।' নিতাই এবার অন্ধকার ছেড়ে আলোয় এলো। মাথায় বড় বড় চুল। মুখে গোঁফ দাড়ি। কচ্ছহীন গেরুয়া কোমরে। গলায় তুলসী মালা, আর উত্তরীয়। সুস্বাস্থ্য, কৃষ্ণকান্ত, নবীন বৈরাগী। গোলকদাস বললেন, 'মনোহরা যা বললে, তাই কর। এর হাত মুখ ধোবার ব্যবস্থা দেখ। আমি পুজো আরতিটা সেরে আসি। ভামিনী কি মন্দিরে গেছে গো?'

'গেছে।' ঘরের ভিতর থেকে রমণী স্বরের জবাব।

যে-কোনো হট্ট মন্দিরেই থাকতে রাজি আছি। কিন্তু রাধে মাধব! কী খুঁজছি, কী পাবো? আজ পর্যন্ত নিজে মালুম পেলাম না, আদৌ কিছু খুঁজি কী না। গোলকদাস সর্বজ্ঞ হয়ে কী প্রাপ্যের বাত দেন? হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে একটু চাপ দিলেন। দিয়ে গাত্রোত্থান করলেন, 'হাতে মুখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস। আরতির সময় মন্দিরে এস।' মাদুরের বাইরে রাখা খড়ম জোড়া পায়ে দিলেন।

দরজায় আবির্ভূত হলো রমণী মূর্তি। চিনতে অসুবিধা হলো না। প্রদীপ হাতে গিয়েছিল তুলসী মঞ্চে। গোলকদাস দাওয়া থেকে নামতে নামতে বললেন, 'মনোহরা, তুমি এখানেই থাক। ব্রজ কোথায়?'

'পুবের ঘরে আছে।' মনোহর জবাব দিল।'

গোলকদাসের আবছা মূর্তি উঠোনে, 'একটু সাবধানে থাকতে বল। রঘু যদি এর মধ্যে আসে, খেদিয়ে দেয় না যেন। বসিয়ে যেন কথা বলে। আখড়ায় হই হল্লা ভাল লাগে না।'

'আমি আছি ঠাকুর ভাববেন না।' মনোহরার স্বরে প্রত্যয়, 'তিলকাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি ব্রজর কাছে।'

উঠোনে খড়মের শব্দ পুবের দিকে গেল। ওদিকেই দোতলা ঘর। একতলা ঘরও বোধহয় আছে। এ ঘর দক্ষিণ দ্বারী। পশ্চিমেও ঘর আছে। সেদিকে কোথায় একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখতে পাচ্ছি, কারা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। নিতাই এগিয়ে এসে বললো, 'তা হলে জামা টামা ছাড়েন বাবুজী। পুকুরে যাবেন?'

'তোমার কি মাথা খারাপ বাবাজী?' মনোহরা দরজার বাইরে এসে

নিতাইয়ের দিকে তাকালো, 'অচেনা জায়গা, নতুন মানুষ। তাকে নিয়ে পুকুরঘাটে যাবে? বাঁধানো ঘাট থাকলে কথা ছিল। বাতি দেখিয়ে চাতালে নিয়ে যাও।' স্বরে প্রায় আদেশ।

নিতাই বললো, 'ঠিক বলেছ দিদি।'

গোলকদাসের কথাটা মিথ্যা না। শরীরের প্রতি রোমকূপে জলের তৃষ্ণা, তৃষ্ণা গলায় বুকেও। কিন্তু এখানে এখন জামা খুলে খালি গা হতে পারবো না। হাতে পায়ে ঘাড়ে গলায় জল ছোঁয়ালেই শান্তি। কাঁধের ব্যাগটা আগেই নামিয়েছিলাম। মনে নানা প্রশ্ন। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথা মনে পড়ছে, 'সহজিয়া বৈষ্ণব। প্রকৃতি আছে।' এই মনোহরা কি গোলকদাসের প্রকৃতি? কিন্তু রমণীর স্বরে আর রূপে স্বাস্থ্যে একটা শালীনতা আছে। ব্যক্তিত্বও।

'গামছা দেব?' মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'ধোয়া পরিষ্কার গামছা আছে।'

আমি মনোহরার দিকে তাকালাম। তার লাল পাড় গেরুয়ার ঘোমটা আরও খানিক ওপরে উঠেছে। কালো চুলের মাঝখানে সিঁথিতে সিঁদুর আছে কি না, বুঝতে পারছি না। শরীরের গঠন দোহারই বলতে হবে। ডাগর চোখজোড়া কি এমনিতেই কালো? না কি অঞ্জনের টান? কপালে নিখুঁত রসকালি আঁকা। ঠোঁট দুটি নিশ্চয়ই তাম্বুলরঞ্জিত। বয়স? তার নির্ঘাৎ হিসাব তো চোখে মুখে শরীরে লেখা নেই। পড়তেও জানি না। যুবতী মনোহরা নিঃসন্দেহে। বললাম, 'সাবান গামছা আমার আছে।'

'তা তো থাকবেই।' মনোহরার ঠোঁটের কোণে সৌজন্যের হাসি, 'ঝোলা ঝোলার দরকার কী? সাবান অবশ্য দিতে পারব না। গামছা দিতে পারব। পরবার কাপড়ও দিতে পারব।'

কাপড়ের ঝোলা থেকে গামছা সাবান টেনে বের করলাম, 'থাক। এ ধুতিটা রাত্রে ছেড়ে শোব।'

'মন্দিরে যাবেন কী পরে?' মনোহরার ভুরু জোড়া লতিয়ে উঠলো। চোখে অবাক দৃষ্টি, 'এই কাপড় পরে?'

তাও তো বটে। সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছি। পাট ভাঙা ধুতি এখন দলা মোচড়া ধুলো ধূসর। পবিত্র মন্দিরে পরে যাওয়া যায় না। বললাম, 'পাজামা পরে মন্দিরে যাওয়া যাবে?'

মনোহরা হেসে উঠে, ঠোঁটে হাত চাপা দিল। হাতে রুপার বালা। প্রবালের রঙের রেখা শাঁখায়। ফিরে তাকালো ঘরের দিকে। সেখান থেকেও হাসি ভেসে এলো। নিতাই আওয়াজ দিয়ে হাসলো, 'পাজামা পরে মন্দিরে যাবেন বাবাজী? ধুতি নেই?'

'থাকলেই পরতে হবে নাকি?' মনোহরার হাসিটা তখনও ঠোঁটে চোখে ঢেউ দিচ্ছে, 'ধোয়া থান দিতে পারি। এরকম শাড়ি চান তো, তাও দিতে পারি।' নিজের আঁচল টেনে দেখালো।

দেখছি রমণী প্রকৃতই প্রকৃতি। সে তো কেবল রূপে না। কথায় আচরণেও। আঁচল দেখাতে গিয়ে অঙ্গের গেরুয়া আবৃত প্রকৃতি উচ্চ শৃঙ্গে প্রকাশ পায়। মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'থান কাপড়ই দেবেন। জামাটাও কি ছাড়তে হবে?'

'কেন থানই গায়ে জড়ালে হবে। মনোহরার হাসি এখন ঠোঁটে টেপা, 'কিন্তু থান পরবেন?'

'অসুবিধে কিসের?'

'ছেলেমানুষ বয়েস।' মনোহরার কালো চোখে কি নজর বাঁকা?

গামছা সাবান নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, 'ছেলেমানুষ নই, বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে।'

'তা হলে তো অনেক বয়স হয়েছে।' মনোহরা আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দেখলো। এক মুহূর্ত চোখে চোখ রাখলো। প্রকৃতির চোখ, সর্বকালের। হেসে বললো, 'তবে রঙ ধরেনি, এই যা। নিয়ে যাও নিতাই ভাই।'

নিতাই হ্যারিকেনটা হাতে তুলে নিল। মুহূর্তেই আমার বুকে ধড়াস। স্যাণ্ডেল জোড়া যে বাগানের সীমানায় রেখে এসেছিলাম। আছ তো? নতুন কেনা, পথে ঘাটে ঘোরবার জন্য শক্তপোক্ত। বললাম, 'আমার স্যাণ্ডেল রেখে এসেছিলাম ওদিকে।'

'রেখে এলে আছে।' মনোহরা সহজ করে বললো, 'নিতাইয়ের সঙ্গে যান।'

নিতাই আলো নিয়ে দাওয়ার নিচে নামলো। কিন্তু আলো দেখাবার দরকার ছিল না। চাল ঢাকা দাওয়ার বাইরে এসে দেখছি, উঠোনের অর্ধেক জুড়ে জ্যোৎস্নার আলো। আজ শুক্লা অষ্টমী। শহরে বিজলী আলোয়, অষ্টমী কেন, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকেও চোখে পড়ে না। গ্রামে অষ্টমীর চাঁদ যেন ফুটফুটে জ্যোৎস্না। এখনও পশ্চিম মুখো ঘরের চালের ওপর চাঁদ, দেখা যায় না। দু তিনটি গাছের লম্বা ছায়া পড়েছে। বন্দী বাতাস এখন মৃদু মন্দে মুক্ত। কৃষ্ণকলি আর মাধবীর ঘন গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর এই চৈত্রের জ্যোৎস্না রাত্রিও কুহু কুহু ডাকে আর্ত বিরহী। দেখলাম, যেখানকার স্যাণ্ডেল সেখানেই আছে। মনে মনে লজ্জা পেলাম। কিন্তু গেলে, এই দূরান্তে অসুবিধায় পড়তে হতো। পায়ে গলিয়ে নিলাম। ঘরের দাওয়ার দিকে একবার দেখলাম। মনোহরাকে দেখতে পেলাম না। নিতাই দক্ষিণেই গেল। পাশাপাশি দুই ঘরের মাঝখানে সরু ফালি। সেই ফালি পথে, আরও দক্ষিণে। পিছনে অনেকখানি জায়গা। পুবে দোতলায় লাগোয়া একটি ঘর। সামনে দুই মস্ত ধানের মরাই। নিতাই আরও এগালো। মরাইয়ের পিছনে লম্বা চালায় অল্প ধোঁয়া উঠছে। গন্ধে টের পেলাম গোয়াল ঘর। হ্যারিকেনের অল্প আলোয় কয়েকটি গাভী চোখে পড়লো। সম্পন্ন আখড়া। ডান দিকে উঁচু বেড়া। বেড়ার গায়ে উচ্ছের লতা জড়িয়ে উঠেছে। দক্ষিণে মাটির পাচিলের

গায়ে দরজা। নিতাই বেড়ার আড়ালে নিয়ে গেল।

চমৎকার। চাতাল তো, সত্যিই চাতাল। শান বাঁধানো। কুয়োটিও শান বাঁধানো। কপিকলের সঙ্গে দড়ি বালতি রয়েছে, কুয়োর উঁচু চওড়া পাড়ে। কিন্তু জল তোলবার দরকার ছিল না। দুটো বড় বালতি ভরা জল। সামনে পেতলের ঘটি। কুয়োর গায়ে এক ধাপ সিঁড়ি। নিতাই সেখানে হ্যারিকেন রাখলো। 'আপনি হাত মুখ ধোন, আমি বাইরে আছি।'

তার বাইরে যাবার কোনো দরকার ছিল না। আমার আড়াল দরকার নেই। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় হ্যারিকেনটা নিষ্প্রভ। সাবান রাখলাম নিচে। স্যাণ্ডেল খুলে রাখলাম দূরে। গামছাটা এদিক ওদিক করে, রেখে দিলাম কুয়োর পাড়ে। হাঁটুর ওপরে কাপড় গুটিয়ে, জামার হাতা তুলে দিলাম। ঘটিতে জল ভরে, চোখে মুখে দিতেই প্রাণ শীতল। জলটা বেশ ঠাণ্ডা, স্পর্শেই শরীর জুড়িয়ে গেল। হাতে মুখে সাবান দিয়ে, যতোটা সম্ভব ধৌত হলো। মাথায়ও অল্প বিস্তর ছিটিয়ে দিলাম। গামছা টেনে নিয়ে মুছতে মুছতে, বেড়ার—ও পারে রমণী পুরুষের স্বর ভেসে এলো। পুরুষটি নিতাই। রমণী কে? মনোহরা না। অন্য কোনো প্রকৃতি-হবে। শুনতে পাচ্ছি, রমণী স্বর, 'পুরুষ মানুষের মতন হলে কথা ছিল। ঘর থেকে বেরব না।' নিতাইয়ের স্বর, আহা, সে মানুষ তো খারাপ নয়। তুমি তার ইস্তিরি। সে তো গাঁয়ে গাঁয়ে রটিয়ে বেড়াচ্ছে না, বউ তাকে ছেড়ে গেছে। বলে নাই, নষ্ট হয়ে গেছে।' রমণী স্বর, 'তা হোক, আমি তো আর ঘরে ফিরছিনে।'

এ আবার কী প্রকারের বাক্য বিনিময়? রমণী কি গৃহত্যাগিনী। সেইরকমই ধ্যান দেয় যেন উভয়ের আলাপে। কিন্তু আমার কী দরকার। একটা রাত্রি কাটানো। এক হাতে সাবান গামছা। অন্য হাতে হ্যারিকেন নিয়ে বেড়ার বাইরে এলাম। নিতাই এলো ছুটে, 'আহা, বাবাজী বলবেন তো।'

পুবের হাওয়া থেকে এক রমণী মূর্তি ঘরের মধ্যে চলে গেল। নিতাই আমার হাত থেকে হ্যারিকেন নিল। এবার মহাপ্রাণী গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। সেই কোন্ বেলায় চিঁড়ে মুড়াক চিবিয়েছিলাম। এখন আর জল ঢাললেও ফুলবে না। চায়ের কথা মনে হতেই, মোতাতটা খা খা করে উঠলো। অন্ততঃ একটু চা পেলেও শান্তি। কিন্তু আখড়া স্থান। পূজা আরতি আছে। তার আগে কি কিছু জুটবে?

নিতাইয়ের পিছু পিছু ঘরের দাওয়ায় এসে উঠলাম। নিতাইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'স্যাণ্ডেল কি নিচে রাখতে হবে?'

'দরকার নেই।' মনোহরা একটা লম্ফ নিয়ে দরজায় এলো, 'দাওয়ায় এক পাশে রেখে দিন। ঘরের ভেতরে আসুন।'

মনোহরার ভাষায় পরিচ্ছন্ন বাঁধুনি। আখড়া বোষ্টমীকে যেন মানায় না। সে লম্ফটা এনে দাওয়ায় রাখলো, 'নিতাই ভাই, হ্যারিকেনটা আমাকে দাও। লম্ফটা গন্ধবাবাজীকে দিয়ে এসো।' হ্যারিকেনটা নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

গন্ধবাবাজী! এমন নাম কখনও শুনিনি। ঝোলাটা মাদুরের ওপর দেখতে পাচ্ছি না। ঘরের মধ্যে পা দিলাম। ঘর বেশ বড়। ডান দিকে বড় তক্তপোষের ওপর নিটোল শয্যা বিছানো। তার ওপরেই আমার কাপড়ের কাঁধ-ব্যাগ। একটা পাট করা কালো পাড় ধুতিও। আমার ঝোলা থেকে বের করেছে নাকি? মনোহরা হ্যারিকেনটা তুলে, চালের গা থেকে ঝোলানো লোহার আংটায় ঝুলিয়ে দিল। ব্যবস্থা সব পাকা। আমার দিকে ফিরে বললো, 'একটা ধুতির ব্যবস্থা হয়েছে। ওই কুলুঙ্গিতে আয়না চিরুণি আছে। কাপড় বদলান, আমি বাইরে আছি।' মনোহরা দরজার দিকে গেল। আমি না বলে পারলাম না, 'ধুতি তো আমার কাছেও ছিল।'

'না হয় আমার যোগাড় করাটাই পরলেন।' মনোহরা দরজার একটা পাল্লা টেনে, নিজেকে অর্দ্ধেক আড়াল করলো। অর্দ্ধাঙ্গ আলোয়। ঠোঁটের কোণে হাসি, চোখের তারা অচঞ্চল, 'কত ধুতি আর নিয়ে বেরিয়েছেন। নিজেরটা থাক। বরং ধুতি জামা খুলে দিন। আজ রাত্রে কেচে দিলে, সকালের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।'

ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, কাচাকাচির দরকার নেই।'

মনোহরা আর একটা পাল্লা টানলো। মুখ ভিতরে। ঘোমটা খসা। চুলে বোধহয় খোঁপা বাঁধা। বললো, 'আগে ছাড়ুন, পরে দেখা যাবে।'

দরজাটা বন্ধ হয় গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। শ্রীপুরের ঠেক কোথায় এসে ঠেকলো। সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়লো। এখন আর তা বৃথা। ঘরের মধ্যে হালকা চন্দনের গন্ধ। ধূপকাঠি জ্বলছে কিনা, বুঝতে পারছি না। জামা গেঞ্জি খুলে ফেললাম। ঝোলা থেকে একটা অয়্যার বের করলাম। মনোহরার দেওয়া ধুতি জড়িয়ে নিলাম। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পয়সার ব্যাগ, সিগারেট দেশলাই, ছোট নোটবুক আর কলম বের করলাম। তারপরে ছাড়া জামা কাপড়গুলো কোনোরকমে ভাঁজ করে, পুরে দিলাম ঝোলায়। ধুতি গুছিয়ে পরে, অর্দ্ধেক গায়ে জড়িয়ে নিলাম। নিজের চিরুণি বের করে কুলুঙ্গির কাছে গেলাম। ভিতরে ছোট একটি আয়না। মুখ দেখা যায় অস্পষ্ট। বাতি নেই। মাথা আঁচড়ে নিলাম। সরে এসে দরজা খুললাম।

দরজার একপাশে মনোহরা। পাশে আর এক প্রকৃতি। চোখ মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। দুজনে নিচু স্বরে কিছু বলছিল। দরজা খুলতেই মনোহরা বললো, 'হয়েছে? বাইরে বসবেন, না ঘরে?'

বললাম, 'বাইরেই বসি।'

'তুই তা হলে যা। সেরকম বুঝলে আমাকে ডাকিস।' মনোহরা অন্য রমণীকে বললো। তারপরে আমার দিকে তাকালো, 'ঘরেই বিছানায় একটু আরাম করে বসুন। আমি আসছি।'

বললাম, 'ইয়ে, একটা কথা—।'

মনোহরা যেতে উদ্যত হয়ে ফিরে তাকলে, 'কী?'

সংকোচ কাটাতেই হলো। নেশার মৌতাত তো! বিব্রত হেসে বললাম, 'একটু চা পাওয়া যাবে?'

'দেখি।' মনোহরার ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি লাগলো। চোখে ঠোঁটে হাসির ছটা, 'পাওয়া যাক বা না যাক, মুখচোরা হয়ে থাকবেন না। একটু মুখ খসাবেন।' সে উঠোনের জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

আরাম করতে ইচ্ছা করছে সত্যি। পরিচ্ছন্ন বিছানাটা দেখে লোভও হচ্ছে। কিন্তু সহজ হওয়া সহজ না। একটা সিগারেট ধরিয়ে, তক্তপোষে বসলাম। লক্ষ গেল পুবের দেওয়ালে বন্ধ জানালা। অনুমান, ঐ দিকে গঙ্গা। জানালার খিলটা খুলে ফেললাম। কাঠের গরাদ। সামনে খানিকটা খোলা জায়গা। ঘরের ছায়ায় অন্ধকার। তারপরে ঝোপ জঙ্গল, গাছপালা। ফাঁকে ফাঁকে নদীর দূরে স্রোত দেখা যায়। সেই পুবে যেখানে জ্যোৎস্নার কিরণ স্রোতে গলছে। ঝিঁঝিঁর ডাক। রাত্রের গ্রামের স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে মাঝে মাঝেই কুহু আর কুহু।

সম্ভবতঃ আমিই চমকাই। যা নিজবাসে আদৌ শুনতে পাই না, সেই লাল চোখ কালো পাখি এখানে রাত্রেও ডাকে। জ্যোৎস্নার আলো আঁধারি। দূরে নদীর বাঁকা স্রোতে ঝিলিক। মাধবী কৃষ্ণকলির সঙ্গে আরও কিছু বনজ গন্ধ। চৈত্রের উতলা বাতাস। সর্বচরাচরে এক স্বপ্নিল মহিমা। স্থান কাল ভুলে যাই। হারিয়ে যাই এক অজানা কালের গভীরে। অবাক মুগ্ধ প্রাণে কী একটা আবেগ চুঁইয়ে আসে। ভিজিয়ে দেয় মন। ভালো লাগার মহত্ত্বটা বুঝতে পারি, একটা আর্ত অনুভূতির মধ্যে।

টের পাই নি, মনোহরা কখন ঘরে ঢুকেছে। হাতের সিগারেট পুড়ে যাচ্ছিল। গায়ের কাছে সামান্য স্পর্শে ফিরে তাকাই। মনোহরা আমার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখ তুলে দেখছে আমার দিকে। ঘোমটা খসা। এলো খোঁপা ভেঙে নেমেছে কাঁধে। চিনতে ভুল করি না। কিন্তু সেই অজানা কালের গভীরে দাঁড়িয়ে কোনো কথা বলতে পারিনা। মনোহরার চোখে যেন অবাক অনুসন্ধিৎসা। স্বর প্রায় চুপিচুপি, 'কী হয়েছে বাবাজী?'

মুহূর্তে ফিরে পাই নিজেকে। জানালার কাছ থেকে সরে এসে বলি, 'কিছু না।'

'কিছু তো বটেই।' মনোহরাও হেসে সরে গেল। হাতে তার পেতলের

রেকাবি, 'স্বপ্ন দেখছিলেন নাকি ? নাকি কারোর জন্য মন কেমন করছে ?'

মন কেমন করছে নিঃসন্দেহে। তবে কারোর জন্য না। এ নিজের জন্য নিজের মন কেমন করা। বললাম, 'না। অনেককাল এমন রাত্রি দেখিনি। স্বপ্ন বলতে পারেন।'

'দেখে মনে হল নিশিতে পেয়েছে আপনাকে। কিন্তু এত কষ্ট কিসের বাবাজী ?' মনোহরার ঠোঁটে হাসি। চোখে এখনও অনুসন্ধিৎসা।

হেসে বললাম, 'কষ্ট কোথায় ? আনন্দ বলুন।' সরে গিয়ে তক্তপোষে বসলাম।

'তাই হবে হয় তো।' মনোহরার ঠোঁটে টেপা হাসি। চোখে ছটা, 'সব কি আর বুঝতে পারি ? এখন একটু খেয়ে নিন।' রেকাবিটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

দেখলাম অপর্যাপ্ত কিছু না। দুটি মালপোয়া। বললাম, 'একটু চা হলেই হতো।'

'পাবেন।' মনোহরা চোখ আমার চোখের ওপর 'এই খেয়ে একটু জল খেয়ে নিন।'

আমি রেকাবিটা হাতে নিলাম। মনোহরা সরে গেল ঘরের এক কোণে। সেখানে মেটে কলসী ঘাসের বিড়েয় বসানো। এক খণ্ড কাঠের ওপর কয়েকটা মাজা থালা গেলাস। সে গেলাসে জল গড়াচ্ছে। আমি উঠে জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলে দিলাম জানালার বাইরে। মালপোয়া তুলে মুখে দিলাম। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা। মিষ্টি রসে ভেজানো। মুখের রসে আরও ভিজে গেল। মনোহরা জলের গেলাস নিয়ে দাঁড়িয়ে, 'একটা আসন পেতে দেওয়া হল না।'

বললাম, 'গেলাসটা মাটিতে রাখুন না।'

'দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। আমিও দাঁড়াই।' মনোহরার চোখের অনুসন্ধিৎসা আর ঘোচে না।

দুটো মালপোয়া প্রায় দুই গ্রাসেই শেষ। খালি রেকাবি মাটিতে নামিয়ে দিলাম। মনোহরা এগিয়ে এসে জলের গেলাস বাড়িয়ে দিল। বাইরে থেকে রমণী স্বর শোনা গেল, 'চা এনেছি।'

'ভেতরে নিয়ে আয়।' মনোহরা ডাকলো। জলের গেলাস তুলে দিল আমার হাতে। ঠাণ্ডা জলের মিষ্টি স্বাদ। সেই কুয়োর জলের স্বাদ। এক চুমুকেই শুষে নিলাম। ক্ষুধা তৃষ্ণার তৃপ্তি। দেখলাম সাদা জমি সবুজ পাড় শাড়ি পরা এক রমণী। রঙ মাজা, গোল মুখ। নাক বোঁচা, ভাসা চোখ। গলায় তুলসীর মালা, কপালে রসকলি। একেবারে নিরাভরণা। মাথায় ঘোমটা নেই। মনোহরার থেকে বয়স অনেক কম। অনুমান অনধিক বিশ। লজ্জাবনত মুখ, ভঙ্গিতে জড়তা। হাতে চায়ের গেলাস। দেখে

মনে হয় কুমারী। তাই কী? না কি কোনো গোঁসাইয়ের প্রকৃতি?

মনোহরা তরুণীর হাত থেকে চায়ের গ্লাস নিল। তরুণী চকিতের জন্য একবার চোখ তুলে দেখলো। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল বাইরে। পরিচয় জিজ্ঞেস করা অশালীন। মনোহরাও সেদিকে গেল না। চায়ের গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'নিন, বিছানায় বসে চা খান।'

একেবারে দুধেল চা। জলের থেকে দুধ বেশি। তবু চুমুক দিয়ে শান্তি। কারণ দারুচিনি লবঙ্গ আদা মেশানো নেই। তেমনও হয়। চায়ের নামে এক প্রকার গোদুগ্ধের পাচন। মনোহরাও বসলো তক্তপোষের এক এক ধারে। ওপরে ঝোলানো হ্যারিকেনের আলো তার মুখে বুকে কোলে। ভেঙে পড়া খোঁপাটা আর জড়ায়নি। চিকুর হানা ঝিলিক দিল ঠোঁটে, 'গায়ে কাপড় জড়িয়ে মানিয়েছে ভাল। কপালে রসকলি ছেপে দিলেই হয়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

'বলুন।'

'বাবাজীর কী কাজ করা হয়?' মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

এই বড় ব্যাজ। হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মনোহরার সহজ কথা, 'শুনলাম তখন, ঘুরে বেড়িয়ে গ্রাম দেব দেউল মানুষ দেখা হয়। তবু, কাজ তো কিছু আছে?'

হেসে বললাম, 'ওটা কি কোনো কাজ নয়?'

মনোহরা ঘাড় সোজা করে তাকালো। হেসে বললো, 'বলতে ইচ্ছা না করলে, জোর করব না। মিছে কথা শুনতে ইচ্ছে করে না।'

মনোহরার ঠোঁটে চোখে একটু ছায়া ঘনালো। তা হলে সত্যি কথাটাই বলতে হয়। বললাম, 'একটু আধটু লেখালেখি করি।'

'বই?' মনোহরার কালো ডাগর চোখ উজ্জ্বল হলো।

চায়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললাম, 'তাই বলা যায়।'

'তা হলে তো বাবাজী সহজ মানুষ নয়।' মনোহরার চোখের তারা নিবিড়, 'আমাদের জ্ঞান গম্যির বাইরে। তাই বুঝি এই ঘুরে বেড়ানো?'

বললাম, 'না, ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে।'

'পেছু টান নেই?' মনোহরা আবার ঘাড় কাত করলো।

বললাম, 'প্রচণ্ড।'

'সত্যি?' মনোহরা হেসে বাজলো। আর তারই উচ্ছ্বাসে গেরুয়া আঁচল খসলো, 'প্রচণ্ড? দেখে মনে হয় ঘুরে বেড়াতেই মন মজে আছে। এমন কেন?'

বললাম যে 'ভালো লাগে।'

'উঁহু।' মনোহারা ঘাড় নাড়লো, 'আরো কিছু আছে। এত দাগা কিসে লাগল?'

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'দাগা ?'

মনোহরা ঘাড় ঝাঁকালো, 'হ্যাঁ। দাগা খাওয়া মুখ দেখলে চেনা যায়।'

বললাম 'তাই বুঝি ? আমি তো জানি নে।'

'মিছে কথা ভারি খারাপ।' মনোহরা ঘাড় নাড়লো। নিজের বুকে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'তোমার ওখানটা জানে। এত ঘুরে বেড়িও না বাবাজী, কোথাও একটু শান্ত হয়ে বস।'

আপনি থেকে ঝপ্ তুমি। এতক্ষণে এই হয় তো তার সহজ সম্বোধন। কিন্তু মনোহরার রূপসী মুখের হাসিতে বিষণ্ণতা। এও প্রকৃতির লীলা ? মুখ দেখে সে দাগার দাগ দেখতে পায়। হাসিতে ছায়া পড়ে। তার জীবনের কী অভিজ্ঞতা জানি না। কথা কইতে জানলেই হয়। মানতে হবে, সংসারে তবে দাগা লাগেনি, এমন মানুষ কোথায় ? অনাহার অপমান ঈর্ষা প্রত্যাখ্যান, লাঞ্ছনা যতেক, সে যদি দাগা খাওয়া, তবে আমি তাই। তাই চলো মন রূপনগরে। রূপের ফেরে ফিরি। বসে থাকার ঠাঁই খুঁজিনি কোথাও। রূপনগরে সুধা আছে। সন্ধান সেই সায়রে। শান্ত হয়ে বসতে পারিনি কোনো দিন। চোখ তুলে তাকালাম। মনোহরা অপলক চোখে তাকিয়ে। নিঃশ্বাস যেন তার বন্ধ, বুকের কাছে ঠেকে আছে। আমি হেসে মাথা নাড়লাম, 'বসবার সময় নেই, ঠাঁইও নেই।'

'কেন ? কী কষ্ট ?' মনোহরার স্বরে উদ্বেগ। সে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে।

বললাম, 'কষ্ট নয়। রূপের টানে ফিরি।'

'রূপের টানে ?' মনোহরা যেন অস্থির হয়ে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। স্বর তার রুদ্ধ, 'সেটা বুঝি তোমার কষ্টের উলটো দিক ?'

তাকালাম চোখ তুলে। মনোহরার নিঃশ্বাসের উষ্ণ মৃদু স্পর্শ আমার মুখে। চোখের কোণ কি তার চিকচিক করে ? এই রমণীর জীবন বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। অথচ মনে হয়, কোথায় একটা চেনাচেনি আছে। কী অবিশ্বাস্য। হেসে বললাম, 'আনন্দ পাই।'

মনোহরা ডান হাতে আমার মাথা স্পর্শ করলো, 'তাহলে আর তুমি শান্ত হয়ে বসবে কেমন করে। এত যখন কষ্ট।'

আমি বলি আনন্দের কথা। সে উল্টো ভাবে। সত্যি তার চোখের কোণে বিচ্ছু টলটল। আমার চুল টেনে ধরলো আলগোছে। যে চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলাম ঘরে, সেটা এখন মনোহরাকে ঘিরে নিবিড়। প্রকৃতির ঢলঢল লাবণ্য আমাকে স্পর্শ করে। আমারও যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। সে সরে গিয়ে, হাত বুলায় চোখে। হেসে বললো, 'তোমাকে প্রথম দেখেই কেমন খটকা লেগেছিল। কথা শুনে আরোই বেশি। যেই যাবার কথা বললে, তখনই আটকে দিলাম। তুমি নিজেও দাগাবাজ আছ বাবাজী। দাগাবাজেই

দাগা খায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে কোথায় যেতে বল দিকি নি ?'

গোবিন্দজীউর মন্দিরের প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের কথা বললাম। মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললো, 'ভাল জায়গা। কিন্তু কেমন টেনে রাখলাম বলতো ? এইবার রূপ দেখ প্রাণভরে।'

মনোহরার লাবণ্যে ঢেউ লাগলো। যেন তুক করার মতোই, বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল বুকে ছোঁয়ালো। তুলে কাজল টানার মতো চোখে টানলো। 'ধরে রাখলাম, এবার যাও দেখি ?'

তাকিয়েছিলাম তার চোখের দিকে। সে খিলখিল করে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল। শরীরের উচ্ছ্বাসে তা চাপা থাকে না। কেবল ভাবি, গতকাল এ সময়ে ছিলাম বিজলী আলোর তলায়। আধুনিকের আসরে। এখন সকল কালের আসর ছাড়িয়ে, এক মহাভাবের অঙ্গনে। সব আধুনিকতার নির্যাস, একলা মনোহরার বচনে। বাস্তববাদীর ঠোঁটের বক্রতাকে দেখতে পাচ্ছি। কোনো দিন গায়ে মাখি নি। মাখলে, নিজেকে দেখতে পাবার এ সুযোগটুকু মিলতো না। বাঁড়ুজ্জে মহাশয় ধরতাইটা দিয়েছিলেন অব্যর্থ।

একটা সিগারেট বিরিয়ে বললাম, 'এবার আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?'

'কর।'

'আপনি কে ?'

'পতিতা।' মনোহরা হ্যারিকেনের নিচে এসে দাঁড়ালো। মুখে তার ছায়া।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে গিয়ে বুকে আটকালো। নির্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। এও কি প্রকৃতির লীলা ? ঠাট্টার একটা সীমা আছে। মনোহরার নিচু স্পষ্ট স্বর, 'মিছে বলি নি। ইস্কুলে পড়েছি, খেলতে খেলতে বড় হয়েছি। একটু দুরন্ত ছিলাম। দেখে বুঝতে পার, দেখতে খারাপ ছিলাম না। ভাল ঘর বর পাবার কথা। একদিন লুট হয়ে গেলাম। চোরাপথে হাতে হাতে ফেরা আর ছিঁড়ে থেতলে খাওয়া। উচিত ছিল মরে যাওয়া। অন্ততঃ আত্মঘাতী হওয়া। পারিনি। মফঃস্বলের হাসপাতালে একটা মরা ছেলে বিইয়ে যখন বাড়ি ফিরলাম, সবাই দেখল সাক্ষাৎ পেত্নী। কুলো ঝাড়া দিয়ে, ঝাঁটা পিটিয়ে তাড়িয়ে দিল। দেবে না ? এমন পাপ কেউ ঘরে রাখে ?'

মনোহরা থামলো। বুকে হাত চেপে যেন জোর করে নিঃশ্বাস নিল। হ্যারিকেনের আলোর নিচের অন্ধকারে তার মুখ আবছা। চৈত্রের জ্যোৎস্না মাখা উতলা রজনী এ ঘরে এখন রুদ্ধশ্বাস। প্রসন্ন হাসি উচ্ছ্বাসের মুখে ঝাপটা দিয়ে নেমে এলো পাথর চাপা স্তব্ধতা। আমি নিজেও যেন নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। বুঝতে পারিনি, একটা জিজ্ঞাসা কোন্ কপাটের খিল খুলে দিচ্ছে।

মনোহরা একটু হাসলো বোধহয়, 'মনে আছে, দেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে। তাই নিয়ে দেশ মত্ত। কিন্তু আমার মত ঘটনা কি ঘটছিল না ?

চিরকালই তো ঘটে আসছে। এক অনাথ আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছিলাম। থাকতে পারিনি। কিন্তু কী হবে এত অনাচারের কথা বলে? তবে পতিতা এক কথা। পতিতাবৃত্তি আর এক কথা, তাই নয়? পুরুষও কত ভাবে পতিত হয়, সেই অর্থে আমি পতিতছিলাম। আমাকে উদ্ধার করেছিলেন কৃষ্ণদাস গোস্বামী, এই আখড়া যাঁর হাতে গড়া। মারা গেছেন। তিনি আমাকে ঠাকুরের পায়ে রেখে দিলেন। যেমন করে শেষ নিদানের আশায় মরার আগে গরীব মানুষ ঠাকুরের থানে ফেলে রাখে। বেঁচে গেলাম।'

ঘরে একটা দমকা বাতাস এলো। হ্যারিকেনটা দুলে উঠলো। সলতেটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। মনোহরার চোখের কোণে জলের বিন্দু টলটলে। মুখে হাসি। ইচ্ছা করলো, উঠে গিয়ে এখন আমি তার মাথায় হাত দিই। কিন্তু সেটা পারবো না। তার জীবনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা অনেক রয়ে গেল। বলা ভালো, নতুন করে জাগলো। কিন্তু আর তা করতে পারি না। বললাম, 'না জেনে এমন একটা কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম। আপনাকে কিন্তু কষ্ট দিতে চাইনি।'

'কষ্ট?' মনোহরা এগিয়ে এলো দু'পা, 'আনন্দ বল। মরে বাঁচার আনন্দ নেই? নিজেকে পবিত্র ভাবতে পারার মত শক্তি আর কী আছে? কৃষ্ণদাস গোস্বামীর কাছেই জেনেছি, যে শরীরে কলঙ্ক, সেই শরীরেই পুণ্য। এই শরীর মহাভব, এই শরীরেই মহাভাব। তিনি সহজভাবের সাধক ছিলেন, আমাকে সেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। সহজ সাধনাই সব থেকে কঠিন সাধনা। আবার অনাচারের ভয়টাও বেশি। কিন্তু সে সব কথা তোমাকে বলবার নয়। তবে তোমাতে আমার মন একটু মজেছে, তাই তোমাকে একটা কথা বলতে পারি। মনোহরার চোখের তারায়, ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দিল।

তার সহজ সাধনার ইঙ্গিতটা জানি। এই শরীর মহাভব, এই শরীরেই মহাভাব, এ বৃত্তান্ত জেনেছি অনেক আগে। সাধক হয়ে না। সাধকের সান্নিধ্যে গিয়ে। দেহতত্ত্ব সেখানেও। ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক। শরীর ব্রহ্ম অভেদ। এক সাধিকা তাঁর পরিচয় দিয়েছিলেন, 'আমি ভাণ্ড। আমি ব্রহ্মাণ্ড।' মনোহরা কী বলবে? আমাতে তার মন মজেছে, সেটা হয় তো যথার্থ অর্থে প্রীতি। অন্যথায় এত কথা বলতো না। আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।

'কৃষ্ণদাস গোস্বামী সেই প্রথম দিন আমাকে যাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছিলেন, আমি তাঁর প্রকৃতি। বুঝলে কিছু?' মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

যদি বা একটা অস্পষ্ট সংকেত পাচ্ছি, মুখ ফুটে তা বলতে পারছি না। তাই ঘাড় নাড়লাম। মনোহরার চোখের তারা নিবিড় হলো, 'সহজ তত্ত্ব। হলো পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব। আমার একজন পুরুষ চাই না? চাই। গোস্বামী যাঁর পায়ে রেখেছিলেন, বলেছিলেন, তোমাকে এত মারলেন তিনি, বাঁচাবার

দায় তো তাঁরই। তিনি সেই পরম পুরুষ। আমি তাঁর প্রকৃতি।' মনোহরার চোখের তারা দুটি প্রতিমার মত দীপ্ত উজ্জ্বল দেখালো। নিজের উদ্ভিন্ন বুকে আঙুল ছুঁইয়ে এমন করে এক পা এগিয়ে দিল, যেন সে এই মুহূর্তে সাক্ষাৎ প্রতিমা।

এই তবে তার প্রকৃতি লীলা? এই তার দেহতত্ত্ব! আমার পুরনো অভিজ্ঞতায় মিললো না। প্রবৃত্তির পিশাচ খড়্গ তাকে ছিন্নভিন্ন করেছে। সেই কারণেই কি তার এই প্রকৃতি লীলা? সেই কারণেই কি এত অনায়াসে সহজ হয়ে উঠতে পারে। হাসির উচ্ছ্বাসে ব্যক্তিত্ব অটুট থাকে? গোলকদাস বাবাজীকেও তাই মান্য করতে হয় তাকে। সেই কারণেই কি তার আদেশ এত স্পষ্ট। এ কি আত্মনিগ্রহ? তাই যদি, তবে তার মানবী রূপে এমন হাসি উৎফুল্ল রমণীয়তা পেল কোথা থেকে?

'কী ভাবছ বাবাজী?' মনোহরা এগিয়ে এলো কাছে।

বললাম, 'ভেবে তো সব কিছুর হদিশ মেলে না। কিছু বিষয় তো চিরদিন ভাবনার মধ্যেই থাকে। বলার কিছু নেই। আমি সাধারণ মানুষ। সহজেই মজে যাই। আপনাকে দেখে তাই অবাক লাগে।'

'ধোকাবাজ।' মনোহরা আমার গায়ে জড়ানো ধুতি বুকের কাছে চেপে ধরলো, 'বড় সাধারণ, তাই সহজে মজে যাও। এইটুকু সময়ের মধ্যে তোমার মজে যাওয়া তো দেখলাম। ওই জানালা থেকে যখন মুখ ফেরালে, তখন তোমার সেই মজা মুখ দেখেছি। নইলে এমন করে তোমাকে খামচে ধরতে পারতাম না।' আমার বুকের কাপড় ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল, 'বুঝেছ? অবাক কিসের? তোমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে পারি। চল, পুজো শেষ হয়ে এল, আরতি দেখবে।'

পা বাড়াবার আগে, আবার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

'আবার?' মনোহরা চোখ বড় করে তাকালো।

বললাম 'তবে থাক।'

'না, শুনি। কিছু চাপা থাকা ভাল নয়।'

বললাম, 'গোলকদাস বাবাজীর ঐ কথাটার অর্থ কী? খুঁজছ, পাচ্ছো না। পাবে পাবে।'

'তোমাকে দেখে কিছু একটা মনে হয়েছে।' মনোহরা হাসলো, 'নিজেই বলবেন। তবে মনে হয়, আমার সেই কথাটিই বলবেন। বাবাজী, একটু শান্ত হয়ে বস। কিন্তু তোমার কপালে যে বসবার ঠাঁই নেই, সে-কথাটা উনি বুঝবেন কিনা জানিনে। চল।'

মনোহরা ঘর থেকে বেরোবার আগে উঁচুতে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের সলতে একটু নামিয়ে দিল। আমি একটু ঠেক খেলাম। আমার সাধারণত্ব আমাকে

চেপে ধরে। তক্তপোষের বিছানায় আমার পয়সার ব্যাগ পড়ে রইলো। মনোহরা পা বাড়িয়ে ফিরে তাকালো, 'কী হলো ?'

বললাম, 'এসব কি খোলা পড়ে থাকবে ?'

'থাকবে। শেকলটা তুলে দিয়ে যাব, তা হলেই যথেষ্ট।' মনোহরা যেন নতুন করে আত্মপ্রকাশ করলো, 'এটা আমার আখড়া। এস।'

আমার ভিতরে কোথায় কুঁকড়ে গেল। বিব্রত হাসলাম। বললাম, 'আসলে আমি এই।'

'যে মানুষ সজাগ নয়, তাকে ন্যালা খ্যাবলা বলে। সে কোন কম্মের নয়।' মনোহরা হেসে বাইরে পা দিল। তার সঙ্গে বাইরে গেলাম। এখন সারা উঠোন বাগান জুড়ে জ্যোৎস্না। ফুলের গন্ধ নিবিড়। কালা পাখি কি থামবে না ? পূবের ঘরে একটা টিমটিমে প্রদীপ জ্বলছে এক পাশে। ঘরের এক পাশ দিয়ে ওপরে ওঠার মাটির সিঁড়ি। আমার কাছে নতুন না। বীরভূমের মলুটি গ্রামে প্রথম মাটির দোতলা ঘরে উঠেছিলাম। মনোহরা সিঁড়িতে পা দিয়ে, আমার একটা হাত টেনে ধরলো। বললাম, 'উঠতে পারবো।'

'অভ্যাস আছে, মাটির সিঁড়ি ওঠা ?'

'আছে।'

'অনেক কিছুই আছে দেখছি।' মনোহরা তবু হাত ছাড়লো না।

ওপরের ঘরে ঘণ্টা কাঁসর বেজে উঠলো। ঘরে উঠে দেখি, পাঁচ ছ'জন বাবাজী রয়েছে। তিন বৈষ্ণবী। বয়স্কা একজন। বাকি দু'জনের একজন তিলকা। আর একজন অচেনা। এই বোধহয় ভামিনী। মনোহরার সমবয়সী হতে পারে। অথবা কিঞ্চিৎ বেশি। শ্যাম অঙ্গে উজ্জ্বল কিরণ। টিকলো নাক, টানা চোখ। জামা শাড়ি মনোহরার মতো। মাথায় ঘোমটা। মাথায় এখন মনোহরার ঘোমটা টানা। তার সঙ্গে ভামিনীর দৃষ্টি বিনিময় হলো। চোখে চোখে হাসি।

নিকোনো মেঝে। কাঠের সিংহাসনে গৌর নিতাইয়ের মৃন্ময় মূর্তি। আর এক সিংহাসনে রাধা কৃষ্ণ। দুই সিংহাসনের মাঝখানে ছোট মাপের একটি ফটো। ফ্রেমে বাঁধানো। পরে জেনেছি ঐটি কৃষ্ণদাস গোস্বামীর ফটো। গোলকদাস বাবাজীর বাঁ হাতে ঘণ্টা। ডান হাতে চামর ঘুরিয়ে আরতি করছেন। নিতাই কাঁসর বাজাচ্ছে। মনোহরা আমাকে আঙুলের নির্দেশে জায়গা দেখিয়ে দিল। আমি এগিয়ে গিয়ে বসলাম। গোলকদাস বাবাজী একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন।

আরতি চললো বেশ খানিকক্ষণ। শুধু চামর না। গেরুয়া উত্তরীয়, দর্পণ, ধূপ, কর্পূরের দীপ। পঞ্চপ্রদীপের আরতি শেষে, সেটি তুলে দিলেন ভামিনীর হাতে। ভামিনী প্রদীপ নিয়ে আগে এলো আমার কাছে। হাত বাড়িয়ে উত্তাপ নিয়ে মাথায় বুকে দিলাম। যেখানে যা নিয়ম। ভামিনী

সকলের কাছে গেল। গোলকদাস তখন চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে। বোধহয় জপ করছেন। সামনে কয়েকটি পাথরের পাত্রে ফুল ফল বাতাসা মণ্ডা। একটিতে খিচুড়ি আর সামান্য ব্যঞ্জন।

গোলকদাস উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন। সেই সঙ্গে সকলে। কেবল আমিই চুপচাপ বসে। গোলকদাস বসে উচ্চারণ করলেন, 'রাধেমাধব।'

সকলে প্রতিধ্বনি করলো। গোলকদাস আমার দিকে ফিরে হাসলেন, 'বেশ দেখাচ্ছে।'

'কপালে একটা রসকলি এঁকে দেব ভাবছিলাম।' মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

গোলকদাস বললেন, 'দিলে না কেন? মানাত ভাল।'

ভামিনী আমার হাতে প্রসাদ বাড়িয়ে দিল। শশা কলা বাতাসা মণ্ডা। তারপরে পাত্র তুলে দিল তিলকার হাতে। বাবাজীরা একে একে সব নেমে গেল। তিলকাও গেল সঙ্গে এবং বয়স্কা বেষ্ণবী। গোলকদাস আমার মুখোমুখি বসলেন। ভামিনী আর মনোহরা পরস্পরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলো। মনোহরা উঠে দাঁড়ালো। আমি তার দিকে তাকালাম। সে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। ইশারায় গোলকদাসকে দেখালো। ভামিনী তুলে নিল খিচুড়ি ভোগের পাত্রটি।

'বাবাজীর থাকবার কী ব্যবস্থা করেছ মনোহরা?' গোলকদাস জিজ্ঞেস করলেন।

মনোহরা বললো, 'দক্ষিণের পুব কোণের ঘরে। নিতাই সঙ্গে থাকবে।'

'ভাল।' গোলকদাস বললেন, 'আমি এর সঙ্গে একটু আলাপ করি।'

মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'করুন।' সে আর ভামিনী নিচে নেমে গেল।

মনোহরা কিছু ভুল বলেনি। গোলকদাসের কথার মধ্যে, একটু শান্ত হয়ে বসার কথাটাই অন্যভাবে এসেছিল। আমি যে ঈশ্বরের সন্ধানে আছি, সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ নেই। মনোহরার সঙ্গে গোঁসাই ঠাকুরের কী আশ্চর্য তফাৎ। ঘুরে ঘুরে সন্ধান হয় না। ছটফটিয়ে ঘুরে ফল নেই। শিকড় গাড়ো, সঁপে দিয়ে থাকো। এমন কি, আভাসে এমন কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃত গুরুর সন্ধান দরকার। গুরু কেন? গুরু কাণ্ডারী, এ ভব তরীর। সেই সঙ্গেই সহজিয়া বৈষ্ণব তত্ত্বের সঙ্গে গুরুর যোগটা কোথায়, সে তত্ত্বটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অবিশ্যি কিছু কিঞ্চিৎ বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের ব্যাখ্যানিও।

হিন্দু তন্ত্র আর বাউলের দেহতত্ত্বের সঙ্গে ইতর বিশেষ কিছু নেই। প্রকৃত বাউলের কোনো ঈশ্বরের আকার আকৃতি রূপ নেই। হিন্দু তন্ত্রে আছে। বৈষ্ণবের আছে রাধাকৃষ্ণ, গৌর নিতাই। গোলকদাস বাবাজীর মনে বোধহয় কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল, পাছে তাঁকে আমি বুঝতে ভুল করি। সেইজন্যই তাঁর

গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'বৈধী' ভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু 'রাগানুগা' ভক্তির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ আছে। রাগানুগা ভক্তি হলো 'রাগের ভজন'। তাকে বলে প্রেম পীরিতি সাধন। একে তুমি বেদে পাবে না। শাস্ত্র ঘেঁটে পাবে না। এর জন্য গুরু চাই। পরম গুরু হলেন গৌর নিতাই। তাঁদের কাছ থেকে যাঁরা তত্ত্ব জেনেছেন, গুরু পরম্পরায় তাঁরাই নানা রূপে নানা খানে বসত করছেন। তোমাকে খুঁজে নিতে হবে। খুঁজছ যখন, পাবে। 'পাবে' বলে গোলকদাস তাঁর উজ্জ্বল চোখ দুটি ভুরুর মাঝখানে এনে, আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। ঠোঁটে ছিল রহস্যের হাসি।

কারণ কী? কেমন যেন মনে হয়েছিল, চেয়ে দেখ স্বয়ং গুরু তোমার সামনে বসে। ছোট আমার মন। হয় তো ভুল বুঝেছি। কিন্তু মনটা সহজ হতে পারেনি। সরস হয়ে ওঠেনি। তিনি গুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন অনেক ভাবে। দু কলি গান গেয়েও শুনিয়েছিলেন, 'আমার যায় না দুখের দিন হয় না সুদিন/আমি কী রূপে পাব শ্রীগুরুর চরণ।' চোখের তারা নিবিড় করে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'গুরু তোমার কাছে পিঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি দেখেও তাকে চিনতে পারছ না। কানা চোখে পাগলের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার চোখ দেখে বুঝেছি বাবাজী, জ্বলে পুড়ে মরছ, তাঁর নাগাল পাচ্ছ না। একটু থিতু হয়ে বসে, ধ্যান দিয়ে নজর কর, পাবে।' আমার ঘাড়ে হাত রেখে, ঝুঁকে পড়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, 'গুরু রূপে নয়ন দেরে মন।'

কথাটা শুনেই আমার কানে বেজে উঠেছিল কেঁদুলির বাউলের গান। যে সে বাউল নন, নাম তাঁর নবনীদাস, বৃদ্ধ। রবিঠাকুর তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন। বাউল অনেক দেখেছি। গান শুনেছি। নবনীদাসের গানের বচন, চোখ মুখের ভঙ্গি, ঠারে ঠোরে নানা ইশারা সংকেত, এমন আর কারোর দেখিনি। শুনি নি। এখন সেই গানের কলি শুনছি, গোলোকদাসের মুখে। সহজিয়া বৈষ্ণবের গুরুতত্ত্বে, বাউল তত্ত্বের তফাত কোথাও নেই। কিন্তু গোলকদাস আমাকে যেমন করে গুরু চিনতে শেখাচ্ছিলেন, শুনে আমার মন বঁড়শীর দূরে। জপেও নেই, টোপেও নেই। তবে কথা একটিও বলি নি। শ্রোতা আমি ভালো। নির্বিকারে শুনি। কানে বাজে ভিন্ন স্বর। বলতে পারি না, অই মহাশয়, আমি রূপের ফেরে ফিরি। আমার রূপনগরের রূপ ভিন্ন। সেখানে আপনিও এক রূপ।

অতএব, গোলকদাস নিজরূপে দর্শনধারী। কারে কয় দীক্ষাগুরু, কে বা শিক্ষাগুরু বেবাক ব্যাখ্যা করেছিলেন। একেবারে শেষে, গুরু কল্পতরু। সে রাগের আশ্রয়। ঘুরে ফিরে সেই তন্ত্রের সংকেত। তন্ত্রে যিনি শক্তি, সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনে সে রাগাত্মিকা। অর্থাৎ প্রকৃতি। বাউলের ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। সেও পুরুষ প্রকৃতি। কারণ, দেহতত্ত্বে এক নেই। প্রকৃতি

পুরুষরূপে জোড়া। সেটুকুই বা তিনি ব্যাখ্যা করতে ছাড়বেন কেন? কৃষ্ণ আপনিই পূর্ণ। রসের আস্বাদনের জন্য অন্য অঙ্গে ভিন্ন। তার নাম রাধা। দুজনের একই আকার। কিন্তু নারী পুরুষ রূপে সতত বিহার করেন। তবে, এর সঙ্গে যোগ সাধনা চাই। কেন? না, কাম ছাড়া গতি নেই। আবার কামকেই প্রেমে রূপান্তরিত করতে হবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা।

অথচ এই কথাগুলোই মনোহরা কতো সহজে বলেছিল। গোলকদাসকে আমার পুরনো অভিজ্ঞতার কথা বলিনি। বলার কোনো কারণ ছিল না। নানা কথার হেরফেরে, সেই নাভিমূল, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার স্থান নির্ণয়। বৈষ্ণব সহজিয়ার ব্যাখ্যাটা এইরকম। মূলাধারে চতুর্দল, স্বাধিষ্ঠানে ষড়দল। এই দশমদলে কুলকুণ্ডলিনী বিরাজ করছেন। কাম ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণ। আর সেই রসবতী যুবতীই ধন্য, যার কৃপাতে কৃষ্ণ উপলব্ধি হয়।

হাতে ঘড়ি ছিল না। সময় ঠাহর করতে পারিনি। বাইরে সেই কুহু কুহু। পুবের জানালা দিয়ে চৈত্রের বাতাস আসছিল। ফুলের গন্ধ সেই বাতাসে। তার সঙ্গে আর এক গন্ধ, একেবারে মহাপ্রাণীর মূলে গিয়ে বিঁধছিল। সুগন্ধ আতপ চালের সঙ্গে ভাজা মুগের ডালের খিচুড়ির গন্ধ। রূপনগর তো কেবল রূপে থাকে না। রসে গন্ধেও আছে। আছে বাতাসে শব্দে। জ্যোৎস্নার মায়ালোকে।

এবসময়ে ভামিনীর আবির্ভাব হয়েছিল, 'গোঁসাই কি তামাক খাবেন?'

'অ্যা?' গোলকদাস হাই তুলে তিনবার তুড়ি দিয়েছিলেন, 'রাধে মাধব। হ্যাঁ ভামিনী, চল নিচে যাই। বাবাজীর সঙ্গে একটু আলাপ করলাম। চল বাবাজী, নিচে গিয়ে বসি।'

আত্মারামের বড় সুখ। কখনও কখনও সে একরকমের খাঁচা ছাড়া হতে চায়। সে খাঁচাটা শরীরের খাঁচা না। ব্যাধের ফাঁদ। নিচে গিয়েছিলাম। তখনই লক্ষ করেছিলাম, সিঁড়ির মুখে দরজা। নিচের ঘরে মাদুরের ওপর তাকিয়া। সামনে গড়গড়া। ভামিনী আমাকে বলেছিল, 'আপনি দক্ষিণের ঘরে যান।'

'এখানেই বসলে হত।' গোলকদাস আবার ফাঁদ পাতছিলেন।

ভামিনী বলেছিল, 'সেই কোথা থেকে, সারাদিন রোদে তেতে পুড়ে এসেছে। বাবাজী তো সহজে ছাড়া পাচ্ছে না, নিয়ে বসবার অনেক সময় পাবেন।'

সে আবার কী? ফাঁদের বহর কতো বড়? কয় দরজা, ক'জন দ্বারী বুঝতে পারি না। সহজে ছাড়া পাচ্ছি না মানে কী? গোলকদাস অগত্যা আমাকে রেহাই দিয়েছিলেন। ভামিনী আমাকে উঠোন পেরিয়ে দক্ষিণের ঘরে পেঁছে দিয়েছিল। শূন্য ঘর। হ্যারিকেনের সলতেটা বাড়ানো। তক্তপোষের বিছানায় বালিশ পাতা হয়ে গিয়েছিল। পাশেই রাখা ছিল আমার পয়সার

ব্যাগ, সিগারেট দেশলাই, চোখের কালো ঠুলি, নোটবই কলম। কাঁধ ঝোলাটা পুব দিকে রাখা একটা কাঠের সিন্দুকের ওপরে। আগেই একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। মনোহরা এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেমন একটু অগোছালো দেখাচ্ছিল। আঁচল দিয়ে মুখ আর গালের ঘাম মুছেছিল। তারপরে প্রথম বাত, 'ঝোলা থেকে ময়লা জামা কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে দিয়েছি।'

আমি ত্রস্ত হয়ে বলেছিলাম, 'কেন? সকালে যদি না শুকোয়?'

'তা হলে দুপুরে শুকোবে।' মনোহরা তক্তপোষের এক ধারে বসেছিল। ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল। কালো তারা চোখের কোণে, 'রূপের টানে যে ফেরে, তার এত তাড়া কিসের?'

বলেছিলাম, 'যাব অনেকখানে।'

'সেই অনেকখানের এই একটা খান।' মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিল, 'ডেকে আনতে যাইনি। নিজে এসেছ। আসাটা নিজের, যাওয়াটা অন্যের হাতে। এটা বোঝ না?'

বলেছিলাম, 'কিন্তু—।'

'চলে যেতে চাও?' মনোহরা আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিল, 'তুমি রূপের টানে ফের। দুঃখীকে দুঃখী চিনতে পারে না? তোমার রূপের ঘরে কী আছে। আমি নেই?' সে তার বুকে হাত রেখেছিল।

আমি হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারিনি। তাকিয়েছিলাম তার চোখের দিকে। তার গোটা জীবনটা যেন চকিতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলাম, মনোহরা আমার অচেনা না। জীবনে সেই প্রথম দেখা। বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মতোই। কিন্তু কোথায় যেন একটা চেনাচিনি হয়ে গিয়েছিল। সেই চেনাটা, হাসির আড়ালে ব্যথিতের বন্ধুত্ব। কথা বলতে পারিনি। একটা আবেগ বোধ করেছিলাম। মনোহরার কালো চোখের দীঘিতে একটা কিরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। নিঃশ্বাস পড়েছিল। বলেছিল, 'মন সাফ?'

আমি ঘাড় কাত করেছিলাম। মনোহরা ডান হাতের তিন আঙুল তুলে দেখিয়েছিল, 'তোমাকে তিনে বাঁধলাম।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী?'

'ত্রি।' মনোহরা আঙুল নামায়নি, 'ত্রি'-তেই অনেক। ধরা আর ছাড়া। ত্রিকাল, ত্রিগুণ, ত্রিবেণী, ত্রিকূল, ত্রিগুণাত্মিকা, ত্রিবেদী, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভুবন, ত্রিশূল, ত্রিরাত্রি। তোমার তিনরাত্রি আমার। লুট পড়েছে, লুটের বাহার, লুটে নেরে তোরা। তোমাকে লুট করলাম। বুঝলে?'

এমনই অনায়াস বোধ করেছিলাম, হেসে বলেছিলাম, 'একটু একটু।'

'সত্যি?' মনোহরা উঠে দাঁড়িয়ে দু হাত ছড়িয়ে দিয়েছিল, 'রূপখোর, দেখ এই আমি সেই প্রকৃতি। চিনতে পার?'

মনে পড়েছিল তার একটি কথা। 'তোমাকে কোলে করে খাওয়াতে পারি।' তাকে চিনতে তো ভুল হবার কথা না। আবার বলেছিলাম, 'একটু একটু।'

'আবার একটু একটু?' মনোহরা হাত তুলেছিল মারের ভঙ্গিতে। মারতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসির মুখে হাত চাপা, 'না মারব না। অনেক মার খেয়েছ, খাবে আরো। মারের গায়ে যদি মলম চাও, তা হলে যখন খুশি এস। এমন একটা ক্ষত্ব দেবে?'

এ কথাটার জবাব দিতে পারিনি। মনোহরা আবার উচ্ছ্বসিত হাসির মুখে হাত চেপেছিল। তারপরে আমার কাছে শুনেছিল গোলকদাসের আলাপ বৃত্তান্ত। মনোহরা একটি মন্তব্য করেছিল, 'তুমি যে রূপে গুরু ধরে আছ, গোঁসাই সেটা জানেন না।'

আমি মনোহরাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'ভামিনী কে?'

'গোলকদাস গোঁসাইজীর প্রকৃতি।' মনোহরা জবাব দিয়েছিল, তার সঙ্গে নিবিড় চোখে তাকিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা, 'তুমি সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রকৃতি বিষয় কিছু জান?'

মনোহরাকে বলতে বাধা ছিল না, 'আমি তন্ত্রসাধক আর বাউল সাধকদের সঙ্গে অল্পবিস্তর মেশবার সুযোগ পেয়েছি। বাউলদের প্রকৃতি করণ কারণ কিছু জানি।'

'তবে তো আর কিছু জানবার নেই।' মনোহরা বলেছিল, 'কিন্তু কতটা জান?'

সেখানে কিঞ্চিৎ ঠেক। কোনো রমণীর সঙ্গে সে-বিষয়ে কখনও কথা বলিনি। জবাব দিয়েছিলাম, 'আমার তো সব কথা জানবার নয়। শুনেছি, গুপ্ত সাধনতত্ত্ব অসাধকের জানার নয়।'

'তবে যে বললে, সাধকদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়েছ?' মনোহরা ঘাড় কাত করে চোখে চোখ রেখেছিল। যেন বন্ধন করেছিল।

আমি বলেছিলাম, 'চণ্ডীদাসের একটা পদ মনে পড়ছে।'

'বল শুনি।'

'প্রকৃতি হইয়া পুরুষ আচার করিবে নারীর সঙ্গ।'

'এটা তো একটা সাধারণ কথা। আর কিছু?'

বিপদগ্রস্ত বোধ করেছিলাম। বলেছিলাম, 'একটা বাউল গানে শুনেছি, কেবল স্ত্রী পুরুষে রমণ করা নয়/আত্মায় আত্মায় রমণ হলে রসিক তারে কয়।'

'ছাট কাট কথা, কিন্তু বস্তু আছে।' মনোহরা বলেছিল, 'মীরাবাঈ শ্রীরূপ গোস্বামীকে কী বলেছিলেন, জান?'

আমি মাথা নেড়েছিলাম, 'না।'

সেই সময়ে তিলকার আবির্ভাব হয়েছিল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'রঘু এসেছে। তার সঙ্গে পাড়ার কয়েকজন মুরুব্বি। গোঁসাইজী তোমাকে আসতে বললেন।'

স্পষ্টতই দেখেছিলাম, মনোহরার চোখে রুষ্ট ভ্রূকুটি। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'এ এক সংসার, বড় জ্বালা। তোমার খিদে পেয়েছে?'

বলেছিলাম, 'পরে খেলেও চলবে।'

'তবে আমি আসি। তুমি ঘরে থাক কি বাইরে যাও, যেমন খুশি।' মনোহরার মুখে অশান্তির ছায়া পড়েছিল। সে ঘরের বাইরে গিয়েছিল।

ফিরেছিল প্রায় এক ঘণ্টা পরে। আমি একবার ঘরের বাইরে গিয়েছিলাম। ঘড়িতে সময় দেখেছিলাম রাত্রি ন'টা। দক্ষিণের ঘরের পিছন থেকে নানা স্বরের কথা ভেসে আসছিল। ইচ্ছা ছিল গঙ্গার ধারে ঘুরে আসি। আখড়ার দরজা বন্ধ ছিল। খোলা উচিত বিবেচনা করিনি। ঘরে এসে, পুবের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। মনোহরা আসার পরে ঘটনা জানতে পেরেছিলাম। তিলিপাড়ার এক বধূ, নাম তার ব্রজবালা। স্বামী রঘুনাথ। ব্রজবালার বিয়ে হয়েছিল বারো বছর বয়সে। এখন চব্বিশ। নিঃসন্তান। ব্রজবালার ধর্মে মতি। সে ঘর ছেড়ে আখড়ায় চলে এসেছে। কিন্তু তার ধর্মে মতি বিষয়ে মনোহরার বিশ্বাস নেই। তার বিশ্বাস, আখড়ার মাধব নামে এক যুবক বাবাজীর ব্রজর ওপর অশেষ করুণা হয়েছে। ব্রজর এই প্রথম আখড়ায় আসা না। কয়েক মাসের মধ্যে মাঝে মাঝেই আখড়ায় পালিয়ে এসেছে। রঘু ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এবার ব্রজ বজ্র কঠিন। সে আখড়া ছেড়ে যাবে না। এ বিষয়ে গোলকদাসের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন মনোহরাকে। মনোহরা যা ব্যবস্থা করবে, তাই হবে। তিনি বুদ্ধিমান লোক। চোরকে বলেন চুরি করতে। গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকতে। মনোহরার ধারণা কী? ধারণা বিবিধ। ব্রজ অসুখী রমণী। শরীরে রূপ স্বাস্থ্য আছে। বুদ্ধি তেমন নেই। তাকে নিয়ে পাড়ায় কিছু কুৎসাও রটেছিল। রঘু নাকি রঘুপতির মতোই বৃষস্কন্ধ বলবান পুরুষ। অন্তত চেহারায় আর কাজে তারই প্রমাণ। মানুষ ভালো, কিঞ্চিৎ গাঁজা ভাঙে আসক্তি। কিন্তু ব্রজ অন্তপ্রাণ। কোনোদিন ব্রজর গায়ে হাত তোলেনি। ঝগড়া বিবাদ করেনি। বরং ব্রজর হয়ে শরিকদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ব্রজর বিষয়ে সে কটু কথা শুনতে নারাজ।

রঘু ব্রজর স্বামী, ব্রজ ছাড়া জানে না। ব্রজ এখন মাধব বাবাজী ছাড়া সংসার আঁধার দেখছে।

মনোহরা জানে না, ব্রজ আর মাধব কতোখানি এগিয়েছে। রঘু গাঁজা

খেতে পারে, ভাঙ খেতে পারে। তার শালীনতা বোধ আছে। সে তার স্ত্রী সম্পর্কে গ্রামে কিছু বলে বেড়ায় নি। সে বিশ্বাসও করে না, স্ত্রী নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ সব নিয়ে মাথাব্যথা শরিক আর পাড়ার লোকের। রঘুর প্রতি মনোহরার একটি প্রীতি বোধ আছে। কিন্তু ব্রজবালার প্রতি আছে তার একটি নারীর স্নেহ। তার বিশ্বাস, ব্রজর নারীত্বের বিকাশ কোথাও অবরুদ্ধ হয়ে আছে। শুধু সেই কারণেই স্বামীত্যাগিনী হওয়াটা সমর্থনযোগ্য না। রঘুকে এভাবে আঘাত দেওয়া চলে না।

আজ ব্যাপারটা ঘটেছে অন্যরকম। রঘুর সঙ্গে তার প্রতিবেশীরা এসেছে। তাদের মতি গতি ভালো না। আখড়ার পক্ষে ক্ষতিকারক। তারা মাধবের চরিত্র নিয়ে কথা তুলেছে। বক্তব্য একরকম পরিষ্কার। মাধব বাবাজী ফুসলিয়ে ব্রজবালাকে আখড়ায় এনে রেখেছে। এর কোনো দায়িত্বই মনোহরা নিতে রাজী না। সে গোলকদাস গোঁসাইয়ের তুষ্ণীভাব লক্ষ করেছে। ব্রজ বলেছে, সে আখড়ার সেবিকা হয়ে জীবন কাটাবে। মনোহরার পরিষ্কার কথা, তা হলে রঘুও আখড়ার সেবক হয়ে থাকবে। যদি রঘু তা না থাকে, মাধবকে আখড়া ছেড়ে যেতে হবে। এর কোনোটাই যদি না হয়, তবে ব্রজবালা আর মাধব যা খুশি তাই করতে পারে। আখড়ায় তাদের স্থান হবে না।

মনোহরার কাছে আখড়া আগে। তারপরে আর সব। তার কথায় রঘুর জ্ঞাতি প্রতিবেশীরা খুশি। রঘুও খুশি। সে তার স্থাবর জঙ্গম যা কিছু আছে, সব নিয়ে আখড়ার সেবা করতে রাজী। ব্রজকে ছাড়তে পারবে না। গোলকদাস এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন। ব্রজবালা আর রঘু দুজনেই আখড়ায় থাকবে। রাধা মাধবের সেবা করবে।

মনোহরার তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্তন। সে বুঝতে পেরেছিল, গোলকদাসের এই সম্মতির মধ্যে দুইটি কারণ বর্তমান। রঘুর যা কিছু সম্পত্তি, সবই আখড়ায় বর্তাবে। মাধবের সঙ্গে ব্রজবালার লীলাও চলতে থাকবে। অতএব এ প্রস্তাবের পক্ষে তার সায় নেই। তার শেষ কথা, হয় ব্রজবালা আখড়ায় থাকবে। অথবা মাধব। দু'জনের একসঙ্গে আখড়ায় থাকা চলবে না।

মনোহরার কথা শুনে আমার মনে পড়েছিল কুয়োতলার বাক্যালাপ। নিতাইয়ের সঙ্গে ব্রজবালার। গোলকদাস বাবাজী তার আগে বলেছিলেন, তিনি আখড়ার মধ্যে কোনো গোলমাল পছন্দ করেন না। কিন্তু আসলে তিনি চান, মাধবের প্রকৃতি হয়ে ব্রজ আখড়ার সেবিকা হবে। রঘু থাকলেও ক্ষতি নেই। মনোহরা তা নাকচ করেছে। ব্রজবালা মনোহরার পায়ে পড়ে কেঁদেছে, 'কেন তুমি আমার সাধে বাদ সাধছ?' মনোহরা বুঝতে পারে, ব্রজর আসল দুঃখটা কোথায়। সে মাধব বাবাজীর প্রেমে পড়েছে। কিন্তু রঘু তার স্ত্রীকে ভালবাসে। মনোহরা আমাকে বলেছিল, 'আমি ব্রজর কানে মন্ত্র দিয়েছি।'

'কী মন্ত্র?'

'তুই আমার আখড়া ছেড়ে চলে যা। মাধব বাবাজীর সঙ্গে যেখানে খুশি যা। মাধব বাবাজীর যদি মনের জোর থাকে, তোকে নিয়ে কোথাও না কোথাও সে ঠাঁই নিতে পারবে।'

আমি হেসে বলছিলাম, 'তা হলে রঘুর কী হবে?'

'সব দায়িত্ব নেবার ক্ষমতা তো আমার নেই।' মনোহরা বিচলিত হয়ে বলেছিল, 'আমি তো দুকুল রাখতে শিখিনি। হয় কুল রাখতে পারি। নয় তো মান। আখড়ার কথা আমাকে ভাবতে হবে। ব্রজ এখন আগুন। প্রকৃতির মধ্যে আগুন থাকে। সে আগুন নিয়ে সবাই খেলতে পারে না। আমি নিজে একটা মেয়ে। ব্রজর অবস্থা বুঝি। কিন্তু এ আগুন আমি আখড়ায় রাখতে পারি নে। রঘু মাধব একসঙ্গে থাকলে, গোলমাল একদিন লাগবেই। আমি সব সময় হুতোশে মরব। আমি ব্রজকে বিদেয় করেছি। রঘু বউ নিয়ে বাড়ি গেছে। এখন মাধব যদি ব্রজকে নিয়ে কোথাও চলে যায়, যেতে পারে। কিন্তু সেখানেও আমার ভয় আছে। আমি যে ঘরপোড়া গরু। মাধব প্রকৃতি সেবা করতে গিয়ে, প্রকৃতিটিকেই হয়তো কোথায় বিসর্জন দিয়ে আসবে।'

আমি দ্বিধার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি তা হলে মাধবকে বিশ্বাস করেন না?'

'যদি করতে পারতাম, তা হলে আগে তো রঘু আর ব্রজর এক সঙ্গে আখড়ায় থাকবার ব্যবস্থা করতাম।'

মনোহরার চোখে উদ্বেগ ফুটেছিল, 'কিন্তু তোমাকে তো বললাম, আমাকে সব সময়ে একটা হুতোশ নিয়ে থাকতে হবে। তা আমার সইবে না। এবার তুমি বল তো, আমি কিছু ভুল করেছি?'

মন্তব্য করা কঠিন। বুঝতে অসুবিধা হয় নি, মনোহরার কাছে আখড়া কুল মান দুই-ই। মাধবের প্রতি তার বিশ্বাস নেই। অথচ সে এই আখড়ার এক বাবাজী। বরং তার প্রাণের টান রঘু আর ব্রজর প্রতি। এখানে সে মানবী। অন্যদিকে, তাকে আমি দেখছি বুদ্ধিপরায়ণা অধ্যক্ষার ভূমিকায়। বলেছিলাম, 'আখড়াকে আপনি ভেজাল মুক্ত রাখলেন। ব্রজবালার ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারছি না।'

'আমি পারছি।' মনোহরার চোখে অন্যমনস্কতা। রুদ্ধ স্বরে ছিল উদ্বেগ, 'ব্রজকে আমি বিসর্জন দিয়েছি। রঘু ওকে বাঁচাতে পারবে না। মাধব ওকে ভালবাসে না। ব্রজ মুখপুড়ি যে তা বুঝতে পারছে না, সেজন্য ওকে দোষ দিই নে। মেয়েটা যে কোথায় মরেছে, তা তো বুঝতে পারছি। রঘু যদি সামাল দিতে পারত, তা হলে সব গোল চুকে যেত। রঘু ঈশ্বরের অনাসৃষ্টি। পুরুষ মানুষের এর চেয়ে অভিশাপ আর কী আছে। তা যদি না হত, ব্রজর মত মেয়ে কখনো স্বামী ছাড়তে চাইত না। প্রকৃতির আর এক

নাম রতি। সে যখন জাগে, তখন তার বাছবিচার থাকে না। ব্রজকে কে রক্ষা করবে?'

এ সব কথার জবাব দিতে পারিনি। মনোহরার উদ্বেগ অসহায়তা আমাকে একরকমের আতুর করেছিল। সেই সঙ্গে এক নিগূঢ় বিস্ময়। যে-রমণীর এমন অনুভূতি, সে কেমন করে এই জীবন কাটাচ্ছে?

এই জিজ্ঞাসাটা রইলো আমার, জগতের সকল মহৎ প্রাণের কাছে। এক গণ্ডগ্রামের সীমানা পেরিয়ে, আধুনিকতার আলোর প্রাঙ্গণে। আমার কোনো জবাব জানা নেই। বুকের কাছে দুহাত জড়ো করে, কেবল নির্বাক অবস্থায় বিস্ময়ে মনোহরার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারি। তবু একটা জবাব পেয়েছিলাম, মনোহরার কাছ থেকেই।

মনোহরার ত্রি-রক্ষা করেছিলাম। তিন রাত্রি ছিলাম। বসে থাকিনি। সুখড়িয়া ঘুরে এসেছি। সঙ্গে ছিল নিতাই। শ্রীপুরের মিত্র মুস্তৌফি বংশেরই আর এক ধারার কীর্তি সেই গ্রামে। এখানেও সেই এক বয়ান। আনন্দরাম মুস্তৌফিও ছিলেন গঙ্গার পূর্ব তীরে উলা গ্রামে। মন কষাকষি নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে। রামেশ্বর পুত্র রঘুনন্দনের সঙ্গেও সেই একই বিরোধ বৃত্তান্ত। তিনি এপারের আঁটিশেওড়ায় এসে, গ্রামের নাম দিয়েছিলেন শ্রীপুর। আঁটিশেওড়া ছিল বাঁশবেড়ের রাজার। সুখড়িয়া ছিল বর্ধমানের রাজার অধীনে। মুস্তৌফিদের সঙ্গে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধ বিবাদের কারণ যথার্থ জানা যায় না। সম্ভবতঃ ব্যক্তিত্ব ও যশের সংঘাত। অথবা হতে পারে, সম্পত্তি আর মর্যাদার বিষয়। আনন্দরামের ছেলে অনন্তরাম চলে এসেছিলেন সুখড়িয়ায়। বর্ধমান রাজা তিলকচাঁদ, সুখড়িয়া গোপীনগর ইত্যাদি স্থান তাঁর নামে বিক্রয় কোবালা লিখে দিয়েছিলেন।

প্রথমে মনে করেছিলাম, শ্রীপুর সুখড়িয়া পাশাপাশি গ্রাম। একরকম বলতে গেলে তাই। কিন্তু দু মাইলটা কিছু না। তার মাঝে আছে কিন্তু ছোট গ্রাম আর পাড়া। বর্ধমানের দত্ত মুস্তৌফিদের বাড়ির এক বন্ধু সেই যে কবে কানে ঢুকিয়েছিল শ্রীপুর সুখড়িয়ার কথা, তারপর থেকে আর ভুলতে পারিনি। আগে বলেছি, চল্লিশের দশকে তখন বন্দুকের কারখানায় নোকরি করতাম। ছেলেবেলায় ইস্কুলের ক্লাস থেকে রূপের হাতছানি আমাকে চিরদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছে। এর কার্যকারণের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাইনি। শৈশবে বুঝতে পারিনি, জীবনটা সকলের এক মাপে ছকে বাঁধা না। এক ঔরস গর্ভে জন্মেও না।

রূপে মজেছি সেই কোন্ কালেই। কিন্তু রূপ তো মহাপ্রাণীটাকে ধরে

রাখতে পারে না। অতএব, বাঁচতে হলে কাজ চাই। শ্রম চাই। শ্রমে বিরাগ নেই। শ্রমের রকম কেমন ? মনের মতো তো ? তা হলে আর এ সংসারে রাগ চলে না। সংসারের তাবৎ মানুষের এই একটা বড় সংকট, মনের মতো কাজ মেলে না। যদি মিলতো, এ পৃথিবীর রঙ রূপ বেবাক আলাদা হয়ে যেতো। সেখানে সব আলা মাটি চাল। বৃহৎ সভ্যতার বাঘ চালের ঘরে, ঘুঁটিগুলো সব অন্য খেলোয়াড়দের হাতে। খেলার চালে ঘুঁটি চলে। ঘুঁটির নিজের সত্তা নেই।

থাক, এ সব সাতে পাঁচের কথা পেড়ে লাভ নেই। নোকরিটাও করতে পারিনি। তখন যে মনে হয়েছিল, এ সংসারে বড় অন্যায় আর অসাম্য। ওটাও একটা রূপের ফের। সেই রূপের ফেরে ফিরতে গিয়ে, নোকরি খতম্। কিন্তু সেটা জীবনে একটা নিরিখ দিয়েছিল। সেই নিরিখটাই, মানুষের অপরূপের রূপের বৈচিত্র্য। মানুষ খেলছে নানা স্থানে। সেও এক রূপের অঙ্গনে। দেখছি, আজও সেই টানেই চলেছি। ছেলেবেলায় ছিল অনেক শাসন কষন। এখনও নেই, এমন বলতে পারি না। শাসন কষনটা এখন, মর্ গিয়ে তোর রূপের ফেরে। আমরা চেয়ে দেখতে যাচ্ছি না।

এ কৈফিয়ৎ না। মনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথা। মনোহরার নানান কৌতূহল। কেমন করে দিক নির্ণয় হয় ? আগে থেকে কেমন করে জানতো পারো, কোথায় কে কোন দেব দেউল মন্দির গড়ে রেখেছে। জবাব তো একটাই। সংসারে অনেক লোক আছে, খবর তাদের গুঞ্জনে। আর দেশ পরিচয়ের ইতিহাসের সন্ধানী যাঁরা, তাঁরা আমার থেকে অনেক বড় জাতের রূপখোর। তাঁরা আদি অন্তের শুলুক সন্ধান রেখে গিয়েছেন জীবনপাত করে। ইতিহাস ভূগোল সমাজ সংস্কৃতি আর মনুষ্য সব'নখের দর্পণ থেকে দেগে দিয়ে গিয়েছেন কাগজের দর্পণে। অতএব সুখড়িয়ার আদি বৃত্তান্ত অজানা থাকবে কেন ? মনোহরা শুনে অবাক, 'এত কাল রয়েছি। পাশের গাঁয়ের কথা কিছু জানি নে। তুমি গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছ, কে কবে কোথায় এসে ঠাঁই নিলে, আর গড়বাড়ি মন্দির করলে। তা হলে তোমার রূপের খোঁজে আরো কিছু আছে। সেটা কী ?'

বলেছি, 'নিজের হদিশ করা। কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কেমন করে, আর কেন, এইটে জানার একটা সাধ। সামনেটাকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'সেটা আবার কী ?'

'ভাঙাচোরা পথের ওপর দিয়ে, নতুন সমাজটা জন্মাচ্ছে কেমন করে। সেইজন্যেই একবার পেছন ফিরে দেখা। পেছনটা চিনলে পরে, সামনের দিকের একটা দাগ দেখা যায়।'

'ভেঙে বল। আমি তোমার মত করে বুঝতে পারি নে।'

হেসে বলেছি, 'ভেঙে বলবার মতো কথা খুঁজে পাই না। আজকাল দেখি, সবাই হাল হকিকৎ সরস করে বাতলে দেয়। শুনে বুঝতে পারি না, সেই হাল

হকিকতের আগা পাছা কিছু আছে কী না। কিন্তু তারা বড় পণ্ডিত। আপনি হয় তো শোনেননি কখনো, একদল লোককে কলকাতায় আঁতেল বলে। তারা সব জান্তা।'

'আঁতেলটা কী জাত ?'

'এক অর্থে নাকি আধুনিক। তারা আধুনিক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। হাতে তাদের ধারালো তলোয়ার আছে। বেফাঁস কিছু বললেই, কুচ্ করে গলা কেটে দেয়।'

'ও বাবা ! সে তো সাংঘাতিক ! তাদের তো কোনদিন দেখিনি ?'

'দেখবেন কী করে ? তারা তো আপনাদের ধারে কাছে আসে না। কিন্তু আছেন কি নেই, তা তারা এক কথায় বলে দিতে পারে।'

'না দেখেই ?'

'হ্যাঁ, তবে বইয়ের পাতা ওলটায়। তাতেই ছক কেটে, জ্যোতিষীর মতো সব বাতলে দিতে পারে। তারা যদি বলে আপনারা আছেন, তো আছেন। যদি বলে নেই, তবে নেই।'

'তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ?'

'ওঠা বসা কথাবার্তা আলাপ পরিচয় সবই আছে।'

'তোমার মুখ থেকে যখন আমাদের কথা শুনবে, তখন কী বলবে ?'

'ইংরেজীতে ভাববে, বাঙলায় হাসবে।'

মনোহরা হেসে বাঁচেনি, 'তুমি আবার আমাকে রূপ দেখাচ্ছ।'

'সেটা সত্যি। ওটাও একটা রূপ।'

সুখাড়িয়া অচেনা জায়গা না। মনোহরা কয়েকবার ঘুরে এসেছে। তবু, বহু চক্র শোভিত অনন্তদেব শালগ্রাম শিলাটি যে আনন্দরাম মুস্তৌফির ছেলে অনন্তদেব তাঁর নিজের নামেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এ খবর জেনে সে অবাক খুশি। সময় জেনে আরও খুশি, একশো পঁচানব্বুই বছর আগে। কাঁটা ঝোপ জঙ্গল গ্রামের সর্বত্র। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা, গঙ্গার পূর্বকূলে যতোটা আস্তানা নিয়েছে, পশ্চিমকূলে এখনও ওতোটা না। তবে একেবারে অনুপস্থিত না। সেই উপস্থিতি দুশো বছরের পুরনো গ্রামকে কোথাও ছুঁতে পারেনি।

সুখাড়িয়া এখন গণ্ডগ্রাম। শ্রীপুরে মুস্তৌফিদের মতো গড় বেষ্টিত অট্টালিকা হয়নি। কিন্তু প্রাচীন বাড়িটি তার হৃত গৌরব নিয়ে, কালের থাবায় জীর্ণ বিবর্ণ। শ্যামরায় নামে আছেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি। এ যদি হয় বৈষ্ণব ধারা, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে অনন্তদেব বারোটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৈষ্ণব শৈবের পাশাপাশি বাস। তা বলে শক্তি কখনও বাদ থাকেন নি। আনন্দময়ীর মন্দির তার প্রমাণ। কালের থাবা তার গায়েও আঁচড় কাটতে ছাড়েনি। অথচ বয়স বেশি না। বাঙলা সালের বারোশো কুড়িতে প্রতিষ্ঠা। বাঙলা দেশের কোনো গ্রামে এতো উঁচু মন্দির

আর দেখেছি বলে মনে করতে পারিনি। কেতাবে বলে সত্তর ফুট আট ইঞ্চি। ঘাড় তুলে দেখতে গেলে আরও বেশি মনে হয়। মন্দিরের চূড়া সংখ্যা পঁচিশ। আঠারো শো তিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে, প্রলয় এক ভূমিকম্প। পাঁচ চূড়া তাতেই ধরাশায়ী। অবিশ্যি পরে আবার নির্মাণ হয়েছিল। কিন্তু আদিরূপের সঙ্গে কতোটা মিল, সে-খোঁজে বিফল। তবে মন্দিরের গায়ে এখনও পোড়া মাটির কারুকার্য মনোহারিণী। সেখানেও সকলের অধিষ্ঠান। রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, রাম-সীতা সিংহ বাহিনী। মন্দিরের মধ্যে শায়িত আছেন শিব। তাঁর বুকে বসে আছেন আনন্দময়ী কালী। এই বুকের ওপর বসে থাকাটা আমার মস্তিষ্কে ঝংকার দিয়েছিল। কামাখ্যা পাহাড়ে এক তন্ত্রসাধকের ঘরে একটা পট দেখেছিলাম। শায়িত শিবের বস্তিদেশে বসে আছেন নগ্ন শ্যামা। সাধক ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই শ্যামা বিপরীত-তরীতুরা। সুখড়িয়ার আনন্দময়ীও কি তাই ? দেখে সেই রকমই ধ্যান দেয়। বিপরীততরীতুরার সঙ্গে আনন্দের যোগ আছে। সে আনন্দ শক্তিসাধকের সাধন কথা।

আমার চোখের সামনে সেই কল্পনার ছবিটা ভেসে ওঠে। এই সব মন্দির বিগ্রহের গড়নদার শিল্পী কারিগররা কোথায় গেল ? একি কেবল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ? মানুষগুলোর বংশধরেরা আজ কোথায় ? মাঠে ঘাটে দরিয়ার ডিঙায় ?

আরও আছে, হরসুন্দরী কালীর মন্দির। আছে না, ছিল। নয়টি চূড়ার সবই ভূমিস্মাৎ। চারদিকে ধ্বংসের লীলা। আশেপাশের নিবিড় ঝোপ জঙ্গলে ইতিহাস নির্বাক। কেবল পাখিরা কথা কয়। পতঙ্গরা মৌনতাকে ভাঙতে পারে না। অটুট কেবল বারো শিব মন্দির। চৈত্র মাসের শেষ সংক্রান্তি আসন্ন। সব গ্রামেই এখন, গেরুয়া ছোপানো বস্ত্র অনেকের অঙ্গে। গোবিন্দগঞ্জের রাম ছুতোরের মতো। গাজনের আয়োজন সর্বত্র।

শোন, জয়বাবা বুড়ো শিবের লাগি-ই-ই-ই। আর মন্দিরের আশেপাশে দু' চার সন্ন্যাসীর জমায়েৎ। সারা দিনের উপোসের সঙ্গে, গাঁজার দম আটকায় না।

ভোরবেলা বেরিয়ে ফিরতে ফিরতে আকাশের পশ্চিম মুখ লাল। তার মধ্যে, নিতাই বৈষ্ণব গাজনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দুই চার দম দিয়ে নিয়েছে। দমের ঘরে কথা থাকে। কইতে নেই। তবে, 'বাবাজী, আপনাকে বলতে দোষ নেই। কথাটা আখড়ায় পাঁচ কান না হয়। তিলকাকে আমি রাধা স্বরূপ দেখি।'

সে তো ভালো কথা। কৃষ্ণরূপে ভাবলেই হয়। ইচ্ছে কোথায় ? তিলকার মা রাধা সেও আছে আখড়ায়। বয়স্কা বৈষ্ণবী। সে বিধবা। তিলকাও বিধবা। বয়স মাত্র আঠারো উনিশ। মনোহরা ঠাকরুণের আপত্তি নেই। গোলকদাস

বাবাজী ঝেড়ে কাসছেন না। কারণ? তিলকা প্রকৃতিটিকে তাঁর নিজের সেবনেচ্ছা। বাধা ভামিনী ঠাকরুণ। সেটা বড় বাধা না। বড় বাধা তিলকা। সে গোলকদাসের সেবা নিতে চায় না। কিন্তু তার মা চায়। কেন? না, তা হলে তিলকা আখড়ার একজন হয়ে উঠবে। কিন্তু তিলকা কি নিতাইয়ের সেবা চায়?

'তা যদি বলেন বাবাজী, পিকিতির মতিগতি বোঝা দায়।' নিতাই বাবাজী বড় অসহায় ভাবে বলেছে, 'অথচ দেখেন, গুরু আমার গোলকদাস গোঁসাই। পিকিতি সেবা তত্ত্ব দান করেছেন আমাকে। যোগবিদ্যা শিখিয়েছেন। শিক্ষা-গুরু পেলাম না। শিক্ষাগুরু ছাড়া, সাধন হয় না। তিনি হলেন শ্রীমতী। তার মতিগতি কিছু বুঝতে পারিনে। এ তো প্রেম পীরিতের মর্ম। চাইলে মেলে না। প্রেম গতিতে রসে রতি। প্রেম ছাড়া তো কিছু নেই। তাই নিয়েই আছি। কবে সে চোখ তুলে চাইবে, সেই আশায় আছি।'

রূপনগরের কতো খেলা। বাইরে সে এক রূপে। অলক্ষে অন্য ঝলক। সাধন ভজন জানি না। বহস্যও বুঝি না। দেখছি দুঃখের সাগর তিনকূলে। এক কূলে বসে কেবল সেই অথৈ দরিয়ার অকূলে চোখ। নিতাই তত্ত্ব সাধনের মুক্তি পথে যাত্রা করেছে। চোখে দেখছি এক বিষণ্ণ পুরুষ। নিতান্ত মানুষ। আর মানসিক যাতনা বয়ে বেড়াচ্ছে।

নবমীর পরে দশমীর রাত। সময় বড় কম। রাত পোহালে যাত্রা। গোলকদাস বাবাজী হেসে বলছেন, 'ত্রি-তেই তো সব নয় বাবাজী। ষড়রূপে থেকে যাও।'

কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। সম্ভবতঃ সহজিয়া ষড়রূপ, ষড়দলের কথা। ষড়দলে কি ষড়রিপু? কিন্তু আগে কোথাও যেন শুনেছিলাম, ষড়দল স্বাধিষ্ঠানচক্র। নাভির নিচে সে প্রেম সরোবর। গোলকদাসের ষড়রূপকে আমি ছ'দিন ভেবেই বলেছি, 'একাদশী পড়ে যাবে। আমাকে তার আগেই যেতে হবে।'

গোলকদাস রহস্য করে আরও অনেক কথা বলেছেন। ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মানুষটিকে কেন যেন মন নেয় নি। তিন রাত্রের মধ্যে একটা বিষয় বুঝেছি। গোলকদাস বাবাজী ক্ষমতা ভালবাসেন। বিষয় বুদ্ধি পাকা। অন্যদিকে তার সহজ সাধনায় এখনও প্রকৃতি সেবায় ঝোঁক বড় বেশি। একা রাধা প্রকৃতি তাঁর কাছে বহু প্রকৃতিতে ঝলক দেয়। আরও যা বুঝেছি, মনোহরার সঙ্গে তাঁর একটা অন্তসংঘর্ষ চলছে নিরন্তর। মনোহরা সে-কথা আমাকে স্পষ্ট করে কখনও বলে নি। সেটা তার চরিত্র না।

মনোহরাকে একটা দিনই পুরোপুরি দেখতে পেয়েছি। শেষ দিন। আগের দিনটা সুখড়িয়া ঘুরে কেটেছে। পরের দিনও ইচ্ছা ছিল, আশেপাশের গ্রামে ঘুরে আসবো। মনোহরা যেতে দেয়নি। অথচ কাছে থাকেনি। সকাল

থেকে তার বিস্তর কাজ। দেখে মনে হয়েছে, বিরাট এক সংসারের যাবতীয় দায় দায়িত্ব বহন করছে সে।

রাত্রে তার বাস দোতলার মন্দিরে। সেখানে রাত্রে কারোর প্রবেশ নিষেধ। ভোরবেলা সবাইকে যার যার কাজের নির্দেশ। কেবল ঘরে না, বাইরেও। দিনের বেলা আখড়ার আর বাইরের বাবাজী বোষ্টমী মিলিয়ে অতিথির সংখ্যা কম না। নিত্য ভোগ সকলের প্রাপ্য। অতএব, ভাঁড়ার থেকে, পাকশালায় সারাদিন সে ব্যস্ত। তার আগেই ভোরে স্নান, পূজা। মেয়ে পুরুষদের দিয়ে, গোটা আখড়া বাড়ি ধোয়া মোছা নিকানো। তার মধ্যেই বাবাজীদের নাম-চলছে। ছুটি তার বেলা শেষে। আহারও সকলের পরে। তবে, তাম্বুল তার মুখে থাকে সব সময়েই। ঠোঁট থাকে রঞ্জিত। মুখে হাসির ছটা। চোখে দ্যুতি।

শেষের দিনটা কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার সঙ্গে কথা হয়েছে অনেক। বীরভূমের এক বাউল আখড়ায় ছাড়া, আর কোথাও এমন নিবিড় আখড়াবাসী হইনি। তিলকা সারা দিনে অনেক বার চা দিয়েছে। প্রথম রাত্রের তুলনায় সে আমার কাছে অনেক সহজ হয়েছিল। ইচ্ছা করেছিল, নিতাইয়ের কথা তাকে বলবো। পারি নি। ভাবা যায়। বলা যায় না। অধিকারের প্রশ্ন আছে। এই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে একটা কথা বুঝেছি। অনধিকার চর্চাটা ভালো না।

কিন্তু নিতাই তিলকার কথা মনোহরার সঙ্গে হয়েছে। আমি তাকে নিতাইয়ের কথা না বলে পারি নি। পাঁচ কান না, এক কান করেছি। মনোহরা আমাকে হেসে জবাব দিয়েছে, 'সময় না হলে কিছুই হয় না বাবাজী। নিতাইয়ের তাল আর তিলকার তাল এক নয়। ওটা যখন মিলবে, তখন ঠিক হয়ে যাবে। বাধা আছে। সে-বাধা কোন কাজের নয়।'

সে-বাধা নিশ্চয়ই গোলকদাস গোঁসাই। আমি জিজ্ঞাসা করিনি। ভামিনীর অবকাশ বেশি। সে আমাকে পান খাইয়েছে। বলেছে, 'মনোহরার মত গুণ জানিনে বাবাজী। কিন্তু মনোহরার ত্রি তো রাখলে না?'

'তিন রাত্রিই তো কাটাচ্ছি।'

'তা সে তো সত্যিকারের তিন নয়। গৃহস্থের মঙ্গলের জন্য তেরাত্রি পোয়াতে হয়। ত্রি-তো অন্য বস্তু।' ভামিনীর টানা চোখের কালো তারায় রহস্যের ঝিলিক দিয়েছে।

বলেছি, 'আমি সেই ত্রি জানি না।'

'না থাকলে জানবে কেমন করে? থেকে যাও।'

যে-কথা মনোহরা বলে নি, সে-কথা অন্যের মানায় না। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থেকেছি। কিন্তু জানি, আমি মনোহরার অতিথি। বলেছি, 'থাকতে পারলে থাকতাম। আমার উপায় নেই।'

'উপায় তো মন।'

'মনের সেই অবস্থা নেই।'

'বাবাজী কি ত্রি বস্ত জান ?'

'না।'

'রূপ স্বরূপ-রসের কথা জানা নেই ?' ভামিনীর টানা চোখে ধনুকের টংকার ছিল।

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'না।'

'আমি বলব ?' ভামিনী যেন গোপন কথা ফাঁস করার ভঙ্গি করেছিল।

আমি জবাব দিইনি। তাকিয়েছিলাম তার রূপসী শ্যামা মুখের দিকে। ভামিনী বলেছিল, 'স্বরূপ, তুমি আগে রূপকে ধর। স্বরূপে আর রূপে মিলে, রসের জ্যোতি দেখতে পাবে।'

আমার কাছে সবটাই ধাঁধাঁ। বলেছি, 'বুঝতে পারলাম না।'

তার মধ্যেই মনোহরা এসেছে। মাথার ঘোমটা খুলে, আঁচল দিয়ে মুখ গলা মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করেছে, 'কী বোঝাচ্ছ ওকে ভামিনীদি ?'

'স্বরূপ রূপ আর রসের কথা।'

মনোহরা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে, 'জবাব দিয়েছ ?'

বলেছি, 'একথার জবাব তো আমার জানা নেই।'

'ভামিনীদি তোমাকে শান্ত হয়ে বসতে বলছে।' মনোহরার পান রাঙানো ঠোঁটে হাসির ঝিলিক। ভামিনীর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'ও রূপের ফেরে ফিরছে। বাবাজীর শেষ জানা নেই ভামিনীদি। অভেদ ভাণ্ডে মতি নেই। রূপে মজেছে, রূপ দেখেই যাবে। বসবার ঠাঁই করতে পারবে না।'

ভামিনীর অবাক মুখে গাম্ভীর্য নেমে এসেছিল, 'কেন বাবাজী, তত্ত্ব কী ?'

'দাগা খাওয়া দাগাবাজ। ধোকা খাওয়া ধোকাবাজ। বুঝলে ?' মনোহরা হেসে ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়েছে।

ভামিনীর চোখে ধন্দ, 'বুঝতে পারলাম না গো মনোহরা।'

'বাবাজী নিজেকে খুঁজছে। বিস্তর পিছু টান, দড়ি ছিঁড়ে দৌড়ুচ্ছে।' মনোহরার চোখের দৃষ্টি সরেনি আমার মুখ থেকে, 'ও কাপড় রাঙায় নি। মন রাঙিয়েছে। মন রাঙিয়েছে। ও ঠাঁই করে বসতে পারবে না। ভাল করে তাকিয়ে দেখনি বাবাজীর মুখের দিকে ? প্রথম দিন দেখে কেমন খটকা লেগেছিল, তাই দুটো দিন আটকে রাখলাম।'

ভামিনীর ধন্দ তবু কাটেনি, 'ধরতে পারলাম না।'

'বাবাজী রূপে স্বরূপ খুঁজছে।' মনোহরা গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ভামিনীর চোখের দিকে, 'সে সব আমাদের রূপ স্বরূপের তত্ত্ব নয়। জগৎ জুড়ে এত যে রূপ, সে রূপে খুঁজে ফিরছে আত্মরূপ। কী, ঠিক বলিনি বাবাজী ?' ঘাড় কাত করে তাকিয়েছিল আমার দিকে।

বলেছিলাম, 'কথাটা বড় কঠিন লাগছে। আপনার মত করে ভাবতে পারি না।

'আত্মানুসন্ধান।' মনোহরার স্বরে যেন দৈববাণী ঘোষিত হয়েছিল। সে এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখে অপলক প্রতিমা দৃষ্টি, 'মানছ ?'

এমন করে বললে, মনের কোথায় ঠেক লেগে যায়। অথচ সত্যটাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। বলেছি, রূপের ফেরে ফিরি। কোথাও কি নিজেকে দেখতে চাই না ? কারা যেন বলেছেন, মানুষের সব থেকে বড় সংকট, সেলফ্ আইডেণ্টিফিকেশন। সেই গানের মতো, 'যা ভাল করে পড় গা ইস্কুলে নইলে দুঃখু পাবি শ্যাষকালে।' 'আপনারে চিনলে পরে চেনা দেবে অপরে।' ভালো করে ইস্কুলে পড়াটা আমার কাছে সেই ধ্যানে আছে। অরূপের সন্ধান জানা নেই। রূপনগরে চলার পথে, বুকের ধুকধুকিতে সেই কথাটা কি অষ্টপ্রহর বাজে না, এখানে আমি কে ? আমি কোথায় ? কিন্তু আত্মানুসন্ধান। সে যে ভারি বড় আর গম্ভীর শোনায় ? বলেছিলাম, 'নিজেকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

'কথা বানাও, না ?' মনোহরার হাত উঠেছিল আবার মারের ভঙ্গিতে। এগিয়ে এসেছিল আর এক পা। আমার মাথার চুলে হাত ছুঁইয়ে দিয়েছিল, 'না মারব না। তুমি তোমার মত বল। সেই ভাল।'

গোলকদাস গোঁসাইয়ের প্রকৃতি ভামিনীর চোখে যে-ধন্দ, সেই-ধন্দ, 'না, তোদের কথা কিছু বুঝতে পারলাম না গো মনোহরা।'

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে আসতেই, জ্যোৎস্নাময়ী হয়েছিল রাত্রি। চৈত্রের বাতাসে কৃষ্ণকলি আর মাধবীর নিবিড় গন্ধ। সারা দিনে অনেক পাখির ডাক শুনেছি। সবাইকে চিনতে পারিনি। দোয়েল শ্যামা বুলবুলি আর টুনটুনিরা ঘরের আনাচে কানাচে। দুপুরটা সেই 'খোকা কোথা' ঘুঘুর দীর্ঘ ডাকের শোক। চড়ুই চটার কথাই নেই। কোকিল কখনও থামে না। রাত্রের বাতাস যত উতলা, নদী যতোই তরল জ্যোৎস্নায় ঢেউ তোলে, কুহু কুহু যেন ততোই বাড়ে। বাকিদের চিনতে পারিনি।

পুজারাতর শেষে, নিজের ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়েছি। পুবের জানালাটা খুলে দিয়ে, ঝুপসি অন্ধকারে জ্যোৎস্না ছড়া। মনে হলো, নিঃসঙ্গ তরল স্রোতে বহতা গলিত জ্যোৎস্না ধারা যেন কোন্ এক মাঝিকে ডাকছে।

'বাতিটা উস্‌কে দাওনি।' মনোহরা এসে ঢুকলো, 'একলা হলেই কেবল নদীর দিকে তাকিয়ে থাক ? কী দেখ তাকিয়ে ?'

মনের কথাটা মুখ থেকে খসে পড়লো, 'মনে হলো নদী বড় একলা। একটা নৌকা নেই, মাঝি নেই।'

'তা হলে একলা নদীর জন্য তোমার মন কাঁদে ?' মনোহরার ডাগর কালো চোখে বিস্ময়, 'তোমার মনের গতি কত দিকে। নদীর জন্যে মন খারাপ

করতে কাউকে আজ পর্যন্ত দেখিনি।'

বললাম, 'দেখতে ভালো লাগে।'

'কিন্তু কিছুই মনের মত হয় না।' মনোহরা হাত তুলে, হ্যারিকেনের সলতে উস্‌কে দিল, 'নিজেও জান এমন খা খা করছে কত নদী। মাঝি নেই তার জলে। তাহলেই বোঝ, কোথাও একটা মানান চাই। তা সে কথা বলে তোমাকে লাভ নেই। মানান বেমানানটা তুমি বুঝতে পার। বস।'

জানালা থেকে ফিরে এসে তক্তপোষে বসলাম। জানি, আমার কাঁধ ঝোলা জামা কাপড় সব গোছানো শেষ। এখনও আমার গায়ে মনোহরার দেওয়া ধুতি। গতকাল যে জামা ধুতি পরে সুখড়িয়া গিয়েছিলাম, তাও ধুয়ে শুকিয়ে পাট করে ঝোলা জাত হয়েছে। মনোহরা বসলো তক্তপোষের এক ধারে। চোখে চোখ পড়তেই সে হাসলো, 'কথা রাখলে, মনে থাকবে। অযত্নের কথা তো জিজ্ঞেস করতে পারিনে। তোমার মত মানুষ কখনো সে সব কথা মুখ ফুটে বলবে না।'

আমি হাসতে গিয়ে, কোথাও একটা ঠেক খাচ্ছি। দু' দিনে বুঝতে পারিনি, কোথায় যেন মনে একটা ঢ্যারা পড়েছে। বললাম, 'অথচ সবই মনে থাকবে। ডুমুরদর বাঁড়ুজ্জে মশাই এখানে আসতে বলেছিলেন। তাঁর কথা না শুনলে ভুল হতো।'

'বলছ ?' মনোহরার চোখের তারা অপলক। বুকের কাছে কি নিঃশ্বাস আটকানো ? বললো, 'সেই বাঁড়ুজ্জে মশাইকে গোঁসাই ঠাকুর মাতাল আর নাস্তিক বলেন।'

'আপনারও কি তাই মনে হয় ?'

'না।' মনোহরা মাথা নাড়লো, 'গোঁসাই যাই বলুন, নিজে ডেকে বসিয়ে তাঁর কথা শুনতেন। আমিও শুনেছি। একদিনও দোতলার ঘরে যাননি। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রাধাকৃষ্ণ দর্শন করেননি। কিন্তু চৈতন্যতত্ত্ব এমন করে বলতেন, মন্ত্রের মত শুনতাম। মোটে তর্ক করতেন না। করবেন কার সঙ্গে ? আর গীতার ব্যাখ্যা, ওরকমও কারুর মুখে শুনিনি। সবই বলতেন হেসে হেসে। গীতার কতরকমের ব্যাখ্যা। চোরের গীতা ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন, ডাকাতের ব্যাখ্যাও শুনিয়েছেন, আবার সংসারের স্বার্থপর মানুষও যে গীতার কত ব্যাখ্য করতে পারে, শুনে হেসে বাঁচিনি। আবার সাধকের ব্যাখ্যাও শুনেছি। চালচুলো নেই একটা মানুষ, মদে মাতাল হয়ে আছেন। অথচ অমন তত্ত্বজ্ঞানী দেখিনি। কৃষ্ণদাস গোস্বামীর কথা মনে পড়ে যেত। আমাদের সহজ সাধনার কথা সব তাঁর জানা। শুনলে মনে হয়, কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। নইলে অমন করে বলতেন কেমন করে ? কিন্তু সবই যেন তাঁর রঙ্গ রহস্য। বাবাজীদের পেছনে লাগতেন। গোলকদাস গোঁসাইকেও ছেড়ে কথা কইতেন না। তোমার সঙ্গে তাঁর কোথায় মিল আছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার সঙ্গে ?'

'হ্যাঁ। তুমি মদ খাও না, তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর না। তবু মনে হয়, তোমাদের মধ্যে কেমন একটা মিল আছে। নেই ?'

মনোহরা ঘাড় কাত করে তাকালো।

বললাম, 'বাঁড়ুজ্জে মশাই গুণী। আমি তা নই। তাঁকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার মনের মতো মানুষ।'

'তবেই বোঝ।' মনোহরার ঘাড়ে ঝাঁকুনি, চোখের তারায় ঝলক, 'মনের মত মানুষ হওয়া কি যে সে কথা ? সংসারে কে কার হতে পারে ? আর কেমন করেই বা তোমাদের দেখা হয় ? কে মিলিয়ে দেয় ?'

এই মিলিয়ে দেবার মধ্যে আমি কোনো অলৌকিক দৈব নির্দেশ দেখি না। কিন্তু মনোহরার সেটাই বোধহয় বিশ্বাস। এক কথায় সে-বিশ্বাসকে ভাঙতে পারবো না। অতএব তর্ক বহুদূরে। কোন্ দৈব নির্দেশে এই আখড়ায় এলাম ? থাকলাম ? মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'এবার বল, কেমন লাগল ?'

আখড়াবাসের প্রশ্ন। বললাম, 'শুধু মুখের কথা শুনলেই কি খুশি হবেন ? বলতে ইচ্ছা করে না ?'

'সত্যি বলেছ।' মনোহরার অপলক চোখ আমার চোখে, 'ভুলে যাই, তোমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। খত্ দিলে না তো ? দেবে নাকি ?'

দেখলাম মনোহরার চোখে ঠোঁটে উদ্গত হাসির উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হয়ে আছে। আমার একটি কথায় খিলখিল ঢেউয়ে আছড়ে পড়বে যেন। বললাম, 'আমি তো সবখানে খত্ দিয়ে বসে আছি।'

মনোহরার উদ্গত রুদ্ধ হাসি উল্টো কলে বইলো। ঠোঁট টিপে ভ্রূকুটি চোখে তাকালো, 'বিকিয়ে বসে আছ। কী রাগ যে হয়। ইচ্ছে করে, চুলের মুঠি ধরে ঘা দুচ্চার লাগিয়ে দিই।'

অট্টহাসি হাসতে পারি। স্থান বিশেষে ঠেক। তবু হেসে বললাম, 'মিথ্যা বলিনি।'

'কেন যে দাগাবাজ বলি, এবার বুঝতে পেরেছ ?' মনোহরা ঝুঁকে পড়লো আমার দিকে। চোখের দৃষ্টি নিবিড়, 'দাগা খেয়ে দাগাবাজ। জানতেও পার না, দাগা দিচ্ছ কোথায় ?'

বললাম, 'বিশ্বাস করুন, দাগা দিচ্ছি ভাবলে নিজেকে কেমন খাটো লাগে।'

'দাগা যখন খাও, তখন কি জানতে পার, কেন খেলে ?' মনোহরা বাঁ হাতের তর্জনী তুলে আমার মুখের দিকে দেখালো, 'এই যে এত দাগ চোখে ? টের পেয়েছিলে কি, তোমাকে যারা দাগা দিয়েছে তারা খাটো না লম্বা ? ওটা যে দেয়, আর যে খায়, সেই জানে। এ কারুর ইচ্ছেয় হয় না। যাই হোক, বিকিয়ে যখন বসে আছ তখন এমনি করেই মাঝে মধ্যে বিকিয়ে যেও। আমি কিছু কেনাকাটা করে নেব।'

বললাম, 'এদিকে এলে আবার আসবো।'

মনোহরা খিল খিল করে হেসে উঠলো। গেরুয়ার আঁচল খসলো। হাসির মুখে হাত চাপা দিল না। দু' হাতে ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়লো। তার হাসিতে আমার কথা দেওয়ার অন্তঃসারশূন্যতা বড় বেশি প্রকট হয়ে পড়লো। হাসতে গিয়ে ঠোঁট আড়ষ্ট। মনোহরা চোখ পাকালো, 'মিছে কথা ভারি খারাপ। বল, বিকিয়ে বসে আছি, কথা দেবার কিছু নেই। এইটুকু বলতে পারছ না? আমি পাড়াগাঁয়ের আখড়ার একটা বোষ্টমী, আমাকে তোমার রেয়াত কিসের?'

তাই কী? আমি আমার আধুনিকের জীবন দিয়ে, মনোহরাকে দেখছি। আধুনিকের যুক্তি তর্ক বিশ্বাস, হৃদয়ের কোন্ কুলায় এসে জীবনের অব্যর্থ সন্ধানী হয়ে ওঠে, তার সংকেত পাইনি কি? বললাম, 'আপনাকে আমার নমস্কার।'

'এমন কত নমস্কার করেছ?' মনোহরার চোখে নিবিড় প্রশ্ন।

এই মুহূর্তে, মনে আমার সুখ দুঃখের নানা দোলা। বললাম, 'অনেক।'

'এই তোমার স্বরূপ।' মনোহরা এগিয়ে এসে, অনায়াসে আমার একটা হাত ধরলো। আমার হাত টেনে নিজের কপালে ছোঁয়ালো, 'এই নাও।'

এ মনের থই পাই না। কোন্ চোরা পথে কী যেন চুঁইয়ে ঢোকে। কথা বলতে পারি না। দেখি, মনোহরার কপালের রসকলির দাগ লেগে যায় আমার হাতে। আমি তার যৌবনের ঘন সান্নিধ্যে বসে আছি। মনে পড়ছে, সে আমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়াতে পারে। শ্রদ্ধা আর বন্ধুত্ব হাত ধরাধরি করে আছে। আমি তার পায়ের দিকে তাকালাম। চিকন ত্বকে কি কিরণ।

মনোহরা আমার হাত ছেড়ে দিল, 'তা হলে এইটুকুই থাকল। স্বরূপে থেক।'

আমি মনে করিয়ে দিলাম, 'মীরাবাঈয়ের কথা কী বলবেন বলেছিলেন?'

'মীরাবাঈ?' মনোহরার চোখে জিজ্ঞাসু ভ্রূকুটি।

বললাম, 'রূপ গোস্বামীকে তিনি কী বলেছিলেন, সেই কথা?'

'তোমাকে সে কথা বলব বলিনি তো?' মনোহরার চোখে বিস্ময়, 'তুমি জান কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

বললাম, 'জানিনে।'

'তোমার বাঁড়ুজ্জে মশাই সে সব জানেন।' মনোহরার ঠোঁটে হাসি, 'কিন্তু সে সব তত্ত্বের বাখান। আমার কাছে শুনবে?'

'আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'প্রকৃতির মুখে এসব শোনার অর্থ জান?' মনোহরার ঘাড় কাত্, চোখে গভীর জিজ্ঞাসা।

মাথা নাড়লাম। মনোহরা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, 'তুমি তো তত্ত্বে নেই।

আমাকে গুরু বলে মানতে হবে যে ?'

'আপনাকে তো নমস্কার বারে বারে।'

আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম তার পায়ের দিকে। মনোহরা হাত চেপে ধরলো, 'বুঝেছি। তত্ত্বে বলে প্রকৃতি শিক্ষাগুরু। তোমার সে শিক্ষায় দরকার নেই। রূপ গোঁসাইকে মীরাবাঈ রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। গোঁসাই তো বৈরাগী, মীরাবাঈয়ের কাছে যেতে পারেন না। স্ত্রী লোক ডাকলে যেতে নেই। তার সঙ্গে আবার কিসের তত্ত্বকথা ? তা একদিন ভিক্ষে করতে করতে গোঁসাই হাজির মীরাবাঈয়ের দরজায়। মীরাবাঈ শুনলেন, এই সেই গৌড়ের বৈরাগী। মূর্খ গোঁসাই বলে হেসে চলে গেলেন। কথা বললেন না। রূপ গোঁসাইয়ের মনে খটকা লাগল। এমন ঠাট্টা বিদ্রূপ কেন ? ফিরে গেলেন মীরাবাঈয়ের কাছে। মীরাবাঈ বললেন, বিষ্ণুতত্ত্ব মানুষের শরীরে। তুমি নিজে কৃষ্ণ নও ? কী শাস্ত্র পড়েছ ? শ্রীবৃন্দাবন যদি পেতে চাও, তবে পাবে এই শক্তির কাছে।' মনোহরা নিজের বুকে হাত ছোঁয়ালো, 'বুঝলে ?'

আমি মাথা নাড়লাম। অথচ তান্ত্রিক বাউলদের সাধনার একটা সংকেত যেন রয়েছে। মনোহরা চোখ বুজে দীর্ঘ কবিতা বলে গেল। কবিতা না, তত্ত্বের বাখানি। মনে রাখা সম্ভব না। 'সহস্রদল পরম কিশোরীর মস্তক উপরে/তাহার ভিতরে রহে রজ শতধারে তাহার অঙ্গেতে হয় মানুষের গতি/ শৃঙ্গার ভজন করে বীজরূপে স্থিতি/ঈশ্বর মিলিবে বলি মানুষ চলি যায় আগে রক্ত চলে পাছে রস রূপে ধায়।'

মনোহরা কতোক্ষণ বললো, কতোক্ষণ শুনলাম, ঘড়ির ঘণ্টায় তার হিসাব নেই। কিন্তু আমার বিভ্রান্ত বিস্ময়ের সীমা নেই। মীরার ভজন নামে এতোকাল অনেক গান শুনেছি। এমন পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব কখনও শুনি নি। শুনে থাকলেও বুঝতে পারি নি। বিরহে কাতর, মিলনে সুখ, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এমন পদ মীরাবাঈয়ে শুনেছি। মনোহরা অনায়াসে যে-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলো, সে তো সেই বেদ বহির্ভূত তান্ত্রিক ব্যাখ্যা। এখানে সেই ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের কথা। পদ্ম কেমন করে ফোটে, ফুলের রসে কী ভাবে সাধন হয়, সেই কথা। সহস্রদল হতে রজঃস্রোতের সঙ্গে রসরাজের মিলন ঘটে। তিন দিন তিন রূপে থেকে সহজ মানুষ রূপে তাঁর প্রকাশ। প্রকৃতি পুরুষের শৃঙ্গারে ঊর্ধ্বগতি হয়ে, যুগলের নিত্যরস লীলা সাধন। এ তো বাউলের তত্ত্ব। কে আগে, কে পরে ? ইতিহাসের সংকেত বোধহয়, সহজিয়া বৈষ্ণবই বাউলের আগে। কিন্তু মীরাবাঈকে যে চিরদিন অন্যরূপে দেখে এসেছি। তাঁর এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা জানা ছিল না।

মনোহরাকে মনে হলো, সে যেন গভীর সুপ্তি থেকে জেগে উঠলো। ঘামে ভিজে গিয়েছে মুখ গলা। ভিজে উঠেছে বুকের জামা। যেন সম্মোহিতা। চোখ আরক্ত। খোলা দরজার বাইরে দশমীর জ্যোৎস্নার তরঙ্গ। আখড়ার

লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। কেবল কুহু কুহু কখনও থামে না। অম্বুরি তামাকের মৃদু গন্ধ গোলকদাস বাবাজীর অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। মনোহরা আস্তে উঠে দাঁড়ালো। পুবের জানলার কাছে গেল। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কিন্তু মস্তিষ্কের কোষে কোষে নানা জিজ্ঞাসা যেন অজস্র বন্দীর মতো চিৎকার করছে।

সিতশোণিতবিন্দুযুগলং। রজঃবীজের মিলন। দেহতত্ত্বের সেই এক ব্যাখ্যা। আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি মনোহরা। তার সাধনা কী? এই তত্ত্বের সঙ্গে, তার যোগ কোথায়? 'আলিঙ্গনে ভাব পূর্ণ কান্তিতে চুম্বন শৃঙ্গারে প্রেম রস বাঞ্ছিতপূরণ।'...মনোহরার কথা। যৌবন যার সারা অঙ্গে জ্যোৎস্না তরঙ্গ দরিয়ায় উথালি পাথালি। সে কেবল বিগ্রহের কাছে সঁপে দিয়ে আছে। তবে কেন, 'কাম রতিতে ঊর্ধ্বগতি।'

'অনেক রাত হল বাবাজী। এবার খেতে দিই।' মনোহরা সরে এলো জানালার কাছ থেকে। কিন্তু তার দৃষ্টি নেই আমার দিকে।

বললাম, 'চলুন যাই।'

'আজ আর এত রাত্রে যেতে হবে না কোথাও। ঘরে বসেই খাও।' মনোহরা ঘরের দরজার কাছে গেল, 'নিতাই এখানে আছে। হাত মুখ ধুয়ে এস।'

হাত ধুয়ে ঘরে ফিরে দেখি, আসন পাতা। কলাপাতায় ভোজ্য। গেলাসে জল গড়ানো। আখড়া নিঝুম। মনোহরা বসে আছে মেঝের এক পাশে। মহাপ্রাণীও কোথায় ঠেক খেয়েছে। ক্ষুধা বড় মন্দ। কিন্তু দেরি করা অনুচিত। আমার শেষ না হলে মনোহরার ছুটি নেই। কোনোরকমে খাওয়া সাঙ্গ করলাম। তিলকা এসে আমার পাতা গুটিয়ে নিয়ে চলে গেল। হাত মুখ ধুয়ে আবার ঘরে এলাম। মনোহরা হাসলো। অথচ তার মুখে সেই আচ্ছন্নতা। আমার মস্তিষ্কের বন্দী গরাদ ভাঙলো, 'মনোহরা দেবী!'

'দেবী?' মনোহরা অবাক চোখে তাকালো, 'বাবাজীর গোল হল। দেবী নই, দাসী। বাবা মা নাম রেখেছিলেন দুর্গা।'

সেও তো সুন্দর নাম। কিন্তু কহিতে ডরাই। অথচ মস্তিষ্কের বন্দীরা গরাদ ভাঙছে, 'এই যদি মূল তত্ত্ব তবে আপনি—?'

কথা শেষ করতে পারি না। মনোহরা মাথা নাড়লো, 'অনেক নিংড়ে নিয়েছ বাবাজী, আর নিও না।'

একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। কিন্তু মন গলে পাথরের গহ্বরে। মনোহরার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারি না। এর মধ্যেই যেন তার চোখের কোলে কালি পড়েছে। চিহ্ন নেই, অথচ আঘাতে ভরা মুখ, 'কী বলতে চাও জানি। সংসারে কি সকলের সব কিছু পেতে আছে? চাইলে মেলে কী?' জবাব দিতে পারলাম না। মনোহরা দু'হাত ছড়িয়ে, নিজেকে দেখালো, 'এই আমার

মধ্যে আছি। অনেক মার তো খেয়েছি। এখন চিকিৎসে হচ্ছে। আমার যা পাওয়ানা নেই, তা ধরতে আমি ছুটব না।'

বন্দী এখন ক্ষ্যাপা। এটা ভালো না। কিন্তু কথা শোনে না। বললাম, 'তবে আপনি এখানে কেন?'

'কোথায় যাব? তুমি নিয়ে যাবে?' মনোহরার শুকনো ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'সংসার তো আপনার জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। আমি কেন?'

'কোন্ সংসার?' মনোহরার চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

আমার মুখে সহসা কথা ফুটলো না। মনোহরা রুদ্ধস্বরে বললো 'বল।'

বললাম, 'মাফ করবেন, আপনাকে দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু সংসারেও কতো শ্রী। আপনার নাম তো দুর্গা।'

'তা হলে এবার শিবকে ডাক, দাঁড়ি খানেক বিয়োই।' মনোহরার স্বরে তীব্র বিদ্রূপ, 'আঁচলে চাবি ঝুলিয়ে, দাপিয়ে সংসার করি।' বলতে বলতে সে দরজার কাছে, 'শুয়ে পড় বাবাজী।' সে দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ কেবল ভর্ৎসনা না। মনোহরা আমার মুখের ওপর দরজা টেনে দিয়ে গেল। সহজ করেই কথাটা বলতে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, আঘাতটা কোথায় লেগেছে। এখন নিজেকেও অপমানিত মনে হচ্ছে। শেষ রাত্রির, শেষ বিদায়টা গ্লানিতে ভরে গেল। বোধহয় অধিকার বোধটাকে ভুল করেছিলাম। কিন্তু অপমানই বা ভাবছি কেন? আমি তো মনোহরার কাছে নিজেকে অস্পষ্ট রাখিনি। তঞ্চকের ভান নেই। ছলনার আশ্রয় নিই নি। তবে থাপ্পড় খেয়েও হাসি ফোটে। আমি তেমনি হেসে পুবের জানালার কাছে গেলাম। মনোহরাকে ভুলতে পারব না। রাত পোহালে চলে যাব। হয় তো দেখা হবে না। ক্ষমাও চাইব না আর মনে মনে। জীবনে সেও একটা দান দিয়ে গেল। ঝোলায় রাখি।

রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না। স্বাভাবিক। তবু শেষ রাত্রে মধুমাসের বাতাসে নেশা লেগে গেল। চোখ মেলে দেখি, জানালায় গাছের ফাঁকে রক্তিম রোদ। প্রায় লাফ দিয়ে উঠলাম। হিসাবটা আগেই ছিল। গুপ্তিপাড়ার দূরত্বকে হেঁটে সামিল করা যাবে না। সেই আবার বলাগড় ইস্টিশন। পা চালিয়ে গেলে, প্রথম রেলটা পেতে পারি। হাতে মুখে জলের ঝাপটা, পথেই হবে। জলাশয়ের অভাব নেই। ঝটিতি জামাকাপড় বদলে নিলাম। বিন্যস্ত হবার কিছু নেই। ঝোলা কাঁধে করলাম।

দরজায় মনোহরা এসে দাঁড়ালে। স্নান শেষ। ঘোমটা নেই। ভেজা চুলে ঝরে পড়া জলের কণায় হীরা জ্যোতি। যোগিনী বেশ। মুখ শীর্ণ, চোখের কোল বসা। ঠোঁটে হাসি, 'ভাবছিলাম ঠিক, চোরটা এ ভাবেই পালাবে। তবু ধরা পড়ে গেলে।'

আমার মান অপমান অভিমান, কিছু নেই। দুঃখ যেটা, মনোহরার নোকষ্ট। তা দূর করে যাবার কথা একবারও ভাবিনি। কারণ যা যায় না, তা যায় না। তাকে আমার যেখানে রাখবার রেখেছি। হেসে বললাম, 'কলকাতার প্রথম গাড়িটা ধরতে চাই।'

'কলকাতায় ফিরে যাচ্ছ?' মনোহরার চোখে ভ্রূকুটি বিস্ময়।

বললাম, 'না। কলকাতা থেকে যে-গাড়িটা আসছে, সেটার কথা বলছি।'

'তার জন্য কি হাতে মুখে জল দেবারও সময় নেই?'

'দেরি হয়ে যাবে। আরো আগে উঠতে পারলে ভালো হতো। পারলাম না।'

'রাগ করেছ?' মনোহরার স্থির দৃষ্টি আমার চোখে।

বললাম, 'আপনার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবো না। দেখুন।'

মনোহরা এগিয়ে এলো কাছে। যেন সত্যি দেখবার জন্যই, তাকালো আমার মুখের দিকে। তারপরে হঠাৎ তার সেই হাসি, যা মুখে হাত চাপা দিয়ে রুখতে হয়, 'দেখলে তো, আসলে আমি একটা মেয়ে। আর কিছুই নই। কথাটা তো মিছে বলিনি। কিন্তু এখানে যে দরজা বন্ধ। এ জীবনে আর বেরতে পারব না।' নিজের বুকে হাত রাখলো। ভেজা চুলের জলের কণা কি তার চোখের কোণে টলটলায়?

মনোহরার হাসি দেখে, আমার মনটা ধুয়ে গেল। রাত্রে যে গ্লানিটা বোধ করেছিলাম, তার ছিটে ফোঁটাও নেই। সে যে একটি মেয়ে, স্বীকারোক্তিটা বড় সরল। জানি, সে তার অধিক কিছু। অন্যথায় এমন করে চোর ধরতে আসতো না। বললাম, 'তবু, দুঃখ দিয়েছি।'

'না।' মনোহরা মাথা নাড়লো, 'ঘা মেরেছ। বড় আচমকা। জেনে শুনে অমন করে মারতে আছে?'

বলতে পারি না, জেনে শুনে মারি নি। ভিতর থেকে মারটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল। রূপ দেখে ফিরি। সে রূপটা সংসার ছাড়া না। সংসারের রূপটাই, এমন মূর্তি ধরে বেরিয়ে এসেছিল, মনোহরার কাছে সেটা মারমূর্তি। তাকে আমি আপনি ছাড়া বলিনি। সে আমাকে বলতেও বলেনি। এটা তার চরিত্রের একটা লক্ষণ। সে আমার থেকে বয়সে বড় কিংবা ছোট, জানি না। কথা শুনে ইচ্ছা করলো, তার মাথায় একটু হাত রাখি। পারলাম না। বরং যে দুঃখ সে মনের স্বস্তিতে বয়ে বেড়াচ্ছে, সেটাকে করুণা করার সাহস যেন না করি। সামনে মাথাটা পেতে দিয়ে বললাম, 'যেমন খুশি শোধ নিন।'

'তা পারছি কোথায় বল।' মনোহরা চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে হাসলো, 'এ শোধ হাতে মেরে, পাতে মেরে হয় না। তোমাকে রক্তগঙ্গা করলেও হয় না।

তবে একটা শোধ নেব। যেচে এসেছ, ধরতে পারলাম না। নিজের হাতেই শোধ দিয়ে যাও।'

বলললাম, 'বলুন কী শোধ দেবো ?'

'যেমনি করে এসেছিলে, আবার তেমনি করে এস। দেবে এই শোধ ?' মনোহরা ঘাড় ঝাঁকিয়ে আরও সামনে এসে দাঁড়ালো।

তার ভেজা চুলের জলের ছিটা লাগলো আমার গায়ে মুখে। শান্তিবারির মতো। মনে পড়লো তার সেই খত্‌ দেবার কথা। সে আবার বললো,

'আমার জীবনটা কেমন, দেখলে তো। তুমি, আর যাঁর কথায় এখানে এসেছ, তাদের মত লোকেরা এলে মনটা ভাল থাকে।'

হেসে বললাম, 'মিছে কথা ভারি খারাপ।'

'আমার কথাই আমাকে ?' মনোহরা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখ পাকালো। পরমুহূর্তেই হেসে আমার এলো চুলে তার ঠাণ্ডা হাত ঘষে দিল, 'মিছে কথা দেবার চেয়ে এই কথা ভাল। তবু বলে রাখি, তুমি রূপখার। নেশা তো একটাই। বড় খারাপ নেশা। এ নেশার অনেক রঙ। একটাতে মৌতাত মজে না। যদি মনে থাকে, ইচ্ছে করে, আবার এস।'

বললাম, 'যেন আসতে পারি। আমার যে এ তিন রাত্রি—।'

মুখে হাত চাপা পড়ে গেল। একটা ত্রস্ত ব্যগ্রতা মনোহরার স্বরে, 'বলো না। ওই ভয়ে তোমাকে একবারও জিজ্ঞেস করিনি, কেমন লাগল। আমি তোমার কতটুকু জানি ? কিছুই না। তুমি একবার মাত্র বলেছ, লেখ। তাইতে একটা আন্দাজ করতে পারি।' সে আমার মুখ থেকে হাত নামিয়ে বুকে রাখলো, 'আমার এখানটা একেবারে পাথর নয়। হয় তো মনে থাকবে। আর একটা দেখলাম, তুমি জোরে বল না।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কী ?'

'যারা লেখাপড়া করে, শহরে থাকে, তারা বড্ড জোরে বলে।' মনোহরা শব্দ করে হাসলো, 'এত জোরে বলে, কারুকে দাঁড়াতে দিতে চায় না।'

মনোহরার চোখের কালো গভীরে তাকিয়ে কথাটার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি। তারপরে হঠাৎ হেসে উঠি। বলি, 'আমি তেমন শহরবাসী নই। তেমন লেখাপড়ার লোকও নই। আমি কারোকে কিছু শেখাতে আসিনি, জোর থাকবে কেমন করে ?' হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

'ঘড়ি দেখো না।' হাতটা সরিয়ে দিল, 'নিতাই বাবাজী বাইরে আছে। সে তোমার সঙ্গে ইস্টিশনে যাবে। এখন কোথায় যাবে, সে কথা ভুলেও জিজ্ঞেস করব না। কিন্তু যাবার আগে আর কিছু বলে যাবে না ?'

মনে কথাটা এসেছিল। উচ্চারণ করলাম, 'ব্রজর কথা জানবার ইচ্ছেটা মন থেকে যাচ্ছে না।'

'বিশ্বাস করবে ?' মনোহরার চোখে উপছে পড়া বিস্ময়, 'ভাবছিলাম,

কথাটা তুমি কি একবারে ভুলে গেছ ? ওর বিসর্জনের কথাটা তোমাকে জানাব কেমন করে ?'

মনটা ভার হয়ে এলো। বললাম, 'বিসর্জনেই যাবে, এমন বলছেন কেন ?'

'বলেছি, ওকে আমি বিসর্জন দিয়েছি।' মনোহরার চোখে উদ্বেগ, 'তুমি কত কি দেখেছ। আমিও যে দেখছি। ব্রজ বিসর্জনে যাবে। কী মূর্তি নিয়ে যাবে, তাই ভেবে গায়ে কাঁটা দেয়। অন্ততঃ ব্রজর খোঁজেই একবার এস।'

মনোহরার কথার পরে, আর ব্রজর জন্য আসবার দরকার নেই। আমি লোকসমাজের যুক্তি বিচারে একটা সামান্য কথা বলেছিলাম। মনোহরাকে তা আঘাত করেছে। তার দৃষ্টি কতো দূরে, কতো সজাগ তার সহজ মন, সেটাও ভাবা উচিত ছিল। আমি সমাজ সচেতন ? মানুষকে ফেরাবো তার আপন সত্তা থেকে। যে সত্তার গভীর আমার অনুমানের বাইরে। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম। মনোহরা জিজ্ঞেস করলো, 'কী ?'

বললাম, 'বলি বটে রূপের ফেরে ফিরি। আসলে ফেলে আসা জগতটা ছাড়ে না, তাই কাকে কী বলতে হয়, সব সময়ে ঠিক করতে পারি না। আপনাকে আমার কাল রাত্রে শেষ কথাটা বলা ঠিক হয়নি।'

আবার সেই কথা কেন ?' মনোহরা মুখ তুলে তাকালো। চোখে করুণ ব্যগ্রতা, 'তোমাকে তো বললাম, আমি একটা মেয়ে। নইলে তোমার ওপর অমন করে রেগে যেতাম ? চোট খেতাম ? সারা রাত্রি কাঁদিয়ে এখন আর এসব থাক।'

তাই থাকবে। ব্রজর কথা উঠলো বলেই, মনোহরার চরিত্রের অন্য দিকটা নতুন করে চোখে পড়লো। তার মুখ থেকে চোখ নামিয়ে, পায়ের দিকে তাকালাম। সে আমার চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরলো, 'এস।'

ঠিক এমনি করে বিদায় চাইনি। তার পায়ের দিকে যে কেবল শ্রদ্ধা করে তাকিয়েছি, তা না। আমার রূপের প্রাণটা পুরুষের। বন্ধু বিদায় কি এমনি করে হয় ? বললাম, 'একবার। ক্ষতি কী ?'

'সত্যি বলছ ?' মনোহরার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

বললাম, 'মিছে কথা ভারি খারাপ।'

'তবে এস।' মনোহরা আমার মাথার চুল ধরে নামিয়ে দিল তার পায়ের কাছে।

আমি নত হয়ে মনোহরার পা স্পর্শ করলাম। শীতল পা দুটিতে হাত দিয়ে, সেই মুহূর্তে আমার সকল যুক্তি বুদ্ধি বাস্তবতা, সেই উপলব্ধিতেই পেঁছে দিল। নারী শক্তিস্বরূপিনী। ত্রিভুবনধারা। দেহস্বরূপিনী। তুমি তপ, জপ। তুমি জননী, তুমিই সখি। তুমি প্রেম, তুমি ইষ্ট। মাথা তুলে দাঁড়ালাম। মনোহরা স্থির অচঞ্চল। দুই চোখ বোজা। ধ্যানস্থ

মূর্তি। কিন্তু চোখের দুই কোণে টলটলে মুক্তা বিন্দু। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত।

খোলা দরজার দিকে চোখ পড়লো। নিতাই ভামিনী তিলকা তিলকার, মা, অনেকেই দাঁড়িয়ে রয়েছে দাওয়ার ওপর। সম্ভবতঃ তারা আমার নমস্কারের ঘটনাটি দেখেছে। তাদের চোখের বিস্ময়ে যেন অলৌকিকতা। কেমন একটা আড়ষ্টতা বোধ করলাম। কিঞ্চিৎ লজ্জাও। সংসারের চোখে হয় তো এ এক দৈব নাটকীয়তা। কিন্তু আমার ভিতরটা ধুয়ে সাফ সুরত্। দূরের আকাশে উড়ে যাওয়ার খুশি স্পন্দন আমার ডানায়। উচ্চারণ করলাম, 'যাই।'

মনোহরা নিশ্চল। চোখ খুললো না। ঠোঁট কাঁপলো না। একটা কথা বললো না। চোখের কোণের মুক্তা বিন্দু গলে পড়লো। আমার মাথা টেনে নামিয়ে দিয়ে সে বিদায় জানিয়ে দিয়েছে। আর তার কিছু বলায় নেই। আমি ঘরের বাইরে এলাম। সবাই আমার পথ ছেড়ে দাঁড়ালা। পূবের ঘরের দাওয়ায় বসেছিলেন গোলকদাস গোঁসাই। গড়গড়ার নল গড়াগড়ি যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে প্রাতঃকৃত্যাদির পূর্বে তামাকু সেবন হচ্ছিল। তাঁর চোখেও দেখছি একটা বিস্ময়ের ঘোর। কাছে গিয়ে হাত জোড় করে নত হলাম, 'যাচ্ছি।'

'তা তো যাচ্ছ বাবাজী। আমার আখড়া মজিয়ে গেলে।' গোলকদাসের ম্লান হাসিতে এই প্রথম বিষয়ী ব্যক্তি অনুপস্থিত, 'আবার কবে আসা হচ্ছে?'

অনায়াসেই বললাম, 'সুযোগ পেলেই আসবো।' এখানে কেন যেন, 'মিছে কথা ভারি খারাপ' ধ্যানে এলো না। তার পায়ে হাত দিতে পারলাম না। আমার অন্তর্যামী দায়ী। ফিরে সকলের কাছে জোড় হাতে বিদায় নিলাম। উঠোনে অনেকে দাঁড়িয়েছিল। সেই রাধা কৃষ্ণরূপী বালক বালিকারাও। স্বয়ং গন্ধবাবা। তার নামের পরিচয়টা পরে জেনেছি। জাঁকটা তার একেবারে-মিথ্যা না। আখড়ার সে প্রধান পাচক। নিরামিষ রান্না সে সত্যিই গন্ধেই ভোজন করিয়ে দিতে পারে।

এখন কৃষ্ণকলির ঝাড় শুকনো। মাধবী লতা বাতাসে দুলছে। তলায় ঝরে পড়ে আছে, নিজেকে নিঃশেষ করা গত রাত্রের অবশিষ্ট নিয়ে। বাতাস বড় এলোমেলো। কাঁচা আমের গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি চোখ তুলে ভামিনীকে খুঁজলাম। সে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল কাছেই। আমার গোনা গুনতি কড়ির হিসাব ছিল। হাতে রেখেছিলাম যৎসামান্য। ভামিনীর সামনে গিয়ে, হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'রাধামাধবের সেবায় দেবেন।'

'আমাকে কেন বাবাজী?' ভামিনীর টানা চোখে বিস্ময়ের চমক, 'মনোহরাকে দিলেন না কেন?'

বললাম, 'একই তো কথা। আপনি রাখুন।'

ভামিনী মুখ ফিরিয়ে তাকালো গোলকদাস গোঁসাইয়ের দিকে। গোলকদাস হেসে বললেন, 'মাথা পেতে নাও গো।'

ভামিনী হাত বাড়ালো। তার হাতে আমার যেটুকু সঙ্গতি তুলে দিলাম। দক্ষিণের ঘরের দরজা খোলা। মনোহরাকে দেখতে পাচ্ছি না। বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। নিতাই আমার সঙ্গে।

বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের মুখটা মনে পড়ছে। ডুমুরদহ থেকে হেঁটে গুপ্তিপাড়া যাবার কথা শুনে তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়েছিল। তার চেয়ে আমার আক্কেলে তিন গুড়ুম। রেল লাইনের হিসাবেই, বলাগড় থেকে গুপ্তিপাড়া ষোল মাইল। রূপের নেশায় মাতাল হওয়া ভালো। অন্ধ হওয়া না। হাঁটা পথের আঁকাবাঁকায় আরও কোন্ না দু চার মাইল বাড়তো।

গাড়িটা পেয়েছিলাম। দৌড়ুতে হয়েছিল। তবে সেটা প্রথম গাড়ি না। দ্বিতীয়। প্রথমটা আরও আগে। টিকিট কাটতে হিমসিম। অন্য কারণে না। টিকেটদাতা মানুষটির চাল বড় গদাইলস্করি। নিতাই পথে আসতে অনেক কথা বলেছে। সব কথার আগে পিছে তিলকা। শুনেছি, বলিনি কিছুই। মনোহরার মন্তব্য আমার মনে ছিল। গাড়ি ধরবার আগে, তাকে একটি টাকা দিতে যেতেই, সে সাপ দেখার মত সরে গিয়েছিল। বলেছিলাম, 'আমার নাম করে, একটু দম দেবেন। ওতেই আমি নিতাই ভোম্ হয়ে যাবো।'

নিতাইয়ের কী হাসি! ভোলবার না। কিন্তু তার শেষ কথাটি চিরদিনের। গাড়ি ঢুকছে ইস্টিশনে। সে আমার কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'বাবাজী মনোহরা দিদির মধ্যে আপনার দর্শন হয়েছে ?'

দেখেছিলাম, নিতাইয়ের চোখে অলৌকিক ব্যাকুলতা। নিতাইয়ের 'দর্শন' বুঝি। সে দর্শনে আমার বিশ্বাস নেই। নিতাইকে তা বোঝাবার সময় ,মন কোনোটাই ছিল না। বলেছিলাম, 'হয়েছে।'

গুপ্তিপাড়ায় এসে, পথ ঠিক করা ছিল। গত মাঘে যে-পথে ফিরেছিলাম, সেই পথেই হাঁটা গ্রামের ভিতর দিয়ে, গন্তব্য অনেক ঘোরা পথ। উত্তর পূবে মুখ করে চলো। গ্রাম থাকবে দক্ষিণে। শ্রীপুর সুখড়িয়ার থেকে কোনো অংশে কম না। বরং দেব দেউলে, নানা মহোৎসবে গুপ্তিপাড়ার টান দেশ দেশান্তরে।

মনে নানা সংশয় ছিল। এমন করে আসবার কথা না। আজ একাদশী। কাল দ্বাদশী চৈত্র সংক্রান্তি। গাজনের সন্ন্যাসীর দেখা সবখানে। আমার গন্তব্য গুপ্তিপাড়া কালনার মধ্যবর্তী স্থানে। হুগলীর শেষ, বর্ধমানের শুরু। শ্যামাক্ষ্যাপার আশ্রমে। গত মাঘে তাঁর সঙ্গেই ত্রিবেণী থেকে নৌকোয় এসেছিলাম। প্রতি পূর্ণিমাতেই প্রায় ত্রিবেণীতে গমন করেন। নৌকোযোগে।

সঙ্গে থাকে কিছু পালিতা পুত্র কন্যা। তিনি সিদ্ধপুরুষ। সেটা পরে জেনেছি। তবে সিদ্ধ অসিদ্ধ আমার জ্ঞানের বাইরে। ত্রিবেণীর ঘাটে একটা আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছিল। দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে এক দেহপজীবিনীর শববাহী হয়েছিলাম। স্নান করতে গিয়ে দেখেছিলাম, ঘাটে নৌকো বাঁধা। নৌকোর সাজগোজ ভালো। সাধক একজন বসে, হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন। মাথায় তাঁর ধূসর রঙের বড় বড় চুল পিঠে ছড়ানো। উচ্চনাসা, উজ্জ্বল টানা চোখ। শক্ত সমর্থ দীর্ঘ শরীর। হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিলেন তন্ময় হয়ে। সেরকম বাজনা কলকাতার নামকরা বাজনদারের হাতেও আওয়াজ দেয় কিনা সন্দেহ। মুগ্ধ হয়েছিলাম। মন্দিরা বাজাচ্ছিল এক তরুণ। তার গায়েও গেরুয়া। শ্যামাক্ষ্যাপার কপালে লাল ফোঁটা। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। কিন্তু তন্ময় সাধক বাদক তাঁর ভুরু নাচিয়ে আমাকে যেন কী ইশারা করছিলেন। আর হাসছিলেন। অন্য দিকে আধুনিকা বালা। ফরসা রূপসী বলা যায়। নীল শাড়ি লাল জামা। শাড়ি পরার ধরনটা বেশ কায়দাদুরস্থ শহুরে। খোলা চুল পিঠে ছড়ানো।

শ্যামাক্ষ্যাপা আমাকে টেনে নিয়ে এসেছিলেন এখানে, তাঁর আশ্রমে। পরিচয়ে জেনেছিলাম, পুত্র কন্যারা সব পথ থেকে কুড়ানো। কিন্তু পরিচয়, সব তাঁর নিজের ছেলে মেয়ে। সকলের নাম তাঁর নিজের দেওয়া। নৌকোয় দেখেছিলাম দুজনকে। গঙ্গা আর যমুনা। রূপ দেখেই নাম স্থির। আশ্রম শাখা করেছেন আরও কয়েক জায়গায়। নিজেকে মহৎ করার চেষ্টা দেখি নি। মেয়েদের ঠিক মতো মানুষ করে, সৎপাত্রে দান। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। তার মধ্যে, তাঁর মনের মতো কোনো কোনো ছেলেকে, বিভিন্ন জেলায় আশ্রমের দায়িত্ব দিয়েছেন।

কেমন করে আমাকে তার নৌকোয় তুলেছিলেন, ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে খবর আছে মুক্ত বেণীর উজান যাত্রায়। তিনি নিজে সাধক পরিচয়ে আমাকে টানেন নি। বেশ্যার শববাহীকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তাঁকে প্রথম দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাজনায় হাতের জাদু দেখে। তারপরে হাট করে খোলা এক প্রসন্ন প্রাণের আশ্রয়। গঙ্গা যমুনার স্বরে গানের জাদু। বিশেষ, শক্তি তত্ত্বের। কেবল সেই গানের সময় তাঁর দু চোখের কূলে জল গলে। দাড়ি গোঁফের ভাঁজে ভাঁজে হাসি। খবর ছিল মাঘেই, যমুনার বিয়ে একরকম স্থির। শ্যামাক্ষ্যাপার এক ভক্ত, কলকাতার ডাক্তারের সঙ্গে। গোলমাল গঙ্গাকে নিয়ে। বিদায়ের দিন ভোরে, গঙ্গা আমাকে সেই নিষিদ্ধ স্থান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। নিষিদ্ধ, কারণ শ্যামাক্ষ্যাপা চান না সেই স্থান দর্শনের কোনো প্রচার মহিমা। গঙ্গা তাঁর অনুমতি নিয়ে আমাকে দেখিয়েছিল। লোহার শিকে ঘেরা, পঞ্চমুণ্ডির আসন। তখন গঙ্গা ব্যক্ত করেছিল, ও না আছে ঘাটে। না বাইরে। আশ্রমের বাইরে বিবাহিত জীবনের কল্পনা ওকে

ভয়ে শিহরিত করে। অথচ ওর সমস্ত প্রাণ, রমণী স্বভাবে বিকশিত হতে চায়। শুনে আমার নিজের মনেই গভীর উৎকণ্ঠা জেগেছিল। কেন যেন কপালকুণ্ডলার কথা মনে পড়েছিল। অথচ জানতাম, শ্যামাক্ষ্যাপা কাপালিক নন। তিনি আর কোনোরকম ধর্মাচরণই করেন না। কেবল সাপ নিয়ে খেলা করেন। হারমোনিয়াম বাজান, মন্দিরার তালে। আর সজাগ দৃষ্টি তার ছেলে মেয়েদের সম্পত্তির দিকে। বুঝেছিলাম, তিনি এক নিরালা আশ্রমে বসে, অনেককে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। ভাগ্যবানের বোঝা বইবার জন্য, ভগবান বলে কেউ আছেন কী না, তার হদিশ পাইনি। তাঁর কর্তব্যের দয়া নিতে অনেকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা বুঝেছি।

কিন্তু তাঁকে নিয়ে নানারহস্য কাহিনী। তিনি কালীর সেবক ডাকাত। তিনি ডাকাতের দল পোষেন। লুটপাট করেন। সুন্দরী মেয়েদের আশ্রমে রাখেন। সবই অবিশ্যি তাঁর মুখ থেকে শোনা। কিছুটা ত্রিবেণীতে গৌরহরি চক্রবর্তীর কাছে। তবে গৌরহরিরও সবই শোনা। চোখে দেখেন নি কিছুই। বরং গৌরহরি চক্রবর্তী আমাকে শ্যামাক্ষ্যাপার আমন্ত্রণ নিতে অনুরোধ করেছিলেন।

ইস্টিশন থেকে তিন মাইলের ওপর পথ। শ্যামাক্ষ্যাপার স্থানীয় নাম ক্ষ্যাপাবাবা। ক্ষ্যাপা তো বটেই। তবে রক্তচক্ষু উগ্র না। বজ্র হুংকার ব্যোম্ ব্যোম্ নেই। অট্টহাসি আর গান। কেবল একটা বিষয়ে আমার গায়ে কাঁটা। উনি সব সময়েই প্রায় সাপ জড়িয়ে থাকেন। সে সাপের বিষ আছে কী না জানি না। রাজ সাপ সন্দেহ নাই। দুরন্ত তার ফণা, ফোঁস শুনলে বুক হিম।

আশ্রমের পাঁচিলের ধার ঘুরে, দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। গাছপালায় নিবিড় ছায়া। ইঁট পাতা রাস্তা। বাগানের এক পাশে কয়েকটি ঘর। মূল মন্দির বাড়ি আলাদা। ভিতরে মন্দির সংলগ্ন উঁচু নাটঘর। নাটঘরের নিচে দু পাশে ঘর। একপাশে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। সামনে আর একটা বাগান। আশ্রমের ছেলেমেয়েদের বাসস্থান আলাদা। সেদিকেও বাগান, আর বড় একটা পুকুর। পানীয় জলের জন্য দুটো টিউবওয়েল আছে। কুয়ো আছে একটা। মন্দিরকে মাঝখানে রেখে, একদিকে মেয়েদের বাসস্থান। বিপরীত দিকে ছেলেদের। ছেলেমেয়েও ছাড়াও, বয়স্ক মেয়ে পুরুষের সংখ্যা ডজন খানেক বটে।

মন্দিরের প্রকোষ্ঠে চতুর্ভুজা কালী। ক্ষ্যাপাবাবা থাকেন, নাটমন্দিরের উত্তরের একটা ঘরে। ছোট ছেলেমেয়েরা এখন নিশ্চয়ই ইস্কুলে। মানুষ কম নেই। কিন্তু কোলাহল নেই। অথচ ভিতরে চলছে যজ্ঞকাণ্ড। সমস্ত আশ্রম পরিষ্কার রাখা, ধোয়া মোছা। রান্নাবান্না, জল তোলা। গতবারে দেখে গিয়েছি, গঙ্গা যমুনা প্রায় ক্ষ্যাপাবাবার পাশে পাশে। প্রীতি আর বকুল

ছাড়া রতন আর ধীরেন মন্দিরের কাজে বেশি ব্যস্ত। রতন বোধহয় বেশি প্রিয়। কারণ সে হারমোনিয়ামের সঙ্গে মন্দিরা বাজায়। বাবার দাড়ি চুলে জড়িয়ে গেলে, কাল কালী গোখরাকে টেনে নামায়। আবার গঙ্গা যমুনা বেশি পাশ ঘেঁষে বসলে, কপট বিরক্তিতে বলে ওঠে, 'যা না, একটু কাছ ছাড়া হ দোকিনি। ডাকিনী যোগিনীগুলো জ্বালিয়ে খেলে।'

গঙ্গা যমুনার অমনি মুখ ভার। শ্যামাক্ষ্যাপা জিভ কেটে নিজেই তখন কালী। বলেন, 'ব্যাটা, মা'কে গালি দেয় ? জিভ কেটে দে।' আবার টেনে নিয়ে আদর করেন।

মূল মন্দির বাড়ির দরজা খোলা। চৈত্রের বাতাসে একটা নিঝুমতা। কিন্তু থেমে নেই কেবল বিহঙ্গকুল। তার মধ্যে সেই কালামুখোর কুউ-উ-উ। হাতের ঘড়িতে দেখছি বেলা বারোটার কাছাকাছি। একটা মৃদু গলার গুন গুনানি কানে আসছে। শুনে ধ্যান, রমণীর। আরও কয়েক পা এগিয়ে, সামনে নাটমন্দির। প্রথমেই চোখে পড়লো শ্যামাক্ষ্যাপাকে। বসে আছেন থামের গায়ে হেলান দিয়ে। খোলা চুলের বাঁ কানের পাশে, সাপের জিভ লকলক করছে। সামনে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ। অচেনা মনে হলো। রতন বসে আছে মন্দিরের দিকে ফিরে। তার অদূরে বকুল।

ক্ষ্যাপাবাবা সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখে অন্যমনস্কতা। আমি ভাবলাম, আমাকে দেখছেন। কিন্তু তা না। আপন মনে আছেন। সরীসৃপ বাহনটি কী করছে ? কান খুঁচিয়ে দিচ্ছে নাকি ? আমি নাটমন্দিরের পূব দিক ঘুরে, দক্ষিণে সিঁড়ির কাছে গেলাম। আসবার কথা না। তবে যাত্রাটা এবার এদিকেই। একবার না এসে থাকতে পারলাম না। কী ভাববেন, কে জানে ? নিচে স্যাণ্ডেল খুলে রেখে, ওপরে উঠলাম। সকলেই প্রায় ফিরে তাকালো। রতন আর বকুলের চোখ খুশিতে ঝলক দিল। কিছু বলবার আগে ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো।

ক্ষ্যাপাবাবার কানের কাছ থেকে বাহনের মুখ সরিয়ে, রতনের দিকে ফিরলেন, 'হ্যাঁরে রতন, আমরা তো কারোকে বশীকরণের মাদুলি কবচ দিই না। দিই ?'

'না বাবা।' রতন হেসে মাথা নাড়লো।

সামনে যারা কয়েকজন বসেছিল, তারা অবাক চোখে ক্ষ্যাপাবাবার দিকে তাকালো। ক্ষ্যাপাবাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মন্ত্রপড়া মায়া ডোর চোখের কাজল সাপের এটুলি শেয়ালের নখ এসব দিয়ে কারোকে তুক করি কি আমরা ?'

'নাতো বাবা।' রতন মাথা নাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

বকুল জোরে হেসে উঠতে গিয়ে মুখে আঁচল চাপা দিল। বাকিরা ক্ষ্যাপাবাবার মুখোমুখি। পিছনে আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। অবাক চোখে

বাবাকে দেখছে। বাবা চুলে জড়ানো বাহনটিকে টেনে কোলের ওপর নামিয়ে দিলেন। হাত দিয়ে আমাকে ইশারায় দেখালেন। মুখ ফেরালেন না। জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কিসের টান? এ যে আমাকেও ধোকা লাগিয়ে দিল?'

একটা কৌতুকের ছটা আমার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রথমে হঠাৎ বুঝতে পারিনি। ক্ষ্যাপাবাবার কথাগুলোর উপলক্ষ আমি। দেখতে পেয়েছেন ঠিক। দৃষ্টি আসলে অন্যমনস্ক ছিল না। রতন আর বকুলের হাসিও সেটা জানিয়ে দিচ্ছিল। বললাম, 'কাছে যেতে পারছি না।'

ক্ষ্যাপাবার থামের হেলান ছেড়ে সোজা হলেন। ফিরে তাকালেন আমার দিকে। চোখের তারায় গোঁফ দাড়িতে হাসির কী বাহার, 'তাই তো বলি, অ্যাঁ? তুমি তো ধর্মে নেই, টানে আছ। এস বাবা আমার।' দু হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'ও তোমার কিছু করবে না।'

এগিয়ে গিয়ে কাঁধের ঝোলাটা নামালাম। বাহনটিকে ভয় আছে। মনে জানি, আসলে বিপদ কিছু নেই। কাছে গিয়ে নিচু হতেই, দু হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন। তাঁর দেহের শক্তি আমার থেকে এখনও বেশি। একেবারে বুকে গিয়ে পড়লাম। বাহনটি ফোঁস করে উঠে, মূল মন্দিরের বন্ধ দরজার কাছে চলে গেল। পায়ে হাত দেবার অবকাশ পেলাম না। দু হাতে আমার মুখ তুলে দেখলেন, 'শুকনো দেখি কেন? কলকাতা থেকে?'

বললাম, 'না, শ্রীপুর—মানে বলাগড় থেকে। এখনো চোখ মুখ ধোয়া হয়নি।'

'ওলো বকুল, ও রতন, শোন।' ক্ষ্যাপাবাবা ব্যস্ত স্বরে বললেন, 'যা, নিয়ে যা। আগে হাত মুখ ধুয়ে নিক। একটু কিছু দে। তাই ভাবি, মুখখানি এত শুকনো দেখায় কেন? অধার্মিক বাবা আমার, খবর সব ভাল তো?'

বললাম, 'ভালো।'

রতন আমার ঝোলাটা তুলে নিল, 'আসুন।'

ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে ঠেলে তুলে দিলেন, 'মুখ ধুয়ে একটু কিছু খেয়ে এস। তারপরে কথা হবে। তবে তার আগে একটা কথা।' বলে হাতছানি দিলেন, নিচু স্বরে বললেন, 'দেখে বড় ভাল লাগল।'

আমার মনটা ভরে যাচ্ছে। যেটুকু বা সংশয় ছিল, তার ছিটে ফোঁটা নেই। রতন উত্তরের বাবার ঘরের পাশের ঘরে গেল। মাঘ মাসে আমাকে ঐ ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। বকুলকে দেখতে পেলাম না। আমি রতনের সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। রতন জিজ্ঞেস করলো, 'এত বেলা অবধি মুখ ধোয়া হয়নি? চাও খাননি নাকি?

সত্যি, এটা নিজেরও খেয়াল ছিল না যেন। শ্রীপুরের বিদায়টা এমনই ঘটনা, তার রেশটা এখনও কাটেনি। বললাম, 'সকাল থেকে কিছুই হয় নি।'

'ছি ছি। শ্রীপুরে কোথায় ছিলেন?'

'বলবো।' কাঁধ ঝোলা থেকে আগে দাঁতমাজা ব্রাশ পেস্ট গামছা বের করলাম। পিছনের দরজা খুলে, চেনা পথে চলে গেলাম। নাটমন্দিরের মাঝ বরাবর, ভিতর দিকে টিউবওয়েল আর কুয়ো পায়খানা। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বেলা বারোটায় প্রাতঃকৃত্য সারতে হলো। রতন আমার কাছ ছাড়েনি। বললো, 'একেবারে স্নানটা সেরে ফেললেই হতো ?'

বললাম, 'এতো সকালের কাজ হলো। আজ দুপুর হতে দেরি হবে।'

ঘরে ফিরে দেখি, গঙ্গা জানালার ধারে বসে আছে। স্নানের শেষে, চুলের দু পাশে দুটি আলগা বিনুনি করা। আটপৌরে ধরনের শাড়ি পরা। কপালে একটি লাল টিপ। সকালের পুজোর পরে পরেছে। ফরসা প্রায় দোহারা গঠন শরীরে কোনো পরিবর্তন নেই। দু মাঘে আর কতটুকুই বা পরিবর্তন হতে পারে। তবে নীল শাড়ি লাল জামা ওর ভারি পছন্দ দেখছি। গালে হাত দিয়ে বসেছিল। ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। ঠোঁটে চোখে প্রীতিপূর্ণ হাসি, 'বকুলটাকে মারতে যাচ্ছিলাম।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

'রান্নাবান্নার কথা হচ্ছে, তার মধ্যে গিয়ে বলে, আপনি এসেছেন। বিশ্বাস হয় ?' গঙ্গার মুখে হাসি। স্বরে তার সেই বীণার ঝংকার। রতন বললো, 'এখন হচ্ছে তো ?'

'তাই তো! ভারি অবাক লাগছে। বিশ্বাস করব কেমন করে ?'

রতন হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। গঙ্গা আবার বললো, 'অসময়ে এসেছেন, কিছু দিতে পারব না। বকুল চা আর মুড়ি নিয়ে আসছে।'

বললাম, 'ওতেই হবে।'

বলতে বলতেই বকুল ঢুকলো। একটি কাঁসার বাটি আর চায়ের গেলাস দুহাতে। এক পাশে পাতা মাদুরের সামনে রাখলো। গঙ্গার দিকে ফিরে বললো, 'এবার তোমাকে দু ঘা দিই ?'

'দে।' গা পেতে দেবার ভঙ্গি করলো, 'কিন্তু তুই বকুল যা। সুবুন্দির মা চালের হিসেব করতে পারবে না। আমি চাল মাপতে মাপতে চলে এসেছি। তারপরে যত খুশি মারিস।'

বকুল চলে যাবার আগে বললো, 'তা যাচ্ছি। কিন্তু গঙ্গাদি, তোমাকে মারব কিন্তু সত্যি। তুমি আমাকে শুধু মিথ্যুক বল নি। বলেছ, ওরকম লোকের নামে বাজে কথা বলিসনে।'

গঙ্গা হাত জোড় করলো। মুখে ক্ষমা চাওয়ার অভিব্যক্তি। বকুল হাসতে হাসতে চলে গেল। এখানে আমার আড়ষ্টতার কিছু নেই। একবার এসেছি। তবু যেন অনেকদিনের চেনা জায়গা। মাদুরে বসে কাঁসার বাটি টেনে নিলাম। মুড়ির সঙ্গে দু চার মণ্ডাও আছে। খেতে শুরু করে দিলাম। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'আপনার খবর সব ভালো ?'

'খুব।' গঙ্গা হাসলো। চেনা হাসি। শালীন, ভদ্র। মুখখানি একটু গোল, পুষ্ট ঠোঁট, ভাসা চোখ, টিকলো নাক। হাসলে বাঁ গালে ছোট একটু টোল খায়। জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কেমন আছেন ?'

বললাম, 'ভালো। যমুনা কোথায় ?'

'যমুনার তো গত ফালগুনে বিয়ে হয়ে গেল !' গঙ্গা অবাক হেসে বললো, 'ওমা, সেই কথাটাই এখনো আপনাকে বলা হয় নি !'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কার সঙ্গে ? সেই—?'

'হ্যাঁ, কলকাতার ডাক্তার। চোত্ মাসের পূর্ণিমায় এসেছিল।' গঙ্গা বললো।

আমার মনে পড়ে গেল, গঙ্গার শেষ কথা। ও এই আশ্রম ছেড়ে বাইরে যাবার কথা ভাবতে পারে না। অথচ মানবীর দেহ মনের সব আকর্ষণই ওর আছে। গঙ্গারও বোধহয় সেই কথা মনে পড়লো। সেদিনের ভোরের ছবিটা আমার চোখের সামনে ভাসছে। সাধন স্থানের শিকের বেড়ার পাশে ঘুরতে ঘুরতে ও কথা বলছিল। আমি দেখছিলাম, যেন ও বন্দিনী হয়ে আছে লোহার গারদে। জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছেন ? আপনার কথা মিলল না, তাই তো ?'

অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। গঙ্গা মাথা ঝাঁকালো, 'মনে নেই ? যখন বললাম, আবার আসবেন। আপনি বললেন, তখন হয় তো আপনাকে আর দেখতে পাব না।'

নিজের উক্তি মনে থাকে না। কথাটা বলেছিলাম, অন্য একটা প্রত্যাশায়। আজও তাই বললাম, 'না পেলেই খুশি হতাম।'

'কেন বলুন তো ?' গঙ্গা ঘাড় কাত করে, ভুরু কুঁচকে তাকালো, 'বাবা রোজ দূর দূর করেন, আপনিও দেখছি সেইরকম বলছেন ?'

কথাটা বলা ঠিক হলো কী না বুঝতে পারছি না। চা মুড়ি খাওয়া শেষ। সিগারেট ধরিয়ে বিব্রত হাসলাম, 'আপনারও যদি যমুনার মতো—।'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। গঙ্গা আলগা বিনুনি দুটো খুলে ফেললো। ছড়িয়ে দিল ঘাড়ে পিঠে। মুখের সরস হাসিটা ম্লান হয়ে গেল, 'একটা কথা বাবাকে আর আপনাকে ছাড়া কারুকে বলিনি। ভুলে গেছেন বোধহয় ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না ভুলি নি। রাগ করলেন না তো ?'

'না।' গঙ্গা মাথা নাড়লো, 'আমি মিথ্যে বলিনি। বাবার দুশ্চিন্তা বাড়ছে। ভাবি, এত দুশ্চিন্তার কী আছে ? বাবা যদি পথ থেকে কুড়িয়ে আনতে পারেন, বাকি জীবনটা থাকতে দিতে পারেন না ?'

আমি গঙ্গার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ওর সেই বীণার বিষণ্ণ সুর কানে বাজলো, 'আমি আমার

বাবা মাকে চিনিনে। সংসার কী, বুঝি নে। অথচ আপনাকে বলতে সংকোচ নেই—আমার মত মেয়ের যে কামনা বাসনা থাকা উচিত, আমার তাও আছে। কিন্তু সেখানে আমি যেতে পারব না।'

বললাম, 'উনি তো বাবার মতো ভাবেন। উপযুক্ত বয়সে মেয়ের গতি করতে চান সব বাবা।'

'কিন্তু বাবা তো মেয়েকে জানেন!' গঙ্গা ম্লান হেসে বললো, 'আরো যত দিন যাচ্ছে, ততো বুঝতে পারছি আমি মিথ্যে বলি নি। বরং, আজকাল আরো বেশি করে মনে হচ্ছে, আশ্রম ছাড়া আমার জীবন নেই। আমি কোথাও গিয়ে, কোন মঙ্গল করতে পারব না।'

মনোহরার কথা মনে পড়ে গেল। একই গঙ্গার কূলে। কতো আর দূরে। দু'জনের মধ্যে কোথায় একটা অস্পষ্ট মিল রয়েছে যেন। সেই কথাটাই মনে পড়ে। অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর। শ্রীপুরের আখড়া আর এই আশ্রম হয় তো ঘর। কিন্তু এ ঘরে সে-ঘর নেই। গঙ্গা অজ্ঞাতকুলশীলা। মনোহরা যৌবনে পা দিয়েই পিশাচের খড়্গে ছিন্নভিন্ন। তার জীবনে কোথাও একটা অস্পষ্ট যুক্তি আছে। গঙ্গার মনের স্রোতে ভয়ংকর ঘূর্ণী পাকটা কিসের?

'চলুন, বাবার কাছে বসবেন। পরে কথা হবে।' গঙ্গা উঠে দাঁড়ালো।

আমি সিগারেট নিভিয়ে দিয়ে নাটমন্দিরে গেলাম। তাকে ঘিরে যারা বসেছিল, তারা নেই। ক্ষ্যাপাবাবা কাছে হাতের ইশারায় দেখালেন, 'এস বাবা, এবার শুনি তোমার কথা। তা চত্রে কি গাজনের সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়েছ?'

কাছে বসে বললাম, 'তা একরকম বলতে পারেন।'

গঙ্গা বসলো একটু দূরে, একটা থামের কাছে। ক্ষ্যাপাবাবা ভুরু নাচিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে গঙ্গে, ও তো আবার ধর্মে নেই। কী বলে বল দিকিনি?'

'কথা কিছু হয়নি বাবা।' গঙ্গা বললো, 'খালি বললেন, আমাকে এসে না দেখলে খুশি হতেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার টানা গভীর চোখ বড় হয়ে ভেসে উঠলো, 'বলেছে? তবে আছিস কেন?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'আমার বলাটা ভুল হয়েছে।'

'কিছু ভুল হয় নি।' ক্ষ্যাপাবাবা গোঁফ দাড়িতে হাতের ঝাপটা দিলেন, 'এবার ওকে গঙ্গায় চুবিয়ে মারব, নয় তো কালে খাওয়াব। কাছে এসে বোস!'

গঙ্গা ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে গিয়ে বসলো। ওর গলায় হাত বেড়িয়ে ধরলেন। আমাকে বললেন, 'আসলে কালে ওকে খেয়েছে, আর নতুন করে কী খাওয়াব? তা বাবা, এবার বল দেখি, শ্রীপুরে কোথায় গেছলে?'

'গোলকদাসের আখড়ায়?' ক্ষ্যাপাবাবা, আর গঙ্গা দুজনেই বিস্ময়ে

ঝলকে উঠলেন। দৃষ্টিবিনিময় হলো দুজনে। ক্ষ্যাপাবাবা অবাক জিজ্ঞাসু চোখে ঘাড় ঝাঁকালেন।

গঙ্গা হাত উলটে বললো, 'বুঝতে পারছিনে বাবা।'

'বুঝিয়ে বলতো বাবা।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন, 'সেখানে কেন ?'

'শ্রীপুর দেখতে গেছলাম। একজন আখড়াতে যেতে বলেছিলেন। তাই গেছলাম।'

'মনোহরাকে দেখেছ ?' ক্ষ্যাপাবাবার চোখে গভীর অনুসন্ধিৎসা।

গঙ্গার চোখেও। এঁরাও তা হলে মনোহরাকে চেনেন ? বললাম, 'দেখেছি। উনিই দু'দিন আটকে দিলেন।'

'অ্যাঁ।' ক্ষ্যাপাবাবার চোখ গোল। তারপরেই তাঁর সেই হাসির দানায় টপ্পা বেজে উঠলো, 'শোন্ গঙ্গা, শোন্। তা মনোহরা জানে, তুমি এখানে আসছ ?'

বললাম, 'না তা বলিনি তো ? কেন ?'

'বললে খুশি হতেন।' গঙ্গা বললো, 'বাবাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসেন। গোলকদাস গোঁসাই পছন্দ করেন না, তাতে ওঁর কিছু যায় আসে না।'

এ আবার নতুন সংবাদ। সহজিয়া বৈষ্ণবী আসে শক্তি সাধকের কাছে। সব দেখছি তালে গোল। নাকি গোলেই তাল বাজে। ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, বলবে তো বাবা। সে যে আমার আর এক মেয়ে। কিন্তু তার গুণ তুক তো ভয়ংকর। ছেড়ে দিল ?'

'তিন রাত্রি রেখেছিলেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার আবার টপ্পা হাসির দানা বাজলো, 'শোন্ গঙ্গা, শোন্। তা কেমন বুঝলে আমার বোষ্টমী মেয়েটিকে ?'

হঠাৎ জবাব দিতে পারলাম না। গঙ্গার দিকে তাকালাম। গঙ্গা আমার দিকেই তাকিয়েছিল। চোখে তার গভীর অনুসন্ধিৎসা। ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে ঘাড় ঝাঁকালেন, 'কী ? কথা বলছ না যে ?'

বললাম, 'দেখুন, আমার কাছে যা কষ্ট, আর একজনের কাছে হয় তো তা নয়। ওঁকে দেখে মনে হলো, উনি সুখ দুঃখের অতীত হয়েছেন।'

ক্ষ্যাপাবাবার চোখে পরম বিস্ময়। তাকালেন গঙ্গার দিকে। তারপরে আমাকে টেনে নিলেন বুকের কাছে, 'তাই তোমার মন কেঁদেছে। কিন্তু বাবা আমার, দেখলে কেমন করে ? আমার ও মেয়েটাকে তো সবাই এমনি করে চিনতে পারে না।'

'তাঁকে দেখে মনে হলো। এর বেশি কিছু জানি না।'

ক্ষ্যাপাবাবা মাথা ঝাঁকালেন। তাঁর বুক ভেদ করে নিঃশ্বাস পড়লো, 'ঠিক, সব কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। কিন্তু এ কি তাজ্জব কথা, তুমি

মনোহরার কাছে ছিলে ? গোলকদাস গোঁসাই কী বললে ?'

'আমাকে দীক্ষা দিতে চেয়েছিলে।'

ক্ষ্যাপাবাবার টপ্পা দানা হাসির সঙ্গে, গঙ্গার বীণার ঝংকার সুর মেলালো। ক্ষ্যাপাবাবার গোঁফ দাড়ি আমার গলায় মুখে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। বড় অস্বস্তি। কিন্তু দুষ্টু বালকের হাসি যেন আর থামতে চায় না। তারপরে হঠাৎ থেমে, আমার কপালে হাত রেখে বললেন, 'ধর্ম তো তুমি মানো না। কিন্তু জেনে রাখ বাবা, পুণ্যি করে এসেছ। তুমি আমাকে নৌকোয় কী বলেছিলে মনে আছে ?'

আমার ঠেক লাগলো। গঙ্গা বললো, 'আমার মনে আছে।'

'বল তো।'

'উনি বলেছিলেন, যিনি শক্তি, তিনিই প্রেম। প্রেমই শক্তির আধার।'

কথাটা আমার না। আমি যেমন শুনেছিলাম, তেমনি বলেছিলাম। আজ মনোহরার পায়ে হাত দিয়ে প্রায় একই কথা বলে এসেছি। ক্ষ্যাপাবাবার দু' চোখে জল টলটলিয়ে উঠলো। বললেন, 'অই, অই, অই হলো মনোহরা! বুঝতে পেরেছিলে ?'

মাথা নেড়ে হাসলেন। তিনি আমার চুলের মুষ্ঠি চেপে ধরলেন। চোখে চোখ রাখলেন। মনোহরার মুখ আমার সামনে ভেসে উঠলো। আমি তো কোনো অধ্যাত্ম ধ্যানে নেই। অলৌকিক চেতনা নেই। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছি, সেখানে মনোহরা ঘন অন্ধকার মেঘে ভার। বজ্র তার চোখে। বললাম, 'তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'শোন্ গঙ্গা, শোন্। ও তো ধর্মে নেই, মনোহরাকে শ্রদ্ধা করে।' ক্ষ্যাপাবাবা আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিলেন, 'বড় খুশি হলাম। তোমার সঙ্গে মনোহরার দেখা হয়েছে। তা এবার বল তো বাবা আমার, চৈত্রের গাজন খেলাটি কোথায় ? আমার এখানেই তো ?'

বললাম, 'না। সামনে বৈশাখী পূর্ণিমা। জামালপুরে যাবো।'

'জামালপুর ?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি বিশাল চোখে তাকালেন গঙ্গার দিকে।

গঙ্গা মাথা নাড়লো, 'আমি তো জামালপুরের বিষয় কিছু জানিনে।'

'সে আমি জানি।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার দিকে তাকালেন, 'সেখানকার কথা তোমাকে কে বললে ?'

বললাম, 'অনেকদিন আগে একজনের মুখে শুনেছিলাম। বৈশাখী পূর্ণিমায় সেখানে ধর্মরাজের উৎসব হয়। বইয়েতেও কিছু পড়েছি। দেখবার খুব ইচ্ছে।'

'হুঁ, বাবায় টেনেছে।' ক্ষ্যাপাবাবার ভুরু নেচে উঠলো, 'ধর্মরাজ তো নেই আর। উনি এখন বুড়ো শিব হয়েছেন। খবর ঠিকই নিয়েছ। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন সেখানে রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হয়।'

গঙ্গার চোখে উৎকণ্ঠিত বিস্ময়। বললাম, 'শুনেছি অনেক বলি হয়।'

'হ্যাঁ, হাজার গণ্ডা। আর বলি নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি। বাবার চেলারা উপোস থাকে। তবে নির্জলা নয়।'

ক্ষ্যাপাবাবা হেসে বাজলেন, 'লাঠি বর্শা হাতে মেয়ে মদ্দ সব একেবারে কাঁচা খেগো দেব দেবী। তা বাবা, ধর্মরাজ তোমাকে টানলেন কেন? দ্রব্য চাপিয়ে মত্ত হবে?'

মাথা নেড়ে হাসলাম, 'আজ্ঞে না। কেমন ইচ্ছে হলো, একবার দেখে আসি। শুনেছি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই একবার সেই গ্রামে গেছলেন। মনে হয় ধর্মরাজকে পরে বুড়ো শিব করেছেন ব্রাহ্মণেরা। আসলে ইনি বৌদ্ধদের কোনো দেবতা। ধর্ম অবিশ্যি বৌদ্ধ দেবতাই। আমি আমাদের দেশের জাত যোদ্ধাদের পুজো দেখতে চাই।'

'ওলো গঙ্গে, তবে এর ঘাড়ে বেশ্যার মড়া চাপবে না কেন?' ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার দিকে বড় চোখ করে তাকালেন, 'কলকাতা থেকে যাচ্ছে ও বলির লড়াই দেখতে। আবার খবরও নিয়ে এসেছে, আদতে উনি বুড়োশিব নন, বৌদ্ধদের ধর্মঠাকুর।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'ভুল খবর নাকি?'

'ভুল হবে কেন? বুদ্ধের ধর্ম, আর হিন্দুর শিব একাকার হয়ে গেছেন। ধর্মরাজের রাজা, আর বুড়ো শিবের বুড়ো, দুইয়ে মিলে বুড়োরাজ। দেবতাটির আসল পরিচয় জান?' ক্ষ্যাপাবাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'অই তোমার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাঁর নাম করলে, তিনি কিচ্ছু লিখেছেন নাকি?'

বললাম, 'লিখে থাকলেও পড়িনি। জামালপুরে গেছলেন, শুনেছি।'

'তা তোমাকে বুড়োরাজ টানলেন কেন, সত্যি করে বলতো বাবা আমার?' ক্ষ্যাপাবাবা আমার কোলের ওপর হাত চেপে, নড়ে বসলেন। গঙ্গাকে ঈশারায় দেখালেন আমাকে, 'ওর তল পাওয়া দেখছি মুসকিল।'

গঙ্গার দু' চোখ ভরা কৌতূহল। আমি বললাম 'ঐ যে আপনি বললেন, ধর্মরাজের রাজা, বুড়োশিবের বুড়ো, দুইয়ে মিলে বুড়োরাজ, সেইটাই আমাকে টেনেছে। ধর্মরাজ তো আগে জাত হিন্দুর দেবতা ছিলেন না। জাত হিন্দুরা যাদের ছোটলোক বলেছে, যাদের জল চল নেই, সেই অচ্ছুতদের গ্রাম দেবতা ধর্মরাজ। আদিতে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ। জামালপুরে যিনি এখন আদি লিঙ্গ বলে পুজো পাচ্ছেন, তিনি মোটেই লিঙ্গ কী না, সন্দেহ তো সেখানেও।'

'সন্দেহ করবার তোমার দরকার কী?' ক্ষ্যাপাবাবা আমার কোলে চাপড় মারলেন, 'তুমি যা ভেবেছ, সেটাই তো ঠিক। ধর্মরাজকে বামুনেরা পরে শিব গড়েছে। জামালপুর হল পূর্বস্থলী থানার মধ্যে। এখনো বিস্তর ধর্মরাজের পুজো হয় অনেক গাঁয়ে, পুরোতরা সব নীচু তলার। বাড়ুজ্জে চাটুজ্জে মুখুজ্জেদের কোন ঠাঁই নেই সেখানে।'

ক্ষ্যাপাবাবা খবর রাখেন আমার থেকে বেশি। বলাতে চাইছেন আমাকে দিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কখনো জামালপুরে গেছেন।'

'যাব না কেন ?' ক্ষ্যাপাবাবার হাসিতে আবার টিপ্পা দানার কাজ, 'সে কি আজকের কথা নাকি ?'

গঙ্গা বলে উঠলো, 'এ খবর জানিনে তো ?'

'তুই তখন কোথায় রাক্ষুসী।' ক্ষ্যাপাবাবা বলেই, চোখ ঘুরিয়ে মা কালী। জিভ কেটে আমার দিকে তাকিয়ে ইশারায় গঙ্গাকে দেখালেন।

আমি হেসে তাকালাম গঙ্গার দিকে। গঙ্গা ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'আমি তো রাক্ষুসীই। সব খেয়ে উজাড় করে দিচ্ছি।' উঠে যাবার চেষ্টা করলো।

ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার হাত টেনে ধরলেন, 'তোকে বলিনি। ওই মন্দিরের মধ্যে যে মেয়েটা আছে, তাকে বলেছি। এখন এর কথা শোন। আমি যখন জামালপুরে গেছি, তখন সত্যিকারের লড়াই হত। কথাটা সত্যি, বলি নিয়ে কাড়াকাড়ি হত বটে, আসলে কাড়াকাড়ি নয়। সবাই বাঁশের লাঠি নিয়ে রায়বেশে আসত। বলি সামনে রেখে লড়াই হত। সে সব লাঠি খেলার কী মার প্যাঁচ। যেমন হুংকার, তেমনি লাঠির সঙ্গে মন্দ আর মত্ত বাগদি মাটি থেকে দশ হাত উঁচুতে লাফিয়ে উঠত। যার জিত, তার বলি। কিন্তু এখন আর সে সব নেই। এখন সত্যি মারামারি হয়। খুনোখুনিও হয়ে গেছে দু'এ চারটে। তারপর থেকে জামালপুরের মেলায় পুলিশ পাঠানো হয়। তা তোমার টানটা তো ঠিক বুঝলাম না বাবা ?'

বললাম, 'যা বললেন, ওটাই আমার টান। এদিকে বীরের লড়াই। অথচ দিনটি হলো অহিংসার পরম করুণাময় বুদ্ধের জন্মদিন, বৈশাখী পূর্ণিমা। নিজের দেশ কাল আবার ধর্ম, কিছুই জানিনে। তাই একটু দেখতে যাওয়া। বই পড়ে এমন একটা কৌতুহল হয়েছে, বুড়োরাজ নামটাই অদ্ভুত। আর কোথাও শুনিনি।'

'শুনবে কেমন করে ? ভাগাভাগি করা হয়েছে, বললাম না ?'

'তা হলে জাতপাতে মেশামেশি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, একরকম তাই বলতে পার। ঠাকুরের দু' পাশে দুভাগে নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এক পাশে ধর্মরাজের, আর এক পাশে শিবের। মাঝখানে কাটা দাগ আছে।'

কী আশ্চর্য আপোষ আর উদারতা।

তবু কেন এত জাত ফিরিস্তি ? বললাম, 'সেই উৎসব একবার দেখতে যাব।'

'থাকবে কোথায় ? সেবাইত বামুনদের সঙ্গে চেনা আছে ?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রুকুটি গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন।

হেসে বললাম, 'জীবনে কোনোদিন যেখানে যাইনি, সেখানে কারোকে চিনবো কেমন করে ?'

'তার মানে, তোমার সেই আহার যন্ত্রতন্ত্র, শয়ন হট্টমন্দিরে।' ক্ষ্যাপাবাবা হাত তুলে নাড়লেন, 'বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ওখানে হট্টমন্দির বলেও কিছু থাকে না। গাঁয়ের বেশির ভাগ লোকই হল চাষাভুষো। বলি আর রক্ত ছাড়া ওই দিন কারোর কোনদিকে নজর থাকে না। কেবল রক্ত আর রক্ত। এমন কি মুসলমানরাও মানত করে।'

'মুসলমান মানত করে? বুড়োরাজের দ্বারে?'

'হ্যাঁ, বুড়োরাজ এমনি দেবতা, তাঁর কাছে সব ধর্ম একাকার। বুঝেছি, টানটা তোমার সেই জন্যেই।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'এখন বল তো, যাবার কী ব্যবস্থা ভেবেছ?'

বললাম, 'পাটুলি ইস্টিশন থেকে জামালপুর হেঁটে যাবো।'

'কত মাইল পথ জান?' ক্ষ্যাপাবাবার স্বর গম্ভীর।

বললাম, 'শুনেছি দু' চার মাইল হবে।'

তোমার মুণ্ডু আর মাথা।' ক্ষ্যাপাবাবা আবার আমার হাঁটুতে চাপড় মারলেন। গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাথাটা খারাপ। কম ক'রে ছ' সাত মাইল রাস্তা। রাত্রে থাকবার জায়গা নেই। বলি নিয়ে কাড়াকাড়ি রক্তের ছড়াছড়ি। হাজার হাজার বলি, একটা আধটা নয়। এতো হল বুড়োরাজের গাজন। এ গাজনে, চেলারা গলা শুকনো রাখে না। অন্যদিকে সন্ন্যেসীদের ভর হয়। ভরে তোমার বিশ্বাস আছে?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

'আমি তো ভেবে কিছু মাথা মুণ্ডু পাচ্ছিনে।' ক্ষ্যাপাবাবা চোখ বুজলেন।

তাঁর ভেবে মাথামুণ্ডু পাবার কী আছে? আমি গঙ্গার দিকে তাকালাম? তাকিয়ে অবাক। সেখানে আবার আর এক ইশারা। গঙ্গা নিজের বুকে হাত দিয়ে ইশারা করছে। ঘাড় ঝাঁকাচ্ছে। মানে কী? আবার আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে, উঁচুতে তুলে দেখালো। ক্ষ্যাপাবাবা চোখ খুলেই, খপ্ করে গঙ্গার হাত চেপে ধরলেন। দৃষ্টি রোষ কষায়িত। গঙ্গার মুখ লাল। চোখ নত। ক্ষ্যাপাবাবা তাকালো আমার দিকে। রক্ষা করুন, আমি কিছু বুঝতে পারিনি।

'তোর সাহস তো কম নয়?' ক্ষ্যাপাবাবা গঙ্গার খোলা চুলের গোছা মুঠি পাকিয়ে ধরলেন, 'তুই যেতে চাস ওর সঙ্গে?'

সর্বনাশ। গঙ্গার ইশারায় এই কথা? গঙ্গার এক হাত এসে পড়লো ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের ওপর। ক্ষ্যাপাবাবা তাকালেন আমার দিকে, 'তুমি আমার মেয়ের মন কাড়ছ?'

ব্যস্ত উৎকণ্ঠায় বললাম, 'না, বিশ্বাস করুন—।'

'থাক, আর কথা বাড়াতে হবে না।' ক্ষ্যাপাবাবা হাত তুললেন, 'এটাকে

দিয়ে আর কিছু হবে না। একে তুমিই নাও।'

মনে হলো, আমার কাছা খুলে গিয়েছে। এবার উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেবো। কিছু বলতে গেলাম। গোঁফ দাড়ির ভেতর থেকে অট্টহাসি বেজে উঠলো, 'কেন, ক্ষতি কী? ঘরের বউ সতীন দেখে মেরে তাড়াবে?' কী সর্বনেশে লোক! আবার বললেন, 'ও তো তোমার ঘরে যাবে না। তোমার সঙ্গে পথে পথে ফিরবে। কী, তাই তো চাস?' গঙ্গার দিকে তাকালেন।

গঙ্গা ঘাড়ে ঝটকা দিল, 'মোটেই তা বলিনি। ওঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। এখন আপনি অনুমতি দিলে হয়।'

উদ্বেগে কঁকিয়ে উঠলাম, 'আমার সঙ্গে যাবেন?'

'হ্যাঁ, খুব ইচ্ছে করছে।' গঙ্গার চোখে সকাতর প্রার্থনা, 'আপনার মত যদি ঘুরতে পারতাম, তবে আর আমার কিছু চাইনে।'

ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'আমি তো সেই কথাই বলছি। গেরুয়া পর, রুদ্রাক্ষের মালা জড়া। হাতে একটা ত্রিশূল নে। ভৈরব ভৈরবী বেরিয়ে পড়।'

একে বলে চোখে ধুতুরো ফুল দেখা। গঙ্গা বললো, 'কেন বাবা মিছিমিছি ওঁকে ভয় দেখাচ্ছেন। দেখুন মুখের কী অবস্থা হয়েছে।'

'ও সব ছলাকলা।' ক্ষ্যাপাবাবার টানা চোখে রহস্যের ঝিলিক, 'বেশ্যার মড়া কাঁধে বইতে পারে, আর তোকে নিয়ে ঘুরতে পারবে না?'

বললাম, 'আজ্ঞে না।'

ক্ষ্যাপাবাবা হা হা হেসে নাটমন্দির কাঁপালেন। সেই সঙ্গে গঙ্গার বীণার ঝংকার। ক্ষ্যাপাবাবা আবার চোখ বুজলেন। গঙ্গার হাসিটি এখন উজ্জ্বল। চোখে ইশারা নেই। আমার বুকে সংকটের বোঝা, উদ্বেগে কথা বন্ধ। হাসা দূরের কথা। ক্ষ্যাপাবাবা চোখ খুললেন, 'হুঁ, তা হলে আজ হল একাদশী। কাল চোত সংক্রান্তি। পরশু ত্রয়োদশী। ওর তো কোন ধারণা নেই। বলে পাটুলিতে নেমে, হেঁটে যাবে জামালপুরে, বুড়োরাজের মেলায়। তারপর নিজেই বলি হয়ে যাক।' বললাম, 'আমি ঠিক পারবো।'

'পারতে যদি আমার এখানে না আসতে।' ক্ষ্যাপাবাবা হাতের ঝাপটায় আমার কথা উড়িয়ে দিলেন, 'আর আমার মেয়ে যখন যেতে চেয়েছে, সে তো তোমার সঙ্গেই যাবে। তবে পাটুলি থেকে নয়, বেলেরহাট দিয়ে যেতে হবে।'

'বেলেরহাট? সেটা আবার কোথায়?'

'পাটুলির আগের ইস্টিশন।' ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, 'বেলেরহাট ইস্টিশন থেকে এক ক্রোশ হাঁটতে হবে। চিঠি লিখে দেব, তোমরা যাবে বনমালী মুখুজ্জের বাড়ি। সে তোমাদের জামালপুর যাবার ব্যবস্থা করবে।'

গঙ্গার চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠলো। আমি বললাম, 'কিন্তু আমি তো সেখান থেকে চলে যাবো কাটোয়ার দিকে?'

'রক্তারক্তি থেকে একেবারে বৈষ্ণবের দরজায় ?' ক্ষ্যাপাবাবা ভ্রূকুটি চোখে তাকালেন।

বললাম, 'অজয় পেরিয়ে চলে যাবো বীরভূমে।'

'গঙ্গা যদি সঙ্গে যায়—।'

'শুনুন।' আমি প্রায় আঁতকে উঠলাম।

'গঙ্গা খিলখিল করে হেসে উঠলো· 'কেন বাবা ওঁকে ওরকম ভয় দেখাচ্ছেন ? শেষটায় সব ভেস্তে যাবে। পূর্ণিমার পরের দিন, আমি বেলেরহাট থেকে এখানে ফিরে আসব। উনি যাবেন ওঁর পথে।'

'তুমি আমার মেয়েকে একলা ছেড়ে দিতে চাও ?' ক্ষ্যাপাবাবা তাকালেন আমার চোখের দিকে।

কী ক্ষ্যাপার পাল্লায় পড়লাম। গঙ্গার দিকে তাকালাম। গঙ্গা চোখের ইশারায় ঘাড় ঝাঁকালো। অর্থাৎ, ইশারা দিচ্ছে, হ্যাঁ তাই বলুন। আমি বললাম, 'তা কেমন করে ছেড়ে দিতে পারি ?'

'এই হল ওর ধর্মের কথা। ও তো ধর্মে নেই।' ক্ষ্যাপাবাবা আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন, 'শোন, যার যেদিকে মন, সে সেদিকে যাবে। মেয়ে আমার তোমার সঙ্গে যেতে চেয়েছে। আমি অনুমতি দিচ্ছি। তোমাকে আমি একটু আধটু চিনেছি বাবা। মেয়ে আমার অবলা নয়। তবে, তোমার রঙটা লেগেছে। যেখানে খুশি তোমরা ছাড়াছাড়ি করো, আমার বলার কিছু নেই। সব মেয়ের গতি হবে। এটার যে কী হবে, জানিনে। শেষে মন্দিরেই না পুঁতে রাখতে হয়।' তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

গঙ্গা ক্ষ্যাপাবাবার পায়ের কাছে নুয়ে পড়লো। আমি যেন সংকটমুক্ত অস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

ব্যবস্থাটা ভালোই হয়েছিল। বেলেরহাটের বনমালী মুখোপাধ্যায় সম্পন্ন গৃহস্থ। শ্যামাক্ষেপার পরম ভক্ত। গঙ্গাকে নিয়ে চতুর্দশীর দিন তাঁর গৃহে পেঁছেছিলাম। অভ্যর্থনা রাজকীয়। জামালপুরের যাত্রী কেবল আমরা ছিলাম না। মুখুজ্জে মশাই স্বয়ং এবং আরও কয়েকজন। তাঁদের সঙ্গে বলির পশু সাতটি। তিন গরুর গাড়ি নিয়ে যাত্রা। এক গাড়িতে আমি আর গঙ্গা। বাকি দুটোতে মুখুজ্জে মশাই, আর তাঁর ব্যাঘ্র-ক্ষত্রিয়, বাউরি লেঠেল সঙ্গীরা। আমাদের গাড়ির ছইয়ের সঙ্গে দুটো জলের জালার গলা দড়ি দিয়ে বেঁধে নেওয়া হয়েছিল। কারণ জলাভাব নাকি নিদারুণ। জলের বদলে রক্ত খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে হয়। কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করেনি। তবে অবস্থা প্রায় সেইরকম।

পাটুলি থেকে হাঁটা পথ ছ' মাইল। বেলেরহাট থেকেও কিছু কম না।

বেলেরহাট থেকে রাস্তা এসে মিশেছে নিমদহে। চলতি কথায় নিমদে। গরুর গাড়ি সারি সারি তো বটেই। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে শত শত মেয়ে পুরুষ চলেছে জামালপুরে। বুড়োরাজের মেলায়। প্রত্যেকের কাঁধে বুকে বলির পশু। পুরুষদের প্রকৃতই রণসাজ।

নিমদে গ্রামের পথে ডান দিকে ঘুরলেই সুদীর্ঘ এক জলাশয়। আমাদের গাড়ির চালক বললো, 'এইটে আসলে গঙ্গা। গঙ্গা এখানে ছিল, এখন সবে গেছে।'

কথাটার সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ঝিল বিলের থেকে অনেক বড়। গোটা নিমদে গ্রাম ঘুরে, জামালপুরের প্রান্তে গিয়ে শেষ। দু' ধারে গ্রাম। তবে গ্রাম চেয়ে দেখার উপায় নেই। গায়ে মাথার চুলে তো বটেই, চোখের পাতায়ও ধুলো। ধুলো মুখের মধ্যে। দাঁতে কির্চকিচ।

গরুর গাড়ির চালক আমাদের গাইড। নিমদেয় পড়ে পুরনো গল্পটা সে বললো। গঙ্গা উপুড় হয়ে শুয়েছিল খড়ের ওপর শতরঞ্জির বিছানায়। আমি এক পাশে কাত হয়ে বসে। গল্প শুরু হতেই গঙ্গা উঠে বসলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, ধুলোমাখা যোগিনী। চোখে মুখে খুশির ছটা। ভাবটা, যাবো না যাবো না যাবো না ঘরে।

চালক বললো, 'এই যে দেখছেন নিমদে গাঁ, যদু ঘোষ নামে এক পুণ্যমন্ত লোক ছিল। বিস্তর তার গরু মোষ। তার মধ্যে এক মায়ের (গাভী) নাম শ্যামলী। যদু ঘোষের নজরে পড়ল, শ্যামলীর বাঁটে দুধ থাকে না। দুইবার সময় সব গাই দুধ দেয়। শ্যামলীর বাঁট শুকনো। এমন কেন? নজর রাখতে লাগল। দেখলে, সব গরু মোষ এক জায়গায় চরতে যায়। শ্যামলী চলে যায় জামালপুরে। যদু ঘোষ পিছু নিল একদিন। জামালপুর তখন জঙ্গলে ভরা। সেঁয়াকুল, বেত আর বাবলা বন। যদু ঘোষ দেখল শ্যামলী এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। আর তার বাঁট থেকে ফোয়ারার মতন দুধ ঝরছে। দেখেই ঘোষের মাথা ঘুরে গেল। বিত্তান্ত কি? ছুটলে বামুনের কাছে। তাঁর নাম মধুসূদন চাটুয্যে। তিনি সব শুনে ঘোষের সঙ্গে সেই জায়গায় গেলেন। গিয়ে দেখেন, দুধ ঝরে পড়ছে এক পাথরের মাথায়।'...

গরুর গাড়ির চালকের অলৌকিক গল্প অলৌকিকতর। বেলা সামান্য বাড়তে না বাড়তেই বৈশাখের খর রৌদ্র গরুর গাড়ির ছই তাতিয়ে তুললো। আমি বললাম, 'এই পাথরটাই ইতিহাসের একটা সংকেত।'

'সেটা কী?' গঙ্গা পা ছড়িয়ে বসেছিল। পা গুটিয়ে গল্প শুনতে বসলো। স্থির হয়ে বসা যায় না। টাল সামলাতে গিয়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে কয়েকবার। লজ্জা পাওয়া অকারণ। বললাম, 'ওটা আমার ধারণা।' পাথরটাকে শিবলিঙ্গ বলা হচ্ছে। আসলে সেটা শিবলিঙ্গ নয়। রাঢ়ের এসব অঞ্চলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার ছিল। নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে

বৌদ্ধ দেব দেবীর নানা মূর্তি। এ পাথর তারই কোনো টুকরো হতে পারে। হতে পারে, কোনো বিগ্রহের শিলা বেদী।'

'শ্যামলীর ঘটনাটা কী?' গঙ্গা ছোট বালিকার মতো জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'ভক্তি আর ভালবাসার গল্প। আবিষ্কারটা যদু ঘোষের থেকে চাটুজ্যে মশাইয়ের বেশি। কারণ স্বপ্নটা তো তিনিই দেখেছিলেন। দেবতা তাঁকে বলছেন, আমার নিত্য পূজা কর। কোনো জাঁকজমক হবে না। শুধু দুধের ভোগ। মন্দির হবে গরীবের কুঁড়ে ঘর। তার মানে কী?'

'কী?' গঙ্গার ভাসা চোখে ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'গরীব মানুষের দেবতা। পাথর রাখা হয়েছিল কোনো গরীবের ঘরে। জাঁকজমক কেমন করে তারা করবে? আসলে তো তিনি ধর্মরাজ। হিন্দুর দেবতার বদলে রাঢ়দেশে লোকদেবতা বা গ্রাম্য দেবতার মধ্যে ধর্মরাজ সব থেকে প্রাচীন। বলা হয় বটে, তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দেবতা। আসলে তিনি ছিলেন সমাজের নিচু শ্রেণীর মানুষের উপাস্য। যে মানুষেরা ছিল রাজার সৈন্যবাহিনীর বীর যোদ্ধা। সামন্ত রাজাদের অধীনে তারাই ছিল সৈন্য যাদের ঢাকে বাজতো দগর, রক্তে। পায়ে ঝমঝম বাজনা ঝাঁজর। লাঠির ঘায়ে তরোয়াল উড়ে যেতো। তাদের দেবতা তো ইঁট পাথরের মন্দিরে থাকতে পারে না। অতএব, চাটুজ্যে মশাই দেবতার বরাত দিলেন কুঁড়েঘর। কারণ সেখান থেকে তাঁকে নড়াবার উপায় ছিল না। ধর্মরাজ বীরত্ব আর শক্তির প্রতীক।'

'ব্রাহ্মণরা কেন ধর্মরাজকে শিব করলেন?' গঙ্গা ঘাড় কাত করে তাকালো। খোলা চুলে কপাল গাল ঢাকা। শরীর দুলছে টলছে গরুর গাড়ীর চাকার তালে।

দুলছি আমিও। মাথা ঠুকে যাচ্ছে জলের জালায়। বললাম, 'ইতিহাসের সময়টা বদলে গেছে তখন। বৌদ্ধ দেবতাকে হিন্দু না করতে পারলে মন মানছিল না। মনটা তো আসলে সকলের ভক্তিতে এক জায়গায়। রোগ শোক দুঃখ, সব কিছুর জন্যই, ঈশ্বর নানারূপে দেবতা। ধর্মরাজকে হিন্দু করতে অসুবিধা কী? এখানেই তো আপোষ। আর এখানেই পরস্পরের মিলন, আর মাখামাখি। বিবাদের মিটমাট। ধর্মরাজের রাজ বুড়োশিবের বুড়ো, বুড়োরাজ। কিন্তু রাস্তায় কাতার দিয়ে যাদের যেতে দেখছি, তাদের বেশির ভাগ কারা?'

'দেখে মনে হচ্ছে ছোট জাত।' গঙ্গা কথাটা বলেই চোখ নত করলো। লজ্জা পেয়ে হেসে বললো, 'সেই বীরের জাত।'

বললাম, 'হ্যাঁ, কারণ উৎসবটা প্রধানতঃ তাদেরই। যে কারণে ক্ষ্যাপাবাবা বললেন, মুসলমানরাও এখানে পাঁঠা মানত করে।'

'গাড়ি তো আর যাবে না বাবু।' চালক বললো।

গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। গাড়ি যাওয়া দূরের কথা, নিজেরা কেমন করে যাবো, সেটাই ভাবনা। বনমালীবাবু এসে আমাদের নামতে বললেন, 'একটু হাঁটতে হবে। কিন্তু জলের জালা নিয়ে যাওয়া চলবে না। ছিনিয়ে খেয়ে নেবে। তেষ্টা পেলে এখানে এসে খেয়ে যেতে হবে।'

একটা আধটা নয়, অনেক গরুর গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন গঙ্গা পেরিয়ে এসেছি। জামালপুরে ঢুকেছি। বাবার এলাকায় পা দিয়েছি। আসন্ন বলির পশুর আর মানুষের চীৎকার। ধুলায় ধুলোকার চারদিক। তার মধ্যেও সেই কুহু কুহু!...

গঙ্গা আমার একটা হাত চেপে ধরলো। আমি তাকালাম তার মুখের দিকে। সে ধুলামাখা মুখ লাল করে বললো, 'কোথায় হারিয়ে যাব জানিনে।'

হাতটা অনায়াসে ধরে নি। চারিদিকে নরনারীর যে-রকম চাপাচাপি ঠাসাঠাসি। হারিয়ে যাবার আশঙ্কাটা অমূলক না। দায়ে পড়েই ধরেছে। যারা আমাদের গায়ে গায়ে ঠেলে চলেছে, মেয়ে মদ্দ সবাই হাতে হাত তো বটেই। মেয়ে বউরা পুরুষের ধুতির সঙ্গে শাড়ির আঁচলে গিঁট বেঁধে নিয়েছে। তবে এ যা ভিড়, গিঁট বাঁধা আঁচলসুদ্ধ হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্যের না। ঠাসাঠাসির চাপে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। অতএব, হাত চেপে ধরায় লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিন্তু গঙ্গার লজ্জাটাও অনিবার্য। কখনও এমন করে পুরুষের হাত ধরে বোধহয় চলতে হয় নি। অথচ এখানে হাতের স্পর্শটা কিছুই না। আমরা এখন বহু অঙ্গে বিশাল এক উত্তাল অঙ্গ। হেসে বললাম, 'শক্ত করে ধরে রাখুন। হারালে দুজনেই হারাবো।'

কথাটা উলটো কলে বাজলো। গঙ্গা বললো, 'এখনই তো হারিয়ে গেছি মনে হচ্ছে। আমরা তো আর আলাদা নেই। সকলের মধ্যে মিশে গেছি।'

কথাটা মিথ্যা না। হারিয়ে যাওয়া বলতে যা বোঝায় আমরা তেমনি করেই সকলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছি। এ হারানোটা নিরিবিলিতে না, আড়ালে আবডালে না। অনেক ভিড়ের মধ্যে থেকেও, দুজনের আলাদা করে হারিয়ে যাওয়া। বনমালী মুখুজ্জে মশাই, আর তাঁর বলির পশুসহ দলবলও এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছি না। দু বছর আগের একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। প্রয়াগের কুম্ভমেলায় ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নানার্থীদের ভিড় এর থেকেও যেন ঠাসাঠাসি ছিল। ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই, ভয়ের শিহরণ লাগলো। মানুষের পায়ের তলায় মানুষ পিষ্ট হয়ে মরেছিল। মৃতের কোনো যথার্থ হিসাব হয় নি। চিতা নিভতে কয়েকদিন সময় লেগেছিল। এবার আমার হাত শক্ত হল। গঙ্গার

হাত সবলে চেপে ধরলাম। গঙ্গা আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো। ওর চোখে জিজ্ঞাসা। ধুলো আর ঘামে আরক্ত মুখ। বললাম, 'আরো শক্ত করে ধরে রাখুন। থামবেন না, আর সোজা হয়ে থাকবেন। পড়ে গেলেই সর্বনাশ মানুষের পায়ের তলায় পিষে যেতে হবে।'

'এত ভয়, এত কষ্ট, তবু এমন জায়গায় আসতেই হবে?' গঙ্গার ধুলো মুখে হাসি।

আমি জবাব দেবার আগেই, গঙ্গার ঘাড়ে ঠেকানো এক হাসকুটি কালো যুবতী বউ হেসে বাজলো, 'হুঁ গ, আসতেই হবে। বুড়োরাজের থানে আসতে গেলে ভয় কষ্ট মানতে নাই। সোয়ামির হাত শক্ত করে ধরে চল।'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না, আমরা—।'

'থাক্ এখন আর শোধরাতে হবে না।' গঙ্গা মুখ থাবাড়ি দিয়ে আমাকে থামালো, 'সেটা হবে আর এক ফ্যাসাদ। কৈফিয়তের ঠ্যালায় অস্থির হতে হবে।'

মেয়ে মদ্দ সকলের গায়ে গায়ে পায়ে পায়ে জড়াজড়ি। গঙ্গার চোখে ভ্রূকুটি ইশারা। বুঝতে অসুবিধা হল না। এই ভিড়ে, আমাদের সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করতে গেলে, নতুন জিজ্ঞাসা অনিবার্য। তখন সত্যি মিথ্যের ফাঁদে পড়ে, বেআক্কেল হতে হবে। কী বা যায় আসে, কে আমাদের কী ভাবলো। নিজেদের তো জানাজানি আছে। অতএব যে যা খুশি ভাবো। সাবধানে চল!

এখন গঙ্গার এক হাত আমার কোমরে। শরীরের ছুৎমার্গিতার কোনো প্রশ্ন নেই। প্রাণের দায়ে স্পর্শানুভূতি মস্তিষ্কে কোনো ঝংকার তোলে না। কিন্তু যতো এগোচ্ছি, ভিড় যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

কিন্তু এ ভয়টা যে কিছুই না সেটা যতো এগিয়ে গেলাম, ততো বুঝতে পারলাম। চিৎকারে কান পাতা দায়। বলি শুরু হয়ে গিয়েছে। বড় একটা পাকা দোতলা বাড়ির সামনে এসে আর কোথাও যেতে পারি না। একটা বিরাট দল লাঠিসোটা নিয়ে মার মার করে এগিয়ে এলো। সঙ্গে মেয়েরাও। যাদের অঙ্গের বসন উদাস। উদ্ধত শরীরে বীরাঙ্গনার স্বরে হাঁকাড়। লাঠিতে লাঠি ঠকাঠক।

গঙ্গার গায়ে মুখে ছিটকে রক্ত লাগলো। আমার ঘাড়ের ওপর একটা মুণ্ডহীন পশুর কালো নধর ধড়। দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরলাম। পুলিশ এলো ছুটে। লাঠি উঁচোবার উপায় নেই। যার বলি, তাকে দাও। একটা আধটা না। ধড় নিয়ে টানাটানি। আমি গঙ্গাকে নিয়ে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করলাম। আমার ঘাড় থেকে তখন ধড় টেনে নিয়েছে। গায়ের পাঞ্জাবিটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু দাঁড়াবো কোথায়?

'এই যে আপনারা। আর আমি আপনাদের খুঁজে মরছি।' হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে উদয় হলেন বনমালী মুখুজ্জে। বললেন, 'আপনি মায়ের হাত ধরুন' বলে, আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, 'বাবার থানে চলুন আগে, তারপরে এক জায়গায় বসাব।'

মনে হলো, আমরাই বলির পশু। ঘামে ধুলায় কাদা মাখামাখি শরীরের পাহাড় ঠেলে চলেছি। সামনে বিরাট নাটশালা। সেখানেও ভিড়। তারই মধ্যে চারপাশে নানা পশরা সাজানো দোকান। সেদিকটায় কিঞ্চিৎ ফাঁকা। বেশ কিছু মিষ্টির দোকান। আসলে খাবারের দোকান না বলে, পুজো দেবার মণ্ডা মিঠাই আর ফুলের দোকান বলাই উচিত। বুড়োরাজ তা হলে রক্ত মাংস ছাড়া মিষ্টিও খান! রক্তারক্তি দেখে বিশ্বাস হয় না। ঐ সব ভক্তরাই বোধহয় আসলে নিরামিশাষী। ব্যাটারি সেটের মাইকে গান আর সার্কাসের খদ্দেরকে ডাকাডাকি, 'বাঘের খেল। রইল বেঙ্গিল টেগারের মুখে মানুষের মুণ্ডু, বিস্ পয়সা!...'

'দেখুন।' গঙ্গা আমার জামা টেনে ধরলো।

ওর লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখি, বিরাট এক তেঁতুল তলায় শুয়োর বাঁধা। ত্রাহি চীৎকার জুড়েছে। কালো জোয়ান পুরুষের হাতে খড়্গ উঠলো। বরাহ মুণ্ডু ছিটকে গেল। মনে হলো, হত্যালীলার এক বীভৎস খেলা চলছে। কিন্তু বরাহ বলির কথা শুনিনি। চোখেও কখনও দেখি নি। অবিশ্যি অন্যভাবে বরাহ হত্যা দেখেছি। বলির থেকে সে-দৃশ্য নৃশংস। কিন্তু মনে অবাক জিজ্ঞাসা, খড়্গ কি বরাহ কণ্ঠও ছিন্ন করতে পারে? না কি অস্ত্রটি অন্য কিছু? যাই হোক, দেখছি, বুড়ো শিব তাও নেন। বলি এক জায়গায় হচ্ছে না। বিশাল এক গাছতলায় খড়ের ঘর। সেখানে নরনারীর প্রচণ্ড ভিড়। দাওয়ার নিচেই যূপকাষ্ঠ। এক ফাঁকে চোখে পড়লো মাত্র। সেখানে মানুষের দেওয়াল। বলির পশু মানুষের মাথা ডিঙিয়ে সেখানে পড়ছে। ছিটকে উঠছে রক্ত। তারপরেই আবার মারামারি কাড়াকাড়ি। যূপকাষ্ঠের ছড়াছড়ি গোটা প্রাঙ্গণ জুড়ে। রক্তের ধারা চারিদিকে।

বনমালীবাবু বললেন, 'মন্দিরে এখন ঢোকা যাবে না। বাবার মাথায় ফুল পড়েছে, দুধ ঢালা হচ্ছে। এইটুকুনই ভরসা। চলুন মন্দিরের পেছনে যাই।'

যাবো কেমন করে? কেমন করে আবার? যেমন করে সবাই যায়। জবাবটা নিজেকে নিজে দিই। গঙ্গাকে চিনতে পারছি না। মুখে গায়ে রক্ত। এলোকেশী। চোখে এখন আর সেই খুশির ছটা নেই। একটা আতঙ্কের ছায়া। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। এই ধরাধরি ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে দ্বিধা সংকোচের বাধা অনেক আগেই দূর হয়ে গিয়েছে। রক্তে মাটি পিছল। খড়ের চালা মাটির দেওয়াল, মন্দিরের চারপাশে দড়িতে ঝুলছে অজস্র ঢ্যালা।

আরও ঢ্যালা বাঁধছে রমণীর দল। পুরুষ কম। কেবল ঢ্যালা না। ছোট লোহার ত্রিশূলও বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এ সব বাঁধাবাঁধির ব্যাপারটা কী?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল গঙ্গা। তার আগেই বেজে উঠলেন বনমালীবাবু, 'মানতের ঢ্যালা বাঁধছে। বাঁজা মেয়ের ছাঁ হবে, শূল পিত্ত বাত ব্যাধি দূর হবে। এমন কি মশাই বোবা কথা কইবে, কানা দেখতে পাবে। সেই মানত।'

আকাঙ্ক্ষিতের আশা। অসহায়ের বিশ্বাস। সেই সঙ্গে ডাক, 'জয় বাবা বুড়োরাজের জয়।'

মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখি, বেজায় ভিড়। একটা নালিমুখ দিয়ে দুধ গড়িয়ে আসছে। সেই দুধ সবাই অঞ্জলি ভরে নিচ্ছে। মুখে দিচ্ছে। শিশি-বোতলে, ঘটি গেলাসে ভরছে। শুনলাম, বাবার চরণামৃত সংগ্রহ হচ্ছে। তার মধ্যেই এখানে ওখানে সন্ন্যাসী ভৈরবীর ভর। সেখানে মেয়েপুরুষ ভেঙে পড়ছে। কে আগে তার কথাটি জিজ্ঞেস করবে তার জন্যে ধস্তাধস্তি, 'ও বাবা, আমার সোয়ামীর খবর বল।' 'ও মাগো, মা, জামাইয়ের পুষ্টি হবে কি? মেয়ে আমার বাঁজা থাকবে কতকাল? ঘর ছাড়বে না তো?'

ভর যাদের হয়েছে, তাদের জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না। মৃগীরুগীর মতো মুখ ঘষছে মাটিতে। মুখের লালা গড়াচ্ছে। মুখে ধুলো কাদা মাখামাখি। অঙ্গের বস্ত্র শাড়ির সাব্যস্ত নেই।

তারপরই ঘুরে এসে আর এক দৃশ্য। বলির পশু নিয়ে টানাটানি কেবল না। ছাল ছাড়িয়ে টানাটানি।

গঙ্গা যেন শিউরে উঠে আমার বুকে মুখ গুঁজে দিল। প্রায় আর্ত, কান্না উদ্‌গত স্বরে বললো, 'এখান থেকে চলুন। আমি আর এসব দেখতে পারছি নে।'

ভিড়ের মধ্য থেকে কে বলে উঠলো, 'ঘরে লিয়ে চলে যান, বউ আপনার ভিরমি যাচ্ছে।'

কারা যেন হেসে উঠলো। মত্ত হাসি, এবং সেই সঙ্গে একটি মন্তব্য, 'অমন ফুলটুসি বউ নিয়ে বুড়োরাজের গাজনে আসা কেন বাপু?'

গঙ্গার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। ও আমার বুক থেকে মুখ তুললো না। এই ভিড়ে, এত লোকের সামনে, আমার কি একটুও সংকোচ হচ্ছে না? হচ্ছে। কিন্তু গঙ্গার অবস্থাও বুঝতে পারছি। এখানে আমি না থেকে ক্ষ্যাপাবাবা থাকলে, ও তাঁর বুকেও এমনি করে মুখ গুঁজে দিত। ও অজ্ঞাতকুলশীলা বটে। কিন্তু ক্ষ্যাপাবাবার আশ্রমে ও অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে, ওর হৃদয় যতো অনায়াস, মন সংস্কারহীন, মানুষের রক্ত নিয়ে উল্লাসে ততোটাই বীভৎস।

আমি উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততায় বনমালীবাবুকে খুঁজে বের করলাম। তিনি আমাদের নিয়ে ভিড় ঠেলে আবার সেই দোতলা বাড়ির সামনে। বাঁ দিক গিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন। ভাবলাম, এবার শান্তি। কিন্তু সেখানেও রোয়াকে উঠোনে ঘরে ঘরে ভিড়। অধিকাংশই মহিলা, নানা বয়সের। পুরুষও আছে। বলির পশুর মুণ্ডুর পাহাড় জমেছে এক পাশে। ধড়ও কম নেই। ছাল ছাড়ানো চলছে। গঙ্গাকে নিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সেই ঘরে রয়েছে বড় একটা তক্তপোষ। গঙ্গা তক্তপোষে উঠে এক কোণে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসলো। এ ঘরে অবিশ্যি গায়ে রক্তমাখা কয়েকজন নরনারী মেঝেয় বসে আছে। সকলেই দম নিতে এসেছে। আবার যাবে।

একটা আয়নায় নিজেকে দেখতে পেলাম। চিনতে পারলাম না। মুখে ধুলা আর রক্ত। মাথার চুলে রক্ত শুকিয়ে লেগে আছে। জামাটা দেখলে খুনী বলে মনে হয়। ধুতিটাও বাঁচেনি। গঙ্গা মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো। বললো, 'একটু জল খাব।'

বনমালীবাবু কাছেই ছিলেন। বললেন, 'দেখছি।'

একটু পরে এক টকটকে ফরসা মহিলা এলেন জলের ঘটি নিয়ে, 'এই নাও মা, জল নাও।'

ঘটির গায়ে রক্ত লেগে আছে। গঙ্গা ঘটি নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে থমকে গেল। বললাম, 'রক্ত শুকিয়ে গেছে। জলে লেগে নেই। আপনি খান, আমিও একটু খাব।'

'তবে আপনি আগে খান।' গঙ্গা ঘটি বাড়িয়ে দিল।

আপত্তি টিকবে না জানি। ঘটি তুলে আলগা করে গলায় ঢাললাম। জলের মধ্যে মাটি। উপায় নেই। গঙ্গাও সেইভাবেই গলায় জল ঢাললো। তারপরে থু থু করে মাটি ফেললো মুখ থেকে। বললো, 'আমরা তো গরুর গাড়িতে যেতে পারি। সেখানে জল আছে। চিড়ে মুড়ি মিষ্টিও আছে।'

সত্যি, বেলা চলে গেল কোথা দিয়ে। খিদে পাবার কথা। গঙ্গার ধুলামাখা মুখ ইতিমধ্যেই যেন শুকিয়ে শীর্ণ। যতোটা ভিড়ে আর রক্তাক্ত দৃশ্য দেখে, ততোটা খিদেয় না। বললাম, 'হ্যাঁ, তাই চলুন।'

বেরিয়ে যাবার মুখে বনমালীবাবু এগিয়ে এলেন, 'এবার কিছু খাওয়া দরকার।'

বললাম, 'আমরা গাড়িতে যাচ্ছি, সেখানেই খাবো।'

'যেতে পারবেন?'

'পারবো।'

'আমার এখনো কাজ কিছু বাকি আছে। এখানে আর নতুন করে কিছু

দেখার নেই। তবে মন্দিরের মধ্যে আপনার ঢোকা হল না।'

বললাম, 'অন্য সময় এসে দেখবো। এ যাত্রায় বাইরে থেকেই বিদায় নিতে হচ্ছে।'

বনমালীবাবু আমাদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে এসে বললেন, 'তেমন বুঝলে বা ইচ্ছে করলে, মাকে নিয়ে আপনি বেলেরহাট রওনা হয়ে যাবেন।'

জামালপুর গ্রামের বাইরে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন আমার জামার কাঁধ ছেঁড়া। গঙ্গার শাড়িতে গাছকোমর বাঁধা। তবু শান্তি। কারণ, ভিড় থাকলেও সেই ভয়াবহ অবস্থা নেই। তবে বলির পশু নিয়ে টানাটানি চলছে সারা পথ জুড়ে। আবার উল্লাসের উত্তাল মিছিলও আছে। মেয়ে মন্দ উন্দাম। দ্রব্যগুণের মাতন। বোধহয় ওটা ছাড়া হয় না।

গাড়ির গরু ছাড়া। গাড়িটা শোয়ানো। চালককে দেখতে পেলাম না। ছইয়ের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখি, ভেজা কাপড়ে জড়ানো একটা বলির পশু। কাপড়টা রক্তে ভিজে উঠেছে। গঙ্গা চোখ কপালে তুলে বললো, 'এখানেও সেই জিনিস ?'

কোথা থেকে চালক এসে বললো, 'কী করব বলেন, একজন এসে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।'

আমি বললাম, 'গরুর জোয়াল চাপাও। আমরা রওনা দেবো।'

'বাবু আসবেন না ?' চালক বিচলিত হলো।

'আসবেন। উনি ওঁর গাড়িতে যাবেন। আমরা তার আগেই চলে যাবো।' আমাকে একটু চোখা ববে নির্দেশ দিতে হলো। না দিয়ে উপায় ছিল না। পাছে বাবুর দোহাই পেড়ে, না যাবার মতলব করে।

গরু জুততে সামান্য সময়। কিন্তু কার বলির পশু আমরা নিয়ে চলেছি ? তার আগে নিজেই খাবার বের করলাম। গঙ্গা আগে জালায় ঘটি ডুবিয়ে প্রাণভরে তৃষ্ণা মেটালো। মিষ্টির হাঁড়িটা বের করে আমার সামনে দিল, 'খান।'

'আগে আপনি খান।'

'শুনুন, আর আমাকে আপনি বলবেন না।' গঙ্গা আমার কাঁধে হেলান দিয়ে বসেছিল। এখন ও নিজেকে ফিরে পেয়েছে। চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাকে একটা কথার জবাব দেবেন ?'

'কী ?'

'এত কষ্ট করে এসব ঘুরে দেখেন কেন ?' গঙ্গার ভাসা চোখে গভীর ঔৎসুক্য।

হেসে বললাম, 'এসব বলে তো বিশেষ কিছু নয়। সব কিছুই দেখতে ইচ্ছে করে। রূপ তো অনেক। এটা সব নয়।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। গঙ্গা জিজ্ঞেস করলো, 'কষ্ট হয় না ?'

'হয়। আবার ভুলে যাই।' হেসে বললাম, 'এখন আর কষ্ট হচ্ছে না। ভাবছি, আমার দেশের কতো জায়গায় কতো কী ঘটে। কতো মানুষের কতো বিশ্বাস সংস্কার, পিছনে রয়েছে একটা ইতিহাসের ধারা। আর এই যে গ্রাম—এ যে আমাদেরই দেশ, এই যে আমরা, সেটা তো এভাবেই জানতে পারি।'

গঙ্গার অবাক চোখে একটা অন্যমনস্কতা নেমে এল। বেলা গড়িয়ে বিকাল। বাতাসে শাদা চন্দনের মতো ধুলা উড়ছে। সাবেক কালের বিচ্ছিন্ন গঙ্গা এখন শুকু শুকু। ক্ষীণ জলের ধারায় রক্তাভা। পাখি ডাকছে, কুহু কুহু।...

জিজ্ঞেস করলাম, 'গঙ্গা, কষ্ট হচ্ছে ?'

কাদা রক্ত মাখা মুখে উজ্জ্বল হাসি ফুটলো। ভাসা চোখে কালো দ্যুতি, 'না। মনে হচ্ছে, এমন কষ্ট অনেক সইতে পারি, যদি আপনার মত করে দেখতে পারি। সত্যি কি অজয়ের ওপারে চলে যাবেন কাল ?'

বললাম, 'আগামীকাল নিমাইয়ের সন্ন্যাসস্থানে যাবো। যেখানে তিনি তাঁর চাচর কেশ মুণ্ডন করেছিলেন। তারপরে অজয়ের ওপারে যাবো।'

গঙ্গার দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের ঘোর, 'আমি যাবো ?'

আমি হেসে বাইরের দিকে তাকালাম। জানি, গঙ্গা কোথায় ঠেকে আছে। বললাম, তোমার জায়গা তো এখনও ঠিক হয়নি। আমার সঙ্গে তোমার রাস্তা মিলবে না। তুমি জানোই।'

'কাল তবে ছাড়াছাড়ি ?' গঙ্গাও বাইরের দিকে তাকালো।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। বুঝতে পারছি, গঙ্গা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুখ দেখে কিছু কি পড়তে পারছে ? ওকে বোঝাতে পারবো না, আমি রূপনগরের পথ ধরেছি। ও এক জায়গায় বাঁধা পড়ে আছে। সেটা ওর মন। ওর মুক্তিটা অন্যখানে। আমার পথে না। রূপনগরের দর্পণে নিজেকে খুঁজে ফিরছি। চিনতে পারি না। সে কথাটা আজ পর্যন্ত কারোকে বোঝাতে পারিনি। মনোহরা হয় তো এক রকমে বুঝেছে। তার একটা সংকেত দিয়েছিল, আত্মানুসন্ধান। কী কঠিন কথা, কতো অনায়াসে উচ্চারিত হয়।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ধরা ছাড়া বলে কি কিছু আছে ? তুমি কাল একলা যেতে পারবে তো ?'

'আপনি পেঁছে দিয়ে আসবেন।' গঙ্গার চোখে কৌতুকের ছটা ! যোগিনী রঙ্গিণী হয়ে ওঠে।

আমি উদ্বেগে তাকাই। গঙ্গা মুখ তুলে হাসলো, 'জানি, আপনার পথে আমার যাওয়া হবে না। ভয় নেই, ফিরতে পারবো। কিন্তু কী একটা কষ্ট হয় জানেন ?'

তাকিয়ে দেখি, যোগিনীর চোখের কোণে টলটল বিন্দু কাঁপে। সহসা

কোনো কথা বলতে পারি না। গঙ্গার স্বর যেন রুদ্ধ, 'কেন পারিনে ?'

হঠাৎ আমার ভিতরে কোথায় সেই গান বেজে উঠলো, 'তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো।'…আসলে এই জিজ্ঞাসা নিয়েই তো নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। ভাবি, আমিই কি পেরেছি ? কে বা কী পেরেছে ? এই মনে ভাবি। গাড়িটা চলছে মাতালের মতো। আমরা টলছি। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে কখন খেয়াল করিনি। গরুর গাড়ির ছইয়ের ফাঁক দিয়ে সন্ধ্যার প্রথম ম্লান জ্যোৎস্নার একটি রেখা এসে পড়েছে। রেখাটি বুক ডিঙিয়ে চিবুক ছুঁয়েছে। ওর মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু চোখ দুটো কোন্ দিকে বুঝতে পারছি না। অথচ ওর গালে একটা রেখা যেন চিক চিক করছে।

গাড়োয়ান হাঁকছে, 'হু' হু', পথ চল্ বাবা। ডাইনে বাঁয়ে করে মেজাজ খারাপ করিসনে। পিটিয়ে মারব তা'লে।'

গঙ্গা চোখের জলে ভেসে উঠলো, 'শুনলেন ?'

'শুনলাম।'

পথ বেঠিকের মারটা সকলের কপালে এমনি করেই নেমে আসে। অতএব, গঙ্গা যাবে আশ্রমে। আমি যাব আমার পথে।…

———

পিঞ্জরে অচিন পাখী

'দগ্ধশুক্র' কথাটা আমি প্রথমে শুনেছিলাম আমার এক জ্যোতিষী বন্ধুর কাছে। এখন মনে করতে পারছি না, বন্ধুটি 'দগ্ধশুক্র জাতক' কথাটি উচ্চারণ করেছিল কি না। সাধারণভাবে, 'দগ্ধশুক্র' কথাটি জ্যোতিষ শাস্ত্রেও অপ্রচলিত। সকলের মুখে শোনা যায় না। আমার জ্যোতিষী বন্ধুটি বলেছিল, কোন ব্যক্তির কোষ্ঠীতে যদি 'দগ্ধশুক্র জাতকের' লক্ষণ দেখা যায়, অথবা ব্যক্তিটির কোষ্ঠীতে তাকে দগ্ধশুক্র জাতক বলে সনাক্ত করা যায়, তা হলে সেই ব্যক্তিকে কথাটি না জানানোই শ্রেয়।

আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমার জ্যোতিষী বন্ধুটি 'দগ্ধশুক্র জাতক' শব্দটি উচ্চারণ করেছিল, এবং বলেছিল,' সমাজে আমাদের চোখের সামনেই অনেক দগ্ধশুক্র জাতকের লোক ঘোরাফেরা করে। কিন্তু কোনো মানুষেরই যেমন তার চরিত্রের বিষয় তার গায়ে লেখা থাকে না, দগ্ধশুক্র জাতকের ব্যক্তির গায়েও কোনো ছাপ মারা থাকে না। আর দশজন বিশিষ্ট বা অবিশিষ্ট ব্যক্তির মতোই সে সমাজে বাস করে। সেও একজন সামাজিক জীব। শিক্ষাদীক্ষা ভদ্রতা নম্রতা এমন কি বিশিষ্ট প্রতিভাধর ব্যক্তি হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব না।

আমি অভিধান সূত্রে দেখতে পাচ্ছি, জাতক শব্দের অর্থ 'জন্মকোষ্ঠী'ও উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আমার জ্যোতিষ বন্ধু 'দগ্ধশুক্র জাতক' শব্দটিই ব্যবহার করেছিল। তার কাছ থেকে যে ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম, তা হলো, 'দগ্ধশুক্র জাতক'-এর ব্যক্তি তিনি পৃথিবীর যতো বড় প্রতিভাধরই হোন, বা এক অতি সাধারণ লোকই হোন, তিনি 'বেশ্যাসক্ত' হবেনই বা হবেই। তিনি গৃহী হতে পারেন, তাঁর স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকতে পারে, এমন কি সেই ব্যক্তি সমাজের একজন বিশিষ্ট শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিতও হতে পারেন, কিন্তু এটি তাঁর ভাগ্যের লিখন, জন্মলগ্নেই সেই ব্যক্তি দগ্ধশুক্রের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন। এর থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। গণিকালয়ে তিনি গমন করবেনই, তিনি গণিকাগামী হবেনই। কিন্তু তার অর্থ, পরদারগামী না। বেশ্যা এবং পরস্ত্রী, দুটি ভিন্ন সত্তা। পরস্ত্রী বলতে আমরা অপরের বিবাহিতা স্ত্রী বুঝি। অথবা পরস্ত্রী বলতে, আমরা বোধ হয় এমন ব্যাখ্যাও করতে পারি, সমাজের গৃহস্থ রমণী। সে বিবাহিতা হতে পারে, নাও হতে পারে। নিজের স্ত্রী ভিন্ন, যে কোনো গৃহস্থ রমণীকেই পরস্ত্রী বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু গণিকা বা বেশ্যা, তার ভূমিকা আলাদা। তাকে বলা হয় পণ্যাঙ্গনা। অঙ্গকে যে রমণী পণ্য করেছে। সহজ কথায় দেহোপজীবিনী। যে স্ত্রীলোকের

দেহই জীবিকা। এ বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, এবং আমার নতুন করে কিছু বলারও নেই। রমণীর এই জীবিকা আমরা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই নানাভাবে জানতে পেরেছি। অতি প্রাচীনকাল থেকেই রমণী এই জীবিকার দ্বারা জীবনধারণ করেছে। এমন কি ইতিহাসও সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস বিখ্যাত গণিকার কথাও আমাদের জানা আছে। এমন কি, আমরা যাকে ক্লাসিক সাহিত্য বলি, গণিকাদের নিয়ে তাও সৃষ্টি হয়েছে।

আপাততঃ এ বিষয় আমাদের আলোচ্য না। দগ্ধশুক্র জাতক-এর কথাই আমি বলছি। আমি আধুনিকতার প্রশ্ন তুলতে চাই না। কেন না, এ শব্দটি আপেক্ষিক। আধুনিকতা কাকে বলে, কে আধুনিক, এ বিষয়ে বিস্তর বিতর্কের অবকাশ আছে। এ-রকম কোনো বিতর্কে আমি যেতে চাই না। নিজেকেও আমি আধুনিক বলে জাহির করতে চাই না। নগরবাসী জীবনের নানা রকমের ধরণধারণ দেখে যদি আধুনিক বলতে হয় তা হলে অনেককেই আধুনিক বলা যায়। কিন্তু আধুনিক মনের কথা আলাদা। এবং তাও বোধ হয় বিতর্কের বিষয়।

আমি সংসারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও পথের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। পাখি যেমন কুলা ছেড়ে, দূরের আকাশে উড়ে যায়, পথের ডাক সেই রকমই আমার মনের পাখায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়। একে যদি কেউ জীবনকে ফাঁকি দেওয়া বলে, পলাতক বলতে চায়, বলুক গিয়ে। আমি জানি, জীবনে কোথাও ফাঁকি দিয়ে সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে, জীবনে কেউ কোনো মহৎ কাজ করতে পেরেছে বলেও মনে করি না। যে পথকে মনে করেছি সংসারের বাইরে, আসলে তা বিশাল সংসারেরই আর এক রূপ। সেই রূপের নেশা আমাকে ডাক দিয়ে নিয়ে যায়। ছোট সংসারে প্রাত্যহিকতা যখন বুকের তৃষ্ণাকে আকণ্ঠ করে তোলে, তখন বিশাল সংসারের বুকে হাত বাড়িয়ে গণ্ডূষ ভরে তৃষ্ণা মেটাই। সেই হিসাবে, পথের ডাকে আমি ঘর বিবাগী বৈরাগী না, বিশাল জীবনের অঙ্গনে, নিজেকে আর এক রকমের আবিষ্কার। নিজেকেই নতুন করে খুঁজে ফেরা।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে, নিজেকে আমি আধুনিক বলতে পারি না। কেন না, আমার ঘর ছাড়া, পথে ঘোরা মনটা আধুনিকতার ধার কাছ দিয়ে যায় না। তখন আমি গগন বিহারী বিহঙ্গের মতো, পাখা ঝাপটা দিয়ে, পরমের স্বাদ ভোগ করি। কিন্তু যুক্তি বলে একটা কথা আছে। সেটাকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। আধুনিক মন মাত্রেই যুক্তিবাদী, এমন কথায় আমার প্রত্যয় নেই। আধুনিকতার যে চিত্র চোখের সামনে দেখি, তার মধ্যে কারণের সন্ধান নেই। নতুন হাওয়ার পন্থী, এমন বলা যায়। যুক্তি ভিন্ন বস্তু। কার্যকারণের যোগসূত্রটা না মিললে, মন তৃপ্ত হতে চায় না।

জন্মলগ্ন থেকেই একজন মানুষ 'দগ্ধশুক্র জাতক' হয়ে জন্মাবে, তার এই

অনিবার্য নিয়তির যুক্তি খুঁজে পাই না। জ্যোতিষী শাস্ত্রে নানান ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কিন্তু মন মানে না। আমি আমার সেই জ্যোতিষী বন্ধুকে একথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম, দগ্ধশুক্র জাতক বংশগত কোনো ধারা বহন করে কী না। জবাব পেয়েছি, না। এ কোনো বংশগত বিষয় না। যার চৌদ্দ-পুরুষের মধ্যে গণিকা-গমনের কোনো ইতিহাস নেই, সেও দগ্ধশুক্র জাতক হতে পারে। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়, আমার বন্ধু নানা গ্রহ নক্ষত্রের কথাও বলেছিল। দগ্ধশুক্র জাতকের জন্মলগ্নে গ্রহ নক্ষত্রের বিশেষ অবস্থানই নাকি তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে নিরূপণ করে। এ-রকম ব্যাখ্যা শুনলে মানুষকে নিতান্তই ভাগ্যের হাতের ক্রীড়নক বলে ভাবতে হয়। আর সে ভাগ্য নিশ্চয়ই দুর্ভাগ্য, নিষ্করুণ, বেদনাদায়ক। মনের যুক্তি এখানে এসেই ঠেক খায়।

আমি ঠেক খেলে কী হবে। অন্যের জবাবে আসবে হয় তো জন্মান্তরবাদের কথা। মানুষ তার জন্মজন্মান্তরের দেনা পাওয়ানা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে শোধ করে যাচ্ছে, পাওয়ানা পেয়ে যাচ্ছে। এখানেও আমার যুক্তি জিজ্ঞাসা হয়ে জেগে ওঠে। জন্মান্তরবাদ মেনে নিয়ে যদি ধরে নিই, মানুষ তার গত জন্মের ফল পরজন্মে ভোগ করে, তবে মানুষের আদি সৃষ্টি থেকে, সংখ্যাতত্ত্বে বিচার মেলে কী করে? এমন তো না, যে পৃথিবীতে এককালীন সমসংখ্যক মানুষের জন্ম হয়েছিল, অতএব জন্মান্তরে সে তার পূর্ণ জীবনের ফলভোগ করছে। আদি সংখ্যা থেকে, কোটি কোটি নতুন মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে। এই সহ তাদের পূর্ণ জীবনের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, কর্ম ছিল না। তাদের জীবনের কর্মফল কীভাবে বিচার করা যায়?

এসব বিষয়ে আমি পণ্ডিত নই, বিজ্ঞও নই। স্বতোৎসারিত ত সরল জিজ্ঞাসা। এবং এসব জিজ্ঞাসার কূট তর্ক নিয়ে আমি অজস্র বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে চাই না। আমি ভাবি, পৃথিবীতে জন্ম নিল এক নবজাতক। সেই মুহূর্তেই তার আমোঘ ভাগ্য লেখা হয়ে গেল, সে দগ্ধশুক্র জাতক। একজনের জীবনে এ ঘটনা মর্মান্তিক আর নিষ্ঠুর।

মনস্তত্ত্বের কথা তোলাও এ ক্ষেত্রে নিরর্থক। জন্মলগ্নেই যার অমোঘ ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে আছে, তার অবচেতন মনের প্রসঙ্গ অবান্তর। পরিবেশ, পরিস্থিতি, জীবনযাপনের ধারা বা জীবনের বিশেষ কোনো মুহূর্তে অভূত-পূর্ব ঘটনায় মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে, আর তার ফলে জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন বা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সেই পরিবর্তনের কথা মানুষ তার সচেতন মন দিয়ে, আবিষ্কার নাও করতে পারে। অবচেতনের গভীর থেকে, তার জীবনের গতিকে চালিত করতে পারে। এ-রকম ঘটনাকে আমরা বৈজ্ঞানিক মনঃসমীক্ষা বা বিশ্লেষণ বলি। দগ্ধশুক্র জাতকের ক্ষেত্রে এই বিশ্লেষণ অপ্রয়োজনীয়। গ্রীক নাটকের বা আমাদের পুরাণের অনেক অভিশপ্ত নায়কের মতোই সে অমোঘ নিয়তির হাতের বলি হয়ে আছে।

ভূমিকা দীর্ঘ করতে চাই না। বরং মনে ব্যাকুলতা, ত্বরায় চলো হে, ত্বরায় চলো। তবু মনে আমার ঠেক। জিজ্ঞাসা, লাম্পট্য আর গণিকা-গমন কি সমপর্যায়ে পড়ে? সমাজে আমরা বিস্তর চরিত্রহীন লম্পট ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু তারা গণিকালয়ে গমন করে, এমন কোনো প্রমাণ নেই। অর্থ আর প্রতিপত্তির জোরে, তারা সমাজের বুকেই লাম্পট্য চালিয়ে যাচ্ছে। চোখ এবং মন খোলা রাখলে, এ নির্মম সত্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা অনেক আদর্শের কথা বলি, মূল্যবোধের কথা বলি, কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নগর জীবনকে কোথায়, কোন্ পঙ্কে নামাচ্ছে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না। অবিশ্যি কেবল নগরজীবন না, গোটা দেশই এর অন্তর্ভুক্ত। বরং গ্রাম জীবন আরও অনেক বেশী অসহায়। সেখানে এখনও সামন্তপ্রথার সব ঐতিহ্যগুলোই রয়ে গিয়েছে। সেখানে গণিকালয় নেই, দরিদ্র নারীই দুশ্চরিত্রের শিকার। অথচ সমাজের দুষ্ট ক্ষত হিসাবে আমরা তথাকথিত 'রেডলাইট এরিয়া'গুলোর দিকে আগে অঙ্গুলি সংকেত করি। এ সংকেত কি বাস্তবে একশো ভাগ সত্যি? যে নারীদের দেহই জীবিকা, নগর কর্তৃপক্ষ তাদের অঞ্চলকে এক জায়গায় সীমিত করেছেন। কিন্তু গোটা সমাজ আর নগরকেই আজ যারা অর্থ আর প্রতিপত্তির জোরে তাদের লাম্পট্যের মৃগয়া ক্ষেত্র করে তুলেছে, তাদের আমরা দেখি, চিনি। তাদের সর্বনাশা খেলার চেহারাটা নগর সভ্যতার একটা অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে মেনে নিয়েছি। কেন না লাম্পট্যও এখানে কালচারের নামে বিকোয়।

যাই হোক, আমি আবার বিতর্কিত বিষয়ে চলে যাচ্ছি। আসলে, আমি আমার এক বন্ধুর করুণ জীবনের কথাই বলতে যাচ্ছি। অতএব, ভূমিকার ইতি এখানেই।

আমি যে বন্ধুটির কথা বলতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। সেটা চাক্ষুষ পরিচয়। চাক্ষুষ পরিচয়ের আগেই আমি তার নামটা কয়েকবার শুনেছি। সে তখন কলকাতার এক বিখ্যাত বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্থার দুনম্বর অধিকর্তা। যে কয়েকবার তার কথা শুনেছি, সবই গুণের কথা। অনেকে তাকে জীনিয়সও বলতো। সে যে নিজের কাজের বিষয়ে, প্রকৃতই একজন গুণী, কিছু কিছু কাজেও তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে আমার আলাপের কোনো সূত্র থাকবার কথা না। সে এক জগতের লোক। আমি ভিন্ন জগতের।

অবিশ্যি কথাটা বোধ হয় ঠিক বললাম না। যাকে বলে 'দীন দরিদ্র সাহিত্যসেবক', নিজেকে যদি তাই বলি, অথবা 'সাহিত্য রচনায় নিজের জীবন-চর্চার অভিলাষী' এই আখ্যাও দিই, তা হলে বোধহয় কোনো না কোনো সূত্রে

বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের একটা সেতু থেকেই যায়। যায় বা বলেই বোধ হয়, এই বন্ধুটির সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটতে পেরেছিল। আমি অন্ততঃ কয়েকজন বরেণ্য এবং শ্রদ্ধেয় কবি সাহিত্যিকের কথা জানি, যাঁরা তাঁদের দুঃসময়ে, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের পাতায় লিখেছেন এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণও করেছেন, বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ভাষা কী আশ্চর্য শিল্প হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, বন্ধুটি প্রথম এসেছিলেন, আমার পরিচিত এক বিশিষ্ট পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে। বন্ধুটির নাম জানা থাকলেও, যেহেতু আগে কখনো চোখে দেখিনি, সেই হেতু ভাবতেই পারিনি, এই সেই সুবিখ্যাত বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্থার একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। পদাধিকারে হোমরা-চোমরা বটে, আসলে সে একজন বিদগ্ধ প্রতিভাধর গুণী। প্রথমতঃ ভাবতে পারিনি, সেই মানুষটির বয়স এতো কম। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, অভিজ্ঞতা ও কাজের হিসাবে, লোকটির বয়স হবে চল্লিশোর্ধ্বে পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে যে এলো, তার বয়স কোনক্রমেই প'য়ত্রিশ ছত্রিশের বেশি নয়। দ্বিতীয়তঃ ঐ রকম সংস্থার, ঐ রকম পদাধিকারী কোনো ব্যক্তিকে, সেই সময়ে বা অদ্যাবধি আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত দেখিনি। অথচ বাইরে, লোক মুখে সে এম জি নামেই পরিচিত ছিল। পরে জেনেছি, সেই দুটি অক্ষরের মধ্যে, তার আসল নামের আদ্য অক্ষরটিই ঢাকা পড়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি অক্ষরের দ্বারা তার সংক্ষিপ্ত নামটি হওয়া উচিত ছিল এ. এম জি.। নাগরিক কেতায়, বা বলা যায় এক রকমের ফ্যাশান, অথবা উচ্চারণের দীর্ঘতার জন্য, পুরো নামের বদলে, দু'-তিনটি অক্ষরের দ্বারা পরিচয়টাই প্রচলিত। পঞ্চাশ দশক থেকে এখন দুই দশক অতিক্রম করে গিয়েছে। নামের কেতাও বদলেছে। আজকাল জুতসই শ্রবণে ঝলক লাগার মতো ডাকনামের প্রচলন বেড়েছে। হয় তো কোনো এক্‌জিকিউটিভের নাম, বা কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির ডাকনামটাই এখন লাগসই। সনি, রনি, সাটু, বুল, জনি, এই রকম নামের সঙ্গে পদবীটা জুড়ে দেওয়া। শুনতে খুবই স্মার্ট লাগে। অনেকটা ইংরেজি ম্যাক্, স্যাম, জন-এর মতো।

যাই হোক, সম্পাদক বন্ধুর সঙ্গে, মধ্য তিরিশ বয়সের এক যুবক যখন আমার ঘরে এলো, আমি ভাবতেই পারি নি, এই সেই এ. এম জি। ভাবতে না পারার কারণ, বয়স তো বটেই, তার ওপরে প্রায় উনিশ শতকীয় বাবু কালচারের পোশাকে। আমি দেখলাম, মাঝারি লম্বা, উজ্জ্বল শ্যাম এক যুবক। মাথায় ঢেউ খেলানো, উলটে আঁচড়ানো, অনতিদীর্ঘ ঘন কালো চুল। গোঁফ-দাড়ি মসৃণ করে কাটা, প্রায় কোমল একটি মুখ। বোধ হয় তার বড় কালো চোখ দুটিই মুখের কোমলতাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। বড় কালো চোখ দুটি শান্ত, অথবা ঢুলুঢুলুই বলা যায়, অথচ বুদ্ধির দীপ্তি ও গভীরতা রয়েছে। মেয়েদের মতো টিকলো নাক, ঈষৎ পুষ্ট ঠোঁট, চিবুকের মাঝখানে

ছোট একটি ভাঁজ। ফরাসডাঙ্গার কাচির ধুতির মতোই ফিনফিনে কালো পাড়ের ধুতি চুনোট করা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে ক্রীম রঙের এ্যালবার্ট। বাঁ হাতে ঘড়ি, ডান হাতের অনামিকায় একটি হীরার আংটি। চুলটা বাবরি হলে, আর হাতে একটি সুদৃশ্য ছড়ি থাকলে, কালীঘাটের পটের বাবুর সঙ্গে একেবারে মিলে যেতো। যুবকের প্রবেশ মাত্রই, আমার ঘরে ছড়িয়ে পড়লো একটি মৃদু সুগন্ধ। কিন্তু তা আদৌ কোনো বিদেশী সুগন্ধ না। গন্ধটা কস্তুরি বা চন্দন জাতীয় আমি সঠিক ধরতে পারি নি।

এ-রকম বেশবাসের ব্যক্তিদের চালচলনে কিছুটা গদাইলস্করি, ধীরে মন্থর আলস্যের ভাব দেখা যায়। কিন্তু বন্ধুটির চালচলনে আচরণে সে-রকম কিছুই দেখি নি। ইংরেজিতে যাকে শার্প চেহারা বলে, আচরণে বলে স্মার্ট, তাকেও সেইরকম দেখাচ্ছিল। তার প্রথম প্রবেশ, এবং আমার অভ্যর্থনার আগেই, সে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করলো। তারপরেই, সম্পাদক বন্ধু পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই, করমর্দনের ভঙ্গিতে ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'লোকে বা বন্ধুরা আমাকে এম· জি বলে ডাকে, আমার নাম অনঙ্গমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। নামটা সেকেলে।' বলে সে হাসলো।

আমি আদৌ কিছু বুঝতে না পেরে, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসু চোখে, সম্পাদক বন্ধুর দিকে তাকালাম। কিন্তু তার আগে, ভদ্রতাবশতঃ নমস্কার বিনিময়, করমর্দন সেরে নিলাম। সম্পাদক বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে হেসে, কিছুটা রহস্যের স্বরে বললো, 'কেবল আদ্য অক্ষর দুটো নয়, খোদ ব্যক্তির মুখে তাঁর পুরো নামটি শুনেও চিনতে পারলেন না? পত্রপত্রিকার জগতের লোকেরা তো ওঁকে এক ডাকেই সবাই চিনতে পারে।'

তা হয় তো পারে, যদিও সেই অর্থে আমি পত্রপত্রিকার জগতের লোক বলে নিজেকে দাবি করতে পারি না। আমি সাংবাদিক নই, কোনো পত্রপত্রিকায় চাকরি করি না। সার্কুলেশন বা অ্যাডভারটাইজের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, মুদ্রণের ব্যাপারেও তথৈবচঃ। পত্রপত্রিকার জগতের লোক বলতে এঁদেরই বিশেষ করে বোঝায়। আমি এক ছদ্মনামধারী লেখক মাত্র। কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গীপিপাসু আমার নগর জীবনের জগত বলতে সেই পরিবেশই বোঝায়। অথবা হয় তো আমার আসল জগতটা দেশে দেশান্তরের পথে ঘাটে, গ্রামে জনপদে নির্জন অরণ্যে, নানা উৎসবের মেলায়। ধর্মে-কর্মে আমার আপন মানুষ, যেখানে নিজেদের জীবনধারণে মগ্ন। যাদের কাছে গিয়ে অবাক্ হয়ে ভাবি, ঘরের কাছেই কতো অচেনা অজানা আমার স্বদেশ, দেশের মানুষ। অতএব আমার ভ্রূকুটি অবাক্ জিজ্ঞাসা সম্পাদক বন্ধু আর আগন্তুকের মুখে বিভ্রান্ত হয়ে ফিরতে লাগলো।

সম্পাদক বন্ধু সত্যিই অবাক্ হেসে বললেন, 'চিনতে পারলেন না? অন্ততঃ এম· জি নামটা—!'

'ওহ্!' আমার মস্তিষ্কে মুহূর্তে বিদ্যুৎ ঝলকে নামটা ঝিলিক হেনে গেল, আমি যুগপৎ লজ্জা ব্যস্ততায় বলে উঠলাম, 'এম. জি ! মানে, উনি সেই এ এম. জি. সেই—।'

এম. জি নিজেই বোধ হয় আমার অবস্থা দেখে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেলো, এবং দুহাত তুলে কিছু বলতে গেল। সম্পাদক বন্ধু বললো, 'যাক, মনে পড়েছে তা হলে? অথচ আপনার সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ কয়েকবার ওঁর কথা উঠেছে, আপনি বলেছেন, ভদ্রলোকের নামই শুনেছি, একবারও চোখে দেখি নি।'

আমি আরও লজ্জিত হয়ে কিছু বলতে গেলাম। এম. জি. নিজে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'পরিতোষবাবু (সম্পাদক) একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আমি এমন কেউ নই যে নামটা বলা মাত্রই উনি আমাকে চিনতে পারবেন। এখন আমারই লজ্জা করছে। আমার নামটা মনে রাখবার কোনো কারণই ওঁর নেই, বরং একজন নতুন কবি বা লেখকের নাম অনেক বেশি মনে থাকার কথা।'

'না না, এ কথা বলবেন না।' আমি ব্যস্ত স্বরে বললাম, 'আপনার নাম, আপনার কাজের কথা এতো শুনেছি, মনে না পড়াটাই অপরাধ।'

এম জি হেসে চোখ কপালে তুললেন, 'অপরাধ?'

'হ্যাঁ, এক রকমের অপরাধই তো।' আমি বললাম, 'কলকাতায় আপনাকে কে না চেনে? আপনি একটা জীনিয়স! দয়া করে বসুন।'

এম জি. যেন প্রায় হতাশ হয়ে বললো, 'অপরাধ! জীনিয়স! দয়া করে বসুন। আপনি মশাই সত্যি লেখক বটে। হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারেন। আমি কোথায় যেচে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম—বলতে পারেন ভক্ত হিসাবে একটু বন্ধুত্বের দাবি নিয়ে এলাম।' কথা থামিয়ে হাতের ভঙ্গি করে বললো, 'অবিশ্যি অনেকে আবার ভক্ত কথাটা পছন্দ করে না। আমি কিন্তু সত্যি আপনার ভক্ত। ধর্মের ভক্তি হিসাবে ধরবেন না, আপনার গুণের আপনার লেখার। এক কথায় আপনি আমার প্রিয় লেখক, আর লেখক কথাটাও আমার ঠিক পছন্দ নয়। যদিও কথাটা আপনাদের সম্পর্কে খুবই চালু—লেখক! হোয়াট ডাজ্ ইট মীন্? রাইটার মানে কি, অথর? লিটেরেটিউর? সাহিত্যিক কথাটাই যথার্থ, কিংবা স্রষ্টা, রচয়িতা। লিখছে তো অনেকেই, লেখকও আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে ডজন ডজন, কিন্তু সবাই বোধ হয় স্রষ্টা বা সাহিত্যিক নয়। অতএব আপনি আমাকে জীনিয়স-টীনিয়স বলবেন না। দয়া করে নয়, আপনার সঙ্গে পরিচয় করবো, বসবো বলেই তো এসেছি।'

আমি সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্যের দিকে তাকিয়ে হাসলাম, এম. জি'র দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি আমাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। আমি কিন্তু

আপনার কাজেই মুগ্ধ, লোকের কথা শুনে জীনিয়স বলি নি। আপনার কথা অনেকের মুখে শুনেছি, আপনাকে দেখবার কৌতূহল ছিল, পরিচয় করবারও ইচ্ছে ছিল। পরিতোষবাবুর কল্যাণে আজ সেটা হয়ে গেল। এটা আমার—যাক, এমন কিছু বলতে চাই নে, যেটা নিতান্তই মামুলী ফর্মালিটির মতো শোনাবে।'

'তা হলে এবার সহজ হয়ে বসা যাক।' এম জি পরিতোষের দিকে তাকিয়ে হেসে, একটা চেয়ারে বসলো।

পরিতোষও বসলেন, এবং হেসে বললেন, 'কে যে কার প্রিয় বা ভক্ত, কিছুই বুঝতে পারছি নে। কেবল দেখছি, আমি যে দু'জনের মাঝখানে পরিচয়ের সেতু, সেই আমাকেই দু'জনে ভুলে গেছে।'

'তাই কখনো হয়?' আমি আবার ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। এবার কী চলবে বলুন। চা না কফি?'

এম জি আর পরিতোষের মধ্যে হাসি ও দৃষ্টি বিনিময় হলো। হাসি ও দৃষ্টিতে কোথায় যেন একটু রহস্যের ছোঁয়া লেগেছিল। এম জি মাথা নেড়ে বললেন, 'না না, ওসব নিয়ে ওঁকে ব্যস্ত করার মানে হয় না।'

'কী বলুন তো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

পরিতোষ বললেন; 'ছুটির দিন, সকাল দশটা বেজে গেছে। চা কফির পাট মিটে গেছে সেই কোন্ সকালে। এখন একটু অন্য পানীয় হলেই ভালো হতো। আপনার ফ্রিজে কী আছে?'

আমি বিব্রত হেসে বললাম, 'আমার ফ্রিজ নেই।'

'পরিতোষবাবু, আপনি মশাই বেরসিক লোক।' এম জি বললো, 'সব ছুটির দিনগুলো যদি ছকে বাঁধা একরকম হয়, তা হলে আনন্দ থাকে না। সকাল থেকে বীয়ার দিয়ে শুরু, দুপুরে জিন্ উইথ লাইম আর তাস খেলা, রাত্রে হুইস্কি দিয়ে শেষ। রকমফের দরকার। আজ আমরা কালকূটের কিছু বিষ পান করবো।' আমার দিকে তাকিয়ে সে তার বড় বড় চোখের পাতা ও ভুরু তুলে ইশারা করলো, এবং আবার বললো, 'বিষ মানে অমৃত।'

পরিতোষ বললেন, 'ওটা আমি ঠাট্টা করে বলেছি। একটু কফিই হোক। তবে মনে রাখবেন, ফ্রিজ আমারও নেই, ঠাণ্ডা বীয়ার আমিও কারোকে অফার করতে পারি নে। ওটাও একটা কথার কথা মাত্র।'

'কিন্তু ছুটির দিনে সকাল হলেই ঠাণ্ডা বীয়ারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন।' এম জি হেসে বললো।

পরিতোষ বললেন, 'আপনার মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশেই আমার এমন দশা ঘটেছে।'

'সঙ্গদোষ যাকে বলে।' এম জি হেসে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'একটু কফি দিতে বলুন, তারপরে আসুন, একটু গল্প করা যাক।'

আমি জানি, এ এম. জি একটি নাম করা বিজ্ঞাপন ও প্রচার সংস্থার বড় অঙ্কের বেতনভোগী কর্মচারী কেবল না, সংস্থার সে একজন অংশীদারও বটে। শুনেছি, ইতিপূর্বে সে অন্য এক সংস্থায় ছিল। সেখান থেকে এসে বোধ হয় বর্তমান সংস্থায় যোগদান করেছে। আরও শুনেছি, যে কোনদিন এ সংস্থা ছেড়ে সে আর এক সংস্থায় যোগদান করতে পারে, অথবা নিজেই একটি সংস্থা গড়ে তুলতে পারে। ইংরেজিতে যাকে বলে, মোস্ট আনপ্রেডিকটেবল, এম. জি অনেকটা তাই। আর, বোধ হয় সেই কারণেই, অনেকের কাছে এম. জি একজন মিস্টিরিয়াস ম্যান। শহুরে অথচ রহস্যময়, এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমি মনে মনে উদ্বেগ বোধ করি। অবিশ্যি যদি তেমন ব্যক্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্কে আসতে হয়। এম জি ইতিপূর্বে যে সংস্থায় ছিল, সে সংস্থার নামডাক তখন সকলের মুখে মুখে। এম জি চলে আসার কিছুকালের মধ্যেই, সে সংস্থাটি একেবারে গণেশ না উলটালেও, বর্তমান অবস্থা বেশ খারাপ। তার পরিবর্তে, এম. জি এখন যে সংস্থায় আছে, নামে ডাকে তারই গগন ফাটছে। এ সবের মধ্যে কী কূটকচাল রহস্য আছে, আমার জানা নেই। বন্ধুবান্ধবদের কথা থেকে এটা অনুমান করেছি যেখানে এম জি. সেখানে জয়জয়কার। কিন্তু এম. জি এমন ব্যক্তি, তার ত্যাগ ও প্রস্থান, সেই জয়জয়কারের ইমারত ধূলিসাৎ করে দিতে পারে। শুনেছি, তার ত্যাগ ও প্রস্থান নিতান্তই কাজ ও পরিচালনা সংক্রান্ত মতান্তর। কাজের মান ও রুচির বিষয়ে সে আপোষ করে না। তার বৈশিষ্ট্যকে সে কোনো মতেই আর দশটা সংস্থার ভেজালের মধ্যে মিশিয়ে ফেলতে রাজী না।

আমি জানি না, অনঙ্গমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নামে এই উনিশ শতকীয় বেশবাসে সজ্জিত ব্যক্তিটি কলকাতার কোনো ধনী বনেদী পরিবারের সন্তান কী না। কিন্তু শুনেছি, প্রথম সংস্থাটিতে যোগদান করার আগে, সে নিজের একলার চেষ্টায় যখন একটি ছোটখাটো সংস্থা গড়ে তুলেছিল. তখনই তার প্রতি সকলের নজর পড়েছিল। সেই সময় সে অর্থাভাবে পায়ে হেঁটে বেড়াতো, কাজের জন্য নানা অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরতো। তখন তাকে দেখে নাকি একজন সামান্য কেরানীর মতো মনে হতো, যদিও আচার ব্যবহার বা কথাবার্তায় আদৌ না। এর থেকে অনুমান হয়, টাকার জোরে সে প্রতিষ্ঠা পায় নি। পেয়েছে গুণের জন্যই। প্রথম বিখ্যাত যে সংস্থা তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল. তারা আর একটা নতুন সংস্থাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে চায় নি, বরং তার স্রষ্টা কর্ণধারকেই উচ্চাসনে বসিয়েছিল। সেখানে মতান্তর ঘটেছিল, তারপরে এই বর্তমান সংস্থায়। যদিও পদাধিকারে ডেপুটি, বলতে গেলে সর্বেসর্বা সে-ই। কবে যে এখানেও মতান্তর ঘটবে, সংঘাত লাগবে, সে কথা কেউ বলতে পারে না।

আমি জানি, আপাততঃ সে যথেষ্ট সম্পন্ন। রাস্তায় নিশ্চয়ই তার গাড়ি

দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িতে ফ্রিজ টেলিফোন ত বটেই, রেডিওগ্রাম থেকে আধুনিকতার সবরকম সরঞ্জামেই সজ্জিত। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকের ঘটনার কথা। সত্তর দশকের শেষের দিকে হলে টেলিভিসনের অনুমানটাও অসঙ্গত হতো না। অবিশ্যি আমার তাতে কিছু যায় আসে না। এম. জি. আমার কাছে অর্থবান ব্যক্তি হিসাবে আকর্ষণীয় ছিল না। গুণের জন্যই তার প্রতি আমার আকর্ষণ আর কৌতূহল ছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ে, তার চেহারা দেখে, কথা শুনে মুগ্ধ হলাম আরও বেশি। বয়সটা অবাক্ করার মতো। চেহারার সঙ্গেও, তার কাজের জগতের অমিলটা চোখে পড়ে। ব্যক্তিত্বটা কথায় জাহির করার মতো না। গলায় তার গান আছে কীনা জানি না, কিন্তু কোমল গম্ভীর স্বরে একটা, ঠোঁটের হাসির মতোই আমেজ মেশানো। প্রথম দর্শনেই লোকটিকে ভালো লেগে গেল। আমি ভিতরে গিয়ে, কাজের ছেলেটিকে কফি তৈরির নির্দেশ দিয়ে এসে বসলাম। এবং আমার কৌতূহলিত প্রথম জিজ্ঞাসাই, 'আপনার এম জি নাম শুনে এতোদিন স্যুটেড বুটেড সাহেব মানুষ বলেই ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখছি কেবল বিপরীত নয়, তার থেকেও বেশি কিছু। যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে, কারণটা কী ? স্বাদেশিকতা ?'

'ধুতি পাঞ্জাবি পরে স্বাদেশিকতার প্রমাণ দেওয়া যায় বলে বিশ্বাস করি নে।' এম জি হেসে বললো, 'অনেক স্বদেশীওয়ালা দেখেছি যারা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া পরে না, এক সময়ে মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করতো। এখন তাদের পোশাক বদলায় নি, কিন্তু বিলিতী হুইস্কি ছাড়া তাদের মুখে রোচে না। সেইজন্যেই এই পোশাকের ব্যাপারে কেউ স্বাদেশিকতার কথা বললে, বিদ্রূপের মতো শোনায়।'

আমি বিব্রত কুণ্ঠায় বললাম, 'আমি কিন্তু বিদ্রূপ করে বলি নি, নিতান্তই কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করেছি। আপনাদের জগতে এটা বিরলতম বললে কম বলা হয়, আজ পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।'

'সেটা মিথ্যে বলেন নি।' এম জি তার ঢুলুঢুলু চোখে স্বভাবসিদ্ধ হেসে বললো, 'আপনি বিদ্রূপ করেন নি, তাও জানি। আমরা বাঙালীরা একটা কথা বলি, আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা। শুনলে মনে হয়, হিন্দী বুলি শুনছি। কিন্তু কথাটা হিন্দী উর্দু বাঙলা, কিছুই না, বাঙালীর নিজের তৈরী একটা বুলি। প্রবাদ হিসাবেও কথাটার কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। ক'জনেরই বা নিজের রুচি মতো খাবার জোটে, আর পরের রুচি মতো পোষাক পরা হয় ? তবে আমার বেলায় বলতে পারি, এ পোশাকটা আপন পসন্দ। কিংবা এও বলতে পারি, এই পোশাকেই আমি সহজ বোধ করি। স্যুট-ট্যুট পরার কথা ভাবলেই কী রকম অস্বস্তি হয়। পৃথিবীর কোনো কোনো গোষ্ঠী উপগোষ্ঠীর উলঙ্গ

মানুষরা যেমন কিছুতেই পোশাক পরতে চায় না, আমার কোট পাতলুন না পরাটা সেই রকমের বলতে পারেন। তা বলে ধরে নেবেন না যেন, আমি কোট প্যাণ্ট পরাটা অপছন্দ করি। আমার অফিসের সহকর্মীরা সবাই কোট প্যাণ্ট পরেন। তাঁদের কারো জামার সঙ্গে টাইয়ের রঙ না মিললে, আমার মন খুঁতখুঁত করে। তাদের পোশাকের অসঙ্গতি দেখলে, নিজে ডেকে বলি।'

পরিতোষবাবু বললেন, 'তার মানে, আপনি নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা কাকে বলে তাও জানেন।'

'না, পোশাকের নিখুঁত বলে কিছু আছে, আমি মনে করি নে।' এম জি. পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বললো, 'মনে রাখবেন, অসঙ্গতির মধ্যেও একটা সঙ্গতি আছে। ইংরেজিতে যাকে কনট্রাস্ট বলে, ঠিক তা নয়। পোশাকটা সভ্যতার অবদান বটে, কিন্তু প্রকৃতির কথাটা ভুললে চলবে না।'

এম. জি কথাটা হয়তো নতুন বলে নি, কিন্তু তার মুখ থেকে শুনে মনে হলো, যেন নতুন কথা শুনলাম। অথবা, বলা যায়, আমার নিজের মনের কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। বললাম, 'আপনি দেখছি আদতে একজন শিল্পী।'

'উঁহু, খাঁটি বিজ্ঞাপনের লোক আমি।' এম জি. সিগারেটের প্যাকেট খুলে আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। আমরা সিগারেট নেবার পরে নিজে একটি ঠোঁটে গুঁজে বললো, 'আধুনিক বিজ্ঞাপন কেবল মন ভোলায় না, নতুন রুচি সৃষ্টি করার দায়িত্বও সে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। এর একটা ব্যবসায়িক দিক আছে, অবিশ্যি, নেচার অ্যান্ড সাইকোলজির স্টাডি করতেই হয়। নইলে, নিত্য নতুনকে সকলের সামনে তুলে ধরে, পকেট কাটবো কেমন করে?' সে হেসে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো।

এম জি বিনয় করে কথাগুলো বললেও, সে যে মনে মনে একজন শিল্পী, এটা বুঝতে আমার অসুবিধে হলো না। নেচার আর সাইকোলজি স্টাডি, নতুন রুচি সৃষ্টি করার দায়িত্ব, এ-সব শিল্পীর চিন্তা ছাড়া হয় না। হয় তো কাল্পনিক অর্থে স্রষ্টা শিল্পীর ধ্যানজ্ঞানের সঙ্গে এর তফাত আছে। কিন্তু এম. জি -ও সচেতন মনের আর এক শিল্পী।

ইতিমধ্যে আমার কাজের ছেলেটি কফি নিয়ে এলো ট্রে-তে করে। আমি নিজে উভয়কে কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজে তুলে নিলাম, বললাম, 'যাই হোক, যে কথা থেকে এতো কথা এলো, আপনার আপন পসন্দ্ পোশাকটি কিন্তু সত্যি সুন্দর। অফিসে এ বেশে আপনাকে মানায় কী না জানি নে, আমার চোখে, এ ছাড়া যেন আপনাকে মানায় না।'

'বিদেশের সাহেব-সুবোরা একটু অবাক্ হয়, ভুরু কোঁচকায়।' এম জি

বললো, 'তবে এ পোশাকটাকে তারা আমার উনিফর্ম বলে ধরে নিয়েছে।'

উনিফর্মের কথা শুনে আমি আর পরিতোষবাবু হেসে উঠলাম। এম· জি· আবার বললো, 'অবিশ্যি অনেকের ধারণা, আমি ইচ্ছে করেই একটা বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছি। তাদের দোষ দিই না। তবে এ পোষাকেই আমি স্বচ্ছন্দ-বোধ করি। স্মার্ট দেখায় কী না জানি নে, আমি যথেষ্ট স্মার্টলি চলাফেরা করতে পারি।'

'সেটা আপনাকে দেখেই বোঝা যায়।' পরিতোষবাবু বললেন, 'দেখেও আসছি বরাবর।'

এম· জি কফির কাপে চুমুক দিয়ে, সিগারেটে একটা টান দিল। একবার গলা খাকারি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, বললো, 'ছুটির দিনে কাজের কথা বলতে ভালো লাগে না, কিন্তু আপনাকে অফিসে ডেকে কথা বলবো, সেটাও ভালো লাগছিল না।'

'কাজ?' আমি অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

এম· জি আর পরিতোষের মধ্যে হাসি ও দৃষ্টি বিনিময় হলো। এম জি. বললো, 'মাফ করবেন। আজ আমি রথ দেখা কলা বেচা, দুটোই করতে এসেছি। রথ দেখাটা হলো আপনার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় করা। এটা অনেকদিনের ইচ্ছে। এইটুকু বিশ্বাস করবেন, নিজের ইচ্ছে মতো সব কিছু করার সময় কিছুতেই করে উঠতে পারিনে। পরিতোষবাবুকে অনেকদিন ধরেই বলছি, আপনার কাছে একদিন আসবো। কিছুতেই হয়ে উঠছিল না। আজ নিয়ে বোধহয় গোটা কয়েক রবিবার পেরিয়ে গেল, তাই না পরিতোষ-বাবু?' সে পরিতোষবাবুর দিকে তাকালো।

পরিতোষবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, তা গত দু মাস ধরেই আসতে চাইছিলেন। কিন্তু ছুটির দিনেও আপনাদের দিল্লী, বোম্বে, মাদ্রাজ, উরোপ, আমেরিকার সাহেবদের দিয়ে মিটিং, লাঞ্চ ডিনার লেগেই থাকে। আসবেন কী করে? আপনাদের চাকরী মানে হোল টাইম জব।'

'যা বলেছেন। গোলামের গোলাম তস্য গোলাম।' এম জি. হাসলো, 'ইচ্ছে করে ডুব দেবার উপায় নেই। এ ভাবে আর চলে না, ভাবছি জীবন-যাপনের ছকটা বদলানো দরকার।'

এম জি.'র সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় খুশি হলেও, আমার মনে একটা ক্ষীণ দ্বন্দ্ব ছিল। এতোক্ষণে সেটা ঘুচলো। এম জি.'র মতো মানুষ হঠাৎ অযাচিত হয়ে আমার বাড়ি এসে আলাপ করবে, এটা অবাক্ হওয়ার মতো কথা। লোকটি বাক্পটু, কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ওর কী কাজ করতে পারি? এম· জি. আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো, 'খুব চিন্তায় পড়ে গেলেন দেখছি। গুরুতর কোনো কাজ নয়, আপনার কাছে আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকালাম। সে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, 'কাজটা আপনার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। হয় তো তেমন মনের মতো হবে না, কারণ কিছুটা ছকে বাঁধা মাপজোকের কাজ।' সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সিগারেটে টান দিল।

আমি অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছি। এম জি কী কাজের কথা বলছে, বুঝতে পারছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ধরনের কাজ বলুন তো?'

'আপনি ভারতীয় পুরাণ থেকে কিছু কাহিনী আমাকে লিখে দেবেন।' এম জি বললো, 'প্রত্যেকটা কাহিনীই চারশো থেকে পাঁচশো শব্দের বেশী হবে না।'

আমি প্রায় উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'কিন্তু আমি তো এরকম কাজ কখনো করিনি।'

'অথচ আপনিই এটা খুব ভালো পারবেন, আমার এ বিশ্বাস আছে।' এম জি বললো, 'আমি জানি, আপনার পক্ষে যেটা সব থেকে ডিফিকাল্ট, তা হলো, চারশো থেকে পাঁচশো শব্দের খাঁচা। সেইজন্যই ছক আর মাপজোকের কথা বলছিলাম। অবিশ্যি পুরাণ বলতে আমি বিশেষ কোনো পুরাণের কথা বলছি নে। মহাভারত রামায়ণ থেকে শুরু করে, যে-কোনো পৌরাণিক কাহিনীই আপনি লিখতে পারেন। ইচ্ছে করলে জাতক থেকেও লিখতে পারেন। কাহিনীগুলো তত্ত্বগত দিক থেকে ঘটনামূলক হলেই ভালো হয়, যাকে বলে কালারফুল গল্প।'

আমি অস্বস্তিতে হেসে বললাম, 'তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমি তো এরকম কাজ কখনো করিনি, ভাবিও নি।'

'একটু করুন না, ভাবুন না একটু।' এম. জি হেসে হাত জোড় করলো, 'এটা আমার অনুরোধ। আমি জানি, আপনি একটু নিয়ে বসলেই হবে, আপনি ও-সবের চর্চা করেন, অসুবিধে কিছু হবে না।'

আমি কুণ্ঠিত ত্রস্ত হয়ে বললাম, 'না না, চর্চা করি বললে ভুল হবে। মহাভারত বা পুরাণ আমার প্রিয় বিষয়।'

'আর এও আমি জানি, আপনি ভারতীয় পুরাণকে ভারতের ইতিহাস বলে বিশ্বাস করেন।' এম. জি বললো, 'আপনার এ বিশ্বাসটা আমাকে আরো বেশি আকর্ষণ করে। যে-কোনো পুরাণের কাহিনী, আপনি যা বেছে নেবেন, সেটাই ফাইনাল, সবই আপনার আপন পসন্দ্। তবে ঐ শব্দের অঙ্কটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। কোনো উপায় নেই। বিজ্ঞাপনের সবটাই সীমিত। একজন সাহিত্যিকের পক্ষে নিশ্চয়ই কাজটা টেকনিকাল, সৃষ্টির আমেজটা তেমন জমে না। তবু, একবার চেষ্টা করে দেখুন।'

লেখা আমার পেশা বটে। তার নিজস্ব একটা গতিবিধি নিয়মনীতি, ভাবনা-চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। তার ভালোমন্দ বিচার্যের বিষয়। কিন্তু

অপরের নির্দেশে এরকম কোনো কাজ করা কঠিন। অথচ এম. জি-কে এক কথায় ফিরিয়ে দিতেও সংকোচ হচ্ছে। আমি কিছু বলবার আগেই পরিতোষবাবু বলে উঠলেন, 'দক্ষিণার অংকটা বলুন।'

আমি বললাম, 'সেটা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'আমিও সেটা নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছি না।' এম জি বললো, কাজের ক্ষেত্রে ওটাকে আমি বাধা বলে মনে করি নে।' কথাটা বলে সে পকেট থেকে একটি চেক বই বের করে টেবিলের ওপর রাখলো, বললো, 'মাসে এরকম দুটো কাহিনী আপনার কাছে চাই। প্রতিটি কাহিনীর জন্য পাঁচশো টাকা আমি ভেবে রেখেছি। আপনি বারগেন করলে, সেটা ফাইনাল করা যাবে। আপাততঃ ষোলটা কাহিনী আপনি লিখে দেবেন।'

এম জি. খুব সহজেই 'বারগেন' কথাটা উচ্চারণ করলো। সম্ভবতঃ ব্যবসায়ের রীতিনীতি বা ভাষা, ওদের কাছে এই রকম। যদিও চারশো থেকে পাঁচশো শব্দের জন্য টাকার অংকটা আমার কাছে কম মনে হলো না। তবু দর কষাকষির অবকাশ সে রেখে দিল। প্রকাশক সম্পাদকের কাছে প্রয়োজনে টাকা চেয়ে নিয়েছি। দর কষাকষির কথা কখনো ভাবি নি। কিন্তু ষোলটা কাহিনী! জিজ্ঞেস করলাম, 'ষোলটা কাহিনী দিয়ে করবেন?'

'ষোলটা বিজ্ঞাপন ছাপা হবে।' এম জি বললো, 'টাকার অংকটা কিন্তু আমি বেশি বলি নি, কারণ এসব ক্ষেত্রে আমরা রয়্যালটির কথা ভাবি নে। অন্ততঃ আমাদের দেশে এখনও সেরকম নিয়ম হয় নি। আপনাকে স্বত্ব বিক্রি করে দিতে হবে। তবে একই বিজ্ঞাপন, বিশেষতঃ এরকম ক্ষেত্রে আমরা একবারের বেশি ব্যবহার করি নে। লোকে এক কাহিনী বারবার পড়তে চায় না, নতুন নতুন কাহিনী চায়। এ ধরনের বিজ্ঞাপনে নতুন কাহিনীর স্বাদটাই আসল। আকর্ষণ বাড়ে।'

আমি কৌতুহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি অবিশ্যি বুঝতে পারছিনে, পুরাণের কাহিনী দিয়ে কিসের বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে?'

'বিজ্ঞাপনের বিষয়ের সঙ্গে আপনার কাহিনীর কোনো যোগসূত্র থাকবে না।' এম জি হেসে বললো, 'ওটা নিয়ে আপনি ভাববেন না। এতোটা ঔদ্ধত্য আমার নেই, কোনো বিশেষ সামগ্রীর মন ভোলানো বিজ্ঞাপন আপনাকে লিখে দিতে বলবো। যদিও বিজ্ঞাপনে আপনার নাম ব্যবহার করা হবে না, কিন্তু বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর সঙ্গে আপনার কাহিনীগুলো আমরা আমাদের ক্রেতাদের উপহার দেবো।'

বুঝতে পারছি, ভেবে কোনো লাভ নেই। ভাবতে গেলে, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নেবার মতো হবে। বিজ্ঞাপন আর প্রচার আজকাল বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করছে, তার গতিবিধি বোঝা আমার কর্ম না। এম. জি আবার বললো, 'আপনি এখন বুঝতে পারছেন না, অবিশ্যি কখনো

করেন নি, কিন্তু এর মধ্যেও একটা ইণ্টারেস্ট আছে।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনার সব কথাই মানছি, কিন্তু আমি পেরে উঠবো কী না, বুঝতে পারছি নে।'

'সময়াভাবের কথা বলছেন ?' এম জি জিজ্ঞেস করলো।

বললাম, 'না, সময় হয় তো করে নেওয়া যাবে। কাজটা আমি করতে পারবো কী না, এখনই আপনাকে কথা দিতে পারছি নে। তবে আমি চেষ্টা করবো।'

'আর আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন, সে-বিশ্বাস আমার আছে।' এম. জি'র স্বরে আত্মবিশ্বাসের সুর, একেবারে মেড টু অরডার না হলেও, আপনি যে অনেক সময় আপনার সম্পাদক বন্ধু বা দাদাদের সংকটে মিরাকল্ দেখিয়ে দিয়েছেন, তা আমি জানি। যাই হোক, বারগেন আপনি করতে পারবেন না, আপনার সঙ্গে কথা বলেই বুঝেছি, অতএব টাকার ব্যাপারটা এখন ফাইনাল করলাম না। মিনিমাম ফাইভ হাণ্ড্রেড, তার ওপরে কী দেওয়া যায়, সেটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আজ আমি আপনাকে কিছু অ্যাডভান্স করে যাচ্ছি।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, আপনাকে এখনই কোনো অ্যাডভান্স করতে হবে না। কিছুটা কাজ আগে করি, তারপরে টাকা দেবেন।'

'ওরকম সিস্টেমে আমার একেবারে বিশ্বাস নেই।' এম জি পকেট থেকে একটি কলম বের করে, চেক বইয়ের পাতা খুললো। আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'কথা যখন দিয়েছেন, চেষ্টা আপনি নিশ্চয়ই করবেন, কোনো সন্দেহ নেই। তবু সম্পাদক না হলেও, আপনাদের একটু আধটু চিনি। আসলে এই অ্যাডভান্সটা আমার হয়ে আপনাকে সব সময়ে তাগিদ দিতে থাকবে সোজা কথায় যাকে বলে, চাপ সৃষ্টি করা। একে বলে ভদ্রলোকের দাওয়াই।' ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে সে হেসে উঠলো।

পরিতোষবাবু হেসে উঠে বললেন, 'একেবারে মোক্ষম পন্থা। আপনি সম্পাদক হলেও আমাদের ওপর দিয়ে যেতেন।'

এম জি. ইতিমধ্যে চেক বইয়ে লিখতে আরম্ভ করেছে। তার ব্যক্তিত্ব বা ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, যে কোনো কারণেই হোক, তাকে আমার ভালো লেগেছিল। সে বাকপটু কিন্তু চালাকি করে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা নেই। সোজা কথাটা সহজ করেই বলেছে। আমি অস্বস্তিবোধ করলেও কিছুটা অসহায় ভাবেই চুপ করে রইলাম। এম জি চেক ছিঁড়ে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, আপাততঃ আড়াই হাজার দিলাম। আপনাকে কিছু লিখে দিতে হবে না, ও-সব লেখালেখিতেও আমার তেমন বিশ্বাস নেই।'

আমি হেসে বললাম, 'ধরুন যদি লেখাটা না হয়, তা হলে কী করবেন ? টাকাটা তো আমি গায়েব করে দিতে পারি।'

'বটে!' এম· জি· আমার চোখের দিকে তাকালো, হেসে বললো, 'তা হলে বুঝবো, আমি লোক চিনতে শিখি নি। সেই হিসাবে টাকাটা গুনাহ্‌গার যাবে, নিন, ধরুন।'

আমি চেকটা নিলাম। দেখলাম, বেয়ারার চেক। বললাম, 'আপনি বোধহয় ভুল করেছেন। চেকটা বেয়ারার। অ্যাকাউণ্ট পেয়ী করেন নি।'

'তা করি নি। নগদ নিয়ে আসতে পারলে ভালো হতো।' এম জি চেক বই আর কলম পকেটে রাখতে রাখতে বললো, 'এতো টাকা সব সময় পকেটে থাকে না। তাছাড়া আজ ছুটির দিন, নইলে ক্যাশ টাকা অ্যাডভান্স করতাম।' সে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে, অল্প একটু কেশে বললো, 'এবার আমার দ্বিতীয় অনুরোধটা জানাচ্ছি।'

এর পরে আবার দ্বিতীয় অনুরোধ! আমি অবাক্ উদ্বিগ্ন চোখে এম· জি'র দিকে তাকালাম। সে নিবিড় করে সিগারেটে টান দিয়ে মিটমিট করে হাসলো। আমি পরিতোষবাবুর দিকে তাকালাম। তাঁর চোখেও অবাক্ জিজ্ঞাসা। বোঝা গেল, দ্বিতীয় অনুরোধের বিষয়টা তাঁরও জানা নেই। তিনি এম জি'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো মশাই একটা কাজের কথাই আমাকে বলেছিলেন।'

'তা বলেছিলাম।' এম· জি হেসে বললো, 'এবার ঠিক কাজের কথা নয়, অকাজের কথা।' সে আমার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে উঠলো, 'ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি। ভয়ের কিছু নেই। এ অনুরোধটা রাখা না রাখা আপনার মর্জি। বলছিলাম না, জীবনটা আর এভাবে কাটাতে পারছি নে। আপনি তো প্রায়ই এদিকে ওদিকে বেরিয়ে পড়েন। মাঝে মধ্যে আমাকে আপনার সঙ্গী করে নেবেন, এই অনুরোধ। ভয় নেই, আমি লিখবো না। এটা আমার একটা সাধ, আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো। আপনার দেখার চোখ আর আমার দেখা নিশ্চয়ই আলাদা। তবু আপনার সঙ্গে মাঝে মধ্যে বেরিয়ে পড়বো, নিজের গণ্ডীটাকে ভাঙতে চাই।'

আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। না হেসে পারলাম না। পরিতোষবাবু ব্যাপারটাকে নিছক ঠাট্টা ভেবে বললেন, 'তা হলেই হয়েছে। আপনি যাবেন ওঁর সঙ্গে ঘুরতে?'

'কেন, পারবো না ভাবছেন?' এম জি· তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত হেসে বললো।

আমি বললাম, 'আপনার কাজকর্মের কথা যে রকম শুনলাম, ঘুরে বেড়াবার সময় কোথায় আপনার? সময় থাকলে তো আপনি নিজেই ঘুরে বেড়াতে পারেন।'

'না না, আমি একেলা ঘুরে বেড়াতে পারি নে।' এম· জি. বললো, 'বিশেষ করে আপনার সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতে চাই। আর সময়ের কথা বলছেন?

ওটা আমি সময়মতো ঠিক ম্যানেজ করে নেবো। এখন আপনি বলুন, আমাকে সঙ্গী হিসাবে নিতে আপনার আপত্তি আছে কী না ?'

আমি হেসে বললাম, 'আপত্তি থাকবে কেন ? আমার তো দিনক্ষণ দেখে, তোড়জোড় করে বেরোবার কোনো ব্যাপার নেই। কখন হঠাৎ কোথায় বেরিয়ে পড়ি, তার কোনো ঠিক থাকে না।'

'জানি, ওটা আপনার ভেতরের ব্যাপার।' এম জি বললো, 'আপনার ভাষায় অদৃশ্যের হাতছানি। কোন্ এক অদেখা বাঁশিওয়ালার বাঁশির সুরে আপনি বেরিয়ে পড়েন। অচিন দেশের অজানা ভিড়ে নিজেকেই খুঁজে বেড়ান। এ অনুভূতি আমার নেই। তবে ঘর বিবাগী না হয়েও, কোনো এক নির্জন নদীতীরে গাছতলায় আমিও আপনার মত বসে থাকতে চাই, অথবা কোনো মেলার প্রাঙ্গণে অজস্রের ভিড়ে মানুষ দেখতে চাই।' কথাগুলো বলতে বলতে এম জি'র চোখে গভীর অন্যমনস্কতা নেমে এলো।

এই মুহূর্তে এম জি-কে আমার অন্য মানুষ বলে মনে হলো। তার চোখের অন্যমনস্কতায়, মুখে কোন গাম্ভীর্য নেই। অবিশ্যি তার বড় চোখ, কোমল মুখ দেখলে, বিশ্বাস হয় না, সে কখনো গম্ভীর বা কঠোর হতে পারে। অথচ সে এমন একটি কাজ করে, গম্ভীর ও কঠোর হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই মুহূর্তে, আমি যদি ভুল না দেখে থাকি, মনে হলো, তার সারা মুখে একটা বিষণ্ণতা। কেবল বিষণ্ণতা না, কেমন একটা অসহায় ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি যেন সারা মুখে নেমে এসেছে। জ্বলন্ত সিগারেটের শেষাংশ তার ঠোঁটে কাঁপছে।

আমি পরিতোষবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। পরিতোষবাবুও আমার দিকে তাকালেন। স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে, পরিতোষবাবুর চোখে অবুঝ দৃষ্টি। এম জি. ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে ছাইদানিতে গুঁজে দিয়ে হাসলো, বললো, 'একটু আনমাইণ্ডফুল হয়ে গেছলাম। আসলে আপনার লেখার কথাই ভাবছিলাম। তা হলে, আমার কথাটা কি রাখবেন ?'

এম জি. যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং সতর্ক ব্যক্তি। নিজের ভাবান্তরকে দ্রুত সামলে নিয়ে, স্বাভাবিক হয়ে উঠলো। আমি বললাম, 'এতে আর কথা রাখারাখির কী আছে ? মনে থাকলে নিশ্চয়ই আপনাকে ডেকে নেবো।'

'এই মনে রাখাটাই আসল কথা।' এম জি হাসলো, 'আমি জানি, আপনার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব নয়। কেন না, আপনার নিজেরই জানা নেই, কখন কোথায় বেরিয়ে পড়বেন। আমিই বরং আপনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবো। অবিশ্যি আপাততঃ কাজের খাতিরে কিছুটা যোগাযোগ তো থাকবেই। তবু আমি নিজের থেকে যোগাযোগ করবো। মুশকিল হয়েছে, আপনার টেলিফোন নেই। অবিশ্যি আপনার পক্ষে যন্ত্রটা খুব সুখদায়ক নয়, একটা বাড়তি ঝামেলা। যাই হোক, যোগাযোগ করতে আটকাবে না। কবে নাগাদ আপনাকে একদিন আমার অফিসে আশা করতে পারি ?'

এম· জি· আবার তার কাজের কথায় ফিরে এলো। আমাকে তার অফিসে আশা করা মানে, কাজটা কতোদূর কেমন এগোলো, সে-বিষয়ে অবহিত হওয়া। বললাম, 'যতো শীগ্‌গির পারি, একদিন যাবো।'

'আপনি দিনটা বলতে পারলে, আমি সময় মতো গাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারতাম।' এম. জি· প্রত্যাশার চোখে আমার দিকে তাকালো।

আমি বললাম, 'দিনটা ঠিক করে বলা মুশকিল। গাড়ি আপনাকে পাঠাতে হবে না। একদিন বিকাল ঘেঁষে আমি চলে যাবো।'

এম জি. উঠে দাঁড়ালো, হাত বাড়িয়ে দিল, 'তা হলে আজ উঠি। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করে গেলাম।'

আমি এম জি'র সঙ্গে করমর্দন করে বললাম, 'সময় নষ্ট হলো কোথায়? কাজের কথাই তো হলো।'

'পরিতোষবাবু, আপনাকে ধন্যবাদ। সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচয়টা আপনিই করিয়ে দিলেন।' এম জি হাসলো।

পরিতোষবাবু বললেন, 'আমি ছাড়াও ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হতে পারতো, সেটা কোনো কথা নয়। এখন ভাবছি, আমে দুধে মিশে গেল, আঁটি গড়াগড়ি যাবে কী না?'

আমি বললাম, 'এটা ঠিক বললেন না পরিতোষবাবু, আপনি আঁটি হবেন কেন? আপনার সঙ্গে আমার সব সময়ের সম্পর্ক।'

'সেই হিসাবে আমি বরং অনেক অনেক দূরের।' এম· জি· বললো।

পরিতোষবাবু হেসে রসিকতা করে, এম. জি'র দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এ পরিচয়টা যেমন তেমন পরিচয় নয়, ব্যবসা ছাড়াও আরও কিছু আছে। অতএব, কিছু দালালি আমার প্রাপ্য।'

এম. জি· হেসে পরিতোষবাবুর হাত চেপে ধরে বললেন, 'দালালি না, কৃতজ্ঞতার কোনো প্রতিদান হয় না। চলুন, আপনার ছুটির দিনটাকে আজ মাতিয়ে তোলা যাক।'

'বহুত আচ্ছা।' পরিতোষবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, 'আপনিও চলুন না?'

আমি হেসে অক্ষমতা জানালাম, 'যেতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমার ছুটি নেই।'

'কারণ সব সময়েই আপনার ছুটি।' এম· জি. হেসে বললো, 'সব সময়ের ছুটির বড় জ্বালা, তাই না?' সে ঘাড় বাঁকিয়ে চোখের পাতা টিপে ইশারা করলো। হাত তুলে আবার বললো, 'আপনি ছুটির জ্বালা ভোগ করুন, আমরা চলি।'

পরিতোষবাবুও হাত তুলে বিদায়ের ভঙ্গী করলেন। এম· জি. দরজার দিকে কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো, 'পুরুষ মানুষের বয়স

জিজ্ঞেস করলে এটিকেটে আটকায় না। আমার সাঁইত্রিশ চলছে, আপনার?'

আমি বয়সের কথায় একটু অবাক হলাম, তবু বললাম, 'আপনার বয়সের সঙ্গে এক আধ বছরের এদিক ওদিক। কেন বলুন তো?'

'একটা সাধারণ কৌতূহল মাত্র।' এম· জি· হাসলো, 'অবিশ্যি বয়সে বন্ধুত্ব আটকায় না, মনের বয়সটা ঠিক থাকলে। আসলে আপনাকে বয়সের তুলনায় কম দেখায়, সেজন্য কিঞ্চিৎ ঈর্ষা বোধ করছি।' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

পরিতোষবাবু দরজার বাইরে থেকে বললেন, 'ঈর্ষা তো আমার বেশি হবার কথা। আপনাদের সমবয়সী হয়ে, আমি অনেক বেশি বুড়িয়ে গেছি।'

এম· জি·-ও দরজার বাইরে গিয়ে বললো, 'বুড়িয়ে যান নি, আপনি একটা পাকা ফলের মতো মানুষ।'

অতঃপর হাসির সঙ্গে বিদায়।

এ· এম· জি· বা অনঙ্গমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই পরিচয় পর্বটাও এক রকমের ভূমিকাই বলতে হবে। দিন দশেক পরে, আমি মহাভারত এবং পুরাণ ঘেঁটে কিছু কাহিনী বেছে, মোটামুটি একটা তালিকা তৈরি করলাম। কাজটা আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন। এরকম শব্দের অঙ্কে বেঁধে, কিছু লেখা হয় তো একটা বিশেষ আর্ট। কিন্তু তা আয়ত্তের অপেক্ষা রাখে। পুরোপুরি কাজে হাত দেবার আগে, আমি এম· জি·'র সঙ্গে আলোচনা করার জন্য তার অফিসে গেলাম। লিফটে চারতলায় উঠে, সামনের ঘরে ঢুকেই দেখলাম, পুরো বিলিতী কেতার সাজসজ্জা। ভিজিটরদের বসবার জন্য দুদিকে দেওয়াল ঘেঁষে নরম গদি আঁটা লম্বা সোফা। মাঝখানে একটি সেণ্টার টেবিল। পি· বি· এক্সচ-এর সামনে কানে হেডফোন লাগানো একটি রূপসী তরুণী। তার পাশের ছোট টেবিলে, ছোট বোর্ডে লেখা, 'রিসেপশান'। ঘরে কোনো ভিজিটর ছিল না।

আমাকে তরুণীর দিকেই এগোতে হলো। সে তখন টেলিফোনে ইংরেজি বুলিতে কথায় ব্যস্ত, ঠোঁটের কোণে ক্ষণে হাসি, ক্ষণে চোখের কোণে ঝিলিক। আমার উপস্থিতিটা আদৌ তার চোখেই পড়ছে না। প্রায় মিনিট খানেক পরে, যেন হঠাৎ আমাকে দেখতে পেলো, জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়েস?'

বললাম, 'মিঃ এ· এম· জি—।'

'দয়া করে আপনার নামটা স্লিপে লিখে দিন।' আমার কথা শেষ হবার আগেই তরুণী ইংরেজিতে বলে উঠে, চোখের ইশারায় সেণ্টার টেবিলটা দেখিয়ে দিল, এবং পরমুহূর্তেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো টেলিফোনের কথায়।

আমি ফিরে গেলাম সেণ্টার টেবিলের কাছে। স্লিপ পেন্সিল দুই-ই

রয়েছে সেখানে। নিজের নাম লিখতে লিখতে ভাবলাম, স্লিপটি দেবো কার হাতে? তরুণী যদি রিসেপশনিস্ট-কাম-টেলিফোন অপারেটার হয়, তবে নিশ্চয় সে স্লিপবাহিকা হতে পারে না। অবিশ্যি নামটা লিখতে লিখতেই জবাব আমার সামনে হাজির। উর্দি পরা বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। তরুণীই নিশ্চয় বোতাম টিপে তাকে ডেকেছে। স্লিপটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো। আমি স্লিপ দিয়ে আবার লম্বা সোফায় গিয়ে বসলাম। এক মিনিট না যেতেই, বেয়ারা এসে বললো, 'আইয়ে।'

আমি ভিতরে যাবার আগে, কানে হেডফোন লাগানো তরুণীর দিকে একবার না তাকিয়ে পারলাম না। লাস্যময়ী তখন রিসিভারের ওপর খিলখিল রবে হাস্য করছিল। খোলা দরজা দিয়ে প্রথম ঢুকে, সামনেই একফালি প্যাসেজ। করিডরের দরজা ঠেলতেই, দু' পাশে দুটি বন্ধ ঘর। তারপরই বড় একটি হল ঘর। অন্ততঃ ডজন খানেক নানা মাপের উঁচু টেবিলের ওপর, টুলের ওপর বসে শিল্পীরা রঙ তুলি নিয়ে অংকনে ব্যস্ত। সকলেই না। কোনো টেবিলে দু'-তিন জন নানা কথায় ব্যস্ত। কেউ আমার দিকে ফিরে তাকালো না। আমি বেয়ারাকে অনুসরণ করে, আবার একটি করিডরের মুখোমুখি হলাম। এখানেও দু' পাশে দুটি বন্ধ ঘর। ভিতরে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। পরিবর্তনের মধ্যে, এখানে মেঝেয় কার্পেট পাতা। করিডর পেরিয়ে, আবার একফালি সরু লম্বা প্যাসেজ। করিডর শেষ হয়েছে সোজা গিয়ে একটি খোলা জানালার কাছে। সেখানে একজন বেয়ারা একটা টুলের ওপর বসেছিল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়ালো।

আমি দেখলাম, করিডরের দু' পাশে, ঝকঝকে পালিশ করা কাঠের দেওয়াল। দুটি আলাদা বড় চেম্বার। বন্ধ দরজার গায়ে পিতলের গোল হাতল ঝকঝক করছে। বাঁ দিকের দরজায় ইংরেজিতে পিতলের অক্ষর, 'এ. এম জি.' নীচে ডেপু. জি. এম.।' ডান দিকের দরজায়, 'ই. এন আর. পদ্মনাভন, নীচে, 'জি. এম.।'

আমি বেয়ারার সঙ্গে বাঁ দিকে ফিরতেই, এ এম. জি'র দরজা ভিতর থেকে খুলে গেল। এম. জি.'র সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরা চেহারা, বড় বড় চোখে উজ্জ্বল খুশি ও অভ্যর্থনার হাসি। সেই সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস, আর সেই আতরের হালকা গন্ধ। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ক'দিন ধরে খুব এক্সপেক্ট করছিলাম। না এলে, এ রবিবারে আপনার বাড়ি গিয়ে হানা দিতাম।'

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। এম. জি. আমাকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে এয়ার কুলারের মন্দ গতি। মাসটা ফাল্গুন হলেও, ইতিমধ্যেই বাইরে বেশ গরম পড়েছে। সেই হিসাবে ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। মোটা কাচে ঢাকা বড় টেবিল, রিভলবিং চেয়ার,

ভিজিটার্সদের গদি আঁটা খানকয়েক চেয়ার বা, স্টীলের আলমারি। এসব কিছুর আগেই, দৃষ্টি টেনে নিয়ে যায়, দেওয়ালের মাঝখানে বড় একটি রঙিন ছবি। স্বাস্থ্যোদ্ধত বিদেশিনীর সোনালী চুল বাতাসে উড়ছে। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশের দিকে। আধ বোজা চোখে সর্পিল দৃষ্টি। একেবারে নগ্ন বলা যাবে না। দুই স্তনাগ্রে ঢাকা পড়েছে প্রজাপতির খোলা পাখা। নিম্নাঙ্গে সবুজ একটি পাতা। আর এক পাশে সাদা কালোয়, একই মাপের একটি মিথুন চিত্র। কোনো মন্দিরের ভাস্কর্যের ফটো না, আঁকা ছবি, পুরুষ ও রমণীর। অন্য এক পাশে পিকাসোর মিথুন চিত্রের স্কেচ, সাদা কালোর প্রিণ্ট নিঃসন্দেহে। বোধ হয় এ ছবিটাই জাঁ পল্ সার্ত্রের কোনো উপন্যাসের কভারে দেখেছি।

এম· জি· আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, টেবিলের পাশ দিয়ে নিজের আসনের দিকে গেল, বললো, 'যা দেখবার, বসে দেখুন। রুচিতে আটকাচ্ছে না তো?' সে তার ঘোরানো চেয়ারে বসলো।

'রুচির মাপকাঠি তো সকলের সমান নয়।' আমি হেসে বললাম, 'সাদা কালোর দুটি ছবিই সুন্দর। কিন্তু প্রজাপতি আর গাছের পাতাই যেন কেমন গোলমেলে লাগছে।'

এম জি টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে নিয়ে হেসে বললো, 'চমৎকার বলেছেন। কিন্তু প্রজাপতি আর গাছের পাতা, আধুনিক সভ্যতা আর আইন বাঁচানোর বিজ্ঞাপনের ছবি। অবিশ্যি আমাদের দেশে এখনও নয়, আইনটা বিদেশের। এটা পঞ্চাশ দশকের শেষ। সত্তর দশকের মধ্যে এ দেশেও এসে যাবে, ভাববেন না।' সিগারেটের প্যাকেটের মুখ খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

আমি সিগারেট নিয়ে বললাম, 'আমার ভাববার কী আছে বলুন? ভাববেন তো সমাজমনের স্বাস্থ্যরক্ষকরা। আমার কোথায় গোলমাল, সেটা তো আপনাকে বললাম।'

'তার মানে, আপনি বিশুদ্ধবাদী।' এম· জি দেশলাইয়ের কাঠি ধরিয়ে ঝুঁকে পড়লেন।

আমি বললাম, 'বড্ড দূরে, সম্ভব নয়। আপনি ধরিয়ে নিয়ে বরং দেশলাইটা আমাকে দিন।'

এম জি নিজের সিগারেট ধরিয়ে আমাকে দেশলাই এগিয়ে দিল। আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আমাকে বিশুদ্ধবাদী বলা যাবে কী না জানি নে, তবে ঐ প্রজাপতি আর গাছের পাতাটা আমার চোখে দৃষ্টিকটু।'

'তার মানেই আপনি বিশুদ্ধবাদী।' এম· জি· এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'তবে আইনরক্ষকদের চোখে আপনি দোষী।'

হেসে বললাম, 'নিরুপায়। আইন যদি ঐ বক্ষাবরণ আর অঙ্গাবরণের সনদ

দিয়ে থাকে বিজ্ঞাপনদাতাদের, তা হলে আমার ভূমিকা সমালোচকের। কারণ আমার কাছে ওটাই ব্যভিচার। ঐ রুচির পরিচয় আমাদের দেশেও যে নেই, তা নয়, ওটা বিকার। তবে এসব নিয়ে কিছু বলা, আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা। দেখা মাত্র যা ধারণা হলো, তাই বললাম।' পকেট থেকে কয়েকটি ভাঁজকরা কাগজ বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'এগুলোতে একবার চোখ বোলান, আমি কিছু কাহিনীর পয়েণ্ট টুকে এনেছি। আপনার কেমন লাগে, জানতে পারলে, শব্দের সংখ্যায় বাঁধতে চেষ্টা করবো।'

'হ্যাঁ, দিন, কাজের কথাই আগে হোক।' এম জি আমার হাত থেকে কাগজ নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তার আগে বলুন, ঠাণ্ডা না গরম, কী চাই? চা কফি, আর এনি কোল্ড ড্রিংকস।'

আমি বললাম, 'চা।'

এম· জি·'র একটা হাত টেবিলের নীচে চলে গেল, এবং সে কাগজের ভাঁজ খুলে দেখতে আরম্ভ করলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই, করিডরের জানালার কাছে যে বেয়ারাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম, সে দরজা খুলে উঁকি দিল, 'হ্যাঁ স্যার।'

'চা নিয়ে এসো।' এম· জি· চোখ না তুলেই বললো।

আমি সেই ফাঁকে ঘরটি দেখে নিলাম। দিক ভুল না হলে, ঘরের পুব দিকে দুটি জানালা। দুটিই বন্ধ। একটি জানালার নীচের অর্ধেক জুড়ে ঘর ঠাণ্ডা করার মেসিন বসানো। নীচের মেঝেয় মোটা কার্পেট পাতা। ঘর ঠাণ্ডা করার মেসিন থাকলেও মাথার ওপরে একটি পাখা আছে। আপাততঃ নিশ্চল। এম· জি·'র নিজের রিভলবিং এবং ভিজিটারসদের চেয়ার ছাড়াও, ঘরের এক পাশে একটি নরম গদী আঁটা বড় আরাম কেদারা, তার ওপরে তোয়ালে বিছানো। অন্যদিকে স্টীলের আলমারি। মোটা কাচের ঢাকা মস্ত বড় টেবিলটা প্রায় ফাঁকাই বলতে হবে। একটা টেবিল ক্যালেণ্ডার, কলমদানে একগুচ্ছ কলম আর রঙ বেরঙের পেন্সিল। এক পাশে কয়েকটি পাতলা ছিমছাম ফাইল। হাতের ডান পাশে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন। ডান পাশে কিছু পেন্সিল স্কেচ, পেপার ওয়েটে চাপা দেওয়া। আমার সামনে, এবং এম· জি·'র সামনে দুটো ছাইদানি। তার সামনের ছাইদানির কাছে ফার্মের লেটার হেড। প্রথম পাতাটার ওপরে নানান রকম হিজিবিজি আঁকা। টেবিলের বাঁ দিকে পাশাপাশি দুটো টেলিফোন।

'সুন্দর!' এম· জি· চোখ না তুলেই বললো, 'প্রেম, যুদ্ধ, ঈর্ষা, চক্রান্ত, শোক, সুখ-মিলন, অভিশাপ, সব রকমই বেছে নিয়েছেন। আর ষোলটা কাহিনীর পয়েণ্টই দেখছি লিখে ফেলেছেন!' সে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো।

বললাম, 'হ্যাঁ, মোটামুটি যেগুলো মনে পড়ে গেল, সেগুলো দু-তিন লাইনে নোট করে ফেলেছি। আপনি ফাইনাল করলে, বই নিয়ে বসবো।'

'ফাইনাল, ফাইনাল !' এম· জি· বললো, বললো, 'বই না ঘেঁটেই এতোগুলো কাহিনী আপনার মনে পড়ে গেল ?'

হেসে বললাম, 'এগুলো তো এমন কিছু কাহিনী নয়, প্রায় সবই জানা। অবিশ্যি অতি প্রচলিত কোনো কাহিনী বেছে নিই নি।'

'আমি তো মশাই এর অর্ধেকই জানি নে।' এম· জি· বলতে বলতে, বাঁ পাশে দুটো টেলিফোনের একটার রিসিভার তুলে নিলেন, বাংলায় বললেন, 'পদ্মনাভনকে একবার দাও।' রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে আমাকে বললো, 'আমাদের জি এম·-এর সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করে দিই।' কথাটা শেষ করেই, রিসিভারের মুখ থেকে হাত সরিয়ে ইংরেজীতে বললো, 'মিঃ পদ্মনাভন, আপনার ঘর কি ফাঁকা আছে ?···আচ্ছা, আমি এক ভদ্রলোককে নিয়ে আপনার ঘরে একবার আসছি। ধন্যবাদ। আমার দিকে ফিরে বললো, 'চলুন, দেখাটা করেই আসি।'

আমি বললাম, 'চা আনতে বললেন যে ?'

'চা আমাদের খুঁজে নেবে, যেখানেই থাকি।' হাসতে হাসতে সে চেয়ার ছেড়ে উঠলো।

আমিও উঠলাম। এম জি· এগিয়ে এসে দরজা খুলে ধরলো। তারপরে দুজনেই পাশের ঘরে গেলাম। প্রায় এক রকমেরই ঘর। এক মাপের। মিঃ পদ্মনাভন দোহারা চেহারার বেঁটে খাটো ফরসা মানুষ। মাথার চুল ধূসর, বয়স অনুমান পঞ্চাশের কাছাকাছি। হাসিখুসি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মুখ। এম· জি· আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন, বসতে অনুরোধ, এবং প্রথমেই ভদ্রলোক জানালেন, তিনি বাঙলা একটু একটু বলতে পারেন, পড়তে পারেন না, অতএব আমার লেখা তিনি কিছু পড়েন নি কিন্তু নামটা শুনেছেন, আমি যে খ্যাতিমান, সে বিষয়ে ওঁর সন্দেহ নেই।

এই সব পোষাকি কথার পরেই, এম· জি· কাজের কথা শুরু করে দিল। আমাকে কী কাজের কথা বলা হয়েছে, এবং আমি কী রকম ভেবেছি, সেই সব কাহিনীর চুম্বকগুলো সে আলোচনা করতে লাগলো। সেই ফাঁকে আমি দেখলাম, পদ্মনাভনের মাথার ওপরে দেওয়ালে, তিরুপতির একটি বাঁধানো ছবি। তার এক পাশে মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের ভাস্কর্যের বড় একটি ডিটেল ফটোগ্রাফ। অন্যদিকে একটি কার্টুন। দূরগামিনী ছোট্ট একটি রমণীর পশ্চাদ্ধাবন করছে বিশাল চেহারার এক পুরুষ। অনেকটা হস্তী ও ইঁদুরের মতো।

মিঃ পদ্মনাভন এম· জি·-কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতো সংক্ষিপ্ত চুম্বক শুনে, আমি ঠিক ধরতে পারছি না। মিঃ রাইটার যদি আর কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করে বলেন, আমার পক্ষে সুবিধা হয়।' তিনি আমার দিকে হেসে তাকালেন।

এম· জি·-ও আমার দিকে তাকালো। আমিও তার দিকে একবার

তাকালাম। বলতে নিশ্চয়ই পারি, কিন্তু ইংরেজিতে নিজেকে প্রকাশ করাটাই যা কষ্টকর। তবু আমি এম· জি·'র হাত থেকে কাগজ নিয়ে, যতোটা সম্ভব বিস্তৃত করে, আর নিজের যোগ্যতা অনুসারে ইংরেজিতে কাহিনীগুলো বললাম। পদ্মনাভন রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এবং শুনতে শুনতে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন। গোটা সাত আষ্টেক কাহিনী বলার মধ্যেই বেয়ারা চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকলো। শুধু পট এবং কাপ-ডিস-চামচ না, একটি পাত্রে কিছু প্যাটিজও রয়েছে। পদ্মনাভন বলে উঠলেন, 'অনেক হয়েছে, আর আপনাকে বলতে হবে না। চমৎকার!' তিনি এম· জি·'র দিকে তাকালেন, 'এম· জি·, তোমারই আইডিয়া এটা, অতুলনীয় আইডিয়া! সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমার কাছ থেকে প্রথমে যখন আইডিয়াটা শুনেছিলাম, বিষয়টা আমি খুব ভালভাবে নিতে পারিনি। মন থেকে পুরো সায় দিতেও পারিনি। এখন লেখকের কাছ থেকে কাহিনীর চুম্বকগুলো যতো শুনছি, ততোই আমার দৃষ্টি খুলে যাচ্ছে। কাহিনীগুলোর সঙ্গে কী দুর্দান্ত ইলাস্ট্রেশন হবে, আমি এখনই যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের চিফ আর্ট ডাইরেকটর মিঃ সরকারের হাতে এ গল্পগুলো জীবন্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু এম· জি·, লেখক মশাইয়ের কাছ থেকে এ কাহিনীগুলোর কেবল বাঙলা রাইট নিলে চলবে না। আপাততঃ হিন্দী আর ইংরেজী অনুবাদের রাইটগুলোও তুমি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নাও।'

'আমি অবিশ্যি অনুমান করেছিলাম মিঃ পদ্মনাভন, আপনি আমার এই আইডিয়াটা অনুমোদন করবেন।' এম· জি ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হেসে শান্ত স্বরে বললো, 'অন্য ভাষার বিজ্ঞাপনের জন্য কথাটা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম।'

মিঃ পদ্মনাভন ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বললেন, 'আমি জানি এম· জি·, তোমার দৃষ্টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। কেবল আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য, তোমার প্রাথমিক বয়ান আমার কাছে দুর্বোধ্য লাগে। তুমি খুবই চালাক লোক—মানে, বুদ্ধিমান।'

'ধন্যবাদ মিঃ পদ্মনাভন।' এম· জি· তার শান্ত স্বরেই বললো। যদিও এই শান্ত স্বরে একটা দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা কান থাকলেই শোনা যায়। সে আবার বললো, 'আপনার ভালো লাগবে, এটা ধরে নিয়েই, সাহিত্যিক মশাইকে আমি কিছু টাকা আমার নিজের অ্যাকাউণ্ট থেকে অ্যাডভান্স করেছি।'

মিঃ পদ্মনাভন প্রায় অভিমানের স্বরে বললেন, 'এটা তুমি আমার ওপরে না, ফার্মের ওপরেই অবিচার করেছো। না না না, এটা তুমি খুবই অন্যায় করেছো।'

'আহা, আমার অ্যাকাউণ্ট আর ফার্মের অ্যাকাউণ্ট তো একই কথা।' এম· জি· হেসে একবার আমার দিকে তাকালো, 'ফার্মের অ্যাকাউণ্ট থেকে

আমার অ্যাকাউণ্টে টাকাটা ট্রান্সফার করে নিলেই হবে।'

ইতিমধ্যে বেয়ারা তিনটি কাপে চা আর চিনি দিয়ে, আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। পদ্মনাভন আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসুন, চা-টা ঠান্ডা করবেন না। খাদ্যবস্তুটা কিসের? আমিষ না নিরামিষ?' সে এম· জি·'র দিকে তাকালো।

'নিরামিষ।' এম· জি· বললো, 'আপনি অনায়াসেই নিতে পারেন।'

পদ্মনাভন একটি প্যাটিজ তুলে নিয়ে বললেন, 'ধন্যবাদ।' আমার দিকে ফিরে তাকালেন, 'তা হলে, কাহিনীগুলোর ভাষান্তরের অনুমতি দিতে আপনার আপত্তি নেই তো?'

আমি এম· জি'র দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপত্তির কী থাকতে পারে?'

'কিছুই না।' এম জি প্যাটিজের ডিসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, পদ্মনাভনের দিকে ফিরে বললো, 'ওঁর যোগ্য দক্ষিণা আমরা দিতে পারলেই হলো।'

আমি একটি প্যাটিজ তুলে নিলাম। স্বীকার করতেই হবে, অর্থকরী দিক থেকে আমার পক্ষে কাজটি শুভই বলতে হবে। যদিও এখনও এরকম একটি টেকনিক্যাল কাজের অগ্নিপরীক্ষা আমার বাকী আছে। আশা করছি, কাহিনীর চুম্বক যখন এঁদের আকর্ষণ করেছে, কাজটা হয়তো আমি করতে পারবো। এতে সৃষ্টির আনন্দ কতোটা পাওয়া যাবে জানি না, কিন্তু এ সংসারে চিঁড়ে ভেজাতে হলে, কখনো কখনো পুরোপুরি সৃষ্টির আনন্দে বোধহয় মেতে থাকা যায় না। অতএব মনের দিক থেকে আমিও খুশি বোধ করছি।

এম জি প্যাটিজে কামড় বসিয়ে, মুখের মধ্যে কিছুটা ধাতস্থ করে, পদ্মনাভনের সঙ্গে আমার দেনাপাওনা বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলো। পদ্মনাভন দরাজ হয়ে বললেন, 'বাঙলা ভাষার সব কাহিনীগুলোর টাকাটাই তুমি ওকে অ্যাডভান্স করে দিতে পারো, আমার কোনো আপত্তি নেই। অনুবাদের রেট ঠিক করে নিয়ে, পরে অন্য ভাষার টাকা দিলেই হবে।'

আমি বললাম, 'ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার প্রয়োজনের সময় টাকা আমি নিজেই চেয়ে নেবো।'

'আপনার প্রয়োজন আর সময়ের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজন আর সময়ের সঙ্গতি নাও থাকতে পারে।' এম· জি· কথাটা বললো চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে, কারো দিকে না তাকিয়ে।

মিঃ পদ্মনাভন প্রায় বিষম খেয়ে বললেন, 'তার মানে, কী বলতে চাও তুমি এম· জি·? ওঁকে এককালীন পুরো টাকাটা দেবার মতো সঙ্গতি আমাদের নেই?'

'আমি তা বলিনি।' এম· জি হেসে তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বললো,

'সঙ্গতি আমাদের নিশ্চয়ই আছে। আমি বলছি ওঁর প্রয়োজন আর সময়, আর আমাদের প্রয়োজন এবং সময়, এ দুটো আলাদা কথা।'

মিঃ পদ্মনাভনের মুখ একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো, তিনি বললেন, 'হুঁ মানে, তুমি আমাদের ফার্মের বিষয়ে কিছু—।' কথাটা তিনি শেষ করলেন না, বা এম· জি -কে কোনো প্রশ্নও করলেন না।

এম· জি· হেসে বললো, 'মিঃ পদ্মনাভন, আপনি খুব সহজেই সীরিয়স হয়ে যান। আমি ফার্মের বিষয়ে কোনো ইঙ্গিতই করছি না। আপনার নির্দেশমতো ওঁকে আমি বাঙলা ভাষার সব টাকাটাই অ্যাডভান্স করে দেবো।'

কিন্তু মিঃ পদ্মনাভনের গাম্ভীর্য কাটলো না, যদিও একটু হাসলেন। আমি কেবল অনুমান করতে পারছি, দুজনের মধ্যে এমন বিশেষ কোনো কথার বিনিময় হচ্ছে, যা একজন বহিরাগতের পক্ষে বোঝা সম্ভব না। অথচ বিষয়টি নিশ্চয় সুখের নয়।

চা পট শেষ হলো। মিঃ পদ্মনাভনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমি এম· জি·'র সঙ্গে আবার তার ঘরে ফিরে এলাম। সে আমাকে বসতে বলে, নিজের চেয়ারে বসে বললো, 'দু' একদিন বাদে এসে আপনার চেকটা নিয়ে যাবেন। আর যদি বলেন তো, বাড়িতেও পাঠিয়ে দিতে পারি।'

আমি হেসে বললাম, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমার কোনো তাড়া নেই। কয়েকদিন বাদে এসে কিছু কাজ জমা দিয়ে আমি নিজেই চেক নিয়ে যাবো।'

'সেটাই ভালো। আপনাকে আরও পাওয়া যাবে।' এম· জি· বললো, 'তাছাড়া আজ অফিসের কাজকর্ম বন্ধ হবার মুখে। আপনার এখন কোনো কাজ আছে নাকি? মানে, কোথাও যাবার আছে?'

আমি বললাম, 'না, এখন আমার ছুটি। কোথাও গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরবো।'

'কোথায় সেই আড্ডা? কফি হাউস?' এম· জি· জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, 'কোনো ঠিক নেই। কোনো বন্ধুর বাড়িও যেতে পারি। বিশেষ বিশেষ রেস্তোরাঁতেও আড্ডা বসে।'

'আজকের আড্ডাটা আমার সঙ্গেই হোক না।' এম· জি·'র বড় বড় চোখে উৎসুক দৃষ্টি, 'অবিশ্যি আমার সঙ্গ বা আড্ডার জায়গা আপনার ভালো লাগবে কি না জানি না। তবে, আমার খুব ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা দিই। অবিশ্যি সেখানে আমাকে ছাড়াও আমার অন্যান্য দু'-চারজন বন্ধুকে পাবেন। আশা করছি, তারাও আপনার সঙ্গ পেলে খুশিই হবে।'

এম· জি·-কে আমার বলা সম্ভব নয়, আমার বাঁধাধরা কোনো আড্ডা নেই। না দিনে, না রাত্রে। কলকাতায় আমার যথার্থ বাসস্থানও নেই। এম· জি· যেখানে দেখা করতে গিয়েছিল, সেটি আমার এক বন্ধুর বাড়ি। কলকাতায়

মাঝে মাঝে থেকে যাবার দরকার হলে, সেখানেই থেকে যাই। সেই হিসাবে বন্ধুর বাড়িটি আমার কলকাতার একটি ঠিকানা। আসলে আমি উত্তর চব্বিশ পরগনাবাসী। ট্রেনে যেতে সময় লাগে এক ঘণ্টা। আমার কলকাতার বন্ধুটি সদ্য বিবাহিত। প্রেমজ বিবাহ, এবং বিয়ের আগেই তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। নিজের বাড়ির তিনতলায় সে সস্ত্রীক থাকে। দোতলাটা পুরোই, বলতে গেলে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। অতএব, আমি কলকাতায় ঠিক গোয়ালে বাঁধা জীবের মতো বাস করি না। শিয়ালদহে ট্রেনে চেপে ফিরে যেতে পারি। অন্য কোনো বন্ধুর বাড়িতেও রাত কাটিয়ে দিতে পারি। ঘুরে বেড়াতেও পারি যত্রতত্র। ইস্টিশনে, ময়দানে, গঙ্গার ধারে, কলকাতার পথে পথে, অথবা সত্যি সত্যি কিছু বাঁধাধরা বন্ধুদের আড্ডায়। অতএব এম জি'র সঙ্গে একটা সন্ধ্যা কাটাতে আমার আপত্তি করার কিছু নেই। বিশেষ করে, কবির উক্তিটা যখন মনে রাখতেই হয়, 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।'…

আমি বললাম, 'আপনার অসুবিধা না থাকলে, আমারও নেই।'

'বাহ্, চমৎকার।' এম. জি খুশীর স্বরে বললো, এবং বোতাম টিপে বেয়ারাকে ডাকলো। ড্রয়ার খুলে, কিছু একটা পকেটে নিল। সম্ভবতঃ পার্স। তারপরে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ধরলো, বললো, 'মিস রায়কে বলে দাও, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।'

ইতিমধ্যে বেয়ারা ঢুকলো। এম. জি. উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি বেরোচ্ছি।'

'আচ্ছা স্যার।' বেয়ারা আগেই এগিয়ে গেল ঘর ঠাণ্ডা করা মেসিনের দিকে। সেটার সুইচ্ অফ করে দিল। এম. জি. টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এগিয়ে এসে বললো চলুন।

আমি চেয়ার ছেড়ে তাকে অনুসরণ করলাম।

এম. জি.'র গাড়ি এসে দাঁড়ালো কলকাতার সব থেকে নামকরা, পাঁচ তারকা হোটেলের সামনে। গাড়ি থেকে নেমে তার সঙ্গে ভিতরে ঢুকে, রিসেপশন ছাড়িয়ে, লাউঞ্জ পেরিয়ে, ওপন এয়ার লনের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাঁচ তারকা হোটেল বটে। যে-সময়ের কথা বলছি, তখনও সেই হোটেলে সুইমিং পুল ছিল না। ইতিমধ্যেই তরুণী রিসেপশনিস্ট থেকে স্টুয়ার্ড বেয়ারারা এম. জি.-কে অভ্যর্থনা আর সেলাম ঠুকে যাচ্ছিল। বোঝা গেল, সে এখানকার নিয়মিত খদ্দের।

লাউঞ্জের বাইরে, ডান দিকের শেষ প্রান্তে 'বার'-এ আলো জ্বলছে। ডান দিকে ছাদ ঢাকা চওড়া প্যাসাজে, এবং তার বাইরে, দু' পাশে ফুলের

টব সাজানো শ্বেত পাথরের মেঝের ওপরে টেবিলে টেবিলে মহিলা পুরুষদের গুঞ্জন চলছে। এম. জি. এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, তারপরেই তুড়ি মারার একটি শব্দ, এবং একটি স্বর ভেসে এলো, 'এম জি, কাম হিয়ার।'

আলো আঁধারিতে আমি নির্দিষ্ট টেবিলটি দেখতে পেলাম না। এম. জি. হাত তুলে ইশারা করলো। আমার দিকে ফিরে বললো, 'কিছু না বলে কয়েই আপনাকে নিয়ে এখানে ঢুকে পড়লাম। জায়গাটা আপনার পছন্দ তো?'

'কলকাতার পান্থশালার স্বর্গ বলতে যদি কোথাও বোঝায়, তবে তো এটা সে-জায়গাই।' আমি হেসে বললাম, 'কিন্তু এ স্বর্গের দেবতাদের যোগ্য স্থান আমার কী না, তা আমি জানি নে।'

এম. জি. আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, 'দেবতা? তা মন্দ বলেন নি। দেবদেবীদের আগমনই এখানে ঘটে বটে। কখনো কি আসেন নি?'

'বাইরে থেকে আসা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে দু-একবার এসেছি, কিন্তু এই খোলা পানশালায় নয়। ঘরের মধ্যে গেছি।'

এম. জি. বললো, 'আমার দু'একজন বন্ধু রয়েছে দেখছি, চলুন, একটু বসা যাক। আপনার যখনই ভালো লাগবে না, বলবেন, তখনই উঠে পড়বো।'

সে বড় কঠিন ব্যাপার। ভালো না লাগার কথা মুখ ফুটে বলতে পারবো কী না জানি না। তা ছাড়া, এখানে আমি মূর্তিমান বেমানান। এ পানশালার আসরে, আমি নিতান্তই রসবঞ্চিত গোবিন্দ দাস। অবিশ্যি ঘ্রাণে যদি অর্ধ ভোজনং হয়, তা হলে, তার অধিক, নিশ্চয় জীবনে দু' একবার উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো গলাধঃকরণ নিশ্চয় করেছি। সেটাকে রসগ্রহণ না বলে, বেরসিকদের মতোই পস্তেছি। স্বাদ গুণ কোনোটাই গ্রহণ করতে পারি নি। আজ এই সত্তর দশকের শেষ প্রান্তে এসে আর অবিশ্যি সে-কথা বলা যাবে না। এম. জি.-কে বললাম, 'আমার জন্য আপনার ওঠার দরকার হবে না। থাকবার সময়ের স্বাধীনতাটা আপনি আমাকে দিলেই হবে।'

'তার মানে, আপনি যখন খুশি চলে যাবার কথাটা আগেই কাড়িয়ে রাখছেন।' এম. জি হেসে আমার হাত ধরে, দু'পাশে গোল টেবিলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল। থামলো গিয়ে একটি টেবিলের সামনে।

দেখলাম বসে আছেন দুজন। একজন দীর্ঘদেহী স্যুটেড বুটেড, আর একজন তরুণী মহিলা। তরুণী তার ঘাড় ছাঁটা চুলে, দীর্ঘ গ্রীবায় ঝাঁকানি দিয়ে বললো, 'হ্যালো এম. জি.।'

'তোমাকে ক'দিন দেখি নি।' এম. জি. বলে, জবাবের অপেক্ষা না করেই আমাকে দেখিয়ে বললো, 'তোমাদের সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দিই। হয় তো নাম শুনেছো, চোখে দেখ নি।' সে আমার নাম বললো, সঙ্গে অবিশ্যি একটি বিশেষণ জুড়ে।

দীর্ঘদেহ স্যুটেড বুটেড আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন 'স্বাগতম।

চোখেও দেখেছি, দূর থেকে পরিচয় হবার কোনো অবকাশ হয় নি।'

আমাকেও অতএব হাত বাড়াতে হলো। এম. জি. পরিচয় করিয়ে দিল, 'সুহাস দাশগুপ্ত। আর ইনি অলকা হালদার। দুজনেই এক কোম্পানিতে বড় পোস্টে আছেন।'

সুহাস দাশগুপ্ত আমাকে একটি হালকা সোফায় বসালেন। অলকা হালদার দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানিয়ে, প্রায় ইংরেজী বলার ভঙ্গীতে বাংলায় বললেন, 'আমি আপনার বই নিশ্চয়ই পড়েছি, নাম তো জানিই। আজ চোখে দেখার সৌভাগ্য হলো। কিন্তু আপনাকে আমি আরও—কী বলবো—আই মীন, এ্যাজেড ভেবেছিলাম।'

আমি নমস্কারের জবাব দিয়ে বললাম, 'বয়স আমার কম হয় নি।'

এম. জি আমার পাশের সোফায় বসে বললো, 'অনেক, প্রায় আমার কাছাকাছি।'

'এ চাইল্ড!' তরুণী বলে উঠলো।

এম জি. বললো, 'থ্যাংক্যু অলকা, আমি তা হলে তোমার কাছে চাইল্ড। এতোদিন বলোনি কিন্তু।'

'এতোদিন বলার অবকাশ মেলে নি।' অলকা ইংরেজিতে কথাটা বললেন।

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে কপালে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো। সুহাস আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জন্য কী বলবো?'

আমি এম জি'র দিকে তাকিয়ে একবার হাসলাম, সুহাসের দিকে ফিরে বললাম, 'যে কোন নরম পানীয়।'

'নরম পানীয়!' অলকা বলে উঠলেন, 'ইউ মীন সফ্‌ট্‌ ড্রিংকস্‌?' তরুণীর বুকের জামায় যেন বিরাট ঢেউ খেলে গেল।

এম জি বললো, 'একটু বীয়র চলুক না? একেবারে কি অভ্যাস নেই?'

'অভ্যাস বলতে যা বোঝায়, তা নেই। তবে একেবারে অচ্ছুত নয়।' আমি হেসে বললাম, 'দু' একবার স্পর্শ করেছি।'

এম. জি. বললো, 'তা হলে একটু বীয়র নিয়ে বসুন, আপনার সঙ্গে আমিও বেস্‌টা তৈরি করে নিই।'

'তুমিও বীয়র?' সুহাস এম জি'র দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বীয়র লাগাও ইধর।'

'জী' বেয়ারা চলে গেল।

নানাবিধ ছোট পাম গাছের টব সাজানো, আকাশের নীচে পানশালার আলো আঁধারি, এখন আমার চোখে অনেকটা সয়ে এসেছে। গোঁফ দাড়ি কামানো সুহাস দাশগুপ্তের পরিচ্ছন্ন দীপ্ত মুখ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। বয়স অনধিক চল্লিশ। অলকা হালদারকে সুন্দরী নিশ্চয়ই বলতে হবে। কাঁধ কাটা এবং সেই সঙ্গে বুকের জামাও অনেকখানি উদার করে কাটা। ডাগর

চোখে কাজল নিশ্চয়ই টানা, আর সেই কারণেই চোখের দ্যুতি যেন একটু বেশি। একটু লম্বা মুখের সঙ্গে দীর্ঘ গ্রীবা, তার সঙ্গে ঘাড় অবধি চুলে তাঁর চেহারায় দেশী রূপসীর থেকে একটা অন্যতর রূপের ছাপটাই প্রকট। বোধহয় একে পশ্চিমী অনুকরণ বা ফ্যাশান বলে। ঠোঁটে অবিশ্যিই ওষ্ঠ রঞ্জনীর গাঢ় প্রলেপ রয়েছে। বসে থাকলেও তাঁকে দীর্ঘাঙ্গী বলে বুঝতে অসুবিধে হয় না। বয়সটা অনুমানের অপেক্ষা রাখে। চব্বিশ থেকে চল্লিশের যে কোনো একটা জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে পানের মাত্রা কতোটা হয়েছে জানি না। চোখের দ্যুতিতে ঝিলিক হেনে বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, লেখক মাত্রই ড্রিংক করে, না করলে লিখতে পারে না।'

'কেমন করে যে তোমার এমন একটা ধারণা হলো, তা অবিশ্যি আমি জানি।' এম জি. বললো, 'তবে তোমার পরিচিত যে কয়েকজন সাংবাদিক-সাহিত্যিককে নিয়ে তোমার ধারণাটা তৈরি হয়েছে, সেটা ভুল। এ দেশের অধিকাংশ সাহিত্যিকই, ড্রিংক বলতে যা বোঝায়, তা করেন না।' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'ঠিক বলেছি কি ?'

আমি বললাম, 'একশো ভাগ।'

'স্ট্রেঞ্জ !' অলকা উচ্চারণ করলেন, এবং কয়েকটি নাম দ্রুত উচ্চারণ করে বললেন, 'এঁরা শুনেছি পাঁড় মাতাল।'

এম জি বললো, 'ঠিকই শুনেছো। তবে যে ক'জনের নাম বললে, তাঁরা প্রায় সকলেই সাংবাদিক। দু'-একজন কবি সাহিত্যিকও আছেন। তবে সেটা ব্যতিক্রম। অবিশ্যি স্বীকার করতেই হবে, হালের কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে পানের প্রবণতাটা বাড়ছে, সেটা কমবয়সীদের মধ্যে। যাঁদের এখন উঠতি বলা যায়। বয়স্কদের মধ্যে প্রায় কেউই এ-সবে নেই। থাকলেও সামান্য। সাংবাদিকরাও যে সবাই সারা দিনরাত্রি শুঁড়িখানায় আসর জমিয়ে বসে থাকেন, তা বলা যায় না। তবে মাত্রাটা তাঁদের মধ্যেই বেশি। আর, তার বোধহয় কারণও আছে।'

এম. জি.'র কথা শেষ হবার আগেই বেয়ারা দু বোতল বীয়র আর তার উপযুক্ত দুটি হাতলওয়ালা বড় গেলাস এনে টেবিলে বসিয়ে দিল। কেউ কিছু বলবার আগেই, দুটো বোতলের মুখ খুলে, সে দুটো গেলাসে ঢেলে, আমার আর এম জি'র সামনে রাখলো। আমি বলে উঠলাম, 'পুরো এক বোতল !'

'যতোটা পারেন, এবং যতোটা আপনার ইচ্ছে।' এম. জি. বললো, 'কোনো জোর নেই। নষ্ট হবে না কিছুই।' সে আমার হাতে একটি গেলাস তুলে দিল ? নিজেরটাও তুলে নিল।

হাতে নিয়ে অনুভব করলাম, কনকনে ঠাণ্ডা। গ্লাসের ওপরে এখনও ফেনা। সুহাস এবং অলকাও তাঁদের গ্লাস তুলে নিলেন। সুহাস আমার

দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজ আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে—'

সকলের ঠোঁট নেমে এলো পানীয়র পাত্রে। আমিও বীয়রের তিক্ত স্বাদ নিলাম। ঠাণ্ডা, ঈষৎ ঝাঁজ, গলা দিয়ে নেমে গেল। সুহাস সামনে রাখা পাত্র থেকে কয়েক দানা চীনে বাদাম মুখে দিয়ে বললেন, 'এবার বলো তো এম· জি· সাহেব, তুমি এই লেখককে নিয়ে ঘুরছো কেন ?'

'মীনিংলেস কোয়শ্চেন।' অলকা বলে উঠলেন, 'প্রথমতঃ, এভাবে জিজ্ঞেস করাই উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, এম· জি. যে পাবলিশার্স নয়, তাও আমরা জানি।'

এম· জি· গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'অতএব, যা খুশি তাই ধরে নিতে পারো।'

'বিজনেস তো নিশ্চয়ই।' সুহাস আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তারপরে এম· জি·'র দিকে মুখ ফেরালেন 'কাজ ছাড়া এম· জি কিছু করে না, সেটা সবাই জানে।'

এম· জি· বললো, 'তোমাদের সঙ্গে এখানে আড্ডায় বসাটাও কি তাই ?'

'তা বলবো না, এটা নিছকই আড্ডা।' সুহাস বললেন।

এম জি· বললেন, 'সেরকমই ধরে নিতে পারো, সাহিত্যিকের সঙ্গে মিশে, আমি একটু নতুন জীবনের স্বাদ পেতে চাইছি।'

অলকা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। হাসিতে কিছুটা বিদ্যুতের ঝংকার। বললেন, 'খুব ভালো বলেছো এম· জি·, তোমার মতিগতি ফিরছে।'

'বিশ্বাস করবে না জানতাম।' এম· জি· আমাকে দেখিয়ে বললো, 'ওঁকেই জিজ্ঞেস করো, আমি বলেছি কী না, আমি আমার বাঁধাধরা জীবনের ছকে একটু ছুটি চাই। সেজন্যই এরকম একজন তীর্থে তীর্থে ঘুরে ফেরা সাহিত্যিকের সঙ্গ নিয়েছি।'

সুহাস বললেন, 'হ্যাঁ, কথাটা তুমি ইদানীং প্রায়ই বলছো কিন্তু তীর্থে তীর্থে ঘুরে ফেরা কি তোমার পক্ষে সম্ভব ?'

'আমি কিন্তু তীর্থে তীর্থে ঘুরে ফিরি না।' না বলে পারলাম না, 'তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানোটা একটু অন্যরকম ব্যাপার। তবে শহরের মিছিল থেকে, গাঁয়ে গঞ্জের মেলা আমার ভালো লাগে। আর মেলাগুলোর উপলক্ষ্য অধিকাংশই ধর্মীয়। কিন্তু তীর্থভ্রমণ আলাদা। অবিশ্যি শহরের বৈচিত্র্যকে আমি খাটো করছি না। কথাটা ভালো লাগার।'

এম· জি· ইতিমধ্যেই নিজের বোতল শেষ করেছে। আমার বোতল থেকে নিজের গেলাস পূর্ণ করে বললো, 'শহরে নিশ্চয়ই বৈচিত্র্য আছে, তবে কৃত্রিমতাটা বেশি। আপনার উদ্দেশ্য তো স্বদেশকে দেখা, স্বদেশকে চেনা।'

'শহর কি বিদেশ ?' অলকা আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি বললাম, 'আদৌ না। এ তো আমাদের জীবনেরই আর একটা রূপ। বিদেশের ঢেউটা কেমন এলোমেলো করে দেয়। শাশ্বত শব্দটা ব্যবহার করতে আমার ইচ্ছা করে না, তবে গ্রামে গঞ্জেই এখনও নিজেদের অনেকটা খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও পরিবর্তনের ঢেউটা সেখানেও গিয়ে লাগছে। আটকে রাখাও সম্ভব নয়। শহরের আকর্ষণ সকলের। কিন্তু খবরের কাগজ বোধহয় আমাদের জীবনের দর্পণ নয়। ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ এখনও অন্য এক দূর জগতের মানুষ, তাদের ধ্যান ধারণার সন্ধানটাও আলাদা।' কথাগুলো বলতে বলতে নিজেই কেমন সংকোচ বোধ করে চুপ করে গেলাম। বললাম 'মাপ করবেন, এ-সব নিতান্ত নিজের ধারণার কথা বলছি। তর্কে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

'আপনি বিশ্বাসে আছেন।' এম· জি· নতুন আর এক বোতল বীয়র চাইলো বেয়ারাকে ডেকে।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বললাম, 'বিশ্বাসের আর এক নাম তো উত্তরণ। তা আমার নেই।'

ইতিমধ্যে সুহাস আর অলকাতে লেগে গেল তর্ক। বিষয়বস্তু ভারতের শহর আর গ্রাম, ধর্ম আর আধুনিকা। আবহাওয়াটা হয়ে উঠলো বড় বেশি তথাকথিত ইতিহাস আর দেশ নিয়ে বিতর্কমূলক। এম· জি· খুব দ্রুত আর এক বোতল বীয়র শেষ করে, পকেট থেকে পার্স বের করে বেয়ারাকে ডাকলো।

সুহাস বলে উঠলেন, 'তুমি উঠছো নাকি ?'

'জানোই তো, এরকম জায়গায় আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।' সে বেয়ারার দিকে তাকিয়ে বললো, 'পুরা বিল লে আও।'

'ইমপসিবল !' সুহাস বাধা দিয়ে বললেন, 'পার্সটা পকেটে রাখো এম· জি·, আজ তোমাকে সে সুযোগ দেওয়া হবে না। কিন্তু আর একটু বসলে হতো না। তোমার বন্ধুর গেলাস যে এখনও খালি হয়নি।'

এম· জি· বললো, 'ওটুকু থাকুক।'

'এখন কি সেই জায়গায় ?' অলকা ঘাড় বাঁকিয়ে, এম· জি·'র দিকে চোখের কোণে তাকালেন।

এম· জি· দাঁড়িয়ে বললো, 'সেই জায়গা বলতে তো একটা জায়গা বলে কিছু নেই। আমার তো অনেক জায়গা। মাছ খাবো, অথচ আঁশটে গন্ধ থাকবে না, এটা আমার পছন্দ নয়। যাই একটু অন্য জায়গায়, দেখি সাহিত্যিকের আবার ভালো লাগে কী না ?' আমার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'উঠুন। ও বীয়রটুকু ছেড়ে দিন।'

আমি সুহাস আর অলকার দিকে একবার অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখলাম। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। সুহাস বললেন, 'যান, এম· জি·'র সঙ্গে ঘুরুন।

স্তবে ভবিষ্যতে, মনে পড়লে আমাদের এখানেও আসবেন, নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম।'

আমি দুজনকে নমস্কার জানিয়ে এম· জি·'র সঙ্গে হোটেলের বাইরে এলাম। তার মাছ খাওয়া এবং আঁশটে গন্ধের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, সে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। তা উঠলো না। চওড়া ফুটপাতের ভিড়ে আমার হাত ধরে চলতে চলতে বললো, 'বিদুষীদের নাগরী চালটা আমার তেমন পছন্দ না। একটু নাচ দেখা যাক। আপনার ভালো না লাগলে চলে আসবো।'

ভালো লাগা না লাগার সীমাটা যে কখন কোন্ পরিস্থিতিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, সেটা আগে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বেশী দূরেও যেতে হলো না। খানিকটা গিয়েই, আর একটি হোটেলের দোতলায় উঠলাম। এম· জি·-কে দেখে বেয়ারা যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সেলাম ঠুকে বন্ধ দরজা খুলে দিল। বিরাট হলঘরে, বিস্তর ডিনার টেবিল সাজানো। মহিলা পুরুষের ভিড়ও কম না। হলের এক প্রান্তে, মাইকের মাউথ পিস্ মুখের সামনে নিয়ে, এক বিদেশিনী গায়িকা শরীর দুলিয়ে গান গেয়ে চলেছে। বাদকেরা তাকে ঘিরে বাজনা বাজাচ্ছে। একজন স্টুয়ার্ড ছুটে এসে এম· জি-কে 'গুড ইভিনিং' জানিয়ে, হাতের ইশারায় নিয়ে গেল একেবারে গানের মঞ্চের কাছাকাছি একটি টেবিলে। সামনে অর্ধচন্দ্রাকার জায়গা খোলা, মেঝে মসৃণ পরিচ্ছন্ন। স্টুয়ার্ড ঝুঁকে পড়ে এম· জি-কে কিছু বললো। এম· জি· বললো, 'বীয়র।'

স্টুয়ার্ড সম্ভবতঃ আরও কিছু অর্ডারের জন্য এক মুহূর্ত তাকালো এম· জি·'র মুখের দিকে। তারপরে চলে গেল। গান শেষ হলো। হলজোড়া হাততালি। মাইকে ইংরেজিতে ঘোষিত হলো, 'মিস সুইস্ এবার আপনাদের সামনে আসছেন।'

আমি ইতিপূর্বে কখনো এ হোটেলে আসিনি। নামটা জানা ছিল। এতো ভিড়, এতো হাসি, গুঞ্জন, পানভোজন, বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা, কোনো কিছুতেই বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। ভারতের বাইরের চেহারাটা জানা নেই। হয়তো এমনটি হলেও হতে পারে। মিস সুইস্-এর নাম ঘোষণা মাত্র আবার হাততালি আর গুঞ্জনের ধ্বনি চড়ে উঠলো। স্টুয়ার্ড বেয়ারাদের ছুটোছুটিও সেই সঙ্গে।

কয়েক মিনিট পানভোজন পরিবেশন চললো, আমাদের টেবিলেও পানীয় এলো। তারপরেই বাদ্যের ঝংকার, এবং বিরাট হলের প্রায় সব আলো নিভে গেল। উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো সেই বাদ্য মঞ্চের সামনের অর্ধচন্দ্রাকার স্থানটিতে। সেই আলোয় আবির্ভাব ঘটলো বিদেশিনী রূপসী উর্বশীর। নাচ শুরু হলো বিদেশী কেতার। এম· জি· বললো, 'বীয়রে একটু চুমুক দিন।'

ইতিপূর্বের বীয়রের তিক্ততাই কিছু ঠোঁটের কষে লেগেছিল। দ্রব্যগুণের

প্রতিক্রিয়া তেমন একটা অনুভব করিনি। অনুষঙ্গ বলে একটা কথা আছে, যাকে ঠিক অনুকরণ বোঝায় না। বোধহয় ইংরেজীতে অ্যাসোসিয়েশন বোঝায়। অথবা সম্পর্ক। মনে হচ্ছে, এ পরিবেশে পানীয় এক সহচরী, আমি চুমুক দিলাম। অন্যদিকে নাচের হাত পা আন্দোলনের মহিমা সঠিক কিছু বুঝতে না পারলেও, স্বাস্থ্যবতী রূপসীর নানা রঙ্গে ও ভঙ্গিতে শরীর দর্শন বৈচিত্র্যময়ী হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে, তাকে ঘিরে আলোও নানা রঙের খেলা চালিয়ে যাচ্ছে।

এম· জি· আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'আগে এখানে এসেছেন নাকি?'

'না।'

'তাহলে হয়তো নতুন বলে ভালো লাগতে পারে।' সে গেলাসে চুমুক দিয়ে, নর্তকীর দিকে তাকালো।

খবরের কাগজে এ-সব বিজ্ঞাপনের ঘটা আমাদের কিছু কিছু জানিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে নর্তকী নাচতে নাচতে তার পোশাক খুলতে আরম্ভ করেছে। নীচের দিকে, এম· জি·'র অফিস চেম্বারের সেই গাছের পাতার ছবিটি ক্রমে ভেসে উঠতে লাগলো। আমার আশেপাশে দর্শকদের উদ্বেল ব্যাকুলতা, অথবা উত্তেজনা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। নর্তকীকে ঘিরে আলোর পরিধি ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। এক সময়ে বক্ষাবরণের সবটুকু খুলে নেবার চকিত মুহূর্তেই, তার নগ্ন পীনবক্ষ দেখা গেল। তারপরেই গাঢ় অন্ধকার। এক পলকের স্তব্ধতা। হঠাৎ হাততালির ঝড়। এমন কি শিস পর্যন্ত বেজে উঠলো। আলো জ্বললো। নর্তকী তখন হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে। একটি ঝলকের ছবির স্মৃতিতে দর্শকরা তখনও আতুর।

আমার নতুন চোখে ঘটনাটা বিস্ময়কর এবং অনেকটা ভোজভাজির মতো। এম· জি· বললো, 'স্টিপট্রিজ। আর দেখবেন নাকি?'

স্থানকাল ভেদে সবই কেমন বদলে যায়। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান গরিব দেশে, রমণীর নগ্ন বক্ষ, প্রকৃতির মতোই সহজ সরল দৃশ্য। মাঠঘাটের কাজ থেকে ঘরকন্নায়, ভারতের গ্রাম গ্রামান্তরে জীবনযাপনের একটা স্বাভাবিক ছবি। গাভী যেমন তার বৎসকে দুগ্ধ পান করায়, এ দেশে কাজের মায়েরা তেমনি বুক খুলে ছেলের মুখে অমৃতের ভাণ্ডারটি গুঁজে দেয়। এমন অসভ্য কে আছে জানি না, আমাদের দেশের সে ছবিকে 'অসভ্য' বলবে। কিন্তু এম· জি·'র অফিস চেম্বার থেকে শুরু করে, কিছুক্ষণ আগে দেখা অলকা হালদার, বা এই হোটেলের এই মুহূর্তে ঝটিতি নগ্ন বক্ষ দর্শানো, আর সেই সঙ্গেই আমাদের নাগর সভ্যতার কাছে এ এক দুরপেনয় লজ্জা, লোভ, আর যৌনতা ছাড়া কিছু না। আমার ক্ষেত্রে, আমি নিজেও তো সেই ভদ্রলোকদের সগোত্র, অতএব মনোভাবের দিক থেকে রাতারাতি আমারই বা চরিত্র বদল হবে, কেমন করে। আমি নিজে যে-সমাজের মানুষ, আমার পারিবারিক জীবনের

শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা, এই হলের আমোদপ্রিয়দের থেকে আলাদা হবার কথা না।

কিন্তু মনে যে ঠেক লেগে যাচ্ছে। অপরাধবোধের থেকেও, ঘটনাটিকে হাস্যকর বেশী লাগছে। আধুনিক নাগর জীবনে এটা প্রমোদ নিশ্চয়ই। প্রমাদ আমার মনে। সুখের ঝংকারে উল্সে উঠতে পারলাম না। ইংরেজীতে স্টিপট্রিজ শব্দের সঠিক অর্থও আমার জানা নেই। এম· জি·-কে বললাম, 'অদ্ভুত বটে, কিন্তু পৌনঃপুনিকতা কি ভালো লাগবে? আমি তেমন উৎসাহবোধ করছি না।'

'জানতাম, এ-রকম কিছু বলবেন।' এম· জি· তার বীয়রের গেলাসে লম্বা চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরালো। প্যাকেট এগিয়ে দিল আমার দিকে, বললো, 'হয়তো খুবই খারাপ লাগছে, বলতে পারছেন না।'

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'আপনি যে-অর্থে খারাপ বলছেন, আমি বোধহয় সে-রকম কিছু ভাবছি না। এখানকার, বা আমাদের শহুরে চোখের কথা আলাদা। আমাদের উচ্চকোটি সমাজের মেয়েদের আমরা অবিশ্যিই নানা পোশাকে সাজিয়েছি, সেটা নকল করেছি অন্যদের। তার ভালো মন্দের বিচারে যেতে চাই নে। কিন্তু সত্যি কি মেয়েদের খোলা বুক দেখবার জন্য এতো বিরাট আয়োজনের দরকার আছে?'

'তা কেন, স্ত্রীর শরীর তো—।'

আমি এম· জি·-কে বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, 'আমাদের সমাজে দাম্পত্য জীবনের কথা টেনে আনাও অর্থহীন। রমণীর বুক নিয়ে ভারতবর্ষ কোনো-কালেই পশ্চিমীদের মতো চিন্তা করে নি।'

'কিন্তু দেখছেন তো, মেমসাহেবের বুক দেখবার জন্য দিশী সাহেববাবুদের ব্যাকুলতা?' এম· জি· হেসে উঠলো।

এম জি'র নিজের মনোভাবটা কি, সেটা জানতে ইচ্ছা করলেও, কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। কিন্তু এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে, আমাদের ধ্যান-ধারণার সংকট কোথায় পৌঁছুচ্ছে, সেটা ভাবলে, এক রকমের উদ্বেগ বিমর্ষতায় মন ভরে যায়। নগ্নতার ব্যাখ্যা কি দেশে দেশান্তরে ভিন্ন না? অথচ, আমাদের নাগর সমাজের ভোগী যোগী বিদগ্ধরা প্রায় এক তালেই পা মিলিয়ে চলেছেন।

এম· জি· মুখে শব্দ করে, হাত তুলে স্টুয়ার্ডকে ডাকলো। বিল চাইলো। স্টুয়ার্ড অবাক চোখে তাকিয়ে ইংরেজিতে বললো, 'সেকি, এখনই চলে যাবেন? আরও অনেক সুপার প্রোগ্রাম বাকী আছে।'

'জানি।' এম· জি· শান্ত স্বরে বললো, 'আজ আমার একটু কাজ আছে, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এখানকার সুপার প্রোগ্রাম তো আমার জানা দেখা বুই-ই আছে। আজ আমি ব্যস্ত।' সে পকেট থেকে পার্স বের করলো।

স্টুয়ার্ড বললো, 'এ বিল পেমেণ্টের জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

এর পরে যেদিন আসবেন, সেদিন দিলেও চলবে। আজ আপনি ব্যস্ত আছেন।'

'থ্যাংক্যু ব্রাদার।' এম· জি· আমার গেলাসের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনার দেখছি এখনও বীয়র পড়ে আছে। শেষ করুন।'

বললাম, 'সময় লাগবে, একটু সময় দিন।'

'তা হলে রেখে দিন, আর খেতে হবে না।' এম· জি· নিজেই আমার গেলাসটা সরিয়ে দিল, 'চলুন, এখান থেকে বেরোনো যাক। আপনার তো নেশা করার কোনো ব্যাপার নেই। মোগলের হাতে পড়ে বিপদে পড়েছেন।' হেসে উঠলো সে।

আমিও সত্যি নিষ্কৃতি পেলাম। কিন্তু অর্থের অপচয়টা গায়ে লাগছে। বললাম, 'কিন্তু এভাবে নষ্ট করাটা—।'

'নষ্ট ?' এম· জি· আমার হাত টেনে ধরলো। 'ও-রকম একটু আধটু নষ্ট রোজই হয়ে থাকে। কে আর রোজ রোজ গেলাস চেটে-পুটে শেষ করছে। চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

আমাকে উঠতেই হলো। এম· জি-কে মনে হচ্ছে, তার যেন বিশেষ কোনো তাড়া আছে। অথচ তার কথায় বা চলাফেরায় তেমন কোনো ব্যস্ততা প্রকাশ পাচ্ছে না। আশপাশ থেকে দু'একটা মহিলা পুরুষের গলা শোনা গেল, 'এম· জি·, কোথায় চললে ?'

'আসছি।' সে হাত তুলে হেসে বললো, এগিয়ে চললো সারি সারি টেবিলের পাশ দিয়ে।

জিজ্ঞেস না করলেও, আমার অনুমান হলো, এম· জি·'র কোনো কাজের তাড়া আছে। অথবা বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি তার সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। এবং একটু অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, তার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের সামনেই, রাস্তার ধারে। এম· জি· গাড়ির দিকেই এগিয়ে গেল। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি পিছনের দরজা খুলে দিল। এম জি· আগে আমাকে ওঠবার জন্য হাত বাড়িয়ে ইশারা করলো। আমি বললাম, 'আমি কোনো ভাবে আমার ডেরায় চলে যাবো। আপনি বরং—।'

'আমি বরং—' এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'আপনি কি ভাবছেন, আপনাকে আমি এখনই ছেড়ে দিয়ে বাড়ি যাবো ? আমার বাড়ি ফেরার এখনও দেরি আছে। অবিশ্যি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই নে, বা সময় নষ্ট করতে চাই নে। আপনার কি এখনই ডেরায় ফেরা দরকার ?' সে তার নিজের ঘড়ি দেখে বললো, 'রাত্রি মাত্র সাড়ে আটটা।'

আমি বললাম, 'রাত্রি সাড়ে আটটা আমার কাছেও মোটেই বেশি রাত্রি নয়। ভেবেছিলাম, আপনার কোনো বিশেষ তাড়া আছে।'

'তা আছে।' এম· জি· এবার আমাকে গাড়ির ভিতর দিকে একটু ঠেলে

দিল, 'আমার সব সময়েই তাড়া। তবে কিসে যে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে, সেটাই বুঝে উঠতে পারি নে।' আমাকে গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে, নিজে ভিতরে বসে দরজা টেনে বন্ধ করে, ড্রাইভারকে বললো, 'লিণ্ডসে স্ট্রীট দিয়ে চলো।'

গাড়ি চললো। এম· জি· বললো, 'আপনি লোক কম দেখেন নি। আমাকেও একটু দেখুন না। না দেখলে ডিসিসন নেবেন কেমন করে, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে মিশবেন কীনা। আমি নিজেকে আপনার কাছে গোপন করতে চাই নে। আর কথাটা মিথ্যে বলিনি। জীবনের ছকটা ভেঙে আপনার সঙ্গে মিশতে চাই।'

'আমি তো কোনো বাধা দেখছি না।' হেসে বললাম।

এম· জি· বললো, 'এতো তাড়াতাড়ি কথাটা বলবেন না। কখন যে বাধা বোধ করবেন, আপনি নিজেও হয় তো জানেন না।'

'দেখা যাক।' আমি হেসে বললাম, 'সে-রকম যদি কিছু ঘটে, তবে আপনাকে বলবো।'

এম· জি·'র হাসি শোনা গেল, 'এটা বলবেন না। লেখা থেকে যদি সাহিত্যিকের চরিত্র বোঝা যায়, তবে কালকূটকে আমি চিনেছি। সে যখন কারোকে ছাড়ে, এমন অনায়াসে ছেড়ে যায়, কিছু বলার থাকে না। বলে কয়ে কোনোদিনই আপনি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবেন না। অবিশ্যি অফিসের কাজের কথা আলাদা। আমি আপনার সঙ্গ চেয়েছি অন্য দিক থেকে। আমি বোধহয় কথা একটু বেশি বলছি, কিন্তু মাতাল হইনি।'

'জানি।' বললাম, 'মাতাল দাঁতাল আমার দেখা আছে।'

গাড়িটা কখন কোন্ পথ দিয়ে দ্রুত চলছিল, খেয়াল করিনি। হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লো। এম· জি· দরজা খুলে আমাকে ডাকলো, 'আসুন।'

আমি নেমে রাস্তাটার দিকে তাকালাম। স্বীকার করতেই হবে, কলকাতার পথঘাট আমার সেই সময়ে নখ দর্পণে ছিল না। আমি পথচারীর আর যানবাহনের ভিড়ে রাস্তাটা সহসা চিনে উঠতে পারলাম না। দেখলাম, সামনেই একটি বন্ধ চওড়া গেট। তার সামনে টুলের ওপর বসেছিল উনিফর্ম পরা একজন দরজারক্ষী। এম· জি-কে দেখা মাত্র উঠে দাঁড়ালো, হেসে সেলাম ঠুকলো। এম· জি· মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিয়ে, ড্রাইভারকে বললো, 'তুমি অপেক্ষা করো।'

দরজারক্ষী দরজাটা খুলতেই বাদ্যের ঝংকার, গানের স্বর, নানা কণ্ঠের কলরব হঠাৎ বাইরে ভেসে এলো। বন্ধ দরজার ভিতরে এমন হই হট্টগোল চলছে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা বা শোনা যাচ্ছিল না। এম· জি· আমাকে ডাকলো 'আসুন।'

আমি এম· জি·-কে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকলাম। বড় হলঘর না হলেও,

একেবারে ছোট না। হয়তো ঘর ঠাণ্ডা করার যন্ত্র চলছে এবং মাথার ওপরে পাখাও ঘুরছে। তবু, ঢুকেই মনে হলো, ঘরটা কেবল গরম না, সিগারেটের ধোঁয়ায় যেন আচ্ছন্ন। টেবিলে টেবিলে, পুরুষের থেকে মেয়েদের ভিড়ই বেশি মনে হলো। কোনো মেয়ের অঙ্গেই শাড়ি নেই। যতোটা সম্ভব, সংক্ষিপ্ত বিদেশী পোশাকে সবাই রঙীন। এমন না যে, সবাই শ্বেতাঙ্গিনী। ধলা কালো ছাড়াও, মিশ্রিত রঙের, এবং মিশ্রিত চেহারার মেয়েরা টেবিলে টেবিলে ছড়ানো। ক্ষুদে চোখ, বোঁচা নাক, উঁচু কপোল পাহাড়ী মেয়েদের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই সঙ্গে সারা ভারতের মিলনও ঘটেছে।

পুরুষরা অবিশ্যিই আছে, এবং তাদের কেউ কেউ নিশ্চিত শ্বেতাঙ্গ। কালো এবং মিশ্রিত রঙের পুরুষও বিস্তর। ধুতি পাঞ্জাবি পরা পুরুষ আমি আর এম· জি· ছাড়া কেউ নেই। অন্ততঃ আমার চোখে পড়ছে না। টেবিলে পানীয়র আগ্রাসী তৃষ্ণা মেটানো, ধূমপান, আলিঙ্গন, আদর সবই চলছে। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকেই দেখা গেল, মাইকের সামনে একজন স্যুটেড বুটেড কালো পুরুষ, ইংরেজি ভাষায় গান করছে। ব্যাণ্ড পাইপ থেকে গীটার বাজিয়ে চলেছে বাদ্যকারেরা। আর তাদের সামনে, জোড়ায় জোড়ায় মেয়ে-পুরুষ জড়াজড়ি করে নেচে চলেছে।

হলের প্রায় মাঝামাঝি দেওয়াল ঘেঁষে বার কাউণ্টার। সেখানেও ভিড়। মদ, সিগারেট, নানা বিদেশী সুগন্ধির সঙ্গে। বিবিধ কসমেটিকের গন্ধে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এম জি আমার একটা হাত ধরেছিল। সে কয়েক পা এগোবার মুহূর্তেই বাধা পেলো। এক কৃষ্ণাঙ্গী, প্রায় হরিণীনয়না, ছিপছিপে অথচ স্বাস্থ্যবতী যুবতী ছুটে এসে এম জি·'র হাত টেনে ধরলো। ইংরেজীতে বলে উঠলো, 'আমি কেবলই দরজার দিকে দেখছি, তুমি কখন আসবে।' কথার ফাঁকে সে চকিতে একবার আমাকেও দেখে নিল।

এম· জি· শান্ত হেসে বললো, 'তাই বুঝি? টেবিল খালি আছে?'

'আমি তোমার জন্য টেবিল রেখে দিয়েছি।' কৃষ্ণাঙ্গী রূপসী বললো, 'অনেকেই আমার টেবিলে বসতে চাইছিল, আমি সবাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম।'

এম· জি· হেসে বললো, 'তা হলে তো আমার জন্য একলা একলা তোমাকে অনেক খরচ করতে হয়েছে।'

যুবতী বললো, 'মাত্র তিন পেগ হুইস্কি নিয়েছি, সেটা কোনো খরচই নয়। সেই হিসাবে তুমি আমাকে তিন হাজারেরও বেশি পেগ পান করিয়েছো।' যুবতী হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, আবার আমার দিকে তাকালো, আর ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকেই বললো, 'তিন হাজার পেগটা কথার কথা, আসলে মোহন আমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি মদ গিলিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই ওর বন্ধু?'

এম· জি· তাহলে এখানে মোহন নামে পরিচিত। সে কৃষ্ণাঙ্গী রূপসীকে

বললো, 'হ্যাঁ, আমার বন্ধু, এসব জায়গায় যাতায়াত নেই।' আমার দিকে ফিরে বাঙলায় বললো, 'আশা করি ভুল বলিনি। আপনি কি আগে এখানে এসেছেন?'

'না', আমি বললাম, 'এ ধরনের বার রেস্তোরাঁর ঠিকানা আমার আদৌ জানা নেই।'

এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে, একটু যেন উদ্বিগ্ন স্বরেই জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার মেজাজ খারাপ হচ্ছে না তো?'

'মেজাজ খারাপ হবে কেন?' আমি হেসে বললাম, 'নতুন নতুন জায়গা আর পরিবেশ দেখছি।'

এম· জি· আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'ঠিক আপনার মতোই কথা। এ জায়গার চেহারা আলাদা। মেয়ে পুরুষরাও আলাদা। পুরুষরা অধিকাংশই কলকাতা বন্দরের বিদেশী নাবিক। মেয়েদের যাদের দেখছেন—না বললেও বোধ হয় এদের পেশা কী, তা আপনি বুঝে নিতে পারবেন। অধিকাংশই গরিব ক্রীশ্চান মেয়ে, যারা মধ্য কলকাতার আশেপাশের অলিতে-গলিতে, এক রকমের বস্তিতেই বাস করে। এদের ইংরেজি বুলি শুনে, আপনি যেন অকস্‌ফোর্ড ডিকসিনারি কনসাল্টের কথা ভাববেন না।' সে হেসে কৃষ্ণাঙ্গী রূপসীর দিকে ফিরে বললো, 'চলো লিজা, তোমার টেবিলে যাই।'

'ওহ্‌ মোহন!' কৃষ্ণাঙ্গ রূপসীর রক্তরঞ্জনী ঠোঁটে অভিমান ফুটে উঠলো, 'আমি লিজা নই, এল্‌সা। তোমার লিজাও বোধহয় তোমার জন্যই বার কাউণ্টারের পাশে একটা টেবিলে একলা বসে আছে।'

অভিমান হবার কথা বটেই! নারী, সে যে-কোনো বর্ণ বা জাতি কুলোদ্ভবই হোক, সব কিছুর আগে সে নারী। এমন কি পেশায় সে দেহোপজীবিনী হলেও তার নারী চরিত্র বদলাতে পারে না। অতএব এল্‌সাকে লিজা বলে ভুল করলে, অভিমান হবেই।

এম· জি· এল্‌সার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'দুঃখিত এল্‌সা। চলো আমরা টেবিলে গিয়ে বসি।'

ইতিমধ্যে অন্যান্য টেবিল থেকে, পুরুষ সঙ্গীদের সঙ্গে বসেও, কোনো কোনো মেয়ে এম· জি·-কে হাত তুলে ডেকে শুভসন্ধ্যা জানাচ্ছিল। এম· জি. সবাইকেই মাথা ঝাঁকিয়ে, হেসে হেসে জবাব দিচ্ছিল। তার এক হাতে আমার হাত ধরা, অন্য হাত এল্‌সার দখলে। একটু ভিতর দিকে, ডান দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি খালি টেবিলের সামনে, আমাদের নিয়ে গেল এল্‌সা। এম· জি· বার কাউণ্টারের পাশে একটি টেবিলের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম, দেখলাম, হাত কাটা সংক্ষিপ্ত পোশাক, একটি ফরসা যুবতী বসে সিগারেট টানছে। দৃষ্টি তার এদিকেই। মুখের অভিব্যক্তি যদিও বড়ই উদাসীন। তার টেবিলের ওপরে রয়েছে একটি বীয়রের বোতল আর

গেলাস। ঠোঁটে চোখে মুখে নিশ্চয়ই তার রঙের প্রলেপ রয়েছে। ঢেউ খেলানো মাথার চুল ঘাড় অবধি ছাঁটা। আঁটো-খাটো ছোটর ওপরে তার চেহারা। মুখটি গোল। এম. জি. তাকাতেই, সে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকালো। হলোই বা শুঁড়িখানার গণিকা, চরিত্র তো একটাই।

এম. জি. গলা নামিয়ে বললো, 'এল্‌সা, লিজাকে এখানে ডাকা যাক। আমার বন্ধু রয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।' এল্‌সা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল, 'লিজার মতো আমার মনে হিংসে নেই।' সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'বস।'

এম. জি.-ও আমাকে বসতে বলে, বার কাউণ্টারের পাশের টেবিলে লিজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কী তাদের কথাবার্তা হচ্ছে, শোনা সম্ভব না। এমন কি কাছাকাছি নিজেদের মধ্যেও গলার স্বর কিছুটা না চড়িয়ে কথা বললে, শোনার উপায় নেই। গান বাজনা নাচ, হই হুল্লোড় হাসিহল্লা, তার মধ্যেই মাঝে মাঝে মাতালের উল্লসিত হাঁক, কান ঝালাপালা করে দেবার যোগাড়। এক ঘণ্টার মধ্যেই, তিন রকমের তিনটি প্রমোদভুবন দেখা হয়ে গেল। প্রথমটিকে বাদ দিলে, বাকী দু'জায়গাতেই দেখছি, সবাই মাতাল, উল্লাসে-বিলাসে মত্ত। এখানে কি কেউ স্বাভাবিক আছে? সুস্থতার কথাটা বোধহয় আলাদা। মাতালদের অনেকে অসুস্থ বলে। অসুস্থ কথাটা আমার মনঃপূত না। বোধহয়, অস্বাভাবিক বলাটাও যথার্থ না। মন গুণে ধন, একটা কথা আছে। সবাই এখানে আসার আগে, মনে একটা প্রস্তুতি নিয়েই আসে। দ্রব্যগুণের কথাটাও ভুললে চলে না। কিন্তু আমার চোখে সবটাই যেন এক প্রমোদ উল্লাসের খেলা। এখানকার মানব মানবী, সবাই যেন শিশুর মতো এক খেলায় মত্ত হয়ে আছে। নিশ্চয়ই এক সময় এ খেলা ভাঙবে। যেমন সব খেলারই একটা ইতি আছে। তখন সবাই হয় তো অবসাদে ভেঙে পড়বে।

অবিশ্যি জানি, কেবল শিশুর খেলা বললে ভুল হবে। এই মধুকরী সরাইখানা যারা খুলে রেখেছে, অথবা যে-মেয়েরা চারদিকে এখনও তীক্ষ্ণ চোখে শিকারের সন্ধান করছে, তার সবটাই খেলা না। কেউ লুটছে, কেউ জীবনধারণের দারুণ উদ্বেগে ভুগছে। তবু সারা হলঘরটির দিকে তাকিয়ে, আমার চোখে এ যেন ক্ষণিকের ছুটি পাওয়ার ছেলেখেলার মতো লাগছে। একেও যদি একটি সংসার বলতে হয়, তা হলে, এ সংসারের ছবি, চরিত্র, সবই আলাদা। অথবা বলতে হয়, সংসার জীবনের বাইরে, এ আর এক জীবন-লীলা।

'দেখ দেখ, তোমার বন্ধু লিজাকে কেমন জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসছে।' এল্‌সা আমার কনুইয়ে খোঁচা দিয়ে বললো।

দেখলাম, এম. জি. লিজাকে কোমরে হাতের বেষ্টনী দিয়ে ধরে নিয়ে আসছে। সেই সঙ্গেই একজন বেয়ারাকে নির্দেশ দিচ্ছে, লিজার বোতল গেলাস্

এল্‌সার টেবিলে পেঁছে দিতে। এম· জি·-কে আমি একটুও চিনতে পেরেছি, একথা কোন রকমেই বলা যায় না। কিন্তু অভিমানী লিজাকে আদর করে ধরে নিয়ে আসার ছবিটি আমার ভালো লাগছে। আর সেই সঙ্গেই মনে পড়ে যাচ্ছে, এম· জি· কে, কী করে, কলকাতার সমাজে কোথায় তার স্থান। এখন তাকে দেখে, তার সেই চরিত্রটা, অথবা ভূমিকাটা ভুলে যেতে হয়। এম· জি· কি বিবাহিত ? কথাটা আমার জানা নেই। জিজ্ঞেস করবার কোনো কারণ বা অবকাশও ঘটে নি।

এম· জি লিজাকে নিয়ে এসে, আমার পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিল। চেয়ার বলতে, এখানে ঝকঝকে গদী আঁটা চেয়ারের কোনো ব্যাপারই নেই। নিতান্তই ফোল্‌ডেড লোহার চেয়ার, তাও রঙচটা, হাতলবিহীন। কোনো কোনোটা নড়বড়ে। টেবিলও লোহারই, এবং তার ওপরে যে কাপড় পাতা আছে, তার অনেকগুলোই দেখছি নোংরা, বিবর্ণ, সিগারেটের পোড়া দাগে ভরা, অথবা ছেঁড়া। মেঝেয় কার্পেটের কল্পনাই করা যায় না। বেয়ারাদের উর্দির অবস্থাও সেই রকম।

এম· জি লিজার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, 'লিজা আমার বন্ধু শ্যাম।'

শ্যাম ! অবিশ্যি সে উচ্চারণটা করলো, ইংরেজি উচ্চারণে '[illegible]'-এর মতো। সে নিজে এখানে মোহন নামে পরিচিত। আমি হয়ে গেলাম শ্যাম। এ ঘটনা পঞ্চাশ দশকের শেষে। কিন্তু তখন জানতাম না, সত্তর দশকের গোড়ায় রাজধানী দিল্লীতে এক রমণী আমাকে এই নামেই ডাকবে। এল্‌সা প্রথমেই বললো, 'লিজা, আজ তোমাকে সত্যি সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'তোমাকে তার চেয়ে বেশি।' লিজাও হেসেই বললো।

এম· জি তার চেয়ার টেনে, লিজা ও এল্‌সার মাঝখানে বসলো। এখানে রমণীর সৌন্দর্যের বিবরণ দেওয়াটা একটা দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু কেন জানি না, কৃষ্ণাঙ্গী এল্‌সাকে আমার বেশি সুন্দরী লাগছিল। কৃষ্ণাঙ্গী অথচ রূপসী, কথাটা অনেকের দ্বন্দ্ব লাগতে পারে। কিন্তু ওর দীর্ঘ শরীরের ছিপছিপে অথচ উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, আয়ত কালো চোখ, অনেকটা সেই কৃষ্ণকলির কালো হরিণ চোখের মতো। শাড়ি পড়লে ওকে কেমন দেখাবে জানি না, আর কপালে যদি থাকতো একটি লাল টিপ। সেই হিসাবে লিজা অনেকটাই যেন মেমসাহেব। এম· জি· জানিয়ে দিল, এল্‌সা গোয়ার মেয়ে, লিজা কেরালার।

এম· জি· এখানে পরিচিত বটে, তবে কোনো বেয়ারা এসে দাঁড়ালো না। তারা সবাই যেন কারখানার শ্রমজীবীর মতো টেবিলে টেবিলে ছুটোছুটি করছে। আমার পিছনের টেবিলের এক সাহেবের ঘর্মাক্ত কাঁধ, প্রায়ই আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কোনো উপায় নেই। টেবিলগুলো গায়ে গায়ে লাগানো। এক টেবিলের লোকের সঙ্গে আর এক টেবিলের লোকের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি

ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানো সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে নাচ গান বাজনার সাময়িক বিরতি হয়েছে। এম· জি· হাত তুলে একজন ছুটন্ত বেয়ারাকে ডাকলো। সে হাত তুলে ইশারা করে আগে একটা টেবিলে ছুটে গেল। লিজার বীয়রের বোতল গেলাস এখনও এসে পেঁছায় নি। কিন্তু এম· জি'র মেজাজ একরকম। শান্ত এবং প্রসন্ন। টেবিলের ওপরে রাখা তার ডান হাতের ওপর লিজার একটি হাত। বাঁ হাত রেখেছে সে টেবিলের নীচে এলসার কোলের ওপর। আমাকে হেসে বললো, 'স্বর্গ থেকে নরকে এলেন বলে মনে হচ্ছে তো ?'

'তা মনে হচ্ছে না।' আমি বললাম, 'স্থান মাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। এ জায়গা দেখতে আলাদা, আসলে তো কার্যকারণ একই।'

এম জি বললো, 'একটুও ভুল বলেন নি। তবে এখানে লুকোচুরি চাপাচাপি নেই, সবটাই আবরণহীন খোলামেলা। জানেন নিশ্চয়ই, কলকাতার অনেক বারে মহিলাদের একলা প্রবেশের অনুমতি নেই। এখানে আছে।'

কথাটা আমার জানা ছিল না। অবাক হয়ে বললাম, 'তাই নাকি ? এরকম নিয়মের কারণ ?'

'তা হলে, অন্য বার রেস্তোরাঁগুলোর সঙ্গে, এর কোনো প্রভেদ থাকে না।' এম· জি· হেসে বললো, 'তা হলে সব জায়গায় গিয়ে, কলকাতা ঝেঁটিয়ে এরাই গিয়ে টেবিল দখল করে বসে থাকবে। আপনাকে গিয়ে এদেরই কারো সঙ্গে বসতে হবে। এখানে শরীরের ব্যবসাটাই আসল। অন্যগুলোকে আলাদা করে না রাখলে, পরিবার নিয়ে যারা আসে, তাদের পক্ষে অসুবিধে। তবে এদের মতো মেয়ে নিয়েও অনেক কাস্টমার যায়। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে গেলে, সাতখুন মাপ। আর এখানে, এরাই কাস্টমার হয়ে আগে টেবিলের দখল নিয়ে বসে থাকে। ট্যাঁকে সামান্য যা কিছু পয়সাকড়ি থাকে, তা দিয়ে কোনো ড্রিংকস অর্ডার করে। শুধু শুধু তো আর বসতে দেবে না। তারপরে পুরুষরা এসে, টেবিল বেছে—অর্থাৎ যে টেবিলের যে মেয়েটিকে পছন্দ, তার দিকেই এগিয়ে যায়। দেহের ব্যবসার প্রথাটা একটু আলাদা, এই আর কি !' বলতে বলতে এম· জি হেসে উঠলো, 'আমার লজ্জা করছে। এ সব কথা আদৌ কারোকে শেখাবার বিষয় হতে পারে না।'

'কেন পারে না ?' আমি বললাম, 'সত্যি, আমি এসব জানতাম না। অবিশ্যি, সেদিক থেকে বলতে গেলে, কলকাতার অনেক কিছুই আমি জানি না।'

এম জি বললো, 'স্বাভাবিক, প্রয়োজন না পড়লে, কে আর এসব জানতে পারে। এই যে দুটিকে দেখছেন, এরাও সেই রকমই বসেছিল। তফাৎ শুধু এরা একজনের জন্য বসেছিল। আমি না এলে, শেষ পর্যন্ত ওদের অন্য কোনো কাস্টমারকে বসাতেই হতো।'

তার কথা শেষ হবার আগেই, একজন বেয়ারা লিজার বীয়রের গেলাস

বোতল টেবিলে এনে রেখে, এম· জিকে বললো, 'মাপ কিজীয়েগা সাব, দের হো গয়া।'

'কোই বাত নহি।' এম· জি, বললো, 'তুমি তিন পেগ হুইস্কি লাগাও, আর এক বোতল বীয়র। হ্যাঁ, আর কিছু খাবার। দু প্লেট ফ্রায়েড হ্যাম অ্যান্ড লিভারস্ দাও।'

খাদ্যের নামটা আমার কাছে নতুন না। কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়ে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আপনি কি আমার জন্যও হুইস্কি বললেন নাকি ?'

'বললাম।' এম· জি· শান্ত হেসে বললো, 'অন্ততঃ সামনে নিয়ে বসুন, খাওয়াটা আপনার মরজি। তবে ভয় নেই, পড়ে থাকবে না কিছুই। এর পরেও অনেক পেগ আসবে।'

এল্‌সা হেসে বলে উঠলো, 'আমি বাংলা কথা বুঝে। মোহন বহুত কথা বলেছে, আমি সব বুঝেছে।' এই পর্যন্ত বলে ও ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি পান করো না ?'

'অভ্যাস নেই।' আমি হেসে জবাব দিলাম।

লিজা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'তোমার কী অভ্যাস আছ শ্যাম ? দেখি, আমিই সেটা মেটাতে পারি কীনা।'

এল্‌সা সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। আমি কালো মানুষ, লজ্জায় লাল হই না, হয় তো আরও খানিকটা কালোই হয়ে উঠি। লিজার কথার ইঙ্গিতটি না বোঝার কথা না। হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, আমার কোনো অভ্যাসেরই তেমন তীব্রতা নেই।'

এম· জি· আমার দিকে তাকিয়েছিল। চোখে তার উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা। বললো, 'আপনি এদের কথায় কিছু মনে করছেন না তো ?'

'মনে করবো কেন ?' আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'ও তো যথাসময়ে যথার্থ কথাটাই বলেছে। আমি উপভোগ করেছি।'

এম জি'র শান্ত চোখে এই প্রথম খুশি উপছানো ঝিলিক দেখতে পেলাম, সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বললো, 'আপনাদের ভাষায় একেই রসিক বলে কীনা জানি নে। অন্ততঃ মুক্ত মনের মানুষ বলতেই হবে। স্থানকাল পাত্রপাত্রী আপনাকে বিব্রত করতে পারে না।'

কথার মধ্যেই বেয়ারা ট্রে হাতে এসে পানীয় পরিবেশন করলো। দ্রুত হাতে, সোডার বোতল খুলে দিল। ইতিমধ্যে আবার বাজনা বেজে উঠলো। দেখলাম, বিভিন্ন টেবিল থেকে জোড়ায় জোড়ায় সব নাচের আসরে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক বিশালদেহী শ্বেতাঙ্গ নাবিক প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়লো আমাদের টেবিলে, এল্‌সার হাত ধরে টেনে বললো, 'আমার অনুরোধ, তোমার সঙ্গে নাচবো, এসো মধু।'

মধু অর্থে এ ক্ষেত্রে 'হানি'। এল্‌সা ত্রস্ত ব্যাকুলভাবে নিজের হাত টেনে,

নেবার চেষ্টা করে, এম জি'র দিকে তাকালো, নাবিককে বললো, 'আমি দুঃখিত, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে বসে আছি।'

'হেই দোস্ত', নাবিকটি এম. জি.'র কাঁধে তার বিশাল থাবা রেখে বললো, 'তোমার বান্ধবীকে নিয়ে আমি নাচতে চাই।'

এম জি হেসে বললো, 'নিশ্চয়ই।' এল্‌সার দিকে ফিরে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলো, 'যাও, নেচে এসো। শত হলেও এরা আমাদের বিদেশী অতিথি। তোমাকে নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে।'

'ভালো লেগেছে মানে?' এল্‌সা বললো, 'তুমি আসার আগে অন্ততঃ তিনবার এসে আমাকে টানাটানি করেছে।'

এম জি বললো, 'তোমার যাওয়া উচিত। আমি তো নাচতে পারি নে, তোমার নাচ দেখতে আমার ভালোই লাগে।'

এল্‌সা উঠে দাঁড়ালো। নাবিকটি বলতে গেলে এল্‌সাকে বগলদাবা করে নাচের আসরে ধরে নিয়ে গেল। নাচ শুরু হয়ে গেল। আমরা এল্‌সাকেই দেখছিলাম। ও দূর থেকে আমাদের দিকে হাত তুলে ইশারা করলো। নাবিকটি ঝটিতি ওর সেই হাতটি টেনে নিয়ে, ওকে বুকের মধ্যে আরও গভীর করে টেনে নিল। এম জি নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'বেচারি! যে ক'দিন কলকাতায় আছে, পাগলের মতো কাটাবে। তারপরেই আবার কতো দিনের জন্য সমুদ্রপাড়ি দেবে, কতোদিন বাদে আবার কোন্ বন্দরে গিয়ে ঠেকবে, কে জানে?'

লিজা বললো, 'আমার কাছেও কয়েকজন এসেছিল, আমি যাই নি।'

এম. জি লিজার কথার কোনো জবাব না দিয়ে, আমাকে বললো, 'এখানকার পরিবেশটা এমনিতে ভালোই। অবিশ্যি যদি এরকম হইচই আপনি পছন্দ করেন। কিন্তু মুশকিল হয়, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো, এখানে হঠাৎ মারামারি লেগে যায়। তখন চেহারা আলাদা। টেবিল চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু হয়ে যায়। বারের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। কে কোথায় পালাবে ঠিক থাকে না। তবে রক্ষে, বেশি একটা ঘটে না, কালে ভদ্রে।'

'সর্বনাশ!' আমি সত্যি উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

এম জি হেসে বললো, 'কেন আর, মেয়ে! মেয়ে নিয়েই যতো গণ্ডগোল। এই যেমন ধরুন, এখন যে সেলারটি এল্‌সাকে টেনে নিয়ে গেল, না গেলেই হয়তো একটা গোলমাল লেগে যেতো। অবিশ্যি লাগতোই, এমন কথা বলছি না, তবে লেগে যেতে পারতো, বিশেষ করে যদি লোকটি বেশি অবুঝ আর মাতাল হতো।'

'সে তো বড় বিপদের কথা!' আমি হেসে বললাম, 'কেউ তা হলে তার মনের মতো সঙ্গিনীকে নিয়ে, সঙ্গ উপভোগ করতে পারবে না?'

এম. জি বললো, 'নিশ্চয়ই পারবে। তার মানে এই না যে, এখানে

অরাজকতা চলে। সবাই একটা নিয়ম মেনে চলে। যে যার সঙ্গিনীকে নিয়েই থাকে। কিন্তু সকলের মনের কথা আপনি বলতে পারেন না। মেয়েরাও যে একেবারে সকলেই এ ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলে, তা বলা যায় না। রূপের দেমাক অনেকেরই আছে আর সে একজনের সঙ্গে চুক্তিবন্ধ হয়েও, অন্যকে চোখের টানে টানতে পারে। তবে, সাধারণতঃ দেখা যায়, কেউ কারোর সঙ্গিনীকে নিয়ে টানাটানি করলেই, গোলমাল লাগে। জোর জবরদস্তির ব্যাপার তেমন ঘটে না। তবে কিছু কিছু মেয়ে আছে, যারা এখানে মক্ষিরানী বলে পরিচিত, আর লক্ষ্য করলে দেখবেন, তারা অনেকের থেকে অনেক বেশি রূপসী, তারা সকলের নজর কাড়তে চায়, মানে সকলের পকেট কাটতে চায়।' বলতে বলতে সে হেসে উঠলো।

'এলসা এখন না গেলে কি সেই রকম কিছু ঘটতে পারতো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

এম জি বললো, 'সেটা নির্ভর করতো সেলারটির মেজাজের ওপর। শুনতে হয়তো আপনার খারাপ লাগতে পারে, তবে ঋতু বিশেষে আমাদের দেশের কুকুরদের দেখেছেন তো, একজনের দিকে নজর গেলে, সবাই গিয়ে সেখানে হাজির হয়, আর মারামারি শুরু করে দেয়। এখানেও সেরকম ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তবু বলছি, এরকমটা প্রায়ই ঘটে না। বিদেশী নাবিকরা এমনিতে শান্তিপ্রিয়, নিয়ম নীতি মেনেই চলতে চায়। তাদের একটা পার্টিকুলার সময় আছে, তারপরে তাদের জাহাজে ফিরে যেতেই হয়। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব ফুর্তি করে নিতে চায়। যদিও সবাই সে নিয়মকে মানে না, কাঁচকলাও দেখায়।' সে আবার হাসলো, 'তবে এ মানুষগুলোকে আমার ভালো লাগে। আসল সত্যি কথা হলো, মেয়েদের প্রভোকেশন। তারা যদি নিঃশব্দ ইশারায় গোলমাল বাধাবার চেষ্টা না করে, তা হলে বিশেষ কিছু ঘটে না।'

আমার মনে ইতিমধ্যে নতুন কৌতূহল দেখা দিয়েছে, জিজ্ঞেস করলাম, 'সব আনন্দ উৎসব প্রমোদবিলাস কি এখানেই শেষ? না, তারপরেও কিছু আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।' এম. জি তার গেলাসে চুমুক দিল, 'সব ব্যাপারটা তো এখানে মিটতে পারে না। জায়গার তো অভাব নেই। মেয়েরা নিজেদের ডেরায় কাস্টমারকে নিয়ে যায়। অথবা ধরুন, রিপন স্ট্রীট বা আশেপাশে এমন সব বাড়ি আছে, যেখানে ঘর পাবার অসুবিধে নেই। সেই হিসাবে বলতে পারেন, এসব জায়গা হলো যোগাযোগের জায়গা।'

এম জি. দেখছি, এখানকার সব ব্যাপারেই যথেষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অতঃপর, আমার মনে কতগুলো জিজ্ঞাসা অনিবার্যভাবেই জেগে ওঠে। এম জি'র কর্মক্ষেত্র থেকে, কলকাতায় যে সমাজে তার বিচরণ ক্ষেত্র, তার কোনো কিছুর

সঙ্গেই, তাকে আমি এ জায়গার সঙ্গে মেলাতে পারছি না। পাঁচ তারকা হোটেলের ওপন এয়ার বারে, অলকা হালদারের মতো মহিলার সঙ্গে তার আড্ডা আসর পানভোজনকে সহজ বলেই মনে হয়। এমন কি, তারপরে যে অভিজাত হোটেলে রূপসী বিদেশিনীর নগ্ন নৃত্য দেখতে গিয়েছিল, বিলাস বিকৃতি যাই বলি, তাও খুব একটা আশ্চর্যের মনে হয় না। কিন্তু এখানে? তুলনায় যে স্থানকে নিতান্ত হতভাগা শুঁড়িখানা, গণিকালয়েরই ভিন্ন এক সংস্করণ, এখানে সে কেন? এখানকার মেয়েদের সঙ্গে তার যথেষ্ট মেলামেশা আছে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। লিজা এল্‌সারা যে তার অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী, তাও স্পষ্ট। কলকাতার, এম জিকে স্বক্ষেত্রে কেবল স্বনামধন্য বলা হয় না, জীনিয়স বলা হয়। তার কাজের রুচি, অভিনবত্ব, দূরদর্শিতা, সব কিছুতেই তাকে গ্রেট বলা হয়। তার মতো লোক কেন এখানে? এইসব মেয়েদের সঙ্গে?

মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। তা সহজে প্রকাশ করা যায় না। বিস্মিত হতে হয়, অস্বস্তি লাগে। তবু কিছুই জিজ্ঞেস করা যায় না। আমিও জিজ্ঞেস করতে পারছি না। সে যে তার ছকের জীবনের কথা বলছিল, এই কি সেই ছক? এমন ছকের গণ্ডীতে সে বাঁধা পড়লোই বা কেমন করে? নারী সুরা বিলাসপ্রমোদ, এসব কিছুর প্রয়োজন তো সে সমাজের বুকে বসেই চালাতে পারে। কলকাতার ঐশ্বর্যবিলাসের অন্য সমাজের কথা তো কিছু কিছু জানি। সেখানেও ব্যভিচার চলে। সেই ব্যভিচারের আর এক নাম আলোকপ্রাপ্ত উচ্চ সমাজের সামাজিক মেলামেশা। নগর সভ্যতার ওটাও একটা অঙ্গ। ইংরেজিতে বোধহয় সেটাকে নিজেদের সুবিধার্থেই 'পারমিসিভ সমাজ' বলা হয়েছে। সেখানে সবই মঞ্জুর। কোনো কিছুতেই বাধা নেই। এম ·জি'র মতো ব্যক্তিকে সেখানে বেমানান লাগবার কথা না। এখানেই মেলাতে পরেছি না।

অবিশ্যি এইসব চিন্তার দ্বারা আমার কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততার কথা বলছি না। সে ধরনের কোনো শুচিবায়ু আমার নেই। আমি আগেই বলেছি, এখানে এই পরিবেশে, সব মেয়ে পুরুষই আমার চোখে যেন এক ধর-ণের খেলায় মত্ত শিশু। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছে, এ শিশুরা বড় হতভাগ্য। তবু এই নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, আমি উপভোগ করছি, যার মধ্যে কোনো অবিমিশ্র আনন্দ নেই। এদের মধ্যে থেকেও, আমি যেন দূরে দাঁড়িয়ে, অন্য এক জগতের মানব-মানবীদের লীলা দেখছি। এ অভিজ্ঞতা সুখের না, দুঃখেরও না। অথচ একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া যেন মনের কোথায় ছায়া ঢাকা দিয়ে রাখছে। কিন্তু উন্নাসিকতা, ঘৃণা, শুচিবায়ুগ্রস্ততা, কিছুই আমাকে স্পর্শ করছে না। এখানে এসে মনে হচ্ছে, জীবনকে যেমন করে হোক, ভোগ করে নেবার বড় তাড়া। যা পারো ভোগ কর, দুদিন বৈ তো নয়।

'অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন দেখছি।' এম জি. বললো, 'নাকি নাচ দেখছেন ?'

আমি নাচের আসরের দিকেই তাকিয়েছিলাম। চোখের সামনে উন্মত্ত উল্লাস নাচের তরঙ্গ, চিন্তার স্রোত চলেছে অন্য খাতে। বললাম, 'নাচই দেখছি।'

'এল্‌সা দেখবার মতোই নাচে বটে।' এম জি· বললো, 'দেখছেন তো, সেলার সঙ্গীটি সরে দাঁড়িয়েছে, এল্‌সার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। আর ও এখন একাই নাচছে, বাকীরা সবাই ওকে ঘিরে হাততালি দিচ্ছে।'

চিন্তা আর চোখের অসঙ্গতিটা এখানেই, আমি খেয়ালই করি নি, এল্‌সা একলা নাচছে, বাকীরা সবাই ওকে ঘিরে হাততালি দিচ্ছে। এল্‌সার হাতে একটি রঙীন রেশমী রুমাল। সে কখনো রুমালটা এক হাতে মাথার ওপর ঘুরিয়ে, নিজের সারা গায়ে সাপের মতো ঘুরিয়ে দিচ্ছে। কখনো দু'হাতে রুমালটি ধরে, অনায়াসেই মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় পেছনের নিতম্বের কাছে, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে সামনে, বুক থেকে, নীচু হয়ে উরতের ওপরে। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন। যেন ওর কাঁধের হাড় নেই। সেই সঙ্গে, পায়ের বিচিত্র তালের ছন্দ। চোখে মুখে হাসির ঝিলিক ও ইশারা। অবিশ্যিই, তার নাচে ও চোখমুখের ভঙ্গীতে যৌনতার অভিব্যক্তি স্পষ্ট। তথাপি বলতে হবে, সে নাচছে নিজের আনন্দে, গভীর মনযোগের সঙ্গে, যাকে বলে মেতে যাওয়া, এবং মাতিয়ে তোলা সবাইকে।

'এটা একটা জিপ্‌সি নাচের ছন্দ।' এম· জি· বললো, 'এলিয়ট রোডের এঁদো গলির মেয়ে, সামান্য গণিকা ছাড়া কিছুই নয়। অথচ এ মেয়ে কলকাতার বড় হোটেলে নাচবার সুযোগ পায় না। পেলে, অনেক মিস সুইস ফ্রেঞ্চ নরওয়েকে হার মানিয়ে দিতে পারতো।'

এল্‌সার নাচ দেখতে আমারও ভালো লাগছিল। ভালো লাগছিল ওকে ঘিরে পুরুষদের শরীর দুলিয়ে হাততালি, উল্লাসের ধ্বনি, শিস্ দিয়ে ওঠা। অনেক মেয়েদের চোখে ঈর্ষা, কারো বা ঠোঁট বাঁকানো বিদ্রূপে। যদিও সকলে না। অনেক মেয়েও এল্‌সার নাচে তালে তালে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু একটা কথা আমার কানে ঠিকই লেগে গিয়েছে, 'এলিয়ট রোডের এঁদো গলির মেয়ে—।'

তার মানে, এম· জি· এল্‌সার ঘরের ঠিকানাও জানে। গমনাগমনও আছে কি ? বোধ হয়। লিজা হাসতে হাসতে বলে উঠলো, 'এল্‌সা আজ গোটা আসরটা কব্জা করে নিয়েছে।'

আমি লিজার দিকে তাকালাম। সে এম· জি'র গায়ে গা ঠেকিয়ে, চেয়ারের পিছন দিয়ে প্রায় গলা জড়িয়ে ধরে আছে। হাসিটি তেমন প্রাণখোলা না। বরং এম· জি'র দৃষ্টিকে তার নিজের দিকে ফিরিয়ে নেবারই চেষ্টা। আবার বললো, 'তোমার কাছে তো এল্‌সার এ নাচ নতুন নয়, এতো দেখছো কি ?'

'ওর নাচ দেখতে আমার বরাবরই ভালো লাগে।' এম. জি. হেসে কথাটা বললো, এবং লিজার গালে একবার নিজের গালটি ঘষে দিল, তোমার নাচও আমি ভালবাসি লিজা।'

আমি নাচের আসরের দিকে চোখ রাখলেও, লিজার কথা শুনতে পেলাম, 'তবু তুমি আমার থেকে এলসাকেই পছন্দ কর বেশি, আমি জানি। গত সপ্তাহেও তুমি এলসার ঘরে গেছলে।'

'কে বললো তোমাকে?' এম. জি. হাসলো, ঘরে মোটেই যাই নি। পেঁাছে দিয়েছিলাম। গত সপ্তাতে তো তোমার ঘরে রোজই অতিথিদের ভিড় ছিল।'

লিজা যেন আদুরে স্বরে বললো, 'সে কথাটাই বা তুমি জানলে কী করে? নিশ্চয়ই এখানকার বেয়ারা সামাদ বলেছে? গত সপ্তাহে তো তুমি এখানে মাত্র দু'দিন এসেছিলে।'

'সে খবরটাও যদি তুমি রাখতে পারো, তবে আমি তোমার খবরটা পাবো না কেন?' এম. জি. শান্ত হেসে জবাব দিল।

লিজা জিজ্ঞেস করলো, 'আজ তুমি কোথায় যাচ্ছো?'

'আমার এই বন্ধুকে নিয়ে এক জায়গায় যাবো।' এম. জি. নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়ে কথাটা বললো, 'তুমি তো ভালোই জানো, আমি এক জায়গায় একজনের কাছে বেশি দিন যাতায়াত করতে পারি নে।'

লিজা বললো, 'তা জানি। কিন্তু তোমাকে গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে বলেছিলাম, আমার খুব টানাটানি যাচ্ছে দু' মাসের ঘরভাড়া জমে গেছে। বাড়িউলী বুড়ীটা খুব জ্বালাতন করছে।'

জবাবে আমি কোনো কথা শুনতে পেলাম না। কিন্তু খস্‌খস্‌ শব্দে বুঝলাম, এম. জি. তার পার্স খুলে লিজাকে টাকা দিল। লিজার উচ্ছ্বসিত খুশির স্বর শুনলাম, 'প্রিয়তম, ধন্যবাদ।' তারপেরই আলগা চুম্বনের একটি শব্দ।

এ সবই আমাকে বিস্মিত করছে। কলকাতার লোক কি এম জি.'র জীবনের এদিকটার কথা জানে? না জানার কোনো কারণও নেই। ঘটনা তো গোপনে ঘটছে না। এমনও হয় তো বলা যাবে না, এম. জি.'র চেনা লোক কেউ এখানে আসে না। অবিশি জোর দিয়ে বলা না। নিশ্চয়ই সুহাস দাশগুপ্তের মতো লোক এ রকম গণিকাদের ভিড়ে ভারাক্রান্ত শুঁড়িখানায় আসে না।

ওদিকে নাচ শেষ হলো। একসঙ্গে সবাই এলসাকে ঘিরে ধরলো। হাতে হাতে বীয়রের বোতল, হুইস্কি বা অন্যান্য পানীয়র গেলাস এগিয়ে দিল সবাই। এলসার পক্ষে এতো পান করা সম্ভব না। কিন্তু প্রায় সকলের বোতলে গেলাসেই সে একবার ঠোঁট ছোঁয়ালো। কেউ কেউ তাকে নিয়ে

টানাটানি শুরু করলো। এল্‌সা ভিড় ঠেলে এগোবার চেষ্টা করলো। যে নাবিকটি তাকে আমাদের টেবিল থেকে নিয়ে গিয়েছিল, সে এল্‌সাকে আগের মতোই বগলদাবা করে, সকলের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এলো। এম. জি'র ঘাড়ে জবর একটি চাপড় মেরে বললো, 'ওহে ভাগ্যবান কুকুর, তোমার রত্ন তোমাকেই ফিরিয়ে দিতে এসেছি।'

ইংরেজিতে 'ইউ লাকি ডগ' কথাটা তেমন বেখাপ্পা শোনায় না। বিশেষ করে এই পরিবেশে, বিদেশী নাবিকের মুখে। এম. জি-ও হেসে জবাব দিল, 'এখানে কোনো কুকুরীই কারোর সম্পত্তি নয়। তুমিও একজন ভাগ্যবান কুকুর হতে পারো। অবিশ্যি যদি এল্‌সা রাজী থাকে।'

এল্‌সা ইতিমধ্যেই টেবিল থেকে ওর হুইস্কির গেলাস তুলে, এক চুমুকে সব শেষ করে দিল, বললো, 'অসম্ভব, আমি আর নাচতে পারবো না।'

নাবিক বললো, 'নাচতে বলছি না, তুমি আমার সঙ্গে থাকলেই আমি হাতে চাঁদ পেয়ে যাই।'

এল্‌সা এম. জি'র দিকে তাকালো. বললো, 'তুমি কি আজ আমাকে ভাগাতে চাইছো নাকি?'

'মোটেই না।' এম. জি. হেসে বললো, 'তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে, ওকে খুশি করতে আপত্তি কী?'

এল্‌সা তবু এম. জি'র পাশে নিজের চেয়ারে বসে, সাহেবকে বললো, 'তুমি তোমার জায়গায় যাও, আমি পরে তোমার কাছে যাচ্ছি।'

বিদেশী নাবিক খুশি হয়ে এল্‌সা এবং এম জি. দুজনের কাঁধেই চাপড় মেরে চলে যেতে যেতে বললো, 'তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ।'

বেয়ারা আবার এসে পানীয় এবং খাদ্য পরিবেশন করলো। এম. জি. আমাকে বললো, 'সেকি মশাই, আপনি যে গেলাসে একেবারে হাতই লাগান নি? অন্ততঃ একটা চুমুক দিন।'

'না দিলেই ভালো হয়।' আমি কুণ্ঠিত হেসে বললাম।

এম. জি বললো, 'আগেই বলেছি, জোর করবো না। কিন্তু খাবারে একটু হাত লাগান।'

লিজা কাঁটা চামচে হ্যাম অ্যান্ড লিভারের টুকরো বিঁধিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, তুমি নাও, আমি নিচ্ছি।' আমি আর একটা কাঁটা চামচ তুলে নিলাম।

এল্‌সা কাঁটা চামচে খাবার তুলে, ইতিমধ্যে মুখে পুরে দিয়েছে, এবং তার মধ্যেই অস্পষ্ট স্বরে এম. জি-কে কিছু বলছিল। এম. জি. বললো, 'হ্যাঁ, তাই হবে। আমি আর এক পাত্র শেষ করেই উঠবো। তুমি বই হুইস্কিটা শেষ করে, ওর কাছে চলে যাও।'

এল্‌সা খুব দ্রুত আবার এক পেগ হুইস্কি সোডা মিশিয়ে শেষ করে দিল।

মুখে খাবার পুরে, উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে ?'

'হবে এক সময়ে কখনো নিশ্চয়।' আমি হেসে জবাব দিলাম।

এল্‌সা লিজাকে হাত তুলে, চোখের ইশারা করলো। ঝটিতি এম· জি'র গালে একবার গাল ঘষে চলে গেল। এম· জি· মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো, এবং বেয়ারাকে হাত তুলে ডাকলো। খাবারের স্বাদটি আমার ভালোই লাগছে। বেয়ারা আসতে এম· জি· বললো, 'আর দুরাউণ্ড হুইস্কি লাগাও, বিল নিয়ে এসো।'

বেয়ারা দৌড়ে চলে গেল। আমি অবাক চোখে এম· জি'র দিকে তাকালাম, ইতিপূর্বে দু'জায়গায় বীয়র দিয়ে ভিত্ রচনা ভালোই হয়েছে। নিজের এবং আমার হুইস্কির গেলাস শেষ। আবার হুইস্কির অর্ডার ? এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে, তার সেই শান্ত ঢুলঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসলো, বললো, 'ভয় নেই, আমি মাতাল হচ্ছি না। মাতাল আমি হই না, তা নয়। মদ খেয়েও যারা মাতাল হয় না, আমি সেই দলে পড়ি নে। তবে, সে-রকম মাতাল আমি হই নে, যারা অন্যের বিরক্তি ঘটায়।'

মদ, খাদ্য, আরও কোনো বিষয় কে কতোটা ভোগ করতে পারে, সেটা বিশেষ ব্যক্তির ওপরে নির্ভরশীল। সেটা বাইরের চেহারা দেখে বোঝা যায় না। এম· জি· তো এ বিষয়ে আমার কাছে সদ্য নতুন। আমি তার কিছুই জানি না। অফিস থেকে ডেকে তুলে এনেছে। তার সব কিছুই আমার কাছে নতুন। কেন এনেছে, তাও জানি না। যদি অন্তরঙ্গ হবার কারণে হয়, তা হলে, তার জীবনযাপনের এ ছবি না দেখলেও, অন্তরঙ্গ হবার অসুবিধা কিছু হতো না। হেসে বললাম, 'আপনার অবস্থা আপনিই ভালো বোঝেন।'

'হয় তো না।' এম· জি· বললো, 'তবে এ ব্যাপারে অনেকটা বুঝি।'

লিজা এম· জি-কে এখন প্রায় দু'হাতে আলিঙ্গন করে বসে আছে। স্থান-কাল ও পাত্র-পাত্রী ভেদে অনেক কিছুই দৃষ্টিকটু লাগে না। অনেক টেবিলেই এ দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। তার চেয়েও কিছুটা বাড়াবাড়ি। অতএব নিজের আচরণকে বাড়াবাড়ি বলা চলে না। এম· জি'র সহজ নির্বিকারত্ব আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। সেটা আমারই মনের দোষ। কেন না, আমার ক্ষেত্রেও, মন গুণে ধন। আমি প্রথম থেকেই তাকে এ পরিবেশে, পরিস্থিতিতে, এরকম আচরণে মেনে নিতে পারছিলাম না। কারণ, প্রথমাবধিই তাকে আমি এ-সবের সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না। অথচ প্রথম দিন দেখেই, একটা মানুষের কোনো সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব না। অথবা কে বলতে পারে, এম· জি'র কাজের সঙ্গে এই জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তো একটি অনিবার্য বিষয়। আপাততঃ এ দ্বন্দ্ব আমার মেটবার না।

বেয়ারা আবার দু পাত্র হুইস্কি এবং সোডার বোতল নিয়ে এলো।

সোডার বোতল খুলে দিয়ে, সে তার কুর্তার পকেট থেকে বিল বের করে এম· জি·'র দিকে এগিয়ে দিল। এম· জি· বিলটি দেখে, পকেট থেকে পার্স বের করে, একটি একশো টাকার নোট বের করে দিল। বেয়ারা বিল আর নোট নিয়ে দ্রুত চলে গেল। লিজা হুইস্কির গেলাসে সোডা ঢেলে দিল। এম· জি· গেলাস তুলে চুমুক দিল। লিজা বললো, 'এতো তাড়া কিসের?'

'আমাকে এবার উঠতে হবে।' এম· জি· শান্তভাবে বললো।

লিজা চোখ ঘুরিয়ে হেসে, এম· জি·'র মুখের কাছে মুখ এনে, নীচু স্বরে বললো, 'নিশ্চয়ই অন্য কোথাও যাবার তাড়া আছে?'

এম· জি· জবাব না দিয়ে হেসে গেলাসে চুমুক দিল। লিজা আবার বললো, 'তুমি আমার ঘরেও আসতে পারো।'

'আর একদিন যাবো।' এম· জি· সিগারেটের প্যাকেটের মুখ খুলে, আগে লিজার দিকে এগিয়ে দিল।

লিজা একটি সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে গুঁজলো। এম· জি· আমার দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিল। আমি সিগারেট নিলাম। তারপরে সে নিজে একটি সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো। আমার আর নিজেরটা ধরিয়ে, লিজার দিকে জ্বলন্ত কাঠি এগিয়ে দিতে, সে ফুঁ দিয়ে কাঠিটা নিভিয়ে দিল। দেশলাইটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, 'আমি তৃতীয় হতে চাই না।'

এম· জি· কোনো কথা না বলে গেলাসে দীর্ঘ চুমুক দিল। বেয়ারা এলো, বিল শোধ করা বাকী টাকা নিয়ে। এম· জি· বিল দেখে, টাকা গুনে, একটি দশ টাকার নোট বেয়ারাকে দিয়ে বাকী টাকা পকেটে গুঁজলো। টিপস্ হিসাবে দশ টাকা অনেক। বেয়ারা খুশি হয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে চলে গেল। বর্তমান সময়ে হলে, নিশ্চয়ই, এই পানীয় ও খাদ্যের হিসাব মিটিয়ে একশো টাকা থেকে বিশেষ কিছু ফেরত আসতো না। এম· জি· হাতের কব্জির ঘড়ি দেখে, আর এক দীর্ঘ চুমুকে গেলাস শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চলুন, ওঠা যাক।'

আমি তো এক পায়ে খাড়া ছিলাম। এম· জি'র কথা শুনে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালাম। এম. জি. দাঁড়িয়ে লিজার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে বললো, 'যে কোনো দিনই আবার দেখা হবে। আজকের মতো, শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি।' লিজা এম· জি'র একটি হাত টেনে, তার ওপরে ঠোঁট বুলিয়ে দিল, আমার দিকে ফিরে বললো, 'আশা করি আবার দেখা হবে?'

আমার হয়ে এম· জি· বললো, 'আশা করতে কোনো দোষ নেই।'

আমি বললাম, 'শুভরাত্রি।'

এম· জি বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালো। আমি অনুসরণ করলাম। দরজার কাছে পেঁছুবার আগেই, এলসা তার নাবিক বন্ধুর টেবিল থেকে

হাত তুলে, প্রায় চিৎকার করে বললো, 'মোহন, শুভরাত্রি।'

এম· জিও হাত তুলে বললো, 'উপভোগ কর। শুভরাত্রি।'

বাইরে এসে মনে হলো, একটা দম বন্ধ খাঁচার থেকে বেরিয়ে এলাম। এম জি· বাইরের গেটম্যানের হাতে টাকা গুঁজে দিল। টাকা আর সেলাম, দুটোই পরস্পরের পরিপূরক। এম· জি'র গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল সামনেই। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এবার গাড়িতে উঠবো। কিন্তু ব্যাপার ঘটলো অন্যরকম। দেখলাম, এম· জি· পকেট থেকে টাকা নিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে বললো, 'তুমি কাল সময়মতো বাড়ি চলে এসো। এখন গাড়ি গ্যারেজ করে দাও।'

ড্রাইভারও সেলাম ঠুকে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'গাড়ি ছেড়ে দিলেন, বাড়ি যাবেন কিসে?'

'চলুন একটা ট্যাকসিতে উঠি।' এম· জি· বললো এবং কাছেই বেশ কয়েকটি অপেক্ষমান ট্যাকসির একটির দিকে হাত তুলে ডাকলো। আমার দিকে ফিরে বললো, 'আপনি বোধ হয় ভাবছেন, ড্রাইভারের ওভারটাইম উঠছে বলে তাকে আমি ছেড়ে দিলাম?'

আমার মনে সে প্রশ্ন আদৌ জাগে নি। কারণ, আমার জীবনধারণের ক্ষেত্রে, এসব ভাববার কথা না। বললাম, 'না, সেরকম কিছু আমার মনে আসে নি।'

'ওভারটাইমের ব্যাপার হলে, ড্রাইভারকে আমি এখানে ঢোকবার সময়েই ছেড়ে দিতাম।' এম· জি· বললো, 'আসলে এখানে ঢোকবার সময় মনটা স্থির করতে পারি নি, এর পরে কী করবো। এখন স্থির করে ফেলেছি। এখন আর নিজের গাড়ি নয়, এবার ট্যাকসিতে যাবো।'

আমি ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বললাম, 'আমাকে পৌঁছুবার জন্য, আপনাকে ট্যাকসি নিতে হবে না। আমি ঠিক আমার আশ্রয়ে চলে যেতে পারবো।'

'তা তো নিশ্চয়ই পারবেন।' এম, জি· বললো, 'কিন্তু আপনাকে এখনই আমি ছাড়ছি নে। অন্ততঃ ছাড়তে চাইছি নে। এখন বেজেছে পৌনে দশটা। আপনার কি বিশেষ কোনো সময় ঠিক করা আছে, যার মধ্যে ফিরতেই হবে?'

বললাম, 'না, সেটা বললে মিথ্যে বলা হবে। কারণ আমার বন্ধু শুয়ে পড়লেও, তার কাজের লোকটি আমার জন্য খাবার নিয়ে বসে থাকে। দরজাও খুলে দিতে হয়। সেটা কোনো কথা নয়। কিন্তু এখন আপনি কোথায় যেতে চান?'

'চলুন একটু ঘুরে আসি।' এম· জি· শান্ত ভাবে হেসে বললেও, তার চোখ দুটো বেশ চকচক করছে। আবার বললো, 'আমি আপনার মনের অবস্থা

হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারছি। ভালো না লাগলে জোর করবো না। তবে আপনি আমার সঙ্গে থাকলে আমি খুশি হবো।' তার চোখে উৎসুক দৃষ্টি।

ইতিমধ্যে ট্যাকসিটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি না বলতে পারলাম না। দেখলাম, ট্যাকসি ড্রাইভার এম· জিকে কপালে হাত ঠেকিয়ে হাসলো, এবং পিছনে ঝুঁকে পড়ে পিছনের দরজা খুলে নিল। অর্থাৎ ট্যাকসি ড্রাইভার তার পরিচিত। এম· জি'র আচার আচরণ আমাকে অবাক করছিল। আমি তার সম্পর্কে কৌতুহল বোধ করছিলাম। সেটা মিথ্যা না। সে আমাকে হাত বাড়িয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য অনুরোধ করলো। আমি উঠে বসলাম। সে উঠে দরজা বন্ধ করে বললো, 'চলো।'

ড্রাইভারটি বাঙালী। কেবল জিজ্ঞেস করলো, 'সেখানে ?'

'হ্যাঁ।' এম· জি· জবাব দিল।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। রাস্তাটা এখন আগের তুলনায় ফাঁকা। আমি এখন চিনতে পারলাম, এটা ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। গাড়ি এগিয়ে চললো ধর্মতলার দিকে। ট্রাম রাস্তা পেরিয়ে, গাড়ি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে পড়ে, উত্তর দিকে ছুটলো। ড্রাইভারের কথা থেকে আগেই বুঝেছি, এম· জি'র গন্তব্য সে জানে।

'জীবনে আপনি অনেক রকম মানুষ দেখেছেন।' এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে দেখেও আপনার অবাক হবার কিছু নেই।'

আমি বললাম, 'ঠিক বললেন না। মানুষ তো অনেক রকমই দেখেছি, অবাকও হয়েছি। আপনাকে দেখেও আজ আমি অবাক হয়েছি।'

'সেটার কারণ বোধ হয়, আপনি এই বারে যা দেখলেন, তার সঙ্গে আমাকে মেলাতে পারছেন না বলে।' এম· জি. জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

আমি বললাম, 'ঠিক বলেছেন। যদিও আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি নে, তবু কোনো কোনো লোকের সম্পর্কে নানা কথা শুনে, তাদের একটা ইমেজ আমাদের মনে দাগ কাটে। এম জি'র সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, হয় তো তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ভাববার অবকাশ কম পেয়েছি। কিন্তু আজ যা দেখলাম, তার সঙ্গে মানুষটাকে সত্যি মেলাতে পারছি না।'

'রুচিহীন বিকৃত বলে মনে হচ্ছে ?' এম জি বললো।

আমি হেসে বললাম, 'এতো সহজে, কোনো মানুষের সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। আপাতদৃষ্টিতে আপনাকে দেখলে, কে কী ভাববে, জানি নে। রুচি বিষয়টা দু'একটি ক্ষেত্রের কিছু আচরণ দিয়ে বিচার করা

যায় না। বিকৃতির কথা তো আসেই না। তবে, মেলাতে পারি নি, এ কথা ঠিক।'

এম. জি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপরে বললো, 'আমি জানি, মেলানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনো মেলাতে পারবেন কিনা জানি নে, কারণ আমি নিজেই অনেক সময় মেলাতে পারি না।' কথা থামিয়ে সে একটু হাসলো, তারপর আবার বললো, 'কথাটা হয়তো একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তবু, আপনি ভালোই জানেন, মানুষ বাইরের জগতকে যতোই আবিষ্কার করুক, সে তার নিজের কাছে ততোটাই অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। আপনারা, সাহিত্যিকরাও বোধহয় আত্মআবিষ্কারের কথা চিন্তা করেন, আধুনিক সাহিত্যের সেটাও একটা লক্ষণ। আপনি সত্যিই আমাকে রুচিবিকৃত ভাবছেন কী না, জানি নে, বা পরে আমাকে যতোই দেখবেন, তখনও ভাববেন কী না, সেই সিদ্ধান্তটা পরে জানা যাবে। আসলে আমি আপনার চোখে আবিষ্কৃত হতে চাই।'

'খুব কঠিন ব্যাপার।' আমি হেসে বললাম, 'এরকম কোনো দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপাবেন না।'

এম· জি হেসে বললো, 'আপনাদের সাহিত্যিকদের যতোটুকু জানি, তাতে ধারণা করেছি, দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে হয় না। সাবকনসাস মাইণ্ডে, দায়িত্ববোধ আপনিই কাজ করতে আরম্ভ করে। অনঙ্গমোহন গাঙ্গুলি নামক একটি চরিত্রের সঙ্গে কিছুদিন মিশলে, আপনি নিজেই হয়তো তাকে এক সময়ে আবিষ্কার করবেন।'···

এম· জি'র কথা শেষ হবার আগেই গাড়ির গতি কমে এলো, ঢুকলো বাঁ দিকের একটা গলিতে। ডাইনে বাঁয়ে দু'একবার ঘুরে, একটি বাড়ির সামনে দাঁড়ালো। বাড়িটির দরজার ভিতরে ঢোকবার ফালি গলিতে কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিল একজন ধুতিপাঞ্জাবি পরা, গাট্টাগোট্টা জাঁদরেল একজোড়া গোঁফওয়ালা মাঝবয়সী পুরুষ। ট্যাকসির মধ্যে এম· জি-কে দেখেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে, দরজাটা খুলে ধরলো। বাড়ির ভিতরে ঢোকবার স্বল্প পরিসর ফালি গলিতে যেসব মেয়েরা দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রায় সকলেই ভিতরের আড়ালে অন্তর্ধান করলো।

ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলে একটা ইন্দ্রিয় আছে। আমার সে ইন্দ্রিয়টি মুহূর্তের মধ্যেই সজাগ হয়ে উঠলো। আশেপাশের পরিবেশ, কয়েকটি ফুলওয়ালা, দোকানপাট, আশেপাশের আরও কয়েকটি বাড়ি, নীচের দরজায় ও ওপরের ব্যালকনিতে নানা সাজে সজ্জিতা রমণীদের দেখেই, আমি স্থানটির সম্পর্কে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেলাম। কলকাতার বিখ্যাত বা কুখ্যাত পল্লীটিকে যার যা অভিরুচি সেই বিশেষণ দিতে পারে। সভ্য জগতের নিজস্ব সৃষ্ট এই

পল্লীকে সভ্য মানুষই নামকরণ করেছে, 'নিষিদ্ধ পল্লী'। সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য যাই হোক, এ অঞ্চলের পাশ দিয়ে গেলেও, এই বিশেষ পল্লীটিতে প্রবেশের কোনো কারণ বা অবকাশ কখনো ঘটে নি। আর এইসব পল্লীর চেহারাটা, সারা দেশেই কম বা বেশি, প্রায় একই রকমের। অতএব ষষ্ঠেন্দ্রিয় চকিত হয়ে ওঠা কোনো বিস্ময়ের না।

এম. জি আমাকে ডাকলো, 'আসুন।'

মধ্য কলকাতার গণিকাদের ভিড়ে, শুঁড়িখানায় ঢুকতে যে সংকোচবোধ তেমন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি, এখানে এসে সেই সংকোচ বোধটাই মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সংকোচটা আসলে সংস্কার। এবং স্বীকার করতেই হবে, এ সংস্কার জন্মগত। এম. জি. যে এখানে আসবে, এ চিন্তা আমার মনে একবারও আসে নি। আমি গাড়ির মধ্যে বসেই, কয়েক মুহূর্ত স্থির স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। দ্বিধা দ্বন্দ্ব আমার সমস্ত মন জুড়ে।

এম জি আবার বললো, 'আমি বুঝতে পারছি, আপনি খুবই অস্বস্তিবোধ করছেন। হয়তো কিছু চেনা লোকের সঙ্গেও আপনার দেখা হয়ে যেতে পারে, বা তারা আপনাকে দেখতে পারে। আপনার সুনামের পক্ষে সেটা খুবই ক্ষতিকারক হবার সম্ভাবনা, এটা বুঝেও এখানে নিয়ে এলাম। জীবনে তো আপনাকে অনেকে অনেক রকম ভুল বুঝেছে, আর একবার না হয় বুঝবে। তবে গাড়িতে বসে না থেকে, ভিতরে ঢুকে যাওয়াই ভালো।'

সুনাম দুর্নামটা ভাগ্য কী না জানি নে। তবে গাড়িতে বসে থেকে, রাস্তার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লাভ নেই। এম. জি. সম্পর্কে কিছু না জেনেই যখন তার সঙ্গে বেরিয়েছি, এখন আর দ্বিধা করে লাভ নেই। মনে গভীর অস্বস্তি নিয়ে নেমে এলাম। এম. জি ট্যাকসি ড্রাইভারকে কিছু বলতে গেল, তার আগেই সে বলে উঠলো, 'আপনি যান স্যার, আমি আছি।'

এম জি আমার একটি হাত ধরলো, দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বললো, 'আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে কোনো স্থানই নিষিদ্ধ বা অগম্য হতে পারে না। কোনো মানুষকেই আপনি অবহেলা করেন না, তা সে যে কোনো শ্রেণী বা পেশারই হোক। একদিক থেকে দেখতে গেলে, আপনি তো সর্বত্রগামী। কোনো মানুষকেই আপনি দূরে রাখতে পারেন না। পারেন কী?'

'এ সব কথা আপাততঃ থাক।' আমি হেসে বললাম। 'একটা কথা তো মনে রাখতেই হবে, আমি সমাজ-বহির্ভূত লোক নই, নিজেকে আমি দশজনের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারি না।'

এম জি আমাকে নিয়ে ডানদিকে ফিরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললো, 'আমরা কিন্তু ভাবি।'

'সেইজন্যই আমাদের নিয়ে মানুষের ভুল বোঝাবুঝি বেশি।' আমি বললাম।

আমরা দোতলায় উঠলেই, ভিতর বারান্দায়, আমাদের সামনে একটি মেয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। শরীরের ভঙ্গিতে একটি নাচের ছন্দে বাঁক নিল, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো চোখের কোণে। সাজগোজের কথা বাদ দিলেও, তাকে স্বাস্থ্যবতী বলতে হবে। মাজা মাজা রঙে কিছু রঙের প্রলেপ মুখে আছে। মাথার খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। ঠোঁটের কোণে হাসি। প্রথমেই বললো, 'নাগর কি আজ ভুল করে এ বাড়িতে?'

যুবতীর হাসি, চাহনি দাঁড়াবার ভঙ্গী ও বাচনে একটি বিশেষ চেহারাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কথার ফাঁকে, সে চকিতে একবার আমাকে দেখে নিল। এম জি হেসে বললো, 'তা কেন, গতকাল রাত্রেও তো এ বাড়িতেও এসেছিলাম।'

'ও মা! তাই বুঝি?' যুবতী মুখ ফিরিয়ে আশেপাশের অন্যান্য ঘরের দরজার দিকে একবার দেখে, একটু গলা তুলে বললো, 'ওলো, তোরা শোন শোন, আমার পীরিতের—(অশ্রাব্য) কথা শোন্, এ নাকি কাল এ বাড়িতে এসেছিল!'

যুবতীর নাটুকে ভঙ্গী ও স্বরের ডাকে, আশেপাশে দু'একটি মেয়ের হাসি-মুখ উঁকি দিল। এম জিও হাসলো। বললো, 'অন্য কোনো বাড়িতে গেছলাম নাকি? মনে করতে পারছি নাতো?'

এবার আর একটি মেয়ে এগিয়ে এলো, যার যৌবন উদ্ধত বা উদ্ধত করে তোলা হয়েছে, হাঁটার ভঙ্গীটি দ ষ্টিকটু। বললো, 'মালের ঘোরে কার ঘরে গেছলো? মনে মনে তোকেই ভেবেছিল, তাই ভুল করে ভাবছে, এ বাড়িতেই এসেছিল।'

আমি অস্বস্তিবোধ করছিলাম। এম জি বললো, 'তা এভাবে পথ আটকালে ঘরে যাবো কী করে? আগে ঘরে চলো, তারপরে কালকের ফয়সালা করা যাবে।'

অন্য একটি মেয়ে একটু দূর থেকে যে-কথাগুলো বললো, তা উচ্চারণের অযোগ্য। প্রথম যুবতী সরে দাঁড়িয়ে বললো, 'এসো, আগের কাজ আগে কর। তারপরে ঘরাঘরির ফয়সালা হবে।'

এম জি· আমার হাত ধরেই রেখেছিল। এগিয়ে গেল সামনের দিকে। থমকে দাঁড়ালো এক মুহূর্ত। কোনো ঘরে রেকর্ডে হিন্দী গান বাজছিল, সেইসঙ্গে বোধ হয় নাচও চলছিল। পুরুষের খুশি মাতাল গলার বাহবা ভেসে আসছে। এম· জি· ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে, তারপরে প্রথম যুবতীটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরতির ঘরে নাচ হচ্ছে বুঝি?'

'কেন, আজ কি বাবুর নাচ দেখার শখ নাকি?' প্রথম যুবতী চোখ ঘুরিয়ে, কোমরে কিঞ্চিৎ মোচড় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

এম· জি· বললো, 'না, জিজ্ঞেস করছি। ভাবছি, কার ঘরে বসবো?'

প্রথম যুবতীর ঠোঁট বেঁকে উঠলো, সেই সঙ্গে মুখেও যেন ছায়া নামলো, বললো, 'এখানে তো কেউ কারোর জন্য নাম লিখিয়ে বসে নেই, তুমিও কারোকে বাঁধা রাখো নি। যার ঘরে হোক, ঢুকে পড়লেই হলো।' বলতে বলতে সে পিছন ফিরে, কোমরে একটু অতিরিক্ত ঢেউ তুলে ডাইনে এগিয়ে গেল।

এম. জি. বললো, 'চলো, তোমার ঘরেই বসি। আরও দু'একজনকে চাই যে।' বলে এদিকে ওদিকে, কয়েকটি মেয়ের উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে, দুজনকে নাম ধরে বললো, 'রমা আর ডলি এসো। মালবিকা কোথায়? ঘরে লোক আছে নাকি?' বলে সে বাঁদিকে তাকালো।

বাঁ দিকের একটি ঘরের খোলা দরজার পর্দা সরিয়ে, অন্য এক যুবতী মুখ বাড়ালো, বললো, 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বলেও তো কোনোদিন ডাকেন নি। আজ যে হঠাৎ মালবিকাকে মনে পড়লো?'

'তোমার নামটা বড্ড বড়, আর শুনি, তুমিও হেঁজি পেঁজিদের তেমন আমল দাও না।' এম. জি. হেসে বললো, 'তাই ডাকতে সাহস পাই নে। আসবে নাকি একবার চুমকির ঘরে?'

মালবিকা যার নাম, সে এবার তার দরজার বাইরে এলো। দেখলাম, কেবল নামে না, শরীরেও সে সকলের থেকে কিঞ্চিৎ লম্বা, বড় চোখ, টিকলো নাক, ছিপছিপে চেহারায় সাজগোজ ভালোই করেছে। মাথার দু'পাশে বিনুনীতে জড়িয়ে নিয়েছে ফুলের মালা। মুখের হাসিটা মন্দ না। বললো 'মোহনবাবুর দয়া হলে আসতে পারি। তবে চুমকির হুকুম পেলে তো।'

'আমি দয়া করবো?' এম জি হাত জোড় করলো, 'আমিই সবার দয়ার পাত্র। চুমকি হুকুম দেবে কেন, তোমাকে নিজেই ডেকে নিয়ে আসবে।'

মালবিকা ইতিমধ্যে আমাকেও একবার দেখে নিয়েছিল। বললো, 'বসুন গিয়ে, আসছি।' বলে ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হলো।

মাইফেল না মহফিল বলে একটা কথা শুনেছি। তার চেহারা কেমন সঠিক জানি না। তবে যতোদূর জানি, গান, নারী, সুরা বোধহয় তার মিশ্রিত অঙ্গ। অনিবার্য অঙ্গ কী না, তার কোনো ধারণা নেই। এম জি. কি সেই রকম মাইফেল বসাতে যাচ্ছে নাকি? স্টিপট্রিজ থেকে কলকাতার নাবিক সঙ্গিনী—তথাকথিত বারোবিলাসিনীর আড্ডা সেরে, শেষ পর্যন্ত কলকাতার নামকরা নিষিদ্ধ পল্লীতে। এখানেও এক না, একাধিক রমণীকে ডাকাডাকি চলছে। আমি ঘটনার গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না।

এম জি. আমার হাত ধরে ডাইনের একেবারে শেষ প্রান্তের একটি ঘরের দরজায় নিয়ে গেল। খোলা দরজা, পর্দা গোটানো। বাইরে থেকেই দেখলাম, ঘরটি খুব ছোট না। এক পাশে ডবল বেড-এর খাটে, মোটা গদির বিছানা। বসবার জন্য কম দামী সোফা সেট, সেণ্টার টেবিল পর্যন্ত রয়েছে। দেওয়াল আলমারিতে নানা সামগ্রী ছাড়াও রয়েছে একটি কাঠের আলমারি, তার পাশে

রেডিওগ্রাম। রেডিওগ্রামের ওপরে, দেওয়ালে লক্ষ্মী নারায়ণের বাঁধানো ছবি। মাথার ওপরে সিলিং ফ্যানটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। চুমকি নামে ঘরের অধিবাসিনী ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, এম জি'র দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। এম. জি আমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

আমি পায়ের স্যাণ্ডেল খোলবার কথা ভাবছিলাম। এম জি বললো, 'দরকার নেই, স্যাণ্ডেল পরেই আসুন।'

'হঠাৎ মালবিকাকে ডাকলে যে?' চুমকির ভুরু কুঁচকে তাকাবার কারণ বোঝা গেল।

এম জি বললো, 'আহা, আগে বসি। নতুন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি, তাকে বসাও। তারপরে তো অন্য কথা।'

'ওদের টাকাপয়সা কী দিতে হবে, সে-সব তুমি কথা বলে নিও।' চুমকির স্বরে রুষ্টতা।

এম জি শান্তভাবেই হেসে বললো, 'নতুন কথা শুনছি। তোমার যদি ভালো না লাগে, তাহলে কি অন্য কোথাও যাবো?'

'আহা, আবার ন্যাকামি হচ্ছে!' মুহূর্তেই চুমকির ঠোঁটে চোখে হাসির চমক ঝিলিক দিল, একটা অশ্রাব্য উক্তি করে বললো, 'আজ কি বস্ত্রহরণ খেলা হবে নাকি?'

জানি না, আরতি কেমন করে চুমকি হয়ে যায়। বোধহয় চুমকি তার ডাক নাম, এম জি'র রাখা হতে পারে। তবে, এখন শরৎচন্দ্রের সেই নায়কটির মতো, আমারও বলতে ইচ্ছা করছে, এ কি হতভাগা জায়গায় নিয়ে এলে চুনীলাল?' তবে এক্ষেত্রে তার অবকাশ দেখছি না। আমি নায়ক না। নায়ক এম জি, এবং চুমকি যে-ভাবে অন্য মেয়েদের টাকার কথা বললো, শরৎবাবুর বেশ্যারা সেই তুলনায় অনেক ঘরোয়া। টাকার কথা সহজে তারা বলে না। তারা বড় উদার আর প্রেমকাতর।

এম জি আমাকে একটি বড় সোফা দেখিয়ে বসতে বললো, 'বসুন। চুমকিকে বললো, 'এখানে আবার বস্ত্রহরণ করতে হয় নাকি? এতো দিন জানতাম না তো?'

চুমকি শরীরে একটা ঢেউ দিয়ে, এম জি'র কাছে গিয়ে, তার গালে একটি ঠোনা মেরে বললো, 'না, তোমরা কি আর হরণ কর, আমরাই সব খুলে বসে আছি। তা বলো তো, খুলেই বসি।' বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

এ ঘরে বসে, কথাগুলো অশালীন বলা যায় কীনা, জানি না। পরিবেশ পাত্র-পাত্রীর একটা পরিচয় আছে। অন্যখানে যে-কথা অশালীন, এখানে হয় তো তা-ই নিতান্ত ঠাট্টা ইয়ার্কি। তবে, আমার পক্ষে অসুবিধা, সহজে হজম করতে পারছি না। এম জি তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বললো, 'না না, ওটি করতে যেও না। জগতলাল কোথায় গেল?'

'এই যে বাবু, আমি এসে গেছি।' এম. জি'র কথা শেষ হতে না হতেই দরজার কাছ থেকে জবাব এলো।

আমি মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, ধুতি পাঞ্জাবি পরা, গাট্টাগোট্টা, একজোড়া গোঁফওয়ালা সেই লোকটি যে ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়েছিল।

এম জি বললো, 'বাহ্, এসে গেছো জগতলাল?' বলে পকেট থেকে পার্স বের করে, বেশ কিছু টাকা নিয়ে বললো, 'কয়েক বোতল বীয়র আর বড় এক বোতল হুইস্কি নিয়ে এসো, আর কিছু খাবার। কী আনতে হবে, তুমি জানোই তো।'

'ওসব আপনাকে কিছু বলতে হবে না।' জগতলাল বললো, 'টাকা দিচ্ছেন কেন, পরে হিসাব করে দিলেই চলবে।'

'না না, তুমি নিয়েই যাও।' এম জি বললো, 'তারপরে আরও লাগলে দেবো।'

চুমকি কারোকে আর কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে, এম জি'র হাত থেকে টাকাগুলো প্রায় ছিনিয়ে নিল। জগতলালের দিকে ফিরে বললো, 'তুমি যাও, বাবু যা বলেছে, তাই নিয়ে এসো। তবে বড় এক বোতল হুইস্কিতে হবে না, আর একটা ছোট বোতলও এনো। মালবিকা তো আবার হুইস্কি ছাড়া কিছু খায় না।'

জগতলাল হাসতে হাসতে চলে গেল। এম জি-কে কী করে বোঝাবো, পরিবেশটি এবং চুমকির আচার আচরণ আমার ঠিক ধাতস্থ হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে একটু অবাক করে দিয়েই, চুমকি ছিনিয়ে নেওয়া টাকাগুলো আবার এম জি'র পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বললো, 'তোমাকে কতোদিন বারণ করেছি, জগতের হাতে ও-রকম বেহিসেবী টাকাপয়সা দেবে না। ও আমার চাকর, অন্য (কিছু আশ্রাব্য কথা) নয়।'

জীবনে আমার আদৌ কিছু দেখা নেই, এমন বলতে পারি না। কলকাতার থেকে আমি মফঃস্বলকে ভালো চিনি, তার চেয়ে বেশি চিনি। দূরের গ্রামে গঞ্জের দেহোপজীবিনীদের। সেখানে শহুরে সাজসজ্জা নেই। সবটাই অনেক বেশি নগ্ন ও নির্মম। অথচ আশেপাশের গৃহস্থ পরিবার ও সমাজের সঙ্গে তাদের পরিচয়টা যেন খুব দূরের না। অশালীন আচরণ, অশ্রাব্য কটূক্তি, মাতাল মেয়ের গালাগাল কিছু কম শুনি নি। কলকাতা বলেই বোধহয় কানে বাজছে, অস্বস্তি লাগছে। আসলে হয় তো, কিছু রঙ ফেরতায়, সবাই এক। তবে এখানে এসে এদের দুর্ভাগ্যের চেহারাটা সহজে চোখে পড়ে না, যা পড়ে দূরের জেলার হাটে বাজারে গঞ্জে মেলায়।

চুমকি এবার আমার দিকে ফিরে বললো, 'আপনি যে মশাই নতুন জামাই হয়ে এসেছেন। বসুন। নাকি হাত ধরে বসাবো?'

ধরেই নিতে পারি, এখানে রাগ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা অর্থহীন।

বললাম, 'না, হাত ধরে বসাতে হবে না, আমি বসছি।'

এম জি'র নির্দিষ্ট বড় সোফায় বসলাম।

এই সময়ে রমা আর ডলি নামে মেয়ে দুটি ঘরে এসে ঢুকলো। এম· জি. ডাকলো, 'এসো এসো। চুমকি বলছিল, তোমাদের টাকার কথাটা তোমাদের সঙ্গে আগেই সেরে নিতে।'

চুমকি আবার একটি অশ্রাব্য উক্তি করে বললো, 'আয়, তোরা বোস।'

ডলি আর রমা দুটো আলাদা সোফায় বসলো, ডলি বললো, 'আর তোরা কি দাঁড়িয়ে থাকবি?'

'না, আমরাও বসছি।' এম জি আমার পাশে বসলো।

চুমকি বসলো তার পাশে। কেবল পাশে বললে ভুল হয়। এ ঘর যে তার, এম· জি যে তার ঘরেই সবাইকে ডেকে এনে বসিয়েছে, এটা প্রমাণ করার জন্যই যেন সে এম· জি'র গায়ে গা ঠেকিয়ে, কোলের ওপর হাত রেখে বসলো।

এখন আর ভেবে লাভ নেই, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম। বেরিয়েছিলাম এক চিন্তা নিয়ে। এখন আমি কলকাতার লালবাতি এলাকার এক দেহজীবিনীর ঘরে।

রমা হাই তুলে বললো, 'আর বসে থাকতে পারছি নে, শুতে ইচ্ছে করছে।'

'খোয়ারি কাটাবার মাল আসছে।' চুমকি বললো, এবং সেই সঙ্গে তার নিজের ভাষায় যা জিজ্ঞেস করলো, তার মর্মার্থ হচ্ছে, আজ সন্ধ্যা থেকে কতোজন গ্রাহকের আগমন রমার ঘরে ঘটেছিল। রমার জবাবও সেই রকম, তবে একটা কথা কানে আমার বিঁধে গেল, 'আমার তো আর তোর মতো অবস্থা নয়, ফুরনে খাটছি। ছেলেটা ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছে, ডাক্তার বলেছে, জ্বরটার লক্ষণ সুবিধের নয়, টাইফেড হতে পারে। চিকিৎসায় খরচ ভালোই হবে।'

টাইফেড নিশ্চয়ই টাইফয়েড, রমার পক্ষে সেটা উচ্চারণ করা সম্ভব না। কিন্তু ছেলের অসুখের কথা বলতে বলতেই, তার ক্লান্ত চোখে মুখে যেন একটা উৎকণ্ঠিত বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এলো। এই সময়ে মালবিকা দরজায় এসে দাঁড়ালো, হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'ঢুকবো নাকি আরতি দেবী?'

চুমকির চোখে মুখে চকিতে একবার বিরক্তি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল, হেসে বললো, 'দেবী? সে তো তুই। তুই হলি লেখাপড়া জানা (অশ্রাব্য বিশেষণ)। তোর কথা আলাদা। মোহনবাবু আজ তোকে আমার ঘরে ডেকেছে· আমি কখনো না বলতে পারি? আয়।'

ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না, চুমকি আর মালবিকার সঙ্গে কোথাও একটা বিবাদের ব্যাপার আছে। আমার পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না। এম জি· দাঁড়িয়ে উঠে ডাকলো, 'এসো মালবিকা, এখানে এসে বস।'

মালবিকা ঘরের ভিতরে ঢুকলো। এম· জি· আমার পাশ থেকে সরে গিয়ে, তাকে জায়গা করে দিল। আমি অসহায় বিস্ময়ে এম· জি'র দিকে তাকালাম। এম· জি. আমাকে চোখের ইশারা করে হাসলো। মালবিকা অনায়াসেই আমার পাশে এসে বসলো। তার পাশে এম· জি·, এম· জি'র পাশে চুমকি। এম· জি· আমার দিকে ফিরে আবার বললো, মালবিকা প্রচুর বই পড়ে। আধুনিক লেখকদের অনেক বই ওর ঘরে আছে।'

'শুধু আধুনিক বলবেন না, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বইও আমার ঘরে আছে।' মালবিকা যেন গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করলো, এবং আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে, আবার এম জি'র দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তা আমার বই পড়ার কথাই আগে ওঁকে বলছেন কেন? উনি কি লেখক, না প্রফেসার?'

আমার আক্কেল গুড়ুম! লেখক প্রফেসরের প্রসঙ্গ এখানে? এম· জি· বললো, 'না, উনি সে-সব কিছু নন, তোমার স্পেশালিটির কথা বললাম। তোমার ঘরে লেখক প্রফেসরদেরও আনাগোনা আছে, সেটাও তো একটা খবর!'

আমি এম· জি'র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কথাগুলো সত্যি কীনা, বুঝতে পারছিলাম না। এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কেবল বই নয়, মালবিকার রবীন্দ্র আর নজরুল সঙ্গীতের ভালো ভালো রেকর্ড আছে।'

তবু ভালো, এমন পল্লীতে, কোনো দেহজীবিনীর ঘরে অবকাশযাপনের জন্য সাহিত্য সঙ্গীতের ব্যবস্থাও আছে। মানতেই হবে, এমনটা আমার চোখে পড়ে নি। কালিদাসের আমলে, নগর জীবনে বারোবানাদের ঘরে নাকি কবি এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক বৈঠকও বসতো। নগরনন্দিনীরা হতো সর্ব কলায় পারদর্শিনী, স্তর ভেদে বিদুষীও বলা যায়। তাদের হাতের মালা কণ্ঠে ধারণ করে বিদগ্ধজনেরা সুখী ও গৌরববোধ করতেন। এখন তো জানি, নগদ বিদায়ের কড়ি ছাড়া, এখানে এক টুকরো হাসিও মেলে না। প্রবাদ, ফ্যালো কড়ি মাখো তেল, তুমি কি আমার পর? সম্ভবতঃ একথাটার গূঢ় অর্থও অদৌ শালীন না। কিন্তু সমানে মুখে মুখে ঘোরে।

কিন্তু মালবিকা কি সেই কালিদাসের কালের নগরনন্দিনী নাকি? আর সেই ভেবেই এম· জি· ডেকে তাকে আমার পাশে বসালো? আমি ছুৎমার্গী না, স্থান-কাল-পাত্র-পাত্রী সম্পর্কেও আমার কোনো রকম শুচিবায়ুগ্রস্ততা নেই, আগেই কবুল করেছি। তবু হায়, জন্মসূত্রে পাওয়া আমার রক্তবাহী ধমনীর ট্র্যাডিশনকে অস্বীকার করি কী করে! মালবিকার পাশে বসে, তার অঙ্গের স্পর্শে আমি স্বস্তিবোধ করছি না।

এম· জি বললো, 'এভাবে বসাটা ঠিক মনের মতো হচ্ছে না। চুমকি, তোমার সেই মোটা সুজনি জোড়া কোথায়? মেঝেয় পাতো, তার ওপরে সবাই বসি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, এ যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।' ডলি হেসে মন্তব্য করলো।

রমা একটি অশ্রাব্য মন্তব্য করলো। তার জবাবে চুমকিও। ইতিমধ্যে বড় একটি ব্যাগ হাতে জগতলাল দরজায় এসে দাঁড়ালো। চুমকি ডাকলো, 'ভেতরে এসো জগত। ব্যাগ রেখে আগে খাটের তলা থেকে সুজনির জোড় বের করে পাতো। বাবুর সোফায় বসে সুখ হচ্ছে না।'

জগতলাল ঘরে ঢুকে, ব্যাগটা এক কোণে সাবধানে রেখে, ব্যস্ত হয়ে খাটের তলায় ঝুঁকে পড়লো। চুমকি দাঁড়িয়ে বললো, 'রমা আর ডলি ওঠ্, সোফা দুটো সরিয়ে ওখানে সুজনি পাতা হবে।'

জগতলাল করিৎকর্মা লোক। খাটের তলা থেকে ঝটিতি বের করলো সুজনি জোড়া। শুনতে সুজনি, আসলে বেশ মোটা, অনেকটা কার্পেটের মতো। কালো জমিতে লাল নকশার কাজ করা। ডলি আর রমা উঠে দাঁড়াতেই জগত সোফা দুটো সরিয়ে দিল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। সুজনি জোড়া পেতে, খাটের ওপর থেকে কয়েকটা বালিশ ছড়িয়ে দিল তার উপরে। দুটো ট্রে নিয়ে এলো ঘরের এক কোণ থেকে। রাখলো সুজনির ওপর। দেওয়াল আলমারি খুলে গুনে গুনে ছ'টি কাচের গেলাস বসিয়ে দিল ট্রে-র ওপরে। ব্যাগ থেকে টেনে টেনে বের করলো কয়েক বোতল বীয়র আর দেড় বোতল হুইস্কি। সবই রাখলো ট্রে-র ওপরে। বড় একটি কাচের জলের জাগে, কুঁজো থেকে জল ভরে রাখলো সুজনির ওপরেই। পকেট থেকে বীয়রের বোতল খোলার চাবি বের করে আগে দু'বোতল বীয়রের মুখ খুলে দিল। খুলে দিল হুইস্কির বোতলের মুখ। দৌড়ে গেল একবার বাইরে। বড় বড় দুটি ঠোঙা নিয়ে ঢুকলো। দেওয়াল আলমারি থেকে দুটো প্লেট বের করে, ঠোঙা উপুড় করে ঢেলে দিল গরম কাটলেট আর চপ।

'এমন না হলে আর জগতলাল!' এম· জি· বললো এবং চুমকির হাত ধরে সুজনির ওপরে বসে ডাকলো, 'এসো, রমা ডলি, কাছে এসে বসো, একটু ঘমপেষ করে আসর করা যাক।' মালবিকার দিকে ফিরে বললো, 'শ্যামবাবুকে নিয়ে তুমিও এসো।'

যাক্, এম জি তাহলে আমাকে শেষ পর্যন্ত শ্যাম বলেই এখানে পরিচয় দিলেন। যদিও ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের গণিকাদের কাছে নামটা উচ্চারিত হয়েছিল স্যাম্। কিন্তু এম· জি'র এ খেলাটা একটু ভিন্ন রকমের। সে আমাকে মালবিকাকে আলাদা করতে চাইছে কেন? আমার অস্বস্তিকে বাড়ানো ছাড়া, এতে আর কোনো লাভ নেই।

মালবিকা আমার দিকে তাকিয়ে, ভদ্রভাবেই বললো, 'আসুন, এক যাত্রায় আর পৃথক ফল করে লাভ কী?'

এখানে আমার কোনো যাত্রা নেই, পৃথক ফলেরও কোনো প্রশ্রয় নেই।

তবে, ক্ষেত্র মাহাত্ম্য যাই হোক, নিয়মের বাইরে আমি যাবো না। এম· জি· বললো, 'চুমকি, তুমিই সবাইকে ঢেলে দাও।'

'অত শত পারবো না বাপু। ঢালাঢালি ঢলাঢলি তুমিই কর।' চুমকি বললো।

রমা হেসে বললো, 'আমিই ঢেলে দিচ্ছি।'

দরজাটা যে কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, খেয়াল করি নি। জগতলাল নিশ্চয়ই বাইরে থেকে টেনে পাল্লা ভেজিয়ে দিয়েছে। রমার কথা শেষ হবার আগেই দরজার বাইরে থেকে পুরুষের গলা ভেসে এলো 'বাবু, ফুল আর মালা এনেছি।'

'নিয়ে এসো।' এম· জি গলা তুলে হুকুম দিল।

দরজা খুলে গেল। একটি রোগা লম্বা লোক, ধুতির ওপরে গায়ে একটি পাতলা চাদর জড়ানো। দেখলে বাগানের মালী বলে মনে হয়। তার দু'হাতের কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত নানা আকারের বেল ফুল ও বকুলের মালা ঝুলছে। হাতেও কয়েক গুচ্ছ। ঘরে ঢুকে, এম জি· আর চুমকির সামনে, সবই ঢেলে দিল। চুমকি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো, 'এ কি করছো ফুলওয়ালা, সব দিয়ে দিলে? এ ঘরে কি আজ ফুলশয্যা হবে নাকি?'

'তোমাদের সব ঘর তো নিত্য ফুলশয্যারই ঘর।' এম জি ফুলওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কতো দেবো হে?'

লোকটি হাত জোড় করে একেবারে বিনয়ের অবতার! প্রায় লজ্জাবতী লবঙ্গলতার মতো হেসে, শরীর দুলিয়ে বললো, 'আপনাব কাছে আবার দামাদামির কী আছে বাবু? আপনি যা দেবেন, তাই হাত পেতে নেবো।'

এম জি পকেট থেকে কিছু টাকা তুলে তার হাতের দিকে এগিয়ে দিল। চুমকি খপ্ করে টাকাগুলো নিয়ে, গুনে দেখে বললো, 'চল্লিশ টাকা!'

'দিয়ে দাও।' এম· জি· বললো, 'কই রমা, গেলাস যে খালিই পড়ে রইলো।'

চুমকি ব্যাজার মুখে টাকাগুলো ফুলওয়ালার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললো, 'ঝোপ বুঝে কোপ, খালি দাঁও মারার তাল। যাও, বাবু যখন দিয়েছে, আমি আর কী বলবো। শেষ রাতের মালা, এ তো আর বিকোতো না।'

ফুলওয়ালা টাকাগুলো নিয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে বেরিয়ে গেল। ডলি বললো, 'ভয় নেই, জগতলাল বাইরে আছে, কিছু আদায় করে নেবে।'

রমা ইতিমধ্যে আগে তিনটি গেলাসে হুইস্কি ঢাললো। বাকিগুলোতে বীয়র। কারোকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই তিনটি হুইস্কির গেলাস এগিয়ে দিল, এম· জি·, মালবিকা আর আমার দিকে। আপত্তি করা বৃথা। গ্রহণ না করলেই হলো। বাকি তিনটি গেলাসে বীয়রের ফেনা উপছে পড়লো।

এম· জি· বললো, 'এবার মালাগুলোর সদ্‌গতি হোক।' বলে সে আগে একটি মালা তুলে মালবিকার হাতে দিল।

জানি না, তার চোখে কোনো ইশারা ছিল কীনা। মালবিকা মালাটি আমার গলায় পরাতে উদ্যত হলো। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে মালাটি হাতে নিয়ে বললাম, 'ধন্যবাদ, এতেই হবে।'

'না হয় গলাতেই নিতেন।' চুমকি চোখের কোণে তাকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে হেসে বললো, 'এ তো আর আসল মালাবদল নয়, এক রাতের জন্য।'...তার বাকি কথাগুলো উচ্চারণের অযোগ্য।

প্রায় একটা অনুষ্ঠানের মতোই, এম জি'র গলায় সবাই মালা পরিয়ে দিল, মালবিকা ছাড়া। এম· জি-ও তাদের গলায় মালা পরিয়ে দিল। আমি সংস্কারমুক্ত না হলেও, একটি মালা মালবিকার হাতে দিলাম। তারপরে চললো সুরা পানের পালা। আসর জমে উঠলো দেখতে দেখতে। এম· জি· দেখলাম, চুমকি, রমা, ডলি, তিনজনকে নিয়েই বেশ মেতে উঠেছে। কী করে এটা সম্ভব হয় জানি না। মালবিকার গেলাস শূন্য হলো কয়েক মিনিটেই। আমাকে বললো, 'আপনার গেলাস যেমনকার তেমনিই রইলো যে।'

'আমি আর পারছি না।' সহজ ভাবেই বললাম।

মালবিকা বললো, 'আগেই অনেক খেয়ে এসেছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ।' সহজেই বললাম, কারণ আমার কাছে আগেরটা বেশিই বলতে হবে।

মালবিকা এবার নিজের গেলাসে, নিজেই পানীয় ঢেলে নিল। চুমুক দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ জায়গায় নতুন নাকি ?'

এখানে আমার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করা অর্থহীন। অবকাশও নেই। তবে মিথ্যা না, আমি এমন পরিবেশে কখনো আসি নি, বসি নি। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ভাবসাব দেখে তাই মনে হচ্ছে।' আবার গেলাসে চুমুক, এবং দৃষ্টি ফেরালো এম· জি'র দিকে।

এম জি'র বুকে তখন চুমকি। ডলি তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে পিছন থেকে। রমা আর একদিক থেকে গা ঘেঁষে বসেছে। এম· জি· মালবিকাকে চোখের ইশারায় কিছু বললো। মালবিকা হাসলো। আসরের চেহারাটা, নিখুঁত বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। ক্রমাগতই বেআবরু আর অশালীন হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে অশ্লীল গানের চুটকি। এম· জি কেবল না, মেয়েরাও তাদের জামা কাপড়ে রীতিমতো অসাব্যস্ত।

এম· জি-কে আগেও মেলাতে পারি নি, এখনও মেলাতে পারছি না। মনে শুধু একটাই জিজ্ঞাসা, তার জীবনের এদিকটা দেখাবার জন্য, আমার ওপরেই এতো দয়া হলো কেন ? আমার নিজের একটা গর্ব ছিল, যে-কোনো

পরিবেশেই আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি। সন্দেহ কি, আমার সে-গর্ব ভাঙতে বসেছে। আমি বারেবারেই এম· জি·'র দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করেই আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে।

শেষ পর্যন্ত আমাকে ছলের আশ্রয় নিতেই হলো। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এম· জি· আমার দিকে তাকিয়ে শশব্যস্ত হয়ে উঠলো, জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'একটু বাথরুমে যাবো।' আমি দরজার দিকে পা বাড়ালাম।

চুমকি বলে উঠলো, 'তোমার বন্ধু কেটে পড়বার তাল করছে।'

এম· জি· মালবিকার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি আমার বন্ধুকে একটু বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।'

দুজনের কথাই বিশেষ অর্থবাহী। আমি যতো সহজে ছল করে পালাবো ভেবেছিলাম, চুমকির অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আমার থেকে বেশি। এম জি'র মালবিকাকে অনুরোধটাও আসলে পাহারা দেবার ইঙ্গিত। আমি হেসে বললাম, 'কোনো মহিলাকে বাথরুম দেখাতে হবে না। ওটা আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবো।'

এম জি'র চোখ তখন লাল, কিন্তু উত্তেজনা নেই, ঢুলুঢুলু। মুখে কুণ্ঠিত অনুরোধের হাসি। সে হাতজোড় করলো। মালবিকা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি এম· জি'র দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে হাসলাম। তার হাসি, তাকানো, হাতজোড়ের ইঙ্গিতই যথেষ্ট। মুখে আর কিছু বলার দরকার নেই। তবু কোনো জবাব না দিয়ে, আমি দরজার কাছে গেলাম। ভেজানো দরজা খুলে বাইরে, দীর্ঘ বারান্দার দু' পাশের ঘরের কোনো কেউ দরজার মুখেই, বসে বিড়ি টানছিল। গন্ধে প্রমাণ, বিড়িটি বিশুদ্ধ বিড়ি, না গঞ্জিকা মিশ্রিত, অথবা বিশুদ্ধ গঞ্জিকা। সে আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, এমন কি বিড়িটাও হাতের আড়ালে গোপন করার চেষ্টা করলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাথরুমটা কোথায়?'

'বাঁ দিকে সোজা চলে যান।' আমার পিছন থেকে মালবিকা বলে উঠলো, 'সাবধানে যাবেন, ভেতরের দিকে বেশি যাবেন না, পেছল আছে।'

অর্থাৎ এম· জি'র পাহাবা ঠিকই আছে। আমি বাঁ দিক ফিরে সোজা এগিয়ে গেলাম। শেষ প্রান্তে আলো জ্বালানো অল্পপরিসর দুর্গন্ধযুক্ত ঘরটি দেখেই বোঝা গেল, দুটি বাথরুম। সাবধানে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, মালবিকা নেই। সিঁড়ির সামনে অবিশ্যি জগতলাল আছে। কিন্তু চোখের সামনে এম· জি'র অনুরোধ-কাতর মুখ ও করজোড় মূর্তি ভেসে উঠলো। অথচ ঐ ঘরটিতে আমি নিজেকে অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ করছি। এ সংসারে সকলের দ্বারা যদি সব কিছু

সম্ভব হতো, তা হলে মানুষের চেহারা বদলে যেতো। বিভেদ বা অসঙ্গতি না, বিবিধের মাঝেই সৌন্দর্য। তবু আজকের রাত্রিটি আমার এম· জি'র যূপকাষ্ঠেই দিতে হবে।

আমি লম্বা বারান্দার খানিকটা এগোতেই, একটি ঘরের দরজায় মালবিকার আবির্ভাব ঘটলো, হেসে বললো, 'বুঝতে পারছি, ও ঘরে আপনার ভালো লাগছে না। আপনি আমার ঘরে বসুন, কেউ আপনাকে জ্বালাতন করবে না।'

বুঝতে অসুবিধা হলো না, এ ব্যবস্থাটিও কর্মিৎকর্মা এম· জি'র পরিকল্পনা। মানতেই হবে, চুমকির ঘরের পরিবেশের থেকে, এখানে একলা ঘর আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে তো ও ঘরে যেতে হবে?'

'কেন? আমি আপনার সঙ্গে বসে গল্প করবো।' মালবিকা দরজার পর্দাটা তুলে ধরলো।

আমি ভিতরে ঢুকলাম। প্রায় চুমকির ঘরের মতোই। একমাত্র বৈশিষ্ট্য, হাল ফ্যাশানের বইয়ের আলমারি। কাচের ভিতরে তাকালেই দেখা যায়, রবীন্দ্র রচনাবলী থেকে আধুনিক বইয়ে ঠাসা। আমি সেদিকে চোখ রেখে, সোফায় বসতে বসতেই বাইরে থেকে জগতলালের স্বর শোনা গেল, 'দিদিমণি।'

'এসো।' মালবিকা আমার মুখোমুখি একটি সোফায় বসলো।

জগতলাল ঢুকলো। হাতে হুইস্কির বোতল, অবশিষ্ট পানীয়সহ একটি গেলাস টেবিলের ওপরে রাখলো। মালবিকা জিজ্ঞেস করলো, 'বাবুর গেলাস কোথায়?'

'সেটা নিয়ে আসছি।' জগতলাল দরজার দিকে পা বাড়ালো।

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললাম, 'দরকার নেই। তুমি বরং আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই এনে দাও।'

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'দরকার হবে না। সিগারেট দেশলাই আমি দিচ্ছি। কিন্তু আপনি কি সত্যি একেবারেই ড্রিঙ্ক করবেন না?'

'না।' আমি মাথা নাড়লাম, 'ও রসটা আমার ঠিক সহ্য হয় না।'

জগতলাল তখনও দাঁড়িয়েছিল। মালবিকা দেওয়াল আলমারির পাল্লা খুলে দামী সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করলো। এগিয়ে এসে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জগতকে বললো, 'তুমি যাও, দরকার হলে ডাকবো।'

জগতলাল চলে গেল। আমি একটি সিগারেট ধরালাম। স্বীকার করতেই হবে, একটু স্বস্তি ও শান্তি বোধ করছি। মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। ঘরটাও ঠাণ্ডা। মালবিকা নিজেই সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিয়ে, একটি সিগারেট ধরালো। স্ত্রীলোকের ধূমপান আমার কাছে নতুন না। ছেলেবেলা থেকেই, গ্রামের হিন্দু মুসলমান পরিবারে বয়স্কাদের হুঁকা টানতে

দেখেছি। বড় হয়েও, ভারতের নানা প্রান্তে কম দেখি নি। তবে উচ্চকোটি সমাজের মহিলাদের ধূমপানের সঙ্গে, সে সব গ্রামীণ স্ত্রীলোকদের তফাতটা যেন আকাশপাতাল। শহুরে মহিলাদের ধূমপান বোধহয় তাদের আলোক-প্রাপ্তির প্রমাণ। গ্রামের গরীব গৃহস্থের খেটে খাওয়া স্ত্রীলোকেরা প্রকৃত ধূমপান করে। সেখানে আধুনিকতার গন্ধ নেই।

মালবিকা সিগারেট ধরিয়ে, গেলাস তুলে চুমুক দিল। আমি বইয়ের আলমারির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ওপরের দেওয়ালে মালবিকারই একটি বিশেষ লাস্যময়ী ভঙ্গীর ফটো। জানি, এতে আলমারির রবীন্দ্র-নজরুলের রচনাবলীর জাত যায় না। আমি উঠে বই দেখবো কী না ভাবছি। মালবিকা অন্য প্রসঙ্গ তুললো, 'আপনি মোহনবাবুর বন্ধু, অথচ এ পাড়ায় এই প্রথম এলেন?'

মালবিকাকে নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই, এম· জি'র সঙ্গে আমার জীবনে আজ দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। জবাব দিলাম, 'সব বন্ধুকে নিয়ে তো সব জায়গায় যাওয়া যায় না। আমি এখানে অচল।'

'অবিশ্যি মোহনবাবু কখনোই তেমন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসেন না।' মালবিকা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'একলাই আসেন। এক বাড়িতেও আসেন না। যেদিন যে বাড়িতে খুশি ঢুকে পড়েন।'

আমি হঠাৎ কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম, 'রোজই আসেন বুঝি?'

'এ বাড়িতে রোজ আসেন না।' মালবিকা গেলাস খালি করে আবার বোতল থেকে পানীয় ঢাললো। নিজেই উঠে, কুঁজো থেকে কাচের জারে জল নিয়ে এসে, গেলাসে ঢেলে চুমুক দিল, বললো, 'তবে উনি আসেন প্রায় রোজই।'

কথাটা শুনে অবাক হওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। মনে কিছু প্রশ্ন তো জেগেই আছে। কিন্তু যার জীবনের কিছুই জানি না, তার সম্পর্কে অবাক জিজ্ঞাসাও অর্থহীন। দেখলাম, মালবিকা ঠোঁট কুঁচকে হাসছে, তাকাচ্ছে আমার দিকে। শঙ্কাবোধ করছি না, অস্বস্তিবোধ করছি। আমি চোখ ফিরিয়ে নেবার আগেই সে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনার বন্ধু মোহনবাবুকে আপনি তেমন চেনেন না।'

কোনো সন্দেহ নেই। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো?'

'উনি আবার সব মেয়ের কাছে যেতে পছন্দ করেন না।' মালবিকা বললো, 'ওঁর পছন্দটা একটু আলাদা।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না। মালবিকা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'চুমকির মতো মেয়েদের ওঁর বেশি পছন্দ। একটু খিস্তি খেউড় করবে, চাল-চলনে একটু ইতরামি থাকবে, ঐ রকম মেয়ে ওঁর পছন্দ। আমার ঘরে মাঝে মধ্যে আসেন, তবে জমে না। আমি আবার ওসব পারি নে। এখানে

ব্যবসা করতে হলেই যে ঐ রকম করতে হবে, তার কোনো মানে নেই।'

বললাম, 'আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝি নে।'

'বোঝেন নিশ্চয়ই।' মালবিকা হেসে একটু চোখ ঘোরালো, 'তা নইলে আর ও ঘর ছেড়ে চলে আসবেন কেন?'

আমি বললাম, 'এখানে সব ঘরেই আমি অচল।'

'আমরা কিন্তু অচলকেও সচল করতে পারি।' মালবিকার রক্তাভ চোখে হাসির ঝিলিক।

যার আচরণ যেমনই হোক, এখানে কেউ ভবী ভোলবার না। বললাম, 'তা পারবেন না কেন? তবে আমি কেবল অচল নই, অযোগ্যও বটে।'

'যোগ্য করতেও পারি।' মালবিকা জবাব দিতে দেরি করলো না, 'এম. জি. আমাকে সেই রকম দায়িত্ব দিয়েছে। বলেন তো দরজাটা বন্ধ করি।'

এম. জি'র ইশারা ইঙ্গিত বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। সে তার নিজের আসর জমাবার জন্য, প্রথম থেকেই মালবিকার কাছে আমাকে এগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। উদ্দেশ্য, বা তার বিশ্বাস, মালবিকাই আমার পক্ষে উপযুক্ত পাত্রী। আমি বেলকাঠ, ব্রহ্মচারী না। কিন্তু মন-মানসিকতা বলে একটা কথা আছে। গণিকার নামে আমার বুক কেঁপে ওঠে না, যেমন রমণী মাত্রেই বুকের রক্তও চঞ্চল হয়ে ওঠে না। আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, দ্রব্যগুণে মালবিকার ক্রমেই পরিবর্তন ঘটছে। বোধহয় এম. জি'র ইশারার নির্দেশ, এখন তাকে কিছুটা বেপরোয়া করে তুলছে। আমি সহজভাবে হেসে বললাম, 'আপনার যথেষ্ট বোধবুদ্ধি আছে। দরজাটা বন্ধ করবেন কেন? বেশ তো গল্প করছি।'

'মোহনবাবু যে আমাকে দুয়ো দেবে।' মালবিকা ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে উঠলো।

আমি বললাম, 'মোহনবাবু বুদ্ধিমান লোক, তিনি আপনাকে দুয়ো দেবেন না। আপনি বরং আপনার গল্প শোনান।'

'আমার আবার গল্প কী থাকবে মশাই?' মালবিকা আবার বোতল থেকে গেলাসে হুইস্কি আর জল ঢাললো, 'আমাদের জীবনে কোনো গল্প নেই। আমাদের গল্প আপনারাই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেটা কেমন?'

'এই যেমন আপনি।' মালবিকা গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'আপনিই তো একটা গল্প। আমার ঘরে বসে আছেন, অথচ রসকষহীন।'

প্রতিবাদ করা চলে না। বললাম, 'নিশ্চয়ই, এখানে এতো লোক আসে, অনেক লোকের অনেক গল্প আপনাদের জানা। আমি আপনার জীবনের গল্প শুনতে চাইছি।'

মালবিকা এই প্রথম চোখ-মুখের ভঙ্গী করে, কতকগুলো অশ্রাব্য কথা

বললো, 'তা ছাড়া আমাদের আর গল্প কী আছে? অবিশ্যি এখানে আবার লেখকরাও আসে, আমাদের জীবন কাহিনী শুনতে চায়। আমাদের আবার কাহিনী কী? শরীর ভাঙিয়ে রোজগার করি। পয়সা পেলে প্রেম করি—প্রেমই তো আমাদের পেশা। গল্পও একটাই। আর কেমন করে এ লাইনে এলাম? খুদে লেখকরা এখানে এসে, ন্যাকার মতো ওসব কথা জিজ্ঞেস করে।'

আমি প্রায় সভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ন্যাকা কেন?'

'ন্যাকা নয়?' মালবিকার শরীর টলে উঠলো, 'খাওয়া-পরার দায়ে এ লাইনে এসেছি, আর তা ছাড়া কেন আসবো?'

আমি সুড়ং খুঁড়তে লাগলাম, 'অথচ আপনি তো মোটামুটি লেখাপড়া জানেন, আপনার রুচি আছে।'

'কাঁচকলা।' মালবিকা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখালো, আর লেখা-পড়া জানা চাকুরে মেয়েদের সম্পর্কে কতকগুলো আপত্তিকর অশ্রাব্য কথা বললো।

আমার সুড়ং খোঁড়ার উৎসাহ নিভে গেল। মালবিকা বললো, 'আমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়েরা বাইরে কী করে বেড়ায়, সব জানা আছে। ওরা স্বামীর ঘর করে, আর আমরা বেশ্যা। স্বামী তো আমারও আছে, দুটো মেয়ে আছে, তবু চাকরি করতে যেতে পারলাম না। একই কথা। তার চেয়ে এখানে বসে রোজগার বেশি করছি।'

মালবিকার অবস্থা দেখে তার স্বামী সংসার সন্তান সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। কারণ, ক্রমেই যেন একটা জাতক্রোধে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ও বলে যেতে লাগলো, 'মেয়েরা তো মেয়েদের শত্রু হয়ই, কিন্তু আপনারা, এই পুরুষ জাতটা সব থেকে শয়তান।'...তার পরের কথা-গুলো আর লিখে প্রকাশ করা যায় না। সে ক্রমেই মাতাল হয়ে উঠছে, ভয়ংকরীও বটে। তার কথা শুনতে শুনতে, জীবনের একটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, যা থেকে অনুমান করলাম, মালবিকার মা এবং নিজের স্বামীই, তার এ পথে আসার জন্য দায়ী। জানি নে, সব দেহজীবিনীর এ কথা বলবার অধিকার আছে কী না? কারণ, সমাজে সংসারে, মেয়েদের প্রতিবাদ, জীবন-যুদ্ধও তো কিছু কম দেখি নি। দায় কি কেবল অপরের? অবিশ্যি ক্ষেত্র বিশেষের কথা আলাদা।

সৌভাগ্যক্রমে, চুমকির ঘরের আসর ভেঙে, এম জি. এসে দাঁড়ালো মালবিকার দরজায়। মুখে যদিও হাসি, কিন্তু চোখ লাল, দৃষ্টিতে যেন একটা বিভ্রম। মাথার চুলে নতুন করে চিরুনি চালানো হলেও, তার জামা কাপড় সব মিলিয়ে আর সেই ফিটবাবুটি নেই। অনেকটাই অবিন্যস্ত এলোমেলো। দরজার ভিতরে পা দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। মালবিকা তখনও

তার কথা বলে চলেছিল। এম· জি বললো, 'এখনও কথা? দরজা যে খোলাই রয়েছে?

'দরজা খোলা থাকবে না তো কি বন্ধ থাকবে?' মালবিকা হঠাৎ যেন আরও ক্ষেপে গেল। আমার সম্পর্কে একটি অশ্রাব্য উক্তি করে বললো, '—তো আমার ঘরে পাঠিয়েছেন। নিয়ে যান, ঠাকুরের ভোগটির গায়ে একটুও ছোঁয়া লাগে নি।'

আমি হাসলাম, কিন্তু মনে মনে গভীর স্বস্তি অনুভব করলাম। এম· জি বললো, 'রাত্রি বারোটা। আমরা এবার বেরোবো। আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিলাম।'

আমি সোফা ছেড়ে উঠে বললাম, 'রাত্রিটা আমার কাছে তেমন বেশি না।'

এম· জি মালবিকাকে বললো, 'তোমার টাকা চুমকির কাছে রয়েছে।'

কথাটা শেষ হলো না, মালবিকা হাতের এক ঝটকায় টেবিলের ওপরে রাখা, জলের জাগ গেলাস বোতল মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, 'লাথি মারি মশাই আপনার টাকায়। আমাকে টাকা দেখাতে আসবেন না। আমি কারোর দান-খয়রাতি চাই নি। বন্ধুকে নিয়ে চলে যান।'

আমি এক পা পেছিয়ে গেলাম। এম· জি'র চোখে-মুখে বিস্ময়। সেও আমারই মতো বুঝতে পারে নি, মালবিকার রাগ কোন স্তরে গিয়ে পেঁছিছিল। দেখলাম, চিৎকারের সঙ্গে তার চোখের কোণে জল জমে উঠেছে। তবু সে রণরঙ্গিনী মূর্তিতেই বললো, 'নিয়ে যান আপনার বন্ধুকে। ঘরে বসবার জন্য আমি কারোর কাছ থেকে টাকা নিই নে। আর কোনোদিন এরকম মানুষকে আমার ঘরে পাঠাবেন না। যান, বেরিয়ে যান আপনারা।'

এম· জি· এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। মালবিকাকে কিছু বলবার চেষ্টা করলো। তার আগেই সে সোফা ছেড়ে উঠে, খাটের কাছে গিয়ে, বালিশের তলা থেকে কিছু টাকা বের করে ছুড়ে মারলো। পাখার বাতাসে, কাগজের টাকা ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো, বললো, 'নিয়ে যান আপনার হুইস্কির টাকা। আমি বিনি মাগনায় কারো কাছ থেকে হুইস্কি খাই নে। যান, বেরিয়ে যান।' বলে, ঘরের শেষ প্রান্তে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তার গায়ের আঁচল খসে মেঝেতে লুটোচ্ছে। দু'হাত দিয়ে ধরেছে জানালার গরাদ।

এম জি· আমার হাতে মৃদু চাপ দিল। আমি তার দিকে তাকালাম। সে আমাকে মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ইশারায় বেরিয়ে আসতে বললো। আমি তার সঙ্গে ঘরের বাইরে গেলাম। বারান্দায় তখন কিছু মেয়ের ভিড়। তারা, আমার দিকে এমন ভাবে তাকালো, যেন আমিই অপরাধ করেছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার যাবেন তো?'

'নিশ্চয়ই, আপনার অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছি।' এম· জি· সকলের দিকে

একবার তাকিয়ে, হাত তুলে, আমাকে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

আমি খুব একটা অবাক হই নি। আমি নিরুপায় ছিলাম। মালবিকা দেহোপজীবিনী, কিন্তু রমণী সে যেই হোক, আগে তাকে রমণীই ভাবতে হবে। তার সঙ্গে পেশার কথাটা নিশ্চয়ই জড়িত। তার আসল ক্ষোভের কারণটা স্পষ্ট। আমার পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেই ক্ষোভ থেকেই, মালবিকা পুরুষ জাতিকে গালাগাল করতে গিয়ে, তার বর্তমান জীবনের জন্য স্বামীকে আক্রমণ করে অনেক কথা বলে চলেছিল।

এম· জি র সঙ্গে নীচে নেমে এসেই দেখলাম, সেই ট্যাকসি দাঁড়িয়ে রয়েছে। জগতলাল আমাদের পিছনে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিল। এম· জি· আগে আমাকে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। পকেট থেকে টাকা নিয়ে জগতকে দিল, এবং নিজে গাড়ির মধ্যে ঢুকে বসলো। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। এম· জি· বললো, 'এদের জীবনেরও কিছু অহংকার আছে, ইগো অফ এ প্রসটিটিউট।'

'এ আলোচনা থাক।' আমি বললাম, 'ব্যাপারটা আমি মোটামুটি বুঝতে পেরেছি। এ নিয়ে আমার তেমন কোনো মাথাব্যথা নেই, তবে মেয়েটির জন্য আমি দুঃখিত। জীবনে ওর অনেক অভিযোগ আছে, হয় তো সাবকন্সাস্ মাইণ্ডে, লজ্জা বা ধিক্কারও আছে। বই আর ভালো গানের রেকর্ড দিয়ে, মেয়েটি হয়তো নিজেকেই অনেকটা ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু আমার কথা তা নিয়ে নয়।'

এম· জি· আমার দিকে তাকালো। তারপরে চোখ ফিরিয়ে বাইরে। এখন রাস্তা ফাঁকা। গাড়ি চলেছে উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে, মধ্য কলকাতা হয়ে দক্ষিণে। আমি তাকিয়েছিলাম এম জি'র মুখের দিকে। রাস্তার আলো মাঝে মাঝে তার মুখে পড়লেও, আমি তার পুরো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। মুখের একটি পাশ দেখতে পাচ্ছি। বেশ কয়েক মিনিট পরে সে আমার দিকে মুখ ফেরালো। মুখে সেই শান্ত হাসি, চোখ ঢুলুঢুলু। বললো, 'আপনাকে আজ খুবই বিরক্ত করেছি।'

'আমি কিন্তু আমার বিরক্তির কথা আপনাকে একবারও বলি নি।' আমি বললাম, 'হয় তো এতো সব কিছুর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু বিরক্তি আমার নেই, রাগও করি নি। আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, আমি কী জানতে চাইছি।'

এম· জি'র ঢুলঢুলু চোখ, মুখে হাসি, তথাপি যেন অন্যমনস্ক ঘোরের আচ্ছন্নতা, যা আগে একবারও দেখি নি। বললো, 'এতোক্ষণ আমি অনেক সুতো ছেড়েছি, এবার আপনার পালা, তাই কি ?'

'আমার তো কোনো সুতো ছাড়ার পালা নেই, গুটোবারও কিছু নেই।' হেসে বললাম, 'আমি আপনার কাছ থেকেই কিছু শুনতে চাইছি। অন্ততঃ

ধারণা করছি, আপনি কিছু বলবেন।'

এম· জি· আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো, বললো, 'হ্যাঁ, তাই তো বলা উচিত। তার আগে জিজ্ঞেস করি, আমাকে আপনি নিশ্চয় নোংরা পাপী ভাবছেন, আর মনে মনে ঘৃণা করছেন?'

'দেখুন এম জি·, পাপ এবং ঘৃণা সম্পর্কে সকলের ধারণা এক রকমের নয়।' আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

এম জি· আবার আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো, বললো, 'আপনাকে কিছুটা বোঝার চেষ্টা করেছি। জানি, পাপ পুণ্য সম্পর্কে আপনি প্রচলিত মত নিয়ে চলেন না। আসলে কী জানেন, আমি একটা ভিন্ন জীবনের অদ্ভুত শিকার ছাড়া আর কিছু নই। তা ছাড়া আমি আর বেশি কিছু বলতে পারি নে। কারণ, আপনি যে বলছিলেন, আমার বাইরের জীবন, কাজের জীবন, এ সবের সঙ্গে মেলাতে পারছেন না, আমিও কোনোদিন মেলাতে পারি নি। হয় তো কথাটা আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না।'

'আমি আপনাকে অবিশ্বাস করি না। কেন না, আপনি আপনার কাজের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি, কিন্তু সস্তা চালাকি আপনি করতে পারেন বলে আমার মনে হয় না।' কথাগুলো শান্ত ভাবে বলতে গিয়েও বোধহয় আমার স্বরে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা ফুটে উঠলো।

এম· জি· হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলো, তারপরেই যেন হঠাৎ চমকে উঠে তাড়াতাড়ি হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'সরি, এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'কী ঠিক হচ্ছে না?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

এম· জি· যেন কেবল বিভ্রান্ত অন্যমনস্ক না, কিছুটা আত্মভ্রংশও, বললো, 'আপনার হাতটা ধরে ফেললাম। এ হাতটাকে এখন আর সুস্থ বলা যায় না, অনেক পাঁক ঘেঁটেছি।'

'আশ্চর্য!' আমি হেসে উঠলাম, বললাম, 'অথচ আপনি তো আমাকে হাত ধরেই নামিয়ে নিয়ে এলেন। ভুলে গেলেন নাকি?'

এম· জি· বিভ্রান্ত, তবু অবাক চোখে তাকালো। এ এক নতুন এম· জি, যার মধ্যে আমি সেই শান্ত অথচ বিজ্ঞাপন ও প্রচারসংস্থার সুদূরপ্রসারী তীক্ষ্নদৃষ্টিসম্পন্ন তুখোড় ব্যক্তিটিকে খুঁজে পাচ্ছি না। নিজের হাতটা তুলে দেখে, যেন আচ্ছন্নের মতো বললো, 'হ্যাঁ, তাও তো বটে।'

আমি নিজেই এম· জি'র হাত নিজের হাতে নিলাম। কেন যেন মনে হচ্ছিল, মানুষটিকে এ মুহূর্তে কেমন অসহায়, কিছুটা আত্মবিশ্বাসহীন মনে হচ্ছে। এখন তার গা থেকে কেবল সেই চন্দন কস্তুরির মিষ্টি গন্ধটি ছড়াচ্ছে না। বরং নানাবিধ প্রসাধনীর একটা রুচিহীন উৎকট গন্ধ, অন্ততঃ

আমার সেই রকমই মনে হচ্ছে, তার সেই মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে। বললাম, 'কী বলছিলেন, বলুন।'

'আমি যে সস্তা চালাকি করতে পারি নে, আপনার মুখ থেকে এ কথাটা শুনে বড় শান্তি পেলাম।' এম. জি. তার সেই আচ্ছন্ন অন্যমনস্ক স্বরে বললো, 'ঠিক এই রাত্রে, এখন, যেখান থেকে ফিরে আসছি, আমাকে দেখলে অন্য কেউ হয় তো আপনার মতো আমাকে এরকম বিশ্বাস করতো না। সস্তা চালাকি আমি সত্যি জানি না, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

বুঝতে পারছি, এম. জি'র মধ্যে কেবল একটা অন্যমনস্ক ঘোরের আচ্ছন্নতা নেই, অবচেতনে বোধহয় একটা গম্ভীর আবেগের স্রোত বহে চলেছে। আমি তার যে হাতটি ধরেছিলাম, সে তার অন্য হাত আমার সেই হাতের ওপর রাখলো, বললো, 'জানি নে, আপনাকে কোনো কালে বন্ধু হিসাবে পাবো কী না? এখন মনে হচ্ছে, আপনার মতো বন্ধু আমার নেই। বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে পেতে চেয়েছিলাম। দয়া করে, এর সঙ্গে কাজের বিষয়কে টেনে আনবেন না, ঘুলিয়ে ফেলবেন না।

'না না, আমি আপাততঃ কাজের বিষয় আদৌ ভাবছি না।' আমি জোর দিয়েই বললাম, 'আমি এখন কেবল আপনার কথাই ভাবছি।'

এম জি'র হাতের উষ্ণ চাপ আমার হাতে একটু জোরে চেপে বসলো, বললো, 'জানি নে, কেন কালকূট নামটা নিয়েছেন। না না, আমি আপনার কাছ থেকে কোনো ব্যাখ্যা চাইছি না। জানি নে বলতে এই বোঝাচ্ছি, আমি নিজে নিজেই একটা ব্যাখ্যা তৈরি করে নিয়েছি কী না। আসলে বুঝতে চেষ্টা করি, আপনি স্বয়ং বিষ, না বিষ পান করে বসে আছেন আকণ্ঠ। নইলে আর আমার হাত চেপে ধরবেন কেন? আমার ওপর এতোটা মমতাই বা দেখাবেন কেন?'

'মমতা আপনাকে কোথায় দেখালাম?' আমি সহজ ভাবে হেসে বললাম। সমস্ত ব্যাপারটাই যাতে সহজ হয়ে ওঠে, এম জি তার আচ্ছন্নতা কাটিয়ে সহজ হয়ে উঠুক, সেই ভাবেই হেসে বললাম, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনি অবসাদগ্রস্ত, হয় তো মনের মধ্যে কিছুটা—'

কথাটা আমি শেষ করতে পারলাম না। এম জি. আমার হাতে আস্তে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। আপনাকে চেনা মানে তো, আপনার লেখা। আমার একটা বিশ্বাস, সাহিত্যিক তার লেখার মধ্যে, কোনো না কোনো ভাবে আয়ডেণ্টিফায়েড নিশ্চয় হন। আপনি বোধহয় বলতে যাচ্ছিলেন, হয় তো আমার মনের মধ্যে কিছু গ্লানিও জমেছে।'

আমি এম. জি'র আচ্ছন্ন মুখের দিকে একটু অবাক চোখে দেখলাম। রাস্তার আলোয়, তার মুখ তেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি বোধহয় তাকে ভুল করে আত্মভ্রংশ ভেবেছি। অন্যথায় সে আমার মনের কথাটা

বললো কেমন করে ? কেবল লেখার পরিচয় থেকেই ?

এম জি· আবার বললো, 'শুধু গ্লানি নয়, ক্লেদও জমেছে। কিন্তু আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করছি, কোনো কোনো পশু যেমন ক্লেদ আর আবর্জনার মধ্যেই বেশ আরামে থাকে, আমিও তাই। তবু—তবু—নাহ্—, সত্যি বড় সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছি। এতে কোনো লাভ নেই। এতে সত্য প্রকাশ পায় না। আজ সন্ধ্যে থেকে এ পর্যন্ত যা দেখলেন, এটা আমার একটা জীবন। ঠিক আমার কাজের জীবনের মতোই, অতি বাস্তব। আমি আমার কাজে যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ি, এ জীবনেও তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ি। এখন হয় তো আপনাকে কিছু একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করবো, বেশ ভালো, শুদ্ধ মনের পাপীর মতো একটা বেশ সুন্দর কৈফিয়ৎ। কিন্তু সেটা মিথ্যা বলা হবে। শুয়োর যেমন তার নোংরা খোঁয়াড়েতে থাকতে ভালোবাসে, পাঁক ক্লেদ না হলে থাকতে পারে না, আমিও—আমার সূর্যাস্তের পরের জীবনটাও তাই। তবু হ্যাঁ, তবু ঐযে বললাম, হঠাৎ মনে হলো, এই পাঁকের হাত দিয়ে আপনাকে ছোঁয়া যায় না—কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলিনি। পাঁকের মধ্যে আছি তার মানে এই নয়, আমি সে বিষয়ে আনকন্সাস্, অনুভূতিবিহীন। আর, — আর, এই অনুভূতিটাই আমার বড় শত্রু। যার মধ্যে আমি আরামে গড়াগড়ি খাচ্ছি, তাকেই আবার এক সময় ভুলে যেতে চেষ্টা করি। যে কারণে আপনার চোখে আমাকে অবসাদগ্রস্ত মনে হয়েছিল, আর মনের গ্লানি দেখতে পেয়েছিলেন।'

এম জি হঠাৎ কথা থামিয়ে, তার সারাদিনের চরিত্রের একেবারে বিপরীত, ব্যস্ততার সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে, আমাকে আগে একটি দিয়ে, নিজে একটি সিগারেট ধরালো। দেশলাইয়ের কাঠির আগুনের আলোয় দেখলাম, ঘোরের আচ্ছন্নতা তার মুখে লেগে আছে, কিন্তু কেমন একটা অসহায় কষ্ট যেন ছড়িয়ে আছে তার সারা মুখে। আমিও সিগারেট ধরালাম, এবং প্রসঙ্গটিকে একটু হালকা করবার জন্যই, সেই বিখ্যাত গানের কলিটা বললাম, "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে", আপনার অবস্থাটা অনেকটা যেন সেই রকমের।

'না না না।' এম· জি. যেন আর্তনাদ করে উঠলো, 'ও রকম কোনো মহৎ প্রাণের ব্যথার সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে ফেলবেন না। সেখানে আছে সদ্আত্মার আর্তনাদ, ধিক্কার। আমি তা নই। আমার এই রাত্রের জীবনটাকে, কোনো সুন্দর জামার আবরণ দিয়েই ঢাকা যাবে না। আমি ক্লেদ আর পঙ্কের জীব। সূর্যাস্ত হলেই, আমাকে যেন কেউ হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, আমার রক্তের মধ্যে তোলপাড় শুরু করে দেয়। আমি থাকতে পারি না। আমি এসব জায়গায়, এদের কাছে ছুটে আসি। অনেকে শুনেছে, কেউ কেউ জানে, কিন্তু তারা আমার এ চরিত্রটাকে প্রাণ ধরে যেন বিশ্বাসও করতে

পারে না। এইবার মনে করুন, কেন আপনাকে আমি আমার জীবনের একটা বাঁধা ছকের কথা বলেছিলাম। এমন ভাবে বলেছিলাম, যেন আমি এই বাঁধা ছকের থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আসলে, আমি চাই কী না, নিজে বুঝি না। চাইবোই যদি, তবুও দিনের পর দিন, একই ঘটনা ঘটবে কেন? বুঝতে পারেন, আমার সারাটা দিনের মধ্যে কখনো কখনো নিশ্চয় এ জিজ্ঞাসাটা জাগে, আর তখনই মনে হয়, আপনার মতো লোকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়ি। পথে পথে, নানা জায়গায়, অনেক মানুষের সঙ্গে ঘুরি ফিরি, আর নিজেকে আবিষ্কার করতে পারি কী না দেখি।'

এম· জি· আবার থামলো, ঘনঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিল। আমি তার কথায় কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করলাম না। এক একটা সময় আসে, একজনকে বলতে দেওয়া উচিত। রোগ অসুস্থতা বলি, দুঃখকষ্ট বলি, বিবেকের তাড়না বলি, যাই হোক না, হয় তো কথার মধ্য দিয়েই তার কিছুটা ওষুধের কাজ করে। আরোগ্য বা যন্ত্রণার লাঘব হতে পারে। সে আবার বললো, 'কিন্তু কী আবিষ্কার করবো? কাকে আবিষ্কার করবো? আমার সে মন কোথায়? ওটা কথার কথা, আমি পালিয়ে আসবো। অথবা আপনাকেই বিরক্ত বা বিব্রত করবো। আপনি পথ চলতে, কোনো গ্রামের বাইরে, গাছতলাবাসী জটাজুটধারী সামান্য একজন ভিখারীর তুল্য মানুষ, তার কাছে বসে রাত কাটিয়ে দিতে পাবেন, আবিষ্কার করে অবাক হন, সেই মানুষটির জীবনে কোনো লোভ নেই, দুঃখ নেই, কিছু পাবার জন্য লালায়িত নয়। সে জীবনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি তাকে মনে মনে নমস্কার করেন। আপনার সঙ্গে আমি কোথায় যাবো? আমাকে তখন হয় তো গঞ্জের মধ্যে গিয়ে কোনো বিকৃত রুচি গণিকার খোঁজে পাগল হতে হবে।'······

'স্যার, আপনার বাড়ি এসে গেল।' ট্যাক্সি ড্রাইভার বললো।

এম· জি· মুহূর্তেই কিঞ্চিৎ সজাগ হয়ে উঠে বললো, 'না না, আমার বাড়ি নয়, আগে ওঁকে নামাতে হবে। খুব দুঃখিত, আপনার বন্ধুর বাড়িটা বোধহয় ছেড়ে এসেছি।'

আমি বললাম, 'আমার একটা কথা রাখুন। আপনার বাড়ি যখন এসেই গেছে, আপনি বরং নামুন, আমি একে নিয়ে আমার আস্তানায় চলে যাচ্ছি।'

'না না, তা কী করে হয়?' এম· জি· বলে উঠলো, 'আপনি এতো রাত্রে আমাকে নামিয়ে দিয়ে একলা ফিরে যাবেন, যাঁকে নিয়ে আমি প্রায় গোটা রাতটা কাটিয়ে এলাম?'

আমি বললাম, 'আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, কোনো সংকোচ করতে হবে না, আমি ঠিক চলে যেতে পারবো।'

'তা নিশ্চয়ই পারবেন।' এম· জি· বললো, 'আর এটাই হলো বোধহয়

আমাকে ত্যাগ করার সব থেকে সহজ উপায় ?'

গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল একটা রাস্তার মোড়ে। কোন দিকে এম· জি'র গাড়ি মোড় নেবে, জানি না। অথচ আমি ইতিমধ্যে এই মানুষটির প্রতি এমন একটা আকর্ষণ বোধ করছি, যার কোনো যুক্তি নিজের কাছেই এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। এই প্রথম আমি তার নাম ধরে বললাম, 'অনঙ্গবাবু, আপনাকে ত্যাগ করার কিছুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আমাকে পৌঁছে দিয়ে এলে যদি আপনি শান্তি পান, তাই করুন। তবে এটুকু বিশ্বাস করবেন, আপনাকে আমি সহজে ভুলতে পারবো না।'

এম· জি· আবার আমার হাত চেপে ধরলো, খানিকটা আত্মগত ভাবে বললো, 'আজ যেন কী বার ? আশ্চর্য, আমি এখন বার তারিখেরও বাইরে।'

'শুক্রবার।' আমি বললাম।

এম· জি· বললো, 'বেশ। আমি তো আপনাকে বোঝাতে পারবো না, আমাকে ভুলতে না পারার আপনার একটি কথায় আমি কতোটা আশ্বস্ত। আমাকে একটা কথা দেবেন ?'

'শুনি ?' আমার মনে একটু দ্বিধা জাগলো।

এম· জি· বললো, 'আপনি তো প্রথম পরিচয়ের রবিবার দিনই জানতে পেরেছিলেন, প্রত্যেক রবিবারেই আমি আমার বন্ধুরা দিনের বেলা থেকেই কোথাও না কোথাও আড্ডায় জমে যাই। এ রবিবারটা আমি সকালে বাড়ি থাকবো, আপনি আসুন। ভয় নেই, রাত্রে ডাকবো না, সকালে আসুন, আসবেন ?'

'কেন আসবো না ?' আমি বললাম। কারণ, এতে কী বাধা থাকতে পারে ?

এম· জি বললো, 'বেশ, তা হলে আপনিই আমাকে পৌঁছে দিন, আমার বাড়িটা চিনে যান। মনে রাখতে পারবেন তো ?'

'আশা করি।' আমি হেসে বললাম।

এম জি-ও হাসলো, 'হ্যাঁ, আমার মতো আর আপনার অবস্থা নয়, আপনি ঠিক চিনে চলে আসতে পারবেন। তা হলে এ কথাই পাকা।' বলে, সে ড্রাইভারকে বললো, 'আমার বাড়িতেই আগে চলো।'

আমি যেমন মানুষই হই, সাধারণ মানুষের থেকে কোনো রকমেই ব্যতিক্রম করতে পারি না। মনের কৌতূহল চাপতে না পেরে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বাড়িতে কি আপনি একলাই থাকেন ?'

এম জি· হেসে উঠে বললো, 'না না, আপনি আমাকে যা ভাবছেন, তা নই। আমি মোটেই বৈরাগী বিবাগী নই। আমি ঘোরতর সংসারী, আমার স্ত্রী-পুত্র আছে। বোধহয়, আপনার-মনে আবার একটা খটকা ধরিয়ে দিলাম ?'

'তা কেন ?' আমি বললাম, কিন্তু মনে মনে অবাক না হয়ে পারলাম না।

আবার সেই অমিল! স্ত্রী পুত্র সংসার, অথচ আজকের রাত্রের জীবন, যা প্রতি রাত্রেরই নাকি ঘটনা, তার সঙ্গে মেলাতে পারলাম না। বললাম, 'আমার কৌতূহল মাফ করবেন।'

এম· জি বললো, 'জানি, আপনি খুবই বিনয়ের অবতার। কিন্তু আপনি জিজ্ঞেস করলেন বলে আমি খুশিই হলাম। বুঝলাম, সত্যি আমার ওপর আপনার মন একটু টেনেছে।'

ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো একটি গেটের সামনে, যার দু'দিকে এখনও স্তম্ভের ওপর দুটি বড় আলো জ্বলছে। গেটটাও খোলা। সামান্য আলোয় যা দেখতে পেলাম, বোঝা গেল, দু'পাশে বাগানের মাঝখান দিয়ে, মোরাম বিছানো রাস্তা ভিতরে চলে গিয়েছে। নিবিড় কিছু গাছপালার আড়ালে, ভিতরের বাড়িটি চোখে পড়ছে না। কিন্তু দূরে, বাঁ দিকে আলোর রেশ চোখে পড়ছে। একজন লোক গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। এম জি· পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে, ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'কম বেশি যাই হোক, পরে হিসেব হবে, এখন আর হিসেব করতে পারবো না।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার হেসে বললো, 'আপনাকে কি স্যার কোনোদিন হিসেবের কথা বলেছি? দয়া করে একটু মনে রাখবেন, তা হলেই হবে।'

এম· জি· দরজা খুলে নামবার আগে, আর একবার আমার হাত চেপে ধরলো, বললো, 'রবিবার সকাল ন'টা থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।'

'আমি ঠিক সময়ে এসে পড়বো।' আশ্বাস দিয়ে বললাম।

এম· জি· গাড়ির দরজাটা বন্ধ করার আগে ড্রাইভারকে বললো, 'এই বাবুকে নামিয়ে দিয়ে যেও।'

'নিশ্চয়।' ড্রাইভার বললো।

এম· জি· গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল। ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চললো। আমি পিছনের উইন্ডোস্ক্রীন দিয়ে দেখলাম, এম· জি· মোরামের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

গোটা শনিবারটা কাজের মধ্যে ডুবে থাকবার চেষ্টা করলেও, এম· জি'র মুখটি বারে বারেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কোনো মানুষ সম্পর্কেই স্থির কোনো সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তাও মাত্র বলতে গেলে, সাকুল্যে দিনে রাত্রে কিছু ঘণ্টার জন্য। তথাপি এম· জি'র মধ্যে যে দ্বৈতসত্তা অবস্থান করছে, তা বোধহয় মিথ্যা না। তার দুটি স্পষ্ট রূপ আমি দেখেছি। কাজের মানুষটির কথা তো একরকম কিংবদন্তীর মতো কলকাতায় প্রচলিত। রাত্রের মানুষটি কতোটা প্রকৃত, এখনও আমি নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না।

পথ চলতে জীবনে অনেক নারী পুরুষ দেখেছি। তাদের সবাইকে সম্যক্ চিনতে পেরেছি বললে, অতিশয়োক্তি হবে। কিছুটা আত্মপ্রতারণাও হবে।

'বিচিত্র' কথাটার একটা স্বাদ আছে। মানুষের মধ্যে আমি সেই স্বাদ পেয়েছি। এই স্বাদটির আকর্ষণ বড় প্রবল। কিন্তু কলকাতার পথে কোনোদিন কোনো মানুষ আমাকে দাঁড় করায় নি। না করার কারণ এই না, আমার পথে ফেরার চলতি মানুষ কলকাতায় নেই। সম্ভবতঃ এমন একটা সূক্ষ্ম ভুল ধারণা আমারও থাকতে পারে, নগর কলকাতার যান্ত্রিক মানুষের মধ্যে, সেই মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

কে সেই মানুষটি? মনের মানুষ? কভু মেলে না। কারণ, মনের মানুষের কোনো ব্যাখ্যা নেই। কী তার পরিচয়, আজও জানতে পারলাম না। বাউল যাকে মনের মানুষ বলে, সে-মানুষ তার আপনার মধ্যে বাস্ করে। আসলে তো আপনাকেই খুঁজে ফেরে। এর মধ্যে আছে অনেক গুহ্য তত্ত্ব, গূঢ় কথা, সাধন তত্ত্ব। আমি সাধন-ভজন জানি না। তবে, একটা কথা নিজের কাছেই কবুল করেছি, খুঁজে ফেরা বলতে সেই একটাই। নিজেকে খুঁজে ফেরা। নিজেকে খুঁজে ফিরি আর সকলের মধ্যে। সেখানেই আমার সব দীনতা, হীনতা, আমার আপনাকে অনেকটা যেন দেখতে পাই। অতএব কলকাতার পথে পথেও নিজেকে খুঁজে ফেরা যাবে না কেন? মানুষের স্বাদটা সেই কারণেই বড় টানে। অমৃতের আস্বাদ তো কোনোদিন জানতে পেলাম না। মানুষকে দিয়েই সেই আস্বাদের খোঁজে ফিরি।

এম জি আমার সেই আস্বাদের বাসনাকে জাগিয়েছে। হয় তো কলকাতার সে খুব একটি সীমিত সমাজের মানুষ। অনেক ঘুরিয়া আমি আইলাম রে কইলকাত্তায়' বাউলের সেই গানের মতো, আপাততঃ তেমন করে কলকাতাকে আমার দেখা হবে না। এম· জি-কে দেখা হবে। নগর সীমিত, জটিল, কিন্তু বিন্দুতেও সিন্ধু দর্শন নিশ্চয় হয়। স্বীকার করতেই হবে, কলকাতাকে আমি তেমন করে দেখতে পাইনি। দেখার বড় সাধ।

এম· জি· গত রাত্রে ফেরার সময়, বারেবারেই একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। পঙ্কিল জীবনের আরামে তার কোনো গ্লানিবোধ নেই। সেখানে সে সুখী পশুর মতো অন্ধ বন্ধ কালা, ক্লেদের মধ্যে লীলা করে বেড়াচ্ছে। যে এ কথাটা বলতে পারে, সে কি সত্যি তার ক্লেদময় জীবন সম্পর্কে একেবারে ধিক্কারহীন, নির্বিকার? আমার মনে কেমন ঠেক লেগে যায়। তা ছাড়া, তার প্রমোদস্থল থেকে ফেরার সময়, তাকে আচ্ছন্ন অন্যমনস্ক, অন্য এক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। যেন সেখান থেকে বেরোবার পরে, সেই হাসিখুশি মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

তবে এখন বলবো না, মন চলো যাই বনে। বরং বলি, মন চলো অনঙ্গরূপ সন্ধানে।

রবিবার এম· জি'র বাড়ির গেটে পেঁছোতে ন'টা বেজে গেল। আগেই বলেছি, কলকাতা আমার কাছে তখনো এক অচিন দেশ। এম· জি'র

বাসস্থানের পাড়াটা এক কথায় আধুনিক কালের অভিজাত। কোনো বাড়ির সঙ্গেই কোনো বাড়ির ঘেঁষাঘেঁষি নেই, সাহেব আমলের কলকাতায় যেমন আছে। এখানে সকলেই যেন পরস্পরের থেকে কিছুটা গা বাঁচিয়ে, একটু ছাড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমাকে আগেই দেখে নিতে হলো, এম· জি'র বাড়ি ঢোকার গেটে, কুকুরের অস্তিত্বের সাবধানী বিজ্ঞপ্তিটি আছে কী না।

নেই। অতএব ভিতরে পা বাড়ালাম। আর তখনই বাঁ পাশের একটি ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। দেখেই চিনতে পারলাম, এম· জি'র ড্রাইভার। যাকে সে পরশু রাত্রে ফি্র স্কুল স্ট্রীট থেকে বিদায় দিয়েছিল। সে এগিয়ে এসে, কপালে হাত ঠেকিয়ে বললো, 'আসুন, ছোটবাবু আপনার কথা বলে রেখেছেন।'

মনে মনে ভাবলাম, ছোটবাবু! এ সম্বোধনটা তার মুখে শুনেছি বলে মনে করতে পারছি না। আমি তার সঙ্গে চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, 'অফিসের বড়বাবুও কি এ বাড়িতে থাকেন নাকি?'

'না স্যার, এখানে অফিসের কেউ থাকে না।' ড্রাইভার বললো, 'এটা তো ছোটবাবুদের নিজেদের বাড়ি। ছোটবাবুর বড়দাদা আর ছোটবাবু এ বাড়িতে থাকেন।'

এম জি'র ঘোরতর সংসারী কথাটা মনে পড়ে গেল। দুই ভাই এক সঙ্গে এক বাড়িতে। এম জি-কে দেখে ভাবাই যায় না। ড্রাইভার আবার বললো, 'বড়বাবু থাকেন একদিকে, ছোটবাবু থাকেন আর একদিকে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই আমি একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, যার আশেপাশের অল্প খোলা জমিতে বাগান করা রয়েছে। কিন্তু বাড়িটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে সব থেকে বেশি, দুটি শাল, একটি সেগুন ও গোটা তিনেক অর্জুন গাছ। কলকাতার বুকে, ফাল্গুনের বাতাসে গাছের হিল্লোল আর কোকিলের ডাক! সত্যি আজব কলকাতা বটে।

'এসেছেন তা হলে সত্যি?' ওপর থেকে এম· জি'র গলা শোনা গেল।

আমি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, রেলিং ঘেরা ছোট একটি খোলা ছাদের ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হলো, বেশ ফিটফাট, বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, পরনে পায়জামা আর পাঞ্জাবি। আমি হেসে বললাম, 'আপনি কি ভেবেছিলেন, আসবো না?'

এম· জি· জিভ বের করলো, বললো, 'তাই কখনো ভাবতে পারি? কুড়ি মিনিট দেরিতে এসেছেন, তাতেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আসুন, ওপরে আসুন।'

ড্রাইভার আমাকে ডাকলো, 'আসুন, এই পথে।'

আমি তাকে অনুসরণ করে, গাড়ি-বারান্দার নীচে প্রথম ঘরে ঢুকে, বাঁ দিকে সিঁড়ি দেখতে পেলাম। কয়েক পা এগিয়ে সিঁড়িতে পা দেবার আগেই

ওপর থেকে এম· জি'র গলা আবার শোনা গেল, 'আসুন।'

আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম। ড্রাইভার ফিরে গেল। ওপরে উঠে ওড়না-ঢাকা বারান্দা। সামনেই পর্দা-ঢাকা ঘরের দরজা। এম· জি'র সঙ্গে ভিতরে ঢুকলাম। বিরাট ঘর। মাঝখানে একটি বড় টেবিল, নীচে কার্পেট পাতা। ঘিরে আছে কয়েকটি মোটা গদি-আঁটা সাবেকি আমলের চেয়ার। কিন্তু নানা ধরনের আসবাবপত্র থেকেও বইয়ের সমারোহ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। ঘরের তিন দিকে কেবল বিভিন্ন আকারের বইয়ের র‍্যাক এবং আলমারি। সেখানে ছোট ছোট হালকা ধরনের বসবার চেয়ার। বোঝা গেল, যখন যেদিকে খুশি বই নিয়ে বসে পড়ার ব্যবস্থা করা রয়েছে।

এদিক থেকে ঘরের সবই ঝকঝকে সাজানো গোছানো। বইয়ের র‍্যাক আর আলমারিগুলোও। কিন্তু বইগুলো যে কেবল সাজিয়ে রাখবার জন্য রাখা নেই, তা বোঝা যায় বইগুলোর চেহারা দেখলে। কিছুটা এলোমেলো, মলাট ছেঁড়া, অবিন্যস্ত ভাব। অর্থাৎ বই নিয়ে প্রায়ই ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়।

'চলুন, পাশের ঘরে গিয়ে বসি।' বলে, ডান দিকের আর একটি ঘরের পর্দা তুলে ধরলো। আমি এগিয়ে গেলাম। সে ঘরে গিয়ে দেখলাম, সেই রেলিং ঘেরা খোলা ছাদ। অথচ এ ঘরের মাঝখানেও টেবিল, যা দেখে মনে হয়, ডাইনিং টেবিল। টেবিল ঘিরে কিছু চেয়ার। ছাদের দিকে, ঘরের মধ্যে সোফা-সেট আর সেণ্টার-টেবিল।

এম· জি· সেদিকে গিয়ে বললো, 'আসুন, এখানেই বসা যাক।'

আমি এগিয়ে বসলাম, আর আমার আবার মনে হতে লাগলো, পরশু রাত্রের সেই লোকটির সঙ্গে এ লোকটিকে মেলানো যাচ্ছে না। সোফা-সেটের এলাকায় দেওয়ালে কালমার্কস আর গান্ধীর ছবি। জানি না, দুই বিপরীত মেরুকে দুই দেওয়ালে প্রতীক হিসাবে রাখা হয়েছে কী না ? অথবা, এম জি'র মনে অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা কাজ করে। অথচ পাশের ঘরে কয়েকটি বড় ফটোগ্রাফ ছাড়া, রামকৃষ্ণদেবের একটি বড় রঙীন ছবিও দেখেছি।

আমরা বসতে না বসতেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় পরা একটি লোক খালি পায়ে ঢুকলো। জিজ্ঞেস করলো, 'ছোটবাবু, বেলা অনেক হয়েছে, খাবার দিয়ে দিই ?'

'হ্যাঁ, নিয়ে এসো। আমারও খিদে পেয়েছে।' এম· জি· বললো, 'বড় টেবিলে দিতে হবে না, এখানেই দাও।'

লোকটি বেরিয়ে গেল। এম. জি আমার পাশের সোফায় বসে বললো, 'বাড়িটা আপনার কেমন লাগছে ?'

'সুন্দর।' আমি বললাম।

এম· জি বললো, 'হ্যাঁ, আমার ঠাকুরদার রুচি ছিল। এখন আমরা দুই

ভাই এ বাড়িতে থাকি। বাড়িটা দুটো অংশে ভাগ করা আছে। তবে আমি এখন এ বাড়িতে ভাড়াটে।'

'ভাড়াটে!' আমি সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে এম· জি'র দিকে তাকালাম।

এম জি· বললো, 'এক রকম তাই বলতে পারেন। আমার অংশটা দাদার কাছে মর্টগেজ করা আছে। আমি প্রথম যে ফার্মে ছিলাম, তাদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। কাজের ব্যাপারে আমি একটু একগুঁয়ে। এখন যে ফার্মে আমি আছি, এটির অবস্থা একটু সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। আসলে এ ফার্মটা ছিল আমেরিকান এক কোম্পানির। তারা রাতারাতি ঠিক করলো, ইন্ডিয়ার তিনটি অফিসই গুটিয়ে নেবে। আমি তখন কলকাতার অফিসের একজন অংশীদার হিসাবে এখানে জয়েন করলাম। মাদ্রাজ অফিস থেকে এলেন পদ্মনাভন। আমার থেকে অনেক ধনী মানুষ। তাঁকে বাড়ি মর্টগেজ দিতে হয় নি। তিনি কলকাতা আর মাদ্রাজ অফিসের বড় অংশটাই কিনে নিলেন। আপনি হয় তো জানেন, আমি আগে যে-ফার্মে ছিলাম, সেটির অবস্থা ডুবুডুবু। এ ফার্মটি বেশ ভালোভাবে মাথা তুলছে। তার কারণ, এ ফার্মের আর্টিস্ট, কর্মী, সকলেই কলকাতার সেরা। এদের সঙ্গে কাজ করেও সুখ। কিন্তু পদ্মনাভন কতোদিন চালাতে দেবেন, বুঝতে পারছি নে। অন্ততঃ আমি কতোদিন থাকতে পারবো, বুঝতে পারছি নে।'

আমি বিষয়টি কিছু জানি না, অতএব জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। এম· জি· বললো, 'পদ্মনাভনের সঙ্গে আমার প্রায়ই মতবিরোধ দেখা দিচ্ছে। লক্ষণটা মোটেই ভালো নয়। আমি চিফ স্টান্টে বিশ্বাস করি নে। চমক দেওয়া, আর অভিনবত্ব নিশ্চয় এক কথা নয়। আর নতুনত্ব মানেই চিফ্ নয়। অফিসের বেশির ভাগই আমার সঙ্গে একমত। তবে বুঝতেই পারছেন, আর একটা নতুন ফার্ম খুলতে যাওয়া কতোখানি রিস্কের ব্যাপার।'

'আমি তো শুনেছি, আপনি কাজের ব্যাপারে কোনো রকম আপোষ করেন না।'

এম· জি· বললো, 'ঠিকই শুনেছেন। কাজটা আমার ঢাক বাজানো বটে। তবে ঢাকীর মতো ঢাকী হওয়া চাই। আমি চাই, আমার রুচি, আমার কাজের অভিনবত্ব, সমস্ত পরিকল্পনাটাই হবে অদ্বিতীয়। খুব কঠিন কাজ। আর এর জন্য দরকার সব থেকে বেশি কমনসেন্স। যারা ভাবে, খুব একটা আনকমন কাজ করতে হলে, আনকমন থিংকিং দরকার, তারা গোড়াতেই গলদ করে বসে। কমন থিংকিং ক্যান ক্রিয়েট বেস্ট আনকমন প্রোডাক্টস, এটা অনেকে বুঝতে চায় না।'

আশ্চর্য, এই লোককেই কি গত পরশু রাত্রে আমি দেখেছি, যে এখন এসব কথা বলছে? আমার চিন্তার ফাঁকেই সেই লোকটি বড় একটি ট্রে দু'হাতে বহন করে নিয়ে এলো। গন্ধেতেই টের পেলাম, খাঁটি গব্যঘৃতের

লুচি, পটল ভাজা, তার সঙ্গে ডিমের ওমলেট। লেবুর রস দু'গেলাস, আর ফল-মিষ্টিও ছিল। লোকটি সেণ্টার টেবিলে খাবার পরিবেশন করে বললো, 'ছোট বউমণি জিজ্ঞেস করলেন, চা না কফি দেবেন ?'

এম· জি· আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। আমি বললাম, 'যেটা খুশি।'

'কফিই দিতে বল।' এম· জি· বললো, 'হ্যাঁ শোনো, কফি নিয়ে তোমার ছোট বউমণিকেই আসতে বল।'

লোকটি চলে যাবার আগে বললো, 'আচ্ছা।'

'আসুন, শুরু করা যাক।' এম· জি· বললো, এবং লেবুর গেলাস আগে তুলে নিল।

লেবুর রসের অভ্যাস আমার নেই। তবু তুলে নিলাম, বললাম, 'আজকের রবিবারটা আপনার নষ্ট হবে না তো ?'

'নষ্ট হবে কেন ?' এম· জি· হেসে বললো, 'প্রত্যেক রবিবারই তো একরকম কাটে। আজ আপনার সঙ্গে কাটবে। অবিশ্যি বলা যায় না, কেউ কেউ এসে হাজিরও হতে পারে।'

আমাদের খাওয়ার মাঝখানেই, অনূর্ধ্ব ত্রিশ এক মহিলা ঢুকলেন। হাতের ট্রে-তে দু' কাপ কফি। ফরসা কোনো রকমেই তাকে বলা যায় না। স্বাস্থ্যটি ভালো। দেখে মনে হলো, সকালেই স্নান শেষে, চওড়া লাল পাড়ের হালকা হলুদের তাঁতের শাড়ি পরেছে। গায়ে হলুদ জামা। মাথার ওপরে ঘোমটা টানা থাকলেও, খোলা চুলের গোছা কাঁধের এক পাশ দিয়ে এলিয়ে দিয়েছে বুকের দিকে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথেয় সিঁদুরও সদ্য টানা, জ্বলজ্বল্ করছে। চোখ-মুখ খুবই সাধারণ। যদি বলতে পারতাম, নিতান্ত পাঁচ পাঁচি, তা হলেই ভালো হতো। কিন্তু অনুমান করে নিয়েছি· এ নিশ্চয়ই এম· জি· পত্নী, ছোট বউমণি। তবে তার শান্ত গম্ভীর চলার মধ্যে একটা শ্রী আছে, আছে একটা বিশেষ সহবত। সে সামনে এসে টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে বসলো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। অনেক দেখে দেখে, এই বিলিতী কেতাটি আয়ত্ত করেছি, মহিলাদের সম্মান দেখাবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হয়। দাঁড়ালো এম· জি·-ও। আমার নাম ঘোষণা করে বললো, 'এই সেই তোমার প্রিয় সাহিত্যিক।' আমার দিকে ফিরে বললো, 'আমার স্ত্রী মন্দিরা।'

আমরা পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলাম। মন্দিরা বললো, 'বসুন।'

'হ্যাঁ, বসুন।' এম· জি· বললো, 'তুমিও বসো মন্দিরা।'

আমি মন্দিরার দিকে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু চোখেই দেখছিলাম। অবিশ্যি যতোটা সম্ভব সভ্যতা বাঁচিয়েই। কারণ, মন্দিরা এম· জি'র স্ত্রী। আমার জানবার কৌতুহল স্বাভাবিক, দাম্পত্যজীবনে স্বামীকে সে কীভাবে গ্রহণ

করেছে যদিও এই রকম পরিস্থিতিতে, আর প্রথম দর্শনেই তা বোঝা আদৌ সম্ভব না। মন্দিরা শান্তভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বসতে খুবই ইচ্ছে করছে, কিন্তু আজ একেবারে সময় করতে পারবো না। আমি আজ এক য়গায় যাবো। আমি কিন্তু সত্যি আপনার একজন ভক্ত পাঠিকা। আর একদিন আসুন না? সারাদিন থাকুন, দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করুন। আপনার কাছে বসে গল্প শুনবো।'

মন্দিরার কথাগুলো স্পষ্ট। তার চোখে-মুখে তেমন বুদ্ধির দীপ্তি না থাকলেও, কথাবার্তায় একটা শান্ত স্নিগ্ধতা আছে।

এসব ক্ষেত্রে যা বলা উচিত, আমি তাই বললাম, 'হ্যাঁ, সময় করে একদিন নিশ্চয়ই আসবো।'

'অবিশ্যি যদি এঁর সময় হয়।' এম· জি-কে দেখিয়ে, মন্দিরা একটু হেসে বললো, 'আচ্ছা, আপনারা খান, গল্প করুন, আমি যাই। আজ ছেলেকে নিয়ে আমার বোনের বাড়ি যাবার কথা আছে।'

মন্দিরার কথা থেকে বোঝা গেল, আমার আর একদিন আসার জন্য তার স্বামীর সময় হবে কী না, তা জানবার কোনো কৌতূহল নেই। আমি তখনও বসি নি। মন্দিরা পিছন ফিরে চলে গেল। তাকে দেখে, আমার যেন অনেকটা পূজারিনীর মতো শান্ত নিরাবেগ মনে হলো। এম· জি'র সঙ্গে যদি মন্দিরাকে তুলনা করতে হয়, অন্ততঃ 'পহলে দর্শনধারী' হিসাবে, তা হলে এম· জি-কে নিশ্চয়ই আমি অনেক সুপুরুষ বলবো—'বাদ গুণবিচারি' হিসাবে? অবিশ্যি মন্দিরার গুণের কথা আমার অজানা। এম· জি'র গুণের কথা সর্ববিদিত।

'আপনার মনে অনেক প্রশ্ন।' এম জি· হেসে বললো, 'আগে খাওয়াটা শেষ করুন, তারপর বসে গল্প করা যাবে।'

আমি একটু লজ্জিত, ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'না না, প্রশ্ন আবার কিসের?'

এম জি তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। দুজনেই নিঃশব্দে খেতে লাগলাম। কিন্তু এম জি'র ঠোঁটে একটু হাসি লেগেই আছে। প্রাতঃরাশ হিসাবে খাওয়াটা ভুরিভোজের তুল্য। বললাম, 'বড় বেশি খাওয়া হয়ে গেল।'

'আমার অবিশ্যি রোজই সকালের এই মেনু।' এম জি বললো, 'সারাদিনে আর বিশেষ কিছু খাই নে। রাত্রের দিকে কী খাই, তা আপনি দেখেছেন। তবে মন্দিরা রোজই রাত্রে খাবার নিয়ে বসে থাকে। যা হোক একটু কিছু মুখে দিতেই হয়।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সারাদিনের পক্ষে খাবারটা তো খুবই কম বলতে হবে!'

'কেন?' এম· জি হাসলো, 'অনেকের অবিশ্যি ধারণা, মদের মধ্যে কোনো

খাদ্যগুণ নেই। তা বোধহয় ঠিক না। আমার মতো খাবার আমি ঠিকই খাই।' বলে, সে একটু শব্দ করে হাসলো, 'মদ কথাটা কতো অনায়াসে এ বাড়িতে এখন উচ্চারণ করা যায়, অথচ আমার বাবা ঠাকুর্দা, চোদ্দ পুরুষের মধ্যে, এ অভ্যাসটি কারোরই ছিল না।'

বলছেন কে? এম জি.!—সূর্যাস্তের পরে সুরাই যার একমাত্র পানীয়। এম. জি. খাবার শেষ করে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো, 'আমার পরিচয় কিছুটা পেয়েছেন, কিন্তু এ বাড়িটার আদি যেখানে, সেই যশোহরে এ পরিবারের পরিচয় পণ্ডিত বংশের। উত্তর কলকাতায় আমার জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে এখনও অন্নপূর্ণার নিত্য পুজা হয়। যাকে বলে একেবারে ধার্মিক, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ পরিবার। আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একদিকে নৈয়ায়িক, অন্যদিকে আইনজীবী। বাবাও সংস্কৃত কলেজ থেকে স্মৃতিতীর্থ হয়েছিলেন। মাছটা এ বাড়িতে যদিও ঢুকতো, মাংস কোনো কালেই না। তবে হ্যাঁ, ধর্ম, শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, এ সবের সঙ্গে গাঙ্গুলী বংশ সম্পত্তির দিক থেকে কখনো মুখ ফিরিয়ে রাখে নি।'

সেটা তো আমি এ বাড়ি দেখেই বুঝতে পারছি। কিন্তু গোটা পশ্চাদ্‌পট যে এতোটা ধর্মপরায়ণ প্রাচীন নৈতিকতার, তা বুঝতে পারি নি। আমি অবাক হেসে বললাম, 'আর এই এক পুরুষেই সব বদলে গেল!'

'এক পুরুষ বলতে আমিই।' এম জি বললো, 'আমার দাদাও অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ মানুষ, নিরামিষাশী। ইংরেজি আর সংস্কৃতে পারদর্শী, কলেজে অধ্যাপনা করেন। তা ছাড়াও আমাদের কিছু পৈতৃক ব্যবসা আছে। যেমন ধরুন, প্রেস,' ধর্মীয় বইয়ের ইংরেজি বাংলা সংস্কৃত পাবলিকেশন। সে সব দাদাই দেখেন, অবিশ্যি আমি অংশীদার বটে।'

চোদ্দ পুরুষের মধ্যে একটি বংশধরের বৈপরীত্যের কী অভূতপূর্ব মহিমা! তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না। আর এই বৈপরীত্যের কোনো সূত্রও আমার পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না। শেষ পর্যন্ত সেই এক কথা, মেলাতে পারছি না।

'বাবা চেয়েছিলেন, আমিও নিশ্চয়ই সংস্কৃতটা পড়বো।' এম. জি. সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'তার আগে ইংরেজিতে এম এ-টা ভালোই করে ছিলাম। সংস্কৃত আমার মন টানে নি, কিন্তু পড়া বন্ধ করি নি। এনসিয়েণ্ট হিস্টরির ওপর আমার আকর্ষণ ছিল। তবে রেজাল্টও খারাপ করি নি। অথচ বাড়ির কেউ ভাবতেই পারে নি, আমি শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আর প্রচারের জগতে আসবো। আসলে, এটাও আমার এক রকমের নেশা। ওয়ার্ল্ডের মাস্টারমাইণ্ডেড অ্যাডভারটাইজ অ্যাণ্ড পাবলিসিটির মহারথীদের সব কাজ আমি সব সময়ে জানবার চেষ্টা করি।

এই সময়ে সেই কাজের লোকটি আবার খালি ট্রে হাতে এলো। শূন্য

পাত্রগুলো সব তুলে নিয়ে যাবার আগে বললো, 'এখন আর কিছু দেবো ?'

এম· জি· একবার ডাইনিং টেবিলের দিকে দেখে বললো, 'না।'

লোকটি বেরিয়ে চলে গেল। আমি এম· জি'র শিক্ষাদীক্ষার কথা ভাবছিলাম। পারিবারিক পরিচয়ের সঙ্গে এরকম শিক্ষিত একটি লোক, যার অভুতপূর্ব দ্বৈতসত্তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অনঙ্গবাবু, বন্ধুত্বের স্বীকৃতি যখন দিয়েছেন, তখন জিজ্ঞেস না করে পারছি নে, গতকাল রাত্রে কোথায় ছিলেন ?'

'কোথাও ছিলাম, যেমন আপনি পরশু রাত্রে দেখেছেন।' এম· জি· শান্ত হেসে বললো, 'যে-ব্যাধ আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে, সে ঠিক সময়ে আমাকে শিকার করে। আমি তখন সেই অচেনা অদেখা ব্যাধের শিকার। কিন্তু আপনি বললে হয় তো বিশ্বাস করবেন না, পরের দিন আমার নিজেরই মনে থাকে না, ঠিক কোন্ মেয়েটির কাছে আমি গেছলাম। আজ সে সামনে দাঁড়িয়ে বললেও, আমার পক্ষে তাকে চেনা সম্ভব না !'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কী করে সম্ভব ?'

'তাও আপনাকে আমি বলতে পারবো না।' এম· জি· বললো, 'আপনি হয় তো এর কোনো ব্যাখ্যা করতে পারেন। জানি নে, জীবনে অনেক মুখের ভিড়ে তারা হারিয়ে যায় কী না, কিন্তু কাল বা পরশু যেদিনই বলুন, সেই বিশেষ মেয়েমানুষটিকে আমি আর চিনতে পারি নে। মেয়েমানুষ বললাম বলে কিছু মনে করবেন না।'

গণিকাদের মেয়েমানুষ বলাটা অযৌক্তিক বা অভব্যতা কী না, এমন সূক্ষ্ম বিচার আমার নেই। আমার পরশু রাত্রের কথা মনে পড়ে গেল। চুমকিকে এম· জি· বলেছিল, সে নাকি তার আগের রাত্রেই তার ঘরে গিয়েছিল। চুমকি তা নিয়ে সবাইকে ডেকে হাসি-ঠাট্টা করেছিল। আমিও ধরেই নিয়েছিলাম, এম জি ঠাট্টা করছে। ইচ্ছা করেই সে চুমকিকে মিথ্যা বলছিল। এখন তার কথা শুনে মনে হলো, সে মিথ্যে বলে নি, ঠাট্টাও করে নি। কিন্তু একটা মানুষের মধ্যে এতো বৈপরীত্যের অবস্থান, আমি আর কখনও দেখি নি। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কথা আপনার মনে আছে তো ?'

'নিশ্চয়ই।' এম· জি· বললো, 'এমন কি, কী সেই মেয়েটার নাম, যে আমাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল, তার চেহারাটাও আমার মনে আছে। আপনার জন্যই মনে আছে। এছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই।'

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, সেই রাত্রে ফিরে আসবার সময়, এম· জি'র ঘোর-লাগা আচ্ছন্ন মুখ। গভীর অন্যমনস্ক। প্রমত্ত বিলাসের শয্যাত্যাগী মানুষটিকে তখন চেনা যাচ্ছিল না। আমাকে স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হয়, এম· জি· একজন মদ্যপ বেশ্যাসক্ত ব্যক্তি। যদিও এটাই তার একমাত্র পরিচয় না, কিন্তু তার জীবনের একটা বড় অংশ। তার মধ্যে এই

বিভ্রম, আচ্ছন্নতা, বিস্মৃতি, এগুলোর কারণ কী? ইচ্ছা করেই ভুলে যাবার চেষ্টা? শুনেছি, এক শ্রেণীর মানুষ, তার যে-কোনোকে ভুলে যেতে চায়, তা সে ভুলে থাকতে পারে। সম্ভবতঃ মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় এর কোনো পরিভাষা বা বিশেষণ আছে, আমার জানা নেই। তবে বিস্মৃতির অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়, এমন লোক আমি দেখেছি। যতোদূর জানি, এ হলো অবচেতন মনের বিষয়। বিস্মৃতিটা আসলে ভুলে থাকবার ইচ্ছারই একটি প্রকাশ, অথচ সে বিস্মৃতি মিথ্যা না।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যদি কিছু মনেই না করতে পারেন, তবে কী করে জানতে পারেন, আপনি একটা ছকের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছেন?'

'আশ্চর্য!' এম. জি হেসে বললো, 'আমি তো আপনাকে একবারও বলি নি, সূর্যাস্তের হাতছানিটা আমি দেখতে পাই নে। সে-বিষয়ে আমি সচেতন। একটু আগেই আমি যে-ব্যাধের কথা বলছিলাম, আমি তখন তার শিকার। আর কিছুই আমার মনে থাকে না। তবে হ্যাঁ, আপনাকে আমি হয়তো ভেঙে বলতে পারবো না, আপনাদের ভাষায় যা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি, খিস্তি বা খেউড়, অর্থাৎ তথাকথিত ককেট্রি বলতে যা বোঝায়, সেদিকেই আমার টান।'

এ সব কথা যে-কোনো লোক শুনলেই তার মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব। অথচ এম. জি. কোনোও গোপনতা রাখে নি। ইতর ভাষায় খারাপ স্ত্রীলোককে যে-ভাষায় সম্বোধন করা হয়, এম. জি. তাই পরিষ্কার করে বলে দিল। স্বীকারও করলো, সেই ধরনের গণিকাদের প্রতিই তার আকর্ষণ বেশি। এক কথায় একে বিকৃতি ছাড়া কিছু বলতে পারি না। অথচ এম. জি. তা ভুলে থাকতে চায়, ভুলেও যায়।

আমি বললাম, 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার এ জীবনের শুরুটা কবে থেকে?'

এম জি কয়েক মিনিট চুপচাপ সিগারেট টানলো, তারপরে বললো, 'যে বয়স থেকে একটি ছেলে মেয়েদের দিকে মেয়ে হিসাবে দেখতে শেখে, বলতে পারেন তখন থেকেই।'

'কিন্তু সে সময়টা তো আপনার কেটেছে কলেজে, ইউনিভারসিটিতে।' আমি বললাম, 'বিশেষ করে অল্প বয়সের মধ্যেই আপনি দুটো বিষয়ে এম. এ পাস করেছিলেন।'

এম. জি. ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, 'সেইজন্যই আমার জীবনে ছাত্রাবস্থায় কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম ঘটে নি, যা আমার অনেক বন্ধুরই ঘটেছিল। তবে হ্যাঁ, সব মেয়ে তো এক রকম ছিল না, কারো কারো অঙ্গভঙ্গি বাচালতা বা সেই ককেট্রিই বলুন, তাদের ওপর আমার আকর্ষণ বেশি ছিল। আর

একটা কথা আপনার কাছে স্বীকার করতে পারি, দ্বিতীয়বার এম এ পরীক্ষার সময় আমি একবার গণিকালয়ে গেছলাম। সেটাও খুব আশ্চর্য ব্যাপার!'

আমি এম জি'র মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সে নিজেই বললো,' কালীঘাটের সেই পাড়া দিয়ে দিনের বেলা একদিন আসতে গিয়ে, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারি নি। আমি একটি মেয়ের ঘরে ঢুকেছিলাম। জীবনে সেই প্রথম। আর সেখান থেকে বেরিয়ে, সোজা কালীঘাটের গঙ্গায় জামাকাপড়সুদ্ধ স্নান করে, জলে ভিজে বাড়ি ফিরেছিলাম। পাপবোধের কি মহিমা বুঝুন!'

এম. জি. পাপবোধের মহিমা কথাটিকে বিদ্রূপ করে বললেও, আমার মনে কেমন একটা দ্বন্দ্ব, পাপবোধ তার নিশ্চয়ই আছে। সেই জন্যই, বিভ্রম, আচ্ছন্নতা, অন্যমনস্কতা, বিস্মৃতি। আমি হেসে বললাম, 'যদি তখন নিজেকে চিনতে পারতেন বা বুঝতে পারতেন, তা হলে নিশ্চয়ই বিয়ে করে সংসার জীবনযাপন করতেন না?'

এম জি'র মুখে মুহূর্তের জন্য ছায়া নেমে এলো। তারপরেই স্বভাব-সিদ্ধ হেসে বললো, 'অথবা এ-কথাই বলতে পারেন, সংসার-জীবনটা পেতেই ছিলাম সেই একই আকর্ষণে।'

'সেই একই আকর্ষণে!' আমি বিমূঢ় চোখে এম জি'র দিকে তাকালাম।

এম জি হাসলো। উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তা হলে, আমার জীবনের একটা বিশেষ অধ্যায় আজ আপনাকে শোনাই।'

এম জি সোফা থেকে উঠে, ডাইনিং টেবিলের এক পাশে রাখা রেফ্রিজারেটর খুলে বের করলো একটি বোতল। দেখেই বুঝলাম, বীয়রের বোতল। পাশেই একটি দেওয়াল আলমারি থেকে বের করলো দুটো গেলাস আর একটি বোতল খোলার যন্ত্র। সবই নিজের দু'হাতে নিয়ে এসে সেণ্টার টেবিলে রাখলো। সোফায় বসে, বীয়রের বোতলের মুখ খুললো। আমি বললাম 'আমার জন্য আর ঢালবেন না। আমার জলখাবারের আমেজটা নষ্ট হবে।'

'বেশ।' এম জি একটি গেলাস ভর্তি করে বীয়র ঢেলে, আর একটিতে অল্প ঢেলে বললো, 'একটু দেওয়া থাকুক, নইলে ঠিক মানায় না।'

আমি হাসলাম। এম জি নিজের গেলাসে একটি দীর্ঘ চুমুক দিয়ে বললো, 'আমাদের ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আপনাকে মোটামুটি বলেছি। সেইদিক থেকে দেখতে গেলেও, আমি এ পরিবারের অকাল-কুষ্মাণ্ড। এ পরিবারের কোনো পুরুষ যা কখনো করে নি, আমি তাও করেছি। আমি প্রেম করে বিয়ে করেছি।'

'মানে, মন্দিরা দেবীর সঙ্গে আপনার প্রেমজ-বিবাহ!' আমি অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

এম· জি· মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ। তবে আপনি যে মন্দিরাকে দেখলেন, আমি এ মন্দিরার প্রেমে পড়ে বিয়ে করি নি। গোলমালটা সেখানেই।'

গোলমাল এম· জি'র, না আমার। এম· জি'র নারী আকর্ষণের প্রকৃতি আর তার স্ত্রী মন্দিরার প্রকৃতি, দুয়ের মধ্যে কোথাও কোনো মিল আমার চোখে পড়ে নি। মন্দিরাকে দেখে বরং একেবারে বিপরীত মনে হয়েছে। কিন্তু শোনা ছাড়া আমার কিছু করার নেই। অতএব এম· জি'র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এম· জি· আবার গেলাসে চুমুক দিল। একটি সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। বললো, 'আপনাকে আগেই বলেছি, আমাদের একটা প্রেস আছে। মাঝে-মধ্যে কাজে-কর্মে আমাকে সেই প্রেসে যেতে হতো। ছাপার ব্যাপারে আমি বরাবরই একটু খুঁতখুঁতে ছিলাম, এখনও আছি। মনের মতো ছাপা না হলে, আমি বারেবারে তা রিজেকট করি। খুব দুর্মূল্য বইও যদি খারাপ ছাপা হয়, আমার পড়তে ইচ্ছে করে না। সুন্দর ছাপা হচ্ছে একটি সুন্দর নিষ্পাপ মুখের মতো, ভাষার গভীরে তার যে-অর্থই থাক।

'যাই হোক, আমাদের প্রেসটা যে পাড়ায়, তার আশেপাশের অধিবাসী সবই প্রায় মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বাস। প্রেসের যে-ঘরটায় আমি গিয়ে বসতাম, তার জানালা দিয়ে একটি সরু গলি, আর তার দু'পাশের পুরনো একতলা দোতলা বাড়িগুলো দেখা যেতো। সেখানেই আমি প্রথম মন্দিরাকে দেখতে পাই।'

এম· জি· কথা থামিয়ে আবার গেলাসে চুমুক দিল, একটু যেন ভেবে নিয়ে বললো, 'আমি দেখতাম, একটি মেয়ে সবে ফ্রক পরা ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। অতি উচ্ছল উদ্ধত তার স্বাস্থ্য। চোখ-মুখ মোটেই তেমন সুন্দর নয়, যা আপনাদের নায়িকার বিবরণে প্রায়ই পাওয়া যায়। বরং সেই হিসাবে মেয়েটিকে কুৎসিতই বলতে হবে। মেয়েটি থাকতো গলির মোড়ের সামনের বাড়িতেই। কেন না, প্রায়ই তাকে আমি রাস্তার ধারের জানালায় দেখতে পেতাম।

'মেয়েটিকে আমি যখন প্রথম ফ্রক পরা অবস্থায় দেখি, তখনই লক্ষ্য করেছিলাম, ওর চালচলনটা মোটেই রুচিকর নয়। বোধহয় এ রকম মেয়ে আপনারও চোখে পড়ে থাকবে। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, সেই মেয়েটির মেলামেশা কথাবার্তা দেখলে শুনলে, ভদ্রলোকদের ভালো লাগার কথা নয়। শাড়ি পরার পরেও তার আচরণের কোনো বদল হয় নি, বরং যাকে আমরা ভালগারাটি বলি, তারই যেন বাড়াবাড়ি দেখা যাচ্ছিল।'

এম· জি· আবার গেলাসে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললো, 'মেয়েটির বাবা-মা, ভাইবোনদের দেখতাম। দেখে বুঝতে পারতাম, এদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। ওর বাবা বড়বাজারের কোনো এক মাড়োয়ারীর

দোকানে সামান্য কাজ করতো। ভালো খাওয়া-পরা জুটতো না। ওরকম গরিব পরিবার সে-পাড়ায় অনেক ছিল। কিন্তু সকলে মন্দিরার মতো ছিল না। আমি দেখতাম, মন্দিরা সাজতে ভালোবাসতো। কিন্তু সাজবার মতো আয়োজন ছিল না। ফলে, মুখে খানিকটা পাউডার, চোখে কাজল, আর সামান্য জামাকাপড়ে ও যেন প্রায়ই নেচে বেড়াতো। সকলের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতো চোখ ঘুরিয়ে, কোমরে হাত দিয়ে, আমি চোখ ফেরাতে পারতাম না। অথচ লক্ষ্য করেছি, ও-পাড়ার সব গরিব মেয়েরাই ওর মতো ছিল না। তাদের আচরণ ভদ্র, শান্ত, এক কথায় যাকে বলে ভদ্র আর চালে সহবত।

'কিন্তু মন্দিরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। একে তো ওর উদ্ধত স্বাস্থ্য একটু যেন দৃষ্টিকটুভাবেই চোখে পড়তো। বা বলতে পারেন, আমাকে বিশেষ আকর্ষণ করতো। কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যেতো, লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি। পুরোপুরি ইস্কুলের বিদ্যেও ওর আয়ত্তে ছিল না। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতে গিয়ে, তাদের গায়ে চাপড় মারতেও দেখেছি। এমন কি, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঘরে অচল, এমন অশ্রাব্য উক্তিও করতে শুনেছি। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে আমি ক্রমেই ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছিলাম, আমার প্রেসে যাবার তাগিদও বেড়ে যাচ্ছিল।'

এম. জি. গেলাস শূন্য দেখে, আবার বোতল থেকে ঢেলে পূর্ণ করলো। আর আমি যেন এক অবিশ্বাস্য কাহিনী রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলাম। এম. জি গেলাসে চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলো, 'আপনাকে আমি আগেই বলে রাখছি, আপনি যেন ভাববেন না, একটি মেয়ের বয়সোচিত চটুলতা আমি বুঝতে পারি নে। সে জিনিস আলাদা। মন্দিরার বয়স তখন কতো হবে? ষোল-সতেরোর বেশি নয়। সেই বয়সে মেয়েদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা, লাজুকভাব, চটুলতা, নিজেদের বন্ধুদের মধ্যে কী রকম কথাবার্তা হয়, আমি জানি। কিন্তু মন্দিরার ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম। এমন কি, আমার প্রেসের অফিস ঘরে বসেই, পাড়ার ঝগড়ার সময় শুনতে পেতাম, মন্দিরার সঙ্গে পাড়ার কোনো মেয়ে মেশামিশি করে, তাদের বাবা মায়েরা তা পছন্দ করতো না। প্রায়ই দেখতাম, সস্তা জামাকাপড়ে সেজে, পাউডার কাজল মেখে একলাই সিনেমায় যাচ্ছে। এমন কি, দু-একবার দু-একটি ছেলের সঙ্গেও ওকে বেরোতে দেখেছি। আপনারা যাকে বলেন অশ্লীল, ওর সবকিছুতেই যেন সেই ভাবটা ফুটে উঠতো। আর সে-সবই আমাকে আকর্ষণ করতো। কেন, আমি নিজের কাছেও তার জবাব খুঁজে পেতাম না। আপনি সহজেই ধরে নিতে পারেন, আমার মধ্যেই নিশ্চয় বিকৃত কামনার বীজ ছিল।'

এম. জি. আবার থামলো, গেলাসে চুমুক দিল। আমি ভাবছিলাম, একটি ধর্মপ্রবণ পণ্ডিত বাড়ির শিক্ষিত যুবকের মধ্যে কেমন করেই বা বিকৃত মানসিকতার বীজ থাকতে পারে। যুক্তি বলে, সব কিছুরই পিছনে একটা

কারণ থাকে। এম. জি'র জীবন কাহিনীর মধ্যে কখনও সেই রকম কোনো কারণই আমি পাচ্ছি না। সে আবার বললো, 'অন্য কিছু না বলে, কর্কোট্রি আর ভালগারিটি বলতে যা বোঝায়, ওর মধো তাই ছিল। তার সঙ্গে ছিল, ওর আচরণের অবাধ্য দুরন্তপনা। আমি নিজের চোখেই ওদের খোলা জানালা দিয়ে দেখেছি, ওর মা ওকে চুল টেনে ধরে পিটছে, শাসন করছে, কিন্তু ও সমানে ওর মায়ের সঙ্গে বিচ্ছিরি ভাষায় ঝগড়া করতো। পরিষ্কার বলতো, 'হ্যাঁ, আমি তো খারাপ মেয়েই। তোমরাই বা কী ভালো? খেতে পরতে দিতে পারো না, এদিকে বছর বছর বিয়োচ্ছ, লজ্জা করে না? তুমি আর বাবা হচ্ছো সব থেকে নোংরা। আমি যা খুশি তাই করবো।' এর থেকে বোঝা যায়, ওর মতো বয়সের মেয়ের চোখের সামনে, বাবা মা তাদের দাম্পত্যজীবনের গোপনীয়তা বজায় রাখতে পারতো না। এদিকটা অভাবের কথা, দারিদ্র্যের কথা, আমি বুঝি। কিন্তু পাড়ার সব দরিদ্র মেয়েরাই তো ওর মতো ছিল না। বেশি কি বলবো, কালীঘাটের সেই পাড়ার মেয়েদের থেকে ওর আচার ব্যবহার কথাবার্তা একটুও ভালো ছিল না।

'এ পর্যন্ত গেল মন্দিরার প্রাথমিক পরিচয়।' এম জি থেমে গেলাসে চুমুক দিয়ে, আর একটি সিগারেট ধরালো, তারপরে বললো, 'আমি যে মন্দিরাকে লক্ষ্য করি, এটা ওর চোখে পড়তে আরম্ভ করেছিল। প্রথমটা নিশ্চয় ওর সংশয় ছিল, কারণ ও ভাবতেই পারতো না, আমি ওকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। আস্তে আস্তে ও যখন বুঝতে পারলো, আমি ওকে লক্ষ্য করি, তখন ও বাড়ির জানালা আশ্রয় করলো। প্রথম প্রথম হাসতো, তারপরে ওর সেই চোখ-মুখের ভঙ্গি। আমি উপভোগ করতাম, যাকে বলে এনকারেজ করা, হেসে তাই করতাম। ও আমাকে শুনিয়ে সস্তা প্রেমের গান শোনাতো। রাস্তাটা এমন চওড়া ছিল না যে শুনতে পাবো না। গলি বললেই চলে। আমি মাথা দুলিয়ে প্রশংসা করে হাসতাম। ও প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমেই আরও বাড়াবাড়ি শুরু করলো। শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাসই করবেন না, ও ওর গা খুলেও আমাকে দেখাতো। আমার রক্তে তোলপাড় করে উঠতো। আমি ওর সঙ্গলাভের জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলাম। ইশারা ইঙ্গিতে ওকে সে কথা জানাতে, ও নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করার ফন্দি বের করেছিল।

'আমি কখন বেরোই, বা বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছি, সেটা লক্ষ্য রেখে ও আগেই বেরিয়ে পড়তো, আর বড় রাস্তার ভিড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াতো। আমি তখনও তেমন স্বাধীন নই, বাড়ির ভয়ও ছিল, ওকে নিয়ে নানান জায়গায় চলে যেতাম। ট্যাকসি চাপবার মতো পয়সা ছিল, রেস্তোঁরায় খাবারও খেতাম। কিন্তু আমি ওকে পাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠতাম। আসলে, ওর মনে সন্দেহ ছিল, আমি ওকে কোনোরকমে ভোগ করে পালিয়ে যাবো। ও সে-সব সন্দেহ করে আমাকে যা-তা বলতো। ভাষা সবই অশ্রাব্য

কূশ্রাব্য। ইতিমধ্যে আমি জেনে নিয়েছিলাম, ওরাও ব্রাহ্মণ।'

এম· জি· থামলো, বোতলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফুরিয়ে গেছে। আর একটা বোতল নিয়ে আসি।' বলে, হেসে রিফ্রিজারেটর থেকে আর একটা বীয়রের বোতল বের করে নিয়ে এলো। আর আমি যেন মনে মনে রুদ্ধশ্বাস হয়ে, একটা আতঙ্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি। এম· জি· ওপনার দিয়ে বোতল খুলে গেলাসে বীয়র ঢেলে, সুদীর্ঘ একটি চুমুক দিল। বললো, 'ইতিমধ্যে বাড়িতে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, আমি বাধা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমি তখন মন্দিরাকে পাবার জন্য পাগল। অথচ বাড়িতে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু সাহস আমাকে ভিতর থেকে যোগাতে হয়েছিল। আমি মন্দিরাকে বিয়ের কথা বাড়িতে জানিয়েছিলাম। শোনামাত্র, আমার দাদার মাথায় প্রথম বজ্রপাত। তিনি প্রেসে যেতেন, মন্দিরাকে চিনতেন, পরিষ্কার বলেই ফেলেছিলেন, ওটা তো একটা সমাজের জঞ্জাল, কুলটা ছাড়া কিছু নয়। এ বাড়িতে ও মেয়ে আনা যায় না।

'কিন্তু আমার একটাই সৌভাগ্য ছিল, বাবা-মা তখন বেঁচে ছিলেন না। আমি মন্দিরাকেই বিয়ে করবো বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলাম। দাদা দেখলেন, আমার সঙ্গে পারবেন না। বললেন, বেশ ওই মেয়েকে যদি বিয়ে কর, তবে আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। আমি তাতেও রাজী ছিলাম। বলতে গেলে, আত্মীয়-স্বজন কেউ আসে নি, আমি মন্দিরাকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিলাম।'

এম· জি· থামলো, হাসলো, গেলাসে চুমুক দিয়ে বললো, 'ঘটনার এখানেই শেষ, এভাবেই আমি বিয়ে করে সংসারী হয়েছিলাম।'

আমি প্রায় সুপ্তোত্থিতের মতো বললাম, 'কিন্তু অনঙ্গবাবু, আপনার এ ঘটনার সঙ্গে, আমার জবাব মিললো না। আজ আমি যে মন্দিরা দেবীকে দেখলাম, আর আপনি যার কথা আমাকে শোনালেন, এদের কারোর সঙ্গেই কারোর মিল নেই।'

'আর সেটাই ট্র্যাজেডি বলুন আর কমেডি বলুন, ঘটে গেছে।' এম· জি· বললো, 'মন্দিরা বা ওর বাবা-মা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি, আমি সত্যি ওকে বিয়ে করবো। কিন্তু ঘটনা যখন ঘটে গেল, তখন সমস্ত ব্যাপারটার চেহারাও বদলাতে লাগলো। প্রথম প্রথম মন্দিরা যেমন এসেছিল, তেমনিই ছিল। সেই আচার আচরণ, অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা। কিন্তু পরিবেশ আর পরিস্থিতি ওকে আস্তে আস্তে বদলে দিতে শুরু করেছিল। আমার চোখের সামনেই ও এ পরিবারের উপযুক্ত বধূ হয়ে উঠতে লাগলো। ওর ভাষা বদলে যেতে লাগলো। আচার আচরণ বদলে যেতে লাগলো, যাকে বলে, এক বছরের মধ্যে মন্দিরাকে আর চেনা যেতো না। ওর পেটে তখন সন্তান। ও ভেবেছিল, আমাকে সুখী করার জন্যই ও নিজেকে এ বাড়ির যোগ্য করে তুলেছিল। আর

আমি আস্তে আস্তে ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলাম। এমন কি দিনের বেলা, দরজা বন্ধ ঘরে ওকে আদর করতে গেলেও, ও আমার কাছ থেকে সরে যেতো। আজ আপনি যে-মন্দিরাকে দেখলেন, সে-মন্দিরা আমাকে আর আকর্ষণ করে না। অথচ, আমি জানি, ও নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ পণ্ডিত অভিজাত পরিবারের বউ করে গড়ে তুলতে কীভাবে কষ্ট করেছে, নিজেকে তিলে তিলে বদলেছে। এমন কি, নিজের বাবা-মাকেও ও আর এ বাড়িতে আসতে দেয় না। বলে, বাবা-মা এ পরিবারে আসার যোগ্য নয়। আরও অবাক কথা শুনবেন ? আমার দাদা বউদি এখন মন্দিরাকে শুধু ভালোবাসে না, নিজেদের ঘরে ডেকে নিয়ে রীতিমতো আদর-আপ্যায়ন করে।'

শেষের এই অংশ যেন আমাকে একেবারে রুদ্ধশ্বাস হতবাক করে দিল। আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। মানব চরিত্রের অভূতপূর্ব বৈপরীত্যের কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এম· জি· বললো, 'এবার আপনার গেলাসে ঢালা সামান্য বীয়ারটুকু চুমুক দিয়ে দিন।'

আমি যেন এম· জি'র কথা শুনতেই পেলাম না। অথচ তার মুখের দিকে সপলক তাকিয়ে রইলাম। মানুষের ভাগ্য বা নিয়তির গূঢ় অর্থ আমি জানি না। কিন্তু যে সুপুরুষ লোকটি আমার সামনে বসে আছে, তাকে আমার মনে হলো, সংসারে এতো বড় দুর্ভাগা বোধহয় আর কেউ নেই। মনস্তত্ত্ববিশারদদের কাছে সে হয় তো সমীক্ষামূলক চরিত্র। আমি এখানে সমীক্ষকের ভূমিকা নিয়ে বসে নেই। অতএব চরিত্রের জটিলতার ব্যাখ্যাও করতে চাই না। আপাতদৃষ্টিতে যে-সুপুরুষ, ভদ্র, শিক্ষিত, বিনয়ী এবং অবশ্যিই রুচিশীল বলতে হবে, তার জীবনের এই ঘটনা শোনার পরে, তাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আমি আর কিছু বলতে পারি না। মাত্রই দু'দিন মেলামেশা, কিন্তু ইতিমধ্যেই মানুষটির প্রতি আমি এক রকমের করুণ ভালোবাসা অনুভব করছি। তার কথা রক্ষার্থে, আমি গেলাসের তিক্ত ও ঝাঁঝালো পানীয়টুকু গলায় ফেলে দিলাম। বললাম, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?'

'আপনার কাছে তো আমি কিছুই গোপন করি নি।' এম· জি· বললো, 'এখনও আপনার এতো সংকোচের কী আছে ? আমি আপনার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তুলে ধরেছি।'

সে-কথা আমাকে মানতেই হবে। জিজ্ঞেস করলাম, 'হয় তো এটা আমার সাধারণ কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নয়, তবু জানতে ইচ্ছে করছে, মন্দিরা দেবীর সঙ্গে এখন আপনার সম্পর্ক কেমন ?'

'তার মানে, আপনি জানতে চাইছেন, আমাকে আজকাল ও কী চোখে দ্যাখে ?' এম· জি· বললো, 'বললাম তো আপনাকে, ওর পুরনো জীবনটার আগাগোড়া বদলে গেছে। ও ঠিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে যায় নি, আমার স্পর্শকে ঘৃণা করে না, তবে যতোটা সম্ভব দূরে দূরেই থাকে। নিজের ছেলে, নিজের

পড়াশোনা, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিবাদ-বিসম্বাদ যেটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল, তা হয় না। সংসারে কোনো অনাসৃষ্টিও করে না। তবে ওকে হাসিখুশি দেখতে পাই না। অবিশ্যি আমি কতোক্ষণই বা আর থাকি।'

এম. জি একটু চুপ করে গেলাসে চুমুক দিল, আবার বললো, 'আর একটা বিষয় আমি বুঝতে পারিনে, ও আর আমাকে ভালোবাসে কী না? কিন্তু কর্তব্যে কোনো ত্রুটি নেই।'

আমি চুপ করে রইলাম। মানুষের সৃষ্টিকর্তা কে জানি না, তার কাছে মাথা কুটেও কোনো লাভ নেই। আমার মনে বিদ্যুচ্চমকের মতো একটি জিজ্ঞাসা বারে বারে ঝিলিক দিয়ে উঠলো, আজকের এই এম· জি মন্দিরাই সৃষ্টি করেছিল? সম্ভবতঃ না। কারণ, এম· জি'র কুলটা শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণের কথা, কালীঘাটের ঘটনাতেই ব্যক্ত। অথচ আমি কেন প্রাণভরে মেনে নিতে পারছি না, এ লোকটি আদ্যন্ত বিকৃত-কাম-রুচিগ্রস্ত? আবার মেনে নিতে না পারলেও, বিরোধিতা করার উপযুক্ত কোনো যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছি না। এখন মনে হচ্ছে, আমিই কোথাও গিয়ে, নতজানু হয়ে, এই চলমান অথচ চিরবধির বিশ্বকে জিজ্ঞাসা করি, জাগ্রত কর আমার অনুভূতি। আমাকে চিনতে দাও, বুঝতে দাও।

'কি, আমি কি শেষ পর্যন্ত আপনাকেই ভাবিত করে তুললাম নাকি?' এম জি· হেসে জিজ্ঞেস করলো, বললো, 'আপনাকে বিচলিত করতে চাই নি। তবে আপনাকে আমার তখনই মনে পড়ে যায়, যখন ভাবি, জীবনের ছকটা থেকে বেরিয়ে যাই কেমন করে?'

এম· জি'র এ কথার জবাব আমার জানা ছিল না। অতএব কোনো জবাবও দিতে পারি না। মানুষ হিসাবে আমরা আলাদা। ছকের ঘর কার নেই? আমারও আছে। সেই ছক থেকে আমিও বেরিয়ে পড়ার জন্য ছটফট করি। বেরিয়েও পড়ি। এম· জি'র গণ্ডীমুক্তির পথ আমার জানা নেই।

ইতিমধ্যে কোকিলের ডাক যেন ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছিল। ছাদের দিকের খোলা দরজা দিয়ে চোখে পড়ছিল, গাছের পাতায় দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা যেন বাড়ছে। শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। আর তখনই আমার মনে পড়ে গেল, সামনেই দোল পূর্ণিমা। আমি প্রস্তুত হয়ে আছি, বিশেষ একটি মেলায় যাবার জন্য। অবিশ্যিই তার প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন নেই। উত্তর চব্বিশ পরগনার সীমান্তে, নদীয়া জেলার শুরুর প্রান্তে, ঘোষপাড়ার মেলায় যাবার জন্য মনটা ব্যাকুল ছিল। এই নতুন না, আগেও গিয়েছি। সুযোগ পেলেই যেতে ইচ্ছা করে। বললাম, 'আপনার ছকের ব্যাপারটা আপনারই, আমি কোনোদিন আপনাকে ছক কাটার কৌশল শেখাতে পারবো

না। তবে আপনার বাড়িতে এসে আজ একটা কারণে বড় ভালো লাগলো। কলকাতায় বসে, এমন বসন্তের আমেজ, আর কোথাও পাই নি।'

'বসন্তের আমেজ!' এম· জি· যেন অবাক হলো, তারপরে হেসে বললো, 'ওহ্! ঐ কোকিলের ডাকের কথা বলছেন? এ-ডাক আমরা তো প্রায় বারো মাসই শুনি। সেইজন্যই বোধ হয় কানে বাজে না।'

আমি বললাম, 'আর আমার মনে পড়ে গেল, দু'একদিনের মধ্যেই দোল পূর্ণিমা। আমি ঘোষপাড়ার মেলায় যাবো।'

'ঘোষপাড়া! সেটা কোথায়?' এম· জি একটু চঞ্চল হলো।

আমি ঘোষপাড়ার স্থান ও স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য বিবরণ দিলাম। এম· জি· সাগ্রহে বললো, 'চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও যাবো। অবিশ্যি যদি আপনার কোনো অসুবিধে না হয়।'

আমি হেসে বললাম, 'অসুবিধে হবে কেন? সেখানে হাজার হাজার মানুষ যায়, আপনিও যাবেন। তবে সারারাত্রি মেলায় কাটাতে আপনার কষ্ট হবে কী না, সেটা ভেবে দেখবেন।'

'দেখাই যাক না।' এম· জি· বললো, 'কষ্ট যে খুব কম করতে পারি, তা ভাববেন না। আমাকে একেবারে অকর্মণ্য অলস বিলাসী ভাববেন না।'

আমি হেসে ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'আপনাকে আমি তা মোটেই ভাবি নি। আপনি যথেষ্ট কর্মিঠ লোক। কিন্তু এ রকম মেলায় আপনি কখনো বোধ হয় রাত্রি কাটান নি, তাই বলছি।'

'বেশ তো, একটা পরীক্ষা হয়ে যাক না।' এম জি হাসলো, আমি আগামীকালই অফিসে বলে রাখবো। গাড়ি নিয়ে যাবো কী?'

আমি বললাম, 'সত্যি কথা বলতে কি, গাড়ি নিয়ে ও রকম জায়গায় যেতে আমার ভালো লাগে না। ট্রেনে রিক্‌শায় পায়ে হেঁটে, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলার একটা আলাদা আনন্দ আছে। দূরত্বও তো তেমন নয়। তবে আপনি যদি গাড়ি নিয়ে যেতে চান—'

'না না, আমি কিছুই চাইছি না।' এম জি হাত তুলে বললো, 'আমি আপনার সঙ্গে আপনার মতো যাবো।'

আমি বললাম, 'বেশ, পরশু বা কবে পূর্ণিমা দেখে আপনাকে আমি জানাবো। তারপর বেরিয়ে পড়বো।'

পূর্ণিমার দিন বিকালে শিয়ালদহ থেকে রওনা। এম· জি· আমার সঙ্গী। দু'জনের কাঁধে ব্যাগ। চিরুনি, দাঁত মাজার ব্রাশ পেস্ট আর একটি চাদর এবং সামান্য দু'একটি টুকিটাকি জিনিস ছাড়া কিছুই নেই। আমি যখন প্রথম ঘোষপাড়ার দোল মেলায় গিয়েছিলাম, সেটা চল্লিশ দশকের গোড়ার

কথা। তখন কল্যাণী নামে ডঃ বিধান রায়ের কন্যা-নগরীটির জন্ম হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর মুখে আমেরিকানরা কয়েক হাজার গ্রাম দখল করে, সেখানে বিশাল বিমানক্ষেত্র, সৈনিকাবাস, বিরাট আধুনিক অস্ত্রাগার তৈরি করেছিল। জায়গাটির নাম দিয়েছিল, রুজভেল্ট টাউন। স্বাধীনতার পরে, পরিত্যক্ত সেই রুজভেল্ট টাউনের ওপরেই কল্যাণী নগরী গড়ে উঠেছিল। এম জি.-কে নিয়ে আমার যাত্রা পঞ্চাশ দশকের শেষে।

রুজভেল্ট টাউন বা কল্যাণী নগরী ঘোষপাড়ার কর্তাভজা ধর্মীয় শ্রেণীর স্থানকে কখনো স্পর্শ করে নি। আজ এই সত্তর দশকের শেষে আর সে-কথা বলা চলে না।

ট্রেনে• যেতে যেতে কর্তাভজাদের বিষয়ে আমার জ্ঞান মতো, মোটামুটি একটা বর্ণনা এম. জি-কে দিলাম। কে আউলেচাঁদ, কেমন করে ঘোষপাড়ায় তাঁর আবির্ভাব ঘটে, গল্পের মতোই সে-কাহিনী। মানুষটি খেল্‌না আর কাঁথা ব্যবহার করতেন। ভক্তদের বিশ্বাস, শ্রীচৈতন্যদেবই পরবর্তীকালে আউলেচাঁদ নামে আবির্ভূত হন। তাঁর শিষ্যরা নিজেদের আউল বলে। সম্ভবতঃ বাউল থেকেই আউল। তাদের ধর্মমতেও বিশেষ একটি মিল পাওয়া যায়। এরা কেউ হিন্দু দেবদেবীর আরাধনা করে না। গুরুই সত্য, গুরুই পরম। এরা গুরুকে বলে 'মহাশয়', শিষ্যকে বলে, 'বরাতি'। 'গুরু সত্য,' এই হলো প্রধান মন্ত্র। তারপরে 'কর্তা আউলে মহাপ্রভু' আমি তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্ধ তোমা ছাড়া নাই।'...এদের হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ নেই। নেহাত খোলাখুলি জাতপাতের কথা মনে রেখে, বাইরে কিছুটা আলাদা ভাব দেখালেও, ভিতরে ভিতরে মুসলমান গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিন্দু শিষ্য আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। তবে এদের মূল কথা, 'মানুষই সত্য।' কারণ স্বয়ং আউলেচাঁদ মানুষ ছিলেন।

এম. জি. আমার কথা শুনতে শুনতে বললো, 'আমি এদের নাম শুনেছি, কিন্তু আচার-ব্যবহার কিছুই জানি নে। কিন্তু সতী মায়ের নাম শুনেছি, তিনি কে?'

'উনি ঘোষপাড়ার রামশরণ পালের স্ত্রী।' আমি বললাম, 'সেখানে গেলে আপনি তাঁর ছবি দেখতে পাবেন, তবে আমি বলতে পারি নে, সে-ছবিটা কতোখানি খাঁটি। সেই সময়ে ছবি এঁকে রেখে, প্রতিকৃতিটিকে এখনও টিকিয়ে রাখা সম্ভব কী না জানি নে। আউলেচাঁদ যখন প্রথম ঘোষপাড়ায় আসেন, তখন এই সতীমা খুবই অসুস্থ ছিলেন। মারা যাবারই কথা। আউলেচাঁদ সামনের একটি পুকুর থেকে কিছু মাটি এনে, তাঁর সারা গায়ে লেপন করে দেন। তাতেই তিনি সুস্থ হন। তারপরে যেটা ঘটে, সেটা হলো আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আউলেচাঁদ হঠাৎ উধাও হন এবং সতী মায়ের গর্ভে তাঁরই সন্তান হয়ে জন্ম নেন। এই সন্তানের নাম, দুলাল।

সেই পুকুরটির নাম, হিমসাগর দীঘি। সেই পুকুরে ডুব দিলে, বন্ধ্যা নারী নাকি সন্তানবতী হয়, বোবায় কথা বলে, অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।'

'আপনি কি এসব বিশ্বাস করেন?' এম. জি. জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম, 'বিশ্বাস কথাটা অনেক বড়। কর্তাভজারা বিশ্বাস করে। সেখানে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন।'

কল্যাণীতে পৌঁছে আমরা রিক্‌শা নিয়ে মেলায় গেলাম। প্রকৃতপক্ষে দোলের আগের দিন থেকেই মেলা জমে ওঠে। চাঁচর হয়, ন্যাড়া পোড়ানো হয় এবং দোলের সঙ্গে রাসও হয়। কিন্তু যে-কথাটা আমি এম. জি.-কে বলি নি এবং যা চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না। যে কোনো কারণেই হোক, ঘোষপাড়ার মেলায় মেয়েদের ভিড় বেশি। তার একটা কারণ নিশ্চয়ই নারীর বন্ধ্যাত্ব, পরিত্যক্ত স্বামীর প্রেমকে পুনঃজাগরণ, ইত্যাদি আছে। তবু অস্বীকারের উপায় নেই, ঘোষপাড়ায় জ্যোৎস্না রাত্রে, বিশাল লিচুবাগানের আলোছায়ায় রমণী-পুরুষের নানা রকম আসর বসে। জানি নে, এরা ভক্ত কী না। সারা রাত্রি রান্নাবান্না চলে, তার সঙ্গে গান-বাজনা। কোনো কোনো আসরের গান-বাজনাকে আদৌ রুচিশীল বলা যায় না। অনেক রমণীর এবং পুরুষের আচরণকেও সুস্থ মনে হয় না।

মেলায় ঢুকে আগে আমরা ডালিমতলায় গেলাম। প্রবাদ, ডালিমগাছটি নাকি আউলেচাঁদের সময় থেকেই রয়েছে। সালের হিসাবে ধরলে, ষোলশো চুরানব্বুইয়ের কিছু পর থেকে। আর আউলেচাঁদ এখানে এসেই বসেছিলেন, সতীমাকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। ডালিমগাছের ডালে ডালে অনেক ঢিল দড়িতে ও ন্যাকড়ায় বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। সবই মানসিক করা। তা ছাড়া প্রায় শতাধিক মেয়ে-পুরুষ ডালিমতলায় হত্যা দিয়ে পড়েছিল।. কেউ কাঁদছিল, কেউ ওলটপালট খাচ্ছিল। কোনো অন্ধ কেবলই তার দুচোখ ঘষছিল। মেয়ের সংখ্যাই বেশি।

অনেক বন্ধ্যা, অন্ধ, বিকলাঙ্গ মেয়েদের হিমসাগর দীঘিতে স্নান করিয়ে, দণ্ডী খাটিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছিল ডালিমতলায়। পাছে তারা থেমে যায়, সেজন্য এমন কি তাদের প্রতি বেত্রাঘাত বা অন্যরকম দৈহিক পীড়নও চলছিল। এম. জি সে-দৃশ্য সহ্য করতে পারছিল না। বললো, 'যতো বিশ্বাসই থাক, মানুষের এমন অবস্থা আমি দেখতে পারি নে।'

আমি তাকে নিয়ে প্রাচীন ঘোষ বাড়ির অন্দর মহলে, সতী মায়ের ছবি দেখাতে নিয়ে গেলাম। এম. জি.'র মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, 'বাহ্, দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। চোখ দুটি অপূর্ব। জননীর থেকে জায়া হিসেবেই যেন ওঁকে বেশি মানায়।'

'কিন্তু কর্তাভজাদের কাছে ইনি মাতৃমূর্তি।' আমি বললাম।

এম. জি. বললো, 'জায়াও তো মা-ই।'

তারপরে এম জি -কে নিয়ে একসময়ে ঘুরতে ঘুরতে আমি লিচুবাগানের জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় গেলাম। সেখানে একটি আসরের সামনে এম. জি. দাঁড়িয়ে পড়লো। সেখানে তখন গান চলছিল। তা ছাড়া রান্নাবান্না গল্পের আসরও বটে। আমি এম. জি.কে বললাম, 'চলুন, আর একটু ফাঁকায় গেলে পূর্ণিমা রাত্রিটি আরও সুন্দর লাগবে। শুনছেন তো, দূরে কোকিল ডাকছে ?'

এম. জি. আমার কথার কোনো জবাব দিল না। আমি দেখলাম, সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই আসরের দিকে এগিয়ে গেল। কেউ কেউ তাকে সাগ্রহে ডাকলো। বিশেষ করে একটি যুবতী রমণী। গাছের ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না, দু' একটি টিমটিমে আলোয় আমি স্পষ্টই দেখলাম, সেই রমণীর চোখের তারায় দ্যুতি ও আমন্ত্রণ। আচরণে তার ভক্তির থেকে অন্য দিকটাই বেশি। সে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। এম. জি'র দিকে তাকিয়ে তার কোমরে যেন একটা নাচের ছন্দ লাগলো। উদ্ধত বুকের আঁচল লুটোচ্ছে। চোখের তারায় স্পষ্টই ইশারা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরা।

এম. জি. মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম, সঙ্গের লোকেরা আপত্তি করবে, কিন্তু করলো না। এম. জি. মেয়েটির পাশে বসলো। মেয়েটি একটি পাত্রে মুড়ি আর শসা এম জি-কে এগিয়ে দিয়ে আমার দিকে ফিরে বললো, 'এসো না গো ভক্ত, বসো। আমরা সবাই সমান।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সবাই সমান।' কয়েকজন প্রতিধ্বনি করলো।

হারমোনিয়ম আর তবলা বাজছিল। একজন পুরুষ গান করছিল। গানগুলো নিশ্চয়ই ধর্মীয়, যদিও সব কথার মানে বুঝতে পারছি না। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে এম. জি'র ঘনিষ্ঠতা যেন দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো। আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। মেয়েটি কি বিবাহিতা ? তার কি স্বামী সঙ্গে নেই ? সঙ্গীরা কারা ? এসব প্রশ্নের মধ্যে সব থেকে বড় প্রশ্ন জাগলো, মেয়েটি নিশ্চয়ই স্বৈরিনী না। অথচ তার হাসি চাহনি ভাবভঙ্গি আদৌ ভক্তিমতীর মতো না। আমি ডাকলাম, 'এম. জি. চলুন, ঘুরে আসি, পরে আবার এখানে আসবো।'

'আপনি ঘুরে আসুন, আমি এখানেই শিকড় গাড়ছি।' এম. জি. বললো।

দু' একটি মেয়ে হেসে উঠলো। একজন বর্ষীয়সী বললে, 'ওলো সুবি, তোকে দেখে মনে হচ্ছে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।'

এম. জি.'র পাশে বসা মেয়েটি বলে উঠলো, 'কপালের লিখন মাসী। এলাম এক মানসিক নিয়ে, এখন দেখছি কর্তার মনের ইচ্ছে অন্যরকম।'

'কী রকম ?' এম. জি. জিজ্ঞেস করলো।

সুবি বললো, 'তা জানি নে।' বলে, শসার টুকরো তুলে এম. জি'র মুখে পুরে দিল।

আমি দেখছি, এম. জি'র হাত ইতিমধ্যেই মেয়েটির সুঠাম হাঁটুর ওপরে। ঘটনাটাকে কাকতালীয় বলবো কী না, বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি

হতবাক স্তব্ধ। এ মেলার প্রকৃতি আমার একেবারে জানা নেই, এমন না। ইতিপূর্বে কিছু কিছু ঘটনা দেখেছি। নিজে কখনো জড়িয়ে পড়ি নি। এম· জি-কে নিয়ে আসার সময় এদিকটা একবারও ভাবি নি। এই মেলারই অন্য অংশে, একবার এক ত্রিশূলধারিনী ভৈরবী আর মত্ত ভৈরব মাত্র কিছু অর্থের বিনিময়ে এমন কাণ্ড করেছিল, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারি নি। কিন্তু এম. জি-কে এখানে ফেলে যাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি একটু দূরে ঘাস ও শুকনো পাতার ওপরে বসলাম। আর তখনই এম· জি· আর সুবি উঠে পড়লো। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, তারা মেলার উত্তরে নির্জনে চলে যাচ্ছে। সুবি যে কোন্ শ্রেণীর মেয়ে তা বুঝে উঠতে না পারলেও, তার হাসি ভাবভঙ্গি বিশেষ মেয়েদের কথাই মনে পড়িয়ে দিতে লাগলো। আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই, দুজনে বাঁ দিকের গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দ্রুত পা চালিয়ে সেদিকে গেলাম, তাদের দেখতে পেলাম না।

বাড়িটি অসামান্য। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। গাছপালার নিবিড় ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না যেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কেবল মেলায় ঢোকবার মুখে বড় বড় দোকানে, বা ছোটখাটো সার্বজাতীয় মেলার তাঁবু এলাকা থেকে মাইকের গান ভেসে আসছে। আমি পাগলের মতোই এম জি· আর সেই সুবিকে খুঁজতে লাগলাম। সারা মেলা ঘুরে ঘুরে বারে বারে সুবিদের আসরে ফিরে এলাম। তাদের দেখতে পেলাম না। তারাও কেউ কিছু বলতে পারলো না।

একসময়ে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে হাতের ঘড়ি দেখলাম। রাত্রি তিনটে বেজে গিয়েছে। আর একবার মেলা ঘুরে যখন ডালিমতলায় এলাম, তখন ভোরের আলো ফুটছে। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো সুবি—সেই স্বাস্থ্যোদ্ধত যুবতীটি স্নান শেষে, কাপড় বদলেছে। এখনও তার চুল ভেজা। কপালে ভোরের প্রথম সূর্যের মতো ডগডগ করছে সিঁদুরের ফোঁটা। সে মন্দিরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি তার দিকে এগোতে গিয়েই ডান দিকে চোখ পড়লো। দেখলাম, এম· জি· উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছে। চোখে তার ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসা। উন্মাদ ব্যাকুলতাই বলতে হবে। নিশ্চয় সুবিকেই খুঁজছে, অথবা আমাকে? দেখছি, তার ধুতি পাঞ্জাবি দলা মোচড়া, আবির সিঁদুর ধুলা লাগানো। সারারাত্রি জাগরণে চোখ দুটো লাল। ডালিমতলার প্রাঙ্গণে, সে প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। দেখতে দেখতে মন্দিরের কাছে, সুবির কাছাকাছি গেল। কিন্তু বিভ্রান্ত দৃষ্টি আবার অন্য দিকে ফিরে গেল। সে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি সুবির দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, তার চোখ বোজা, যেন

ধ্যানস্থ। নতুন শাড়ি পরলেও গায়ের জলে নানা খানে ভেজা। যেন শিশির ভেজা ফুলের মতো। আর তাকে দেখে, আমি রাত্রের মূর্তিটা যেন মনেই করতে পারছি না। এখন তাকে দেখাচ্ছে পূজারিনীর মতো।

আমি এম· জি'র সামনে গেলাম। ডাকলাম, 'অনঙ্গবাবু, শুনুন—'

এম· জি আমার দিকে শূন্য চোখে ফিরে তাকালো, যেন আমাকে ঠিক চিনতে পারছে না। আমি তার হাত ধরে ডাকলাম, 'অনঙ্গবাবু, আপনি সারারাত কোথায় ছিলেন? আমি আপনাকে খুঁজছি।'

'সুবি—সুবাসী কোথায় বলতে পারেন?' এম· জি· আচ্ছন্ন স্বরে বললো, তার চোখে-মুখেও একটা আচ্ছন্নতার ঘোর।

আমি মুখ ফিরিয়ে চকিতে একবার সুবির দিকে দেখে বললাম, 'সে তো আপনার সঙ্গেই ছিল। আপনি জানেন না, সে কোথায়?'

'না।' এম জি ব্যাকুলভাবে মাথা নাড়লো, 'না, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখের সামনেই সে ভিড়ের মধ্যে পুকুরে নামলো, তারপরে উঠে আসতেও দেখেছি, কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল সে? আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

আমি এম· জি'র চোখের দিকে তাকালাম। আচ্ছন্ন একটা ব্যাকুল হাহাকার। অথচ এইমাত্র সে সুবি নামে রমণীর কাছ থেকে ঘুরে এলো, কিন্তু তাকে দেখতে পেলো না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি মেয়েটির সেই আস্তানায় গেছলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সুবাসী সেখানে নেই।' এম· জি· বললো, 'আমি সেই হিমসাগর না কী নামের দীঘি, সেখান থেকে সারা মেলায় তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি না।'

আমি আবার সুবির দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকতে পারছে না। অথচ ঢোকবার তেমন কোনো চেষ্টাও নেই। সে দু' হাত বুকের কাছে রেখে, চোখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে, মন্দিরের মধ্যে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে। আশেপাশের নরনারী অনেকেই তাদের সরঞ্জাম নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে চলেছে।

আমি এম· জি'র হাত ধরে মন্দিরের কাছে গেলাম। দাঁড়ালাম সুবাসীর অনেকটা কাছে। সুবাসীর চোখ বন্ধ, আর দেখলাম, তার দু' চোখে যেন জলের ধারা নামছে। এম জি· সুবাসীর দিকে তাকালো, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, আবার অন্যদিকে পা বাড়ালো। আমি অবাক হলাম। এম· জি কি সুবাসীকে দেখতে পেলো না? নাকি তাকিয়েও চিনতে পারলো না? আমি তার দিকে এগিয়ে বললাম, 'দেখতে পাচ্ছেন না?'

'না, না তো!' এম· জি· ব্যাকুল আচ্ছন্ন স্বরে বললো, 'কোথায় গেল ও, কোন্‌দিকে?'

আমি মুখ খুলতে গিয়েও চুপ করে রইলাম। জীবনের এক আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ঘটনা আমি দেখছি। যাকে সারারাত ধরে একজন দেখলো, এখন এতো কাছে দাঁড়িয়েও তাকে না চিনতে পারার কারণ কী? জীবনের একি কৌতুক!

এম· জি প্রাঙ্গণের দক্ষিণের দরজার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলো। আমি তার হাত ধরে বললাম, 'এখানেই দাঁড়ান, হয় তো সুবাসী ঘুরে ফিরে এখানেই আসবে।'

এম জি মাথা নাড়লো, 'না না, সে ভিড়ের মধ্যেই কোথাও আছে, আমি দেখি।'

আমি আবার সুবাসীর দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে মন্দিরের কাছ থেকে সরে এসে পূর্বদিকে হেঁটে চলেছে। ধীর মন্থর তার গতি। গত রাত্রের সেই চটুল দেহজীবিনীসুলভ কোনো আচরণের চিহ্নই তার মধ্যে নেই। আমি এম জি'কে সেদিকে ফিরিয়ে হেঁটে চললাম। এম জি আমার সঙ্গে চললো। সুবাসী আমাদের কাছে থেকে বেশি দূরে না। সে একলা হাঁটছে। এম জি· সেদিকে তাকিয়ে দেখছে, কিন্তু চোখে তার একই ব্যাকুল সন্ধান, আর ঘোরের আচ্ছন্নতা।

আমি আর এম· জি· পূবের পাঁচিলের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সুবাসী আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। এম· জি· একবারও তার দিকে তাকালো না। বিভ্রান্তের মতো আশেপাশের সকলের মুখের দিকে দেখছে।

আমি কথা বলতে চাইলাম। মনে হলো, আমার জিহ্বায় গলায় যেন এক পাথরের ভার। আমি কিছুই বলতে পারছি না। অথচ এম· জি'র চোখের সামনে দিয়ে সুবাসী আপন মনে চলে যাচ্ছে। এখন তার চোখ খোলা, কিন্তু তারও দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন, মুখ অন্যমনস্ক।

আমি কথা বলতে পারছি না। অথবা ইচ্ছা করেই হয় তো বলছি না। কিন্তু জীবনরঙ্গের একি আশ্চর্য খেলা! বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ বিশ্বাস না করে উপায় নেই। সুবাসীকে হয় তো জীবনে আমি আর কখনোই দেখবো না, তার জীবনের কথাও জানবো না। কিন্তু এম জি'কেও কি চিনতে পারছি? পারছি না, তবু আমার বুকের মধ্যে যেন একটা ঢেউ জেগে উঠছে। সুখ ও দুঃখ, যুগপৎ আমার মনে একটা স্রোতের সংঘর্ষে, চোখ দুটো ঝাপসা করে তুলছে।

আমি এম. জি'র হাত ধরে, অন্যদিকে হাঁটতে লাগলাম। এম· জি'র চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে।

মাস খানেক পরে, এম. জি.'র বাড়িতে বসেই তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি নিজেই তাকে সেই ঘটনার কথা বললাম। এম. জি'র মুখে ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্নতা নেমে এলো. শান্ত হেসে বললো. 'হতে পারে, আমি জানি নে। আমি ওকে খুঁজে পাই নি। বোধহয়, সুবাসী তখন আমার জগত থেকে হারিয়ে গেছলো।'

আর আমার মনে হলো, বিকার না, বিশুদ্ধ চিত্তেরই আর-এক রূপ আমি দেখেছি। এম. জি. আমাকে তখন তার কোষ্ঠীর কথা শোনালো। সে প্রথম এম এ পাস করার পরে তার বাবা তাকে কোষ্ঠীটি দেখান। জ্যোতিষীর বিচারে অনঙ্গমোহন ছিল দগ্ধশুক্র জাতকের পুরুষ। গণিকাগমন নাকি যার ভাগ্যের অমোঘ নিয়তি।

আমি জ্যোতিষী জানি না, তার বিচারও জানি না। এম. জি'র বাবা যদি তাঁর পুত্রকে কোষ্ঠীটি না দেখাতেন, তা হলে কী হতো ? সেই ভবিষ্যতের বিচারও আজ নিরর্থক। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এই মানুষটি যেন আপন খাঁচায় অচিন পাখি। নিজের ভিতরের মানুষটির সঙ্গে তার কখনো কখনো দেখা হয়, যেমন হয়েছিল সেই মেলায়। আমি দেখছি, বিপরীত দিক থেকে, অবচেতনে, এ এক শুদ্ধ মনের মানুষ। বাইরে তার আর এক রূপ, যেখানে সে নিজেকে ব্যাধের শিকার বলে জানে।

বাইরের এই মানুষটিকে না, ভিতরের সেই মানুষটিকেই আমার নমস্কার। নমস্কার আরও, যার উদ্দেশ্যেই হোক. প্রার্থনা, পাখীটি অন্ধকার খাঁচা থেকে মুক্ত হোক। শুদ্ধাশুদ্ধের সংঘর্ষ থেকে, সে কি কোনোদিন, সেই ভিন্ন রূপিনী সুবাসীকে চিনতে পারবে না ? সেই সুবাসীই বা কবে চিনবে ?

এম. জি. বললো, 'আবার কবে বেরিয়ে পড়বো, এখন সেই অপেক্ষা।'

আমারও সেই একই অপেক্ষা।

———